অ-সঙ্গ

গীতায় "সঙ্গ" শব্দ আসক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গহীনতা ীলে যেমন অনাসক্ত ভাব বুঝায়, অপর দিক দিয়া তেমনই মানুষের সঙ্গ রিত্যাগ করিয়া একাকী, গৃহহীন, অনিকেতন অবস্থাকেও বুঝায়। গান্ধীজী ধু অনাসক্তি নয়, সঙ্গহীনতার সাধনাও অভ্যাস করিতেন। সেই বিষয়েই ালোচনা কবিব।

একটি একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা লইয়াই আরম্ভ করি। বিষয়টি আমার ক্ষে লজ্জার হইলেও তাহাব মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুও আছে বলিয়া সঙ্কোচ রিত্যাগ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস, তারিখ ১৭। ান্ধীজী তখন নোয়াখালি পরিক্রমাব পর বিহারে উপস্থিত হইয়াছেন। ্দিন আমরা সকলে পাটনা-গয়া লাইনে তারেগনা স্টেশনে নামিয়া দাঙ্গা- ্ধ্বস্ত মসৌড়ি নামে একটি স্থানে চলিযাছি। পথে প্রচণ্ড ভিড়। প্রতি টশনে, এমন কি স্টেশনের বাহিরেও বিপুল জনতা হাতে পতাকা লইয়া াভাযাত্রা করিয়া গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। গাড়ির পাদানিতে র্শনেচ্ছু লোকের ভিড় বারংবার জমিয়া উঠিতেছে; গান্ধীজী জানালার পাশে সিয়া কিছু লিখিতেছেন, মাঝে মাঝে জনতার দিকে ফিরিয়া নমস্কার রিতেছেন। গ্রামের লোক সাজ-গোজ করিয়াও যেমন আসিয়াছে, তেমনই াঠের চাষী ধূলাপায়ে সোজা পাশের মাঠ হইতে ছুটিয়াও আসিয়াছে।

আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভ্যাস আছে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া ম্পাদনের জন্য মাঠে যাইতে হইলে আমি মাটিতে একটি গর্ত করিয়া থাকি, বং মাটি খুঁড়িবার জন্য কোন ছোট অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। ্রূপ কাজের জন্য কি অস্ত্র লইলে সুবিধা হইবে, অথচ যাহা পুঁটুলির ভিতরে হজে বহন করা যায়, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গবেষণা করিয়াছি ও একটির র একটি অস্ত্রের পরীক্ষাও করিয়াছি, কিছুতেই যেন সন্তোষ লাভ করিতে ারি নাই। যখন আমরা তারেগনার জন্য রেলে চলিয়াছি, এমন সময়ে একটি টশনে দর্শনেচ্ছু জনতার মধ্যে অকস্মাৎ এক চাষীর হাতের একখানি সাধারণ রপির উপরে নজর পড়িল। প্রচণ্ড ভিড় এবং কোলাহলের মধ্যে তাহাকে

ডাকিয়া খুরপিখানি চাহিয়া লইলাম। মনে হইল, ইহার দ্বারা কাজ হইবে। তাহাকে বলিলাম, তুমি এটি আমাকে দিবে? পয়সা দিতেছি, এইরূপ আর একখানি খরিদ করিয়া লইও। সে ইতস্তত করিতে লাগিল। আমি জিনিসটি ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু পাশের জনতা সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, গান্ধীজীর সঙ্গের লোক এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন, ইহার দাম লইও না, এমনই দিয়া দাও। লোকটি এই হট্টগোলের ভিতরে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া রাজি হইয়া গেল। জনতার মধ্যে পতাকাধারী কংগ্রেসকর্মীগণ হাঁকিয়া বলিলেন, আমরা উহার ব্যবস্থা করিয়া দিব, আপনি খুরপিটি লউন ইত্যবসরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি খুরপিখানি আজও রাখিয়া দিয়াছি কোনদিন ব্যবহার করিতে পারি নাই, বা তাহাব সুযোগ ঘটে নাই।

মাঝে মাঝে এই ঘটনাটির বিষয়ে ভাবিয়াছি। গান্ধীজীর পার্শ্বচর ত্যাগী মহাপুরুষের পার্শ্বচর, অতএব ত্যাগের বিভূতিতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই বিভূতির সুযোগ লইয়া একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য নয়, অনাবশ্যক দ্রব্যকে স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করিতে পারিলাম। তাহাও জনসাধারণের কোনও প্রয়োজনে নয়; একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। ইহার গ্লানি আমার পরিপূর্ণভাবে আজও কাটে নাই, এবং আমাকে সাবধানও করিযা দিয়াছে—যেন কোনও ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া না খাই। কিন্তু ত্যাগ বা মহিমার ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া খাইবার প্রবৃত্তি যে কী তীব্র আকার ধারণ করে, তাহা আমি নিজের জীবনে এবং বন্ধুদের জীবনেও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। তাহার আকস্মিক ছায়ায় সেবাধর্ম বা অপর কোন বৃহৎ ধর্মও ক্ষণেকের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা দীর্ঘদিন গান্ধীজীর পাশে থাকিয়া বহু তপস্যার মধ্য দিয়া গিয়াছেন অনাহার, অর্ধাহার, শারীরিক শ্রম, মৃত্যুভয় প্রভৃতিও যাঁহাদিগকে সেবাধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যেও ছোটখাট ঘটনায় অসাবধানতার পরিচয় পাইয়াছি। সামান্য এক জোড়া জুতা কিনিতে হইবে তাহার জন্য কোনও ভক্তের প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চড়িয়া পাঁচ টাকার তেল পুড়াইতে আমরা লজ্জিত হই নাই। ভক্ত গাড়িখানি ব্যবহার করিতে দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমাদের তিন টাকার জুতা কিনিতে গিয়া সস্তার বাহন খোঁজা উচিত ছিল কি না, ইহাও তো ভাবিবার বিষয়।

গান্ধীজীর পার্শ্বচরদের দশা যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিজের মধ্যে এইরূপ সতর্কতায় শিথিলতা কখনও অনুভব করি নাই। দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্মভাব স্থাপন এবং তাহাদের মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে সেই ভাব কম্পাসের কাঁটার মত সর্বদাই এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া থাকিত। সঙ্কেতের দ্বারা তাঁহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিত। বস্তুত উহাই তাঁহার রক্ষাকবচের মত ছিল।

ইহার ফলে গান্ধীজীর দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজের জন্য তিনি যথাসম্ভব কম খরচ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে যখন চম্পারণে সত্যাগ্রহ চলিতেছে, তখন তো তিনি নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিন আনার বেশি ব্যয় করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে নানাভাবে শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে ডাক্তারদের পরামর্শমত তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহার মূল্য তিন আনার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃদ্ধি পাইলেও শরীরের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন, তিনি সে সীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করিতেন না।

পূর্বে গান্ধীজী ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু একটি কলম হারাইয়া যাইবার পর তিনি সাধারণ নিব-যুক্ত কলমেই লেখার কাজ চালাইতেন। রেলে বা মোটরে লিখিবার সময়ে তাঁহাকে আমাদের কাহারও কলমই ব্যবহার করিতে দিতাম, কিন্তু অপর সকল সময়ে তিনি উহাকে বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কেহ দামী কলম উপহার দিলে, যত শীঘ্র পারেন তাহা আর কোনও অভাবী লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া তবে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। লিখিবার উপযুক্ত এক টুকরাও সাদা কাগজ তাঁহার কাছে ফেলিবার উপায় ছিল না। পুরাতন খাম কাটিয়া, তাহার লেখা অংশের উপরে নূতন কাগজ সাঁটিয়া তিনি চিঠিপত্র পাঠাইতেন। লাট সাহেবের নিকটেও এইরূপ মেরামত-করা খামে চিঠি পাঠানো হইয়াছে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ কোন বস্তু অপচয়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে কখনও কখনও তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণস্বভাবের মনে হইত।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কার্পণ্যের ভাব তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। যখন কোনও কাজের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তখন তিনি

প্রয়োজন বিবেচনায় তাহা ব্যয় করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার নোয়াখালি হইতে দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের নিকট অত্যন্ত জরুরী চিঠি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। ডাকেও তাড়াতাড়ি পাঠানোর উপায় ছিল। কিন্তু পূর্বে দুই-একখানি চিঠি ডাকে পাঠানোর ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনও উপায়ে তাহার মর্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া সেবার গান্ধীজী ট্যাক্সিযোগে ফেণী, এবং ফেণী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিশেষ এরোপ্লেনের সাহায্যে ও কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত প্লেনে লোক মারফত চিঠি পাঠাইবার আদেশ দিলেন। ফলে, একখানি চিঠির পিছনে কয়েক শত টাকা খরচ হইয়া গেল। এ বিষয়ে গান্ধীজী যে নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা বহুদিন পূর্বে লেখা একখানি প্রবন্ধের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

Because an institution happens to have plenty of funds it does not mean that it should anyhow spend away every pie that it possesses. The golden rule is not to hesitate to ask for or spend even a crore when it is absolutely necessary and when it is not, to hoard up every pie though one may have a crore of rupees at one's disposal. —(*Young India*, 21-5-31, p. 118)

টাকা বা কোনও বস্তুর প্রতি গান্ধীজীর আসক্তি ছিল না, বৈরাগ্যও ছিল না। স্বাস্থ্যের বা শরীরের সম্বন্ধেও তাই। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার যত্নের অভাব ছিল না; অথচ প্রয়োজন হইলে শরীরকে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিবার জন্য তিনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। অত্যন্ত নিয়মিত ভাবে চলিয়া, পরিমিত সু-সম আহার করিয়া যে দেহযন্ত্রকে সেবাধর্মের উপকরণস্বরূপ তিনি রক্ষা করিতেন, আবার মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগাইবার জন্য সেই দুর্বল শরীর লইয়া পদব্রজে নোয়াখালি পরিক্রমার সঙ্কল্প লইতে, অথবা কলিকাতায় আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, আমি চিকিৎসকদের চেষ্টায় শুধু দেহধারণ করিয়া পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। আমার দেহ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সজীব জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকিবে—ইহা আমার নিকট অসহ্য মনে হয়। কাজ করিতে করিতে দেহপাত ঘটুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

টাকা এবং স্বাস্থ্যের সম্পর্কে তিনি যে উদাসীনতার পরিচয় দিতেন, নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কেও তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। মানুষ অনেক সময়ে নিজের চেয়ে নিজের ছেলেকে বেশি ভালবাসে। নিজের মৃত্যু কামনা করিতে পারে, কিন্তু নিজের রচিত কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত করিলে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু বিচিত্র এই যে, গান্ধীজী এ বিষয়ে মমতাশূন্য ছিলেন, অথবা মমতাশূন্যতার অতি নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সবরমতীর আশ্রম, অথবা গান্ধী সেবা-সংঘ নামক সংঘকে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া নূতন রূপ দেওয়ার কাজ যেমন তিনি নিঃসঙ্কোচে করিয়াছিলেন, একদিন প্রয়োজনবোধে সেবাগ্রাম পরিহার করিয়া পূর্ববঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেও তেমনই তাঁহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। পিছনের কোনও টান তাঁহার ছিল বলিয়া কেহ অনুভব করে নাই।

নোয়াখালি পৌঁছিবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জানাইলেন যে, এখানে তিনি শুধু ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য আসেন নাই, বরং স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য, বাঙালী হইবার জন্যই, আসিয়াছেন। প্রথমে ঠিক বুঝা যায় নাই, কতদিন থাকিতে হইবে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এখানকার কাজের জন্য কয়েক বৎসর ব্যাপী স্থির চেষ্টার প্রয়োজন। এবং অনুভবমাত্র সেই কার্যে নিষ্ঠার সহিত লিপ্ত হইলেন, পিছনের দাগ যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন।

গান্ধীজী ঐ কারণেই বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ কারণেই আশ্রম হইতে আগত সহকর্মী পিয়ারেলাল, অমতুস সলাম, সুশীলা নায়ার সুশীলা পাই, ঠক্কর বাপা প্রভৃতি সকলকে দূরে সরাইয়া একান্ত আশ্রয়হীনভাবে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করিয়া তাহাদের বদ্ধ হৃদয়ের দুয়ারে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভয়পঙ্কে নিমগ্ন, অত্যাচারজর্জরিত হিন্দুকে উদ্ধার করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন সুহরাবর্দি গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে চেষ্টার অবধি ছিল না, মুসলিম লীগের কর্মীগণ মুসলমান জনসাধাধারণের উপরে তাঁহাকে

মূল্যস্বরূপ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিত ময়দানে নামাইবার জন্য অছিলার পর অছিলা খুঁজিতেছেন, ইহা তাহারা জানিত এবং সেই জন্যই গান্ধীজীকে ইসলামের প্রবলতম শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াও যে কেহ নোয়াখালিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহান্ত ঘটাইতে পারিত, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঝাঁপাইয়া সেই আগুনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। সেই ঝাঁপাইবার কালে তাঁহাকে স্বহস্তে নিজের পুরাতন বন্ধনগুলি উৎপাটিত করিতে দেখিয়াছি। এরূপ বীর্যের এক অমোঘ আকর্ষণ আছে বলিয়া গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা যখন নোয়াখালি হইতে বিহারের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখন বাঙালী সেবকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সেবাকার্যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই জন্য রান্না কাপড়-কাচা প্রভৃতির কাজে ব্রতী একটি বালককে বিহার পর্যন্ত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইল। কে জানে, সেখানে গিয়া আবার নূতন লোককে এই কাজে তৈয়ারি করিতে কত দিন সময় লাগিয়া যাইবে? কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন, এরূপ একজন কর্মীকে এখানেই কোন গ্রামের মধ্যে কাজের জন্য রাখিয়া যাইতে চাই। সামনে যাহা হইবার তাহা হইবে, আমার কোন কাজ আটকাইয়া থাকিবে না।

এরূপ কথা শুনিলে মনে আনন্দ হইত; আবার ভয়ও হইত এই ভাবিয়া যে, বারংবার পরীক্ষা ও পরিবর্তনের ভার তাঁহার দুর্বল শরীর কতদিন সহ্য করিবে? নিকেতনহীন মানুষ, কিন্তু নিকেতনের বিকল্পে অন্তত স্থির সেবার একটা আচ্ছাদন তো চাই।

কিন্তু বিহারে অবস্থানকালে গান্ধীজীর চরিত্রে একটি সংস্কারের আভাস নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। ইহার জন্য ততটা প্রস্তুত ছিলাম না। গান্ধীজী নিজে হাতে পুরাতনের রজ্জুবন্ধনগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেও তাহারা তো তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। যে চন্দ্র সূর্যের দীপ্তি লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সূর্যের পক্ষে তাহাকে দরকার নাই; কিন্তু চন্দ্রের তো সূর্যকে প্রয়োজন

হইয়া উঠে। সে বস্তু অনুভব করিয়াই গান্ধীজী সাময়িকভাবে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিবার সময়ে সেবাগ্রাম হইতে আগত সহচারীগণকে বলিয়া গেলেন, এবার তোমাদের পরীক্ষার সময়। আমি নিকটে থাকিব না, হয়তো সারা জীবন তোমাদিগকে এখানে অতিবাহিত করিতে হইবে, সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক থাকিবে না, এমন অবস্থায় যে অধঃপতিত মনুষ্যত্বের পঙ্কোদ্ধার করিবার কাজে একাগ্র থাকিতে পারিবে, সেই সার্থক হইবে। সার্থকতা ভিন্ন তাহার আর কোনও পুরস্কার নাই।

বিহারে গান্ধীজী চলিযা আসিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, নোয়াখালি হইতে নয, অপর প্রান্ত হইতে আশ্রমের পুবাতন সহকর্মীগণ মধ্যে দুই-একজন সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমন এক-আধজন কর্মীর কারণে কিছু অসুবিধাও ঘটিতে লাগিল। যে বিশেষ কর্মীটির কথা এখন স্মরণে আসিতেছে, তাঁহাব নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজীর সান্নিধ্যের হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সান্নিধ্যেব যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, তাঁহার উপস্থিতিতে শিবিরে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না; গান্ধীজী নিজেই যত দিন না এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তত দিন আমার পক্ষে কিছু বলা অশোভন হয়। একদিন ঘটনাক্রমে প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। আমিও গান্ধীজীকে বলিলাম, আপনি যেমন কঠোরহস্তে নোয়াখালিতে পুরাতনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজও তাহা করিবেন না কেন?

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সেবাগ্রাম এবং বোম্বাইয়ের পুরাতন সহকর্মীদের নিকট হইতে গান্ধীজীর নিকট কঠিন পত্র আসিতেছে। ব্রহ্মচর্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করিয়াছি। গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে স্বীয় মত ঘোষণা করিতেছেন, এবং আমাদিগকে ডাকিয়া কখনও কখনও ইহাও বলিতেছেন একলা চলাই আমার ভাগ্যের লিখন। সকলে ছাড়িয়াও যদি চলিয়া যায় তবু আমি যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, সে পথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না। এইরূপ অকুণ্ঠ বীর্যের মধ্যেও যখন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মমতায় তাঁহাকে প্রভাবান্বিত হইতে দেখিতাম, তখন মনে হইত, এত বীর্যের

আপনি কেন দৃঢ় হইবেন না? তিনি দুঃখভরা অন্তঃকরণে আমাকে লিখিয়া উত্তর দিলেন—

Your letter is frank. ...it makes me sad. I see that I have lost caste with you. I must not defend myself. If we ever meet and if you would discuss what I consider to be your hasty judgment, we shall talk. Love. Bapu.

গান্ধীজী আজ নাই। যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে যে নির্মমতা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সেবাধর্মের যজ্ঞে সকল বস্তুকে একান্তভাবে আহুতি দিবার যে প্রচণ্ডতা কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়ায় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। পরমহংসদেব যখন ব্রহ্মসাধনা করিতেছেন, তখন বারংবার কালী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টির পথরোধ করিতেছিলেন। তিনি যখন অসির আঘাতে সেই মূর্তিকে খণ্ডিত করিলেন, তখনই মুহূর্তের মধ্যে কালীর সমগ্র কালো পিছনের ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত হইয়া গেল, ভগবান পরমহংস নির্বিকল্প সমাধিতে নিমজ্জিত হইলেন।

গান্ধীজীর মধ্যে এইরূপ, এই তমিস্রবিদারী অসির শাণিত শক্তির প্রকাশ দেখিব—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছিলাম। তাহা যে পাই নাই, এমন কথা বলিব না। তাহা ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিতাম, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত, নরসমাজের সংস্কারের অবশেষও গান্ধীজীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

গান্ধীজীকে বিদ্যুৎশিখার পরিবর্তে বরং মহা মহীরুহের মতই মনে হইতে লাগিল। অনুভব করিতাম, যেন তাহাই তাঁহার যোগ্যতর প্রতীক। মানুষ কত বড় হইতে পারে, অপর মানুষের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াও কেমন ভাবে আকাশস্পর্শী হইতে পারে, তাহারই সাক্ষাৎ গান্ধী-চরিতের মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম। ধরণী হইতে উদ্ভূত বিশাল মহীরুহ শত শত যুগের বৃদ্ধি ও বেদনার ভার বহন করিয়া জনসমাজের অরণ্যের পরপারে যে গগন বিস্তীর্ণ তাহাকেই যেন চুম্বন করিতেছে, কিন্তু ধরণীর সহিত যোগ তাহার বিছিন্ন হয় নাই। আর শুধু ছিন্ন হয় নাই, এমন নহে। যে শিকড় মাটির মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তাহার শিরায় শিরায় যে সকল মাটির ঢেলা জড়াইয়া রহিয়াছে, যে মৃত্তিকাস্তূপ হইতে, যে অগণিত ক্ষুদ্রতর জীবরাশির দেহপঙ্ক

সেই জীবকণিকার প্রতি, তাহার যেন মমতার অবধি নাই। তাহাদের রক্ষা করিতে, নিজের পত্ররাজির আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকেই সমৃদ্ধ করিতে যেন এই বৃদ্ধ মহীরুহের যত্নের শেষ নাই।

বন্ধুবর কানু গান্ধীর নিকটে শুনিয়াছিলাম, গান্ধীজী ইদানীং যেন নরম হইয়া পড়িযাছিলেন। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাসে কারাবাসের পূর্বে তাঁহার চরিত্রে অসির প্রভার মত যে তীব্রতা প্রকাশ পাইত, কারাবাসের সময়ে মহাদেব দেশাই এবং তৎপরে কস্তুরবার মৃত্যুব পব নাকি তাহা হ্রাস পায়। আমি যে অবস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গলাভের সুযোগ পাইযাছিলাম, তাহা ইহার পরের ঘটনা। বিচিত্র নয় যে, মানবের প্রতি কোমলতা, অপরকে রক্ষা কবিবার, ধারণ করিবার, পোষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, পুরুষ মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্পে অর্ধনারীশ্বরের এক অপরূপ কল্পনা একদা কোনও সাধক সৃজন করিয়াছিলেন। পাথরের গড়া মূর্তিতে নয়, মাটির গড়া মানব-চরিত্রের মধ্যে, তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দী বনাম বাংলা

'শনিবারের চিঠি'তে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা দেখি। এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলা দরকার মনে করি। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী নিয়ে যা মতবিরোধ সেটা এ প্রদেশের, আমাদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। গান্ধীজী হিন্দুস্থানীর সমর্থক ছিলেন, জওহরলালও তাই। রাজনৈতিক কারণে অন্তত হিন্দুস্থানী থাকা উচিত। তা ছাড়া হিন্দুস্থানী ভাষাটি চমৎকার। আমি ওটাকে সৌজন্যের ও প্রেমকাব্যের ভাষা ব'লে জানি। জওহরলালের ওপর হিন্দীর প্রবর্তকেরা খুশি নন। হিন্দীর দিকে জোর অনেক। যারা এই ভাষা বলে, তাদের সংখ্যা অপরিমেয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্য-প্রদেশ, রাজস্থান, পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দীভাষী। তার পিছনে এ সকল প্রদেশের সরকারী জোর আছে এবং হিন্দীকে অগ্রবর্তী করবার জন্য হিন্দী সাহিত্য-

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জোরালো তাগিদ আছে। বাঙালীর তরফ থেকে হিন্দীর দাবিকে জোরালো করেছেন প্রধানত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখানকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও হিন্দীই যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত খুব প্রচার করেছেন। হিন্দীর সবল প্রতিবাদী শিখ, মাদ্রাজী ও মারাঠীরা; বাঙালী একেবারেই নয়।

বাঙালী যে প্রতিবাদী নয় তার কারণ বোধ করি যে, আমাদের পরোক্ষ-ভাবে উপলব্ধি আছে যে বাংলা সাহিত্য ভঙ্গুর নয়, কোন রাষ্ট্রভাষাই তার ক্ষতি করতে পারে না। বাংলা সাহিত্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যভাবে হিন্দী মারাঠী ও গুজরাতী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ক'রে আসছে, এ কথাটা পুরানো। কিন্তু যে কথাটা এ সম্পর্কে নূতন ক'রে বলা যেতে পারে তা এই যে, অ-বাঙালী সাহিত্যের এ গ্রহণপ্রবণতার আমরা কোনদিন সুযোগ নিই নি, যা বহুকাল পূর্বে নেওয়া আমাদের কর্তব্য ছিল। তা হ'লে আজ আমাদের কান্নাকাটি করতে হ'ত না। আমার মনে হয়, এখনও সে শুভক্ষণ হারিয়ে যায় নি। এখনও আমাদের দেবার ও নেবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

যা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, হিন্দীর জয় হবেই। হিন্দীতে এমন বড় লেখক দেখি না, যে নিজের প্রতিভা দিয়ে হিন্দী সাহিত্যকে আগিয়ে দিতে পারে, সবই সাধারণ ব'লেই ধ'রে নেওয়া উচিত। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যিকদের একটি অসাধারণ গুণ আছে, সেটি তাঁদের নিষ্ঠা ও হিন্দী সাহিত্যকে বড় করবার জেদ। এঁদের সাহিত্যগত কিছু আচার আমার খুব ভাল লাগে। তার ছেলেমানষী অংশটুকু বাদ দিয়ে সে সব আমাদের জানবার ও শেখবার মত। ছেলেমানষী—ফরমাশ দিয়ে বড় সাহিত্য গ'ড়ে তোলার তাগাদা। এ তাগাদাটা নিত্য ও তার হাস্যকর দিকটার বিষয়ে বড় ছোট কোন হিন্দী সাহিত্যিকই সচেতন নন। এঁদের সকলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, একবার কলম নিয়ে বসলেই রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়রের মত সাহিত্যসৃষ্টি করা যেতে পারে। এটাকে আমি হিন্দী সাহিত্যের প্রচারের দিক বলব। হয়তো এই সন্ধিক্ষণে এ রকম ছেলেমানষী কথা বার বার বলারও প্রয়োজন আছে।

হিন্দুস্থানী অ্যাকাডেমি সাহিত্য প্রচারের জন্য যথেষ্ট তৎপর ও অর্থব্যয় করেন, এ দুটি প্রতিষ্ঠান খুব সজীব ও সক্রিয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সে ক্রিয়াশীলতা ও সজীবতা নেই। দূর থেকে মনে হয়, এদের তুলনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এখন একটা মিউজিয়ামে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের তো কথাই নেই, সেটা কেবল একটা বাৎসরিক সামাজিক মিলন ক্ষেত্র, তা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র কোন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, এমন কথা আমার জানা নেই।

হিন্দী সাহিত্যিকদের জেদ আমার ভাল লাগে। তাঁদের দলাদলি নেই। হিন্দী সাহিত্যকে বিপন্ন মনে করলে এঁরা একযোগে কাজ করতে পারেন। ব্রিটিশ শাসনকালে বোখারির অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও-র বিরুদ্ধে সকল হিন্দী সাহিত্যিকের ধর্মঘট মনে রাখার মত ঘটনা। তাতে অনেকের অন্নে হাত পড়েছিল। আমরা বৎসরান্তে সাহিত্য-সভা করি এখানে ওখানে। হিন্দী সাহিত্যিকদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান তো আছেই, তার মত এত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী সমাগম বোধ করি আমাদের কোন সাহিত্য-সভাতে কোনকালে হয় না। এঁরা কেবল এই বাৎসরিক সভা ক'রেই ক্ষান্ত নন। কবি-সম্মেলন ও মুশায়রা এঁদের নিত্যকারের অনুষ্ঠান। একটু সুযোগ পেলেই, পাঁচজন লোক একত্র হবার সম্ভাবনা হ'লেই, সেখানে কবি-সম্মেলন আহ্বান করা একটি চমৎকার অভ্যাস। তাতে শুধু নূতন কবি ও লেখককে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয় না, একসঙ্গে ব'সে বিচার আলোচনা করারও একটা মহা মূল্য আছে। সারারাত্রি ধ'রে সাহিত্যামোদীদের কবি-সম্মেলন এ প্রদেশে নিত্যকার ব্যাপার। তা থেকে কেউ উঠে যায় না, ঘুমে ঢুলেও পড়ে না, তন্ময় হয়ে কাব্যালোচনা শোনে। এঁদের দেখলে আমার মনে হয় যে, এমন সাহিত্য-ফ্যানাটিক সাহিত্য-মাতাল লোক আর কোন দেশে নেই। আজ হিন্দীতে কোন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নেই, কিন্তু এ কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি যে, এ সাধনার শক্তি তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে একদিন তুলসীদাসের পুনরাবর্তনের কাল পরিপক্ক হয়ে উঠবে, প্রতিভার আগমন হবেই, যেমন ক'রে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের উদয় হয়েছিল পূর্বকালের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কারণে। এর সঙ্গে এখানকার বাঙালীর রবীন্দ্র-সাহিত্য-বাসর তুলনীয়। মাসে একবার সে

শজন লোকও উপস্থিত থাকে সেটাকে খুব সফল সভা বলতে হবে। ামাদের উচিত, এই কবি-সম্মেলনের প্রথা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত যে, বর্তমান কালের সকল সাহিত্যই কিঞ্চিৎকর। এ কথাটার গায়ের জোরেও প্রতিবাদ করা যায় না। বর্তমান ন্দী সাহিত্যকে এ পর্যায়ে ফেলা অন্যায় হবে না। এ সাহিত্যের পরিধি ব ছোট, শুধু কাব্য ও গদ্য-সাহিত্য। তুলনায় গদ্যের চেয়ে কাব্যপ্রচেষ্টাকে াল ও বড় বলা যায়। গদ্য-সাহিত্যে আলোচনার অংশটা খুবই কম।

উপন্যাস, বর্তমান বাংলা উপন্যাসের মত, জার্নালিজ্‌মের দ্বারা প্রবলভাবে াক্রান্ত। শুধু উদ্দেশ্যমূলক, ঘটনা-গ্রন্থন জাতীয় উপন্যাস, উপন্যাসের ভীরতর ও কঠিনতর পন্থার বিষয়ে হিন্দী লেখকদের বিন্দুমাত্র কোন চেতনা খা যায় না। হিন্দীর স্থায়ী কোন রঙ্গমঞ্চ নেই, কাজেই বাংলা দেশের মত টকের হাতে-কমলে জ্ঞান এখানে বিরল। রেডিওর চাহিদার কারণে এখন দেশে একাঙ্ক নাটক লেখার ধুম লেগে গেছে। আজীবন কখনও থিয়েটার খে নি, এমন নাট্যকারের লেখা নাটক রেডিওতে গ্রাহ্য হতে দেখেছি। াজেই, বর্তমান কালে হিন্দী নাটক আমার প্রাণহীন ব'লে মনে হয়। হিন্দী টগল্পের হাত এখনও কারও গ'ড়ে ওঠে নি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেমন, হিন্দী সাহিত্যও তেমনই তিনটি প্রবল ভাবের দ্বারা আক্রান্ত। সে প্রভাব সিনেমা, রেডিও ও জার্নালিজ্‌মের। ্যামেরার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য চিত্রশিল্পে নানা অঙ্কনপদ্ধতি গ'ড়ে ঠেছে, কিন্তু সাহিত্যকে রক্ষা করার কোন উদ্যোগ কোথাও দেখা যায় না। াংলা সাহিত্যের নিকটবর্তী অতীতটা খুব মজবুত ও জোরালো; কাজেই বর্তমান ালের এ তিনটি প্রভাব তার সমূহ ক্ষতি করতে পারবে না ব'লেই মনে হয়। ন্দী সাহিত্যিকেরাও এ প্রভাবের অত্যন্ত অহিতকর ফলের বিষয়ে একেবারেই চেতন নয়, বরং সিনেমা-রেডিও ও সংবাদ-সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য লে গ্রহণ করবার খুব ঝোঁক দেখা যায়। কালের গুণে এখনকার ইংরেজী -সাহিত্যে যেমন, সমসাময়িক কাল মানুষ-নায়ককে স্থানচ্যুত ক'রে নিজেই ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্য এ নূতন বিপদ থেকে মুক্ত নয়, হিন্দী

এই নূতন নায়কের আগমন দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক
গঁকোর ভ্রাতারা। তাঁরা বলেছিলেন, সেই ১৮৫৬ সালে যে, একদিন মানুষ
তার অফুরন্ত দুঃখবেদনা সত্ত্বেও সাহিত্যে আর নায়কত্ব করবে না, করবে এই
সমসাময়িক কাল, সেই হবে মুখ্য, আর মানুষ ও তার সকল প্রকাশ হবে
গৌণ। ইংরেজ সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে সচেতনতা দেখি, নিত্য প্রতিবাদ
পড়ি। আমাদের এ বিষয়ে চৈতন্য হয় নি, হিন্দী সাহিত্যিকের বয়স এখনও
অপরিণত, তার তো হবার কথাই নয়। ইংরেজী সাহিত্য এ নূতন প্রয়াসের
দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না, সেটা আপনা হতেই শুকনো পাতার মত
ইংরেজী সাহিত্যের অঙ্গ থেকে ঝ'রে পড়বে। বাংলা সাহিত্যের, রবীন্দ্রনাথ
সত্ত্বেও, ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের এ ঘোর বিপদ থেকে মুক্তি
পাওয়া সহজ কথা নয়। একা প্রেমচাঁদের প্রভাব এ দুর্ঘটনার ফল ঠেকিয়ে
রাখতে পারবে না। সে প্রভাব কতটুকুই বা! সাহিত্যের ভেতর দিয়ে
সমাজ-সংস্কার করার প্রবণতা হিন্দী লেখকদের খুবই বেশি, কাজেই এ প্রয়াসটা
সাহিত্যিক না হয়ে একান্ত প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়ে। তুলনামূলক
এই অল্প কয়েকটি কথা বলাই যথেষ্ট।

হিন্দীর এলাকায় অনেক বাঙালীর বাস। দেশের নূতন পরিকল্পনায়
আমাদের নিজের বিশিষ্ট সংস্কৃতি বজায় রাখা এখনই কঠিন হয়ে উঠেছে, পরে
আরও হবে ব'লে মনে হয়। এখন থেকে সচেতন ও সাবধান না হ'লে সংস্কৃ
ঘটাও আশ্চর্য নয়। রক্ষা পাবার দুটো ছাড়া তিনটে উপায় নেই। প্রথম
উপায়, নিজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া, অনেকে এই পথ এখন
ধরেছেন। নূতন পরিচয়ে দেখি "বাংলাভাষী বিহার", "বাংলাভাষী হিন্দুস্থানী"
এটা আত্মবিক্রয় ক'রে টিকে থাকার ও অন্নসংস্থান করার সহজ পথ ব'লে ম
হ'লেও প্রকৃতপক্ষে সহজ নয়, শুধু হীনতা স্বীকার করা। এই হাত-কচলানো
সত্ত্বেও পাটনা রেডিওতে আমি আজ পর্যন্ত একটিও বাংলা শব্দ উচ্চারিত হ
দেখি নি। মানুষ যেখানেই যাক নিজের দেশের জলবায়ু, বেশ, খাদ্য, আচা
আচরণ নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য। অন্তত বলেছে
জুলিয়ন হক্সলি, হাডন ও কার-সণ্ডার্স সাহেব। আমার বাবা ও পিতৃ
শ্রীকেদারনাথ বাঁড়ুজ্জে মহাশয় উত্তর চীনের টিনসিন শহরে থাকতেও ধুতি
পাঞ্জাবি প'রে, দেশী শাক-চচ্চড়ি খেয়ে নিজের দেশ ও জাতিকে স্ম

করতেন। আমি জম্মু শহরে এক ডোগরার বাঙালী স্ত্রী দেখেছি। মেয়েটি নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিত হ'লেও নিজের ভাষা ও বাঙালীত্বের শাঁখা-সিঁদুর বর্জন করে নি। শিয়ালকোটের কাছে এক নিভৃত গ্রামে আমি আর একটি বাঙালী মেয়ে দেখেছি, তার স্বামী পাঠান। কিন্তু মেয়েটির ঘরে শিবলিঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, সঞ্চয়িতা। নিজের সংস্কৃতি আমরা পরিহার করতে চাইলেও সংস্কৃতি তার মানব-রক্তের বাসা ছেড়ে যেতে চাইবে ব'লে মনে হয় না। মন-যোগানো, সুযোগ-সুবিধার চেয়েও জন্মের কারণে, ঐতিহ্যের কারণে বাঙালীর প্রাণবায়ু বাঙালীত্ব দিয়েই গঠিত, সেইটাই বড় কথা। প্রকৃত বাঙালী না হ'লে প্রকৃত ভারতীয়ও হওয়া যায় না, তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বাড়া আর নেই।

দ্বিতীয় পন্থা, নিজের খোঁটার জোর বাড়িয়ে, তাতে জোর রেখে আক্রমণক হওয়া। এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, বিশিষ্ট সংস্কৃতি আয়ত্ত ক'রে নূতন রূপে এ দেশকেই দেওয়া, যা এ দেশে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ক'রে গেছেন। আর, এই দেশেরই কায়মনোবাক্যে কল্যাণ চাওয়া, "প্রবাসী" হয়ে থাকা নয়। সাহিত্যের দিক দিয়ে যুক্তপ্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে আজও হিংসা করে না, খুবই শ্রদ্ধা করে। বাঙালী সংস্কৃতির ওপর ঝোঁকও কম দেখা যায় না। সন্দেশ রসগোল্লা থেকে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুকে এবং আজও নিজের ব'লে মানে। ঐক্যের বন্ধন আজও আছে, যদিও কিছু অর্বাচীনের রবীন্দ্রনাথকে খাটো করবার প্রয়াসও দেখা দি...ছে। কিন্তু আমরা নিজেদের পূর্ব মর্যাদা আর যে রক্ষা করতে পারি..., সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দোষ। আমরা ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেছি, যার বাড়া আর দুঃখ নেই। দোষটা বড় কম নয়। আমরা আর নিতেও পারি না, দেবার শক্তি তো নেইই। প্রথম আমরা যখন এ দেশে আসি, তখন আমার বয়স আট বছর। উর্দু আর হিন্দীতে হাতেখড়ি তখনই হয়েছিল। তারপর এ দেশে যখন স্থায়ীভাবে এলুম, তখন আমার বয়স তেরো, *হিন্দী ও উর্দু অবশ্যশিক্ষণীয় হ'ল*। একসঙ্গে তিনটি অ-বাঙালী ভাষা শিখতে গিয়ে লেখাপড়া না হতে পারে, কিন্তু মারা যাই নি, বাপ-মাও কান্নাকাটি করেন নি। আমার বি. এ. ক্লাসেও এমন বাঙালী সহপাঠী ছিলেন, যাঁরা ফার্সী পড়তেন। উর্দু ও ফারসীনবিসের বাঙালী সমাজে বেশ প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই বাঙালীত্ব পরিহার করেন নি। এখনকার এদেশী বাঙালী

উর্দু দূরের কথা, হিন্দীর নামেই শিউরে ওঠেন। সবচেয়ে বিশ্রী জিনিস যা প্রায়ই কানে শুনি সেটা নিজেদের জাতি ও ভাষাকে শ্রেষ্ঠতর মনে ক'রে হিন্দীকে হেয় ভাবা। আগে আমরা দু মাসের জন্য বিলেত গেলে অক্সফোর্ড স্কুলের বাঁকা বুলি আওড়াবার চেষ্টা করতুম। ছ বছর এ দেশে বাস ক'রে হিন্দী ব'লে এক গ্লাস জল চাইতেও শেখেন নি, এমন ভয়াবহ বাঙালী আমার আশেপাশে সমারোহ ক'রে আছেন। অথচ হিন্দী অত্যন্ত সৌজন্যের পোশাকি ভাষা। হিন্দী এখন বাঙালীর স্কুলেও অবশ্যশিক্ষণীয় হয়েছে, তা নিয়ে হা-হুতাশের অন্ত দেখি না। আর উঠে গেছে এদেশবাসীদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করার চমৎকার অভ্যাস। বনেদী বাঙালীর সামাজিক আদান-প্রদান এখনও কিছু আছে, নবাগতের একেবারেই নেই ভাষার অজ্ঞতার কারণে। বই প'ড়ে কোন ভাষা সম্যক আয়ত্ত হয় না, তার প্রকৃষ্ট পথ মানুষের মুখ থেকে শেখা।

৺অমৃতলাল শীল ফারসী ও উর্দুর পণ্ডিত ছিলেন। বহুকাল পূর্বে ৺রামানন্দবাবুর তাগিদে তিনি জেবউন্নিসা থেকে গালিব পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট কবির রচনা বাংলায় ভাষান্তরিত ক'রে গেছেন। উর্দুর প্রথম সাহিত্যালোচনার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ৺মাখনলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে কিংবা ১৮৮০ সালে, আগ্রা থেকে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ৺চিন্তামণি ঘোষ। আমাদের যুবক বয়সে কবি অতুলপ্রসাদের বাড়িতে প্রতি রবিবারে জটলা হ'ত। তিনি আমাদের সামনেই কজরী গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষায় কজরী রচনা করেছিলেন। তাঁর মুখে প্রথম আমরা বাংলা কজরী গান শুনি। তারপর এই গ্রহণ করবার ব্যাপারটা উঠে গেল। বোধ করি এখন বাঙালী ঐতিহাসিক ছাড়া আর কেউ উর্দু হিন্দী নথিপত্র ঘাঁটে না। ঠেট হিন্দীর পুরাতন কাব্য খুবই চমৎকার। কজরী রসিয়া লোকগীতির রত্নসম্ভার এখনও আমাদের গ্রহণ করবার অপেক্ষায় আছে। যাঁরা কবিতা রচনা করেন এমন লোকের এ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নি

বাঙালী হিন্দী লিখতে পারেন এমন দু-চারজন আছেন, কিন্তু তাঁরা সাহিত্যিক-গুণসম্পন্ন নন। নিজের অভিজ্ঞতার কারণে বলতে পারি যে আমাদের হিন্দী লেখার দুটি অন্তরায়। প্রথম, আমাদের ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত শব্দবহুল আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। শব্দবিন্যাস ও শব্দমাধুর্য আয়ত্ত করা বহু সাধন

ভিন্ন সম্ভব হয় না। এই শিক্ষানবিসী কালটা অত্যন্ত কটু ও দুরূহ। সবচেয়ে বড় বাধা লিঙ্গভেদের কচকচি আয়ত্ত করা। "লোটা ডুব গয়া" "লুটিয়া ডুব গঈ" এই বিভেদ আমাদের পক্ষে সমস্যামূলক ব্যাপার। ইংরেজী Preposition-এর নির্ভুল ব্যবহার যেমন কোন ভারতীয় লেখকের কোনদিন আয়ত্তীভূত হ'ল না, হিন্দীর লিঙ্গভেদ তেমনই আমাদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হবার নয় ব'লেই আমি মনে করি। লিঙ্গের পার্থক্য সর্বত্র এক নয়। কাশী প্রয়াগ লক্ষ্ণৌ মথুরার ব্যবহারে একই ক্রিয়ার ব্যবহার সর্বদা এক নয়। তাতে হিন্দুস্থানীরাও ভুল করে। কিন্তু আমাদের বেলায় সে ভুলটা হাস্যকর, তাদের বেলায় নয়, কতকটা ভিন্ন "মুহাবরা"-য় দাঁড়ায়। 'শনিবারের চিঠি' পঞ্জাবী লেখকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁদের এ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় না, লিঙ্গভেদটা তাদেরও একই ধরনের ব'লে। এইটুকু ছাড়া আমাদের হিন্দী লেখার কোন বাধা নেই। ভাষার ঢঙ পাঠ ও মেলামেশার দ্বারা আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। আমাদের হিন্দী সম্পূর্ণ ক'রে শিখতে হবে, হিন্দী থেকে নিতে হবে, তাকে দিতেও হবে। শব্দের বর্ণপর্যায়, স্বাদিষ্ট শব্দের বেলায় হিন্দী দরিদ্র। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আমাদের সে ঐশ্বর্য কম নয়। আমরা দু হাতে তা বিলিয়ে হিন্দীকে সমৃদ্ধ করতে পারি। ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করার গর্ব বাঙালীর আছে। হিন্দী বাংলা ভাষার সহোদর ভগ্নী। শালিকার অনুগ্রহলাভ করার মত সেটাকে যথেষ্ট আয়ত্ত করা বেশ সহজ কথা। আমি স্বপ্ন দেখি যে, একদিন বাঙালী লেখক হিন্দী সাহিত্যে বন্যা ডেকে আনবে। সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় আমাদের শুধু বাংলার বাইরে পা বাড়াবার উদ্যমের দরকার।

আমি নিয়ম ক'রে দুটি ইংরেজী সাহিত্য-পত্রিকা পড়ি। সে দুটির নাম Penguin New Writing ও Horizon। এ দুটি পত্রিকার আলোচনা কেবল ইংরেজী সাহিত্যে আবদ্ধ নয়। আধুনিক গ্রীক ও চীনা সাহিত্যও তাতে আলোচিত হতে দেখেছি। পত্রিকা দুটির নূতনকে জানবার : খুবই। New Writing-এর সম্পাদক জন লেহ্‌ম্যান আমাকে সাহিত্যের বিষয়ে লেখবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাছে আমার প'ড়ে বাংলা সাহিত্য-পরিচয় An Acre of Green Grass-এ দাঁড়ায়,

(৩৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

২

এশিয়াটিক সোসাটির কর্ম্মক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হরপ্রসাদ সে-যুগের অপর এক ্য মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি—প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিৎ জন্দ্রলাল মিত্র। ইঁহারই সাহচর্য্যে কলিকাতায় হরপ্রসাদের প্রকৃত কর্ম্ম-ানের সূত্রপাত হইয়াছিল; তিনি প্রধানতঃ পুরাতত্ত্ব-চর্চায় জীবন উৎসর্গ রিয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ লিখিয়া গিয়াছেন, ১৮৭৮ সনে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে তাঁহাকে পালতাপনী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে বলেন। এই সময়ে ন্দ্রলাল নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধ পুথির রণমূলক তালিকা প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পুথিগুলির উদ্ধৃত শর বা বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহারই সম্পন্ন করিবার কথা, কিন্তু কাল অসুস্থ হইয়া পড়ায় হরপ্রসাদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ন্যস্ত কার্য্যটি প্রসাদ কিরূপ যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ১৮৮২ সনে প্রকাশিত *e Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের ভূমিকায় জন্দ্রলাল তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

"It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে ১৮৮৫ সনে ঋগ্বেদের যে অনুবাদ-প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন:—"এই প্রণালীতে াদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহর-াদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত । ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত না ও শাস্ত্রী উপাধি হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক ান শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ র্য্য প্রথম হইতে আমায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন

co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task ; and he did his work to my entire satisfaction. I must add, however, that I did not deem it necessary, nor had I the opportunity, to compare all his renderings with the originals."

প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ এই প্রবীণ প্রাচ্যবিদেরই নিকট পুথির তালিকা প্রণয়ন কার্য্যে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যে-কার্য্যের জন্য পরবর্ত্তী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহারই সূচনা বলিতে হইবে।

রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে হরপ্রসাদ ১৮৮৫ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাষাতত্ত্ব কমিটিরও (Philological Committee) সভ্য হইয়াছিলেন। তদবধি সোসাইটির বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানকার্য্যে তিনি ডঃ হর্নলিকে সাহায্য করিতে থাকেন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির Joint Philological Secretary নির্ব্বাচিত হইয়া বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত-বিভাগের তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ সনে সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্য অতীব যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন সোসাইটি তাঁহাকে ১৯১০ সনে "ফেলো" এবং ১৯১৯-২০ ও ১৯২০-২১ সনে উপর্য্যুপরি দুই বার সভাপতির পদে বরণ করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের উপর এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি-সংগ্রহের ভার ছিল তিনি ১৮৭০ সন হইতে সোসাইটির আনুকূল্যে সংগৃহীত-পুথির বিবর

৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ (ইং ১৮৯০) প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরে ১৮৯১
নের ২৬এ জুলাই তাঁহার দেহান্ত হয়। হরপ্রসাদই ১০ম খণ্ডের শেষার্দ্ধ বা
য় ভাগ সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন (ইং ১৮৯২)। সমগ্র দশ খণ্ডের সূচীও
াহারই কৃত। রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ জুলাই
াসেই হরপ্রসাদকে পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যের পরিচালক (Director of
he Operations in search of Sanskrit Mss.) পদে অভিষিক্ত
রেন। তদবধি প্রায় সারা জীবনই তিনি পুথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।
জন্য তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন স্থান ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করিতে
ইয়াছে; এমন কি নেপালের মত প্রত্যন্ত প্রদেশেও তিনি একবার নহে—
রি বার গমন করেন। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু দুর্লভ পুথি তিনি
পালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতা
পলব্ধি করা যায়—সোসাইটির সেক্রেটরীকে প্রদত্ত পুথি-সংক্রান্ত তাঁহার
পোর্টগুলি হইতে; এগুলি নানা তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। এই সকল রিপোর্টের
ধ্যে আমরা এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি :—

1892. Report of the Operations in search of Sanskrit Mss. (Sep. 1888—1891), 8 pp.

1895. Do. (1892—Nov. 1894), 20 pp.

(এই দুইটি রিপোর্ট ১০ম খণ্ড, ২য় ভাগ ও ১১শ খণ্ড *Notices of Sanskrit Mss.*-এর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে)

1901. Rep. on the Search of Sanskrit Mss. (1895—1900), 25 pp.

1905. Do (1901—1902 to 1905—1906), 18 pp.

1911. Do (1906—1907 to 1910—1911), 10 pp.

হরপ্রসাদের পুথি-সংগ্রহকার্য্যে পারদর্শিতা ও পুরাতত্ত্বে বহুজ্ঞতার কথা
রকারের অবিদিত ছিল না। এই জন্য ১৯০৮ সনে অক্সফোর্ড হইতে আগত
প্রাচ্যবিৎ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব যখন উত্তর-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন
তাঁহার সাহায্যকল্পে সহযাত্রী হইবার জন্য হরপ্রসাদই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।
এই উপলক্ষ্যে হরপ্রসাদ অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলর-স্মৃতিভবনের জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য
বৈদিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও প্রায় ৭ হাজার
দুর্লভ প্রাচীন পুথির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ক্রয় করিতে

পারেন নাই; ১৯০৮, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুথিগুলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর করিলে ম্যাকডোনেল এই পুথি-সংগ্রহের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তৎকালীন চ্যান্সেলর লর্ড কার্জনের নিকট আবেদন জানাইতে বিলম্ব করেন নাই। কার্জন নেপালের মহারাজাকে তার করেন। মহারাজা অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহারই অর্থে হরপ্রসাদকে পুথিগুলি ক্রয় করিতে বলিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ এই সকল পুথির তালিকা প্রণয়ন ও যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জন হরপ্রসাদকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

1, Carlton House
Terrace, S. W.
5th January, 1910

My Dear Sir,

I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatigable exertion have enabled you to render to us.

With the best wishes for the New Year and with the hope that scholars like yourself may never be wanting in India

I am,
Yours faithfully,
CURZON OF KEDDLESTON.

১৯০৯, ফেব্রুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল রাজপুতানা

গুজরাটে ভাট ও চারণ কবিদিগের পুথিগুলি অনুসন্ধান করিবার জন্য রপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে থমে সার্ জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৯০৪ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনকে চেতন করেন। কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে পত্রলেখালেখি ছাড়া পরিকল্পনাটি র্য্যকর হয় নাই। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হরপ্রসাদের চারি ৎসর লাগিয়াছিল। এ-বিষয়ে ১৯১৩ সনে তিনি সোসাইটিকে যে *Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles* দাখিল করেন তাহাতে প্রকাশ :—

> "I have made three tours in Rajputana visiting some of the capitals and ancient towns therein and in Gujerat. I have submitted four Progress Reports since 1909 to the Society and I am now submitting a General Report of my work for the last four years. In the first year I visited Jaipur, Jodhpur and Baroda. In the third year, I visited Jaipur, Jodhpur and Bikanir, and in the fourth, I visited Bharatpur, Bundi, Ujjain, Mandasore, Ajmere, Jodhpur and Bilada."

উল্লিখিত চারি খানি Progress Report মুদ্রিত হইয়াছিল, অন্ততঃ এক-নির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; উহা—*Report of a Tour in Western India in Search of Mss. of Bardic Chronicles.* 6 pp. এই কল রিপোর্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে রাজপুতানার তিহাসে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১৩২১ সালে বর্দ্ধমান হিত্য-সম্মিলনে পঠিত হরপ্রসাদের "হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা" প্রবন্ধটি ঠিতব্য।

কিন্তু কেবলমাত্র পুথি সংগ্রহ করিয়াই হরপ্রসাদ তৃপ্ত থাকিতে পারেন ই। তিনি সংক্ষিপ্ত বিবরণী সহ তৎকর্ত্তৃক পরীক্ষিত নানা স্থানের এবং পাল-দরবারের পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়া-লেন। তাঁহার সম্পাদনায় এই তালিকাগুলি প্রকাশিত হয় :—

Notices of Sanskrit Mss.

First series : 1892 : Vol. X (2nd part).

Second series : 1898-1900 : Vol. I, pp. 432.
1898-1904 : II, ,, 238.
1904-1907 : III, ,, 253.
1911 : IV, ,, 265.

1905. *A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss belonging to the Darbar Library, Nepal* Vol. I (with a Historical Introduction by Cecil Bendall.)

1915. Do. Vol. II.

1915. *Catalogue of Manuscripts in the Bishop's Colleg Library, Calcutta* (Under orders of the Govern ment of Bengal,)

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে হরপ্রসাদের প্রচুর অবসর ছিল তিনি সোসাইটির কার্য্যে—বিশেষ করিয়া পুথি-সংগ্রহ ও পুথি-সংরক্ষণ কার্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া অবধি তাঁহার অবসর একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। তিনি দুঃখের সহিত সোসাইটিকে লিখিয়াছিলেন :—'My appointment to the Principalship of th Sanskrit College was rather unfortunate for my literary an scientific work." অগত্যা নিরলস কর্ম্মী হরপ্রসাদকে কলেজের ছুটি দিনগুলি দূরবর্ত্তী স্থানে পুথি-সংগ্রহ কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হইত। ১৯০ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সত্যই স্বস্তি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সোসাইটির কাউন্সিলে নিকট প্রস্তাব করেন যে, সোসাইটির গৃহে গবর্মেণ্টের ও সোসাইটির নিজস্ব পুথি-সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা—Descriptiv Catalogue সঙ্কলন করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাবে সোসাই যে কেবল সম্মত হইয়াছিলেন তাহা নহে, এই কার্য্যের জন্য মাসিক দুই শ টাকা বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* এই সময়ে সোসাইটির গৃহে পুথি

* এই বৃত্তি সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির নথিপত্রে প্রকাশ :—

"Since 1909 Mm. Haraprasad Shastri has been in receipt of an allowan of Rs. 800. Of this Rs 100 was debited under the head Salary of Officer i

.ংখ্যা ছিল—১১,২৬৪ খানি ; ইহার মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ও
কী ৮১০৮ খানি হরপ্রসাদ কর্তৃক ক্রীত। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

"This is the first of a long series of volumes of a descrip-ive catalogue of Sanskrit manuscripts belonging to the Government collection in the Asiatic Society's Rooms,—collected since the institution of the Search of Sanskrit Manuscripts under the order of Lord Lawrence's Government in 1868. The number of the collection stands at present at 11,264; of these 3,156 were collected by my illustrious predecessor Raja Rajendralal Mitra, LL. D., C. I. E., and the rest by my humble self. Besides Sanskrit, t has manuscripts in Prakrit, Hindi, Marwari, Marhatti, Newari, and Bengali. But these form an insignificant part of the whole. The works relate to orthodox Hinduism, Buddhism of various yanas, Jainism of various schools, Vaisnavism, Saivaism, Tantrism and other systems of sectarian Hinduism. The various branches of th knowledge of the Hindus are well represented in thi collection. Manuscripts are written in various scripts Bengali, Devanagari, Udiya, Marwari, Kasmiri, Newari both ancient and modern. Some of the ancient manuscript go so far back as the 9th century A. D. There is on

Fund. The Shastri was proposed as President in 1918 and elected in Februar 1919. It was thought desirable that a President should not be in receipt emoluments from the Society. The Shastri waived his claims to a remuner ion during his term of Presidency which lasted during 1919 and 1920. 1921 he was appointed a Professor in the Dacca University and he ag waived any claim to receipt of the old allowance (his letters of 17th May 7th June, 1921) till the termination of his appointment, and June 1924. offered to continue his work on the Catalogue gratuitously and to let Government grants accrue during this period to be utilised for expenditure printing." ('হরপ্রসাদ জীবনী', পৃ. ১১৪)

unique manuscript in ancient Bengali hand, copied undoubtedly in the last years of the 10th century. There are numerous manuscripts, dated in the 11th century The subsequent centuries are very well represented...... Besides unique manuscripts which open up vast vistas of research in history, religion, and sciences of ancient India, whole literatures are revealed in this collection. For instance, there are numerous works of Vajrayana, Mantrayana, Kalacakrayana to be found here, which throw a flood of light on those later phases of Buddhism which developed out of the Mahayana system. But for these works, these phases of the religion would have remained only a name." (*A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. I. Preface)

হরপ্রসাদ Descriptive Catalogue-এর সমগ্র অংশ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবিতকালে এই কয় খণ্ড, তথ্যপূর্ণ মুখবন্ধ সহ, প্রকাশিত হইয়াছিল :—

ইং ১৯১৭ ১ম খণ্ড—বৌদ্ধ সাহিত্য
১৯২৩ ২য় খণ্ড—বৈদিক সাহিত্য
১৯২৫ ৩য় খণ্ড—স্মৃতি
১৯২৩ ৪র্থ খণ্ড—ইতিবৃত্ত ও ভূগোল
১৯২৮ ৫ম খণ্ড—পুরাণ
১৯৩১ ৬ষ্ঠ খণ্ড—ব্যাকরণ ও অলঙ্কার

এই তালিকার অপরাপর খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হরপ্রসাদেরই তত্ত্বাবধানে কৃত হইয়াছিল; এগুলি সোসাইটি কর্তৃক ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্যেই

ইং ১৯৩৪ : ৭ম খণ্ড—কাব্য
১৯:৯-৪০ : ৮ম খণ্ড—তন্ত্র (দুই ভাগ)
১৯৪১ : ৯ম খণ্ড—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য
১০ম খণ্ড—জ্যোতিষ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী কেবল—দর্শন, জৈন সাহিত্য, বৈষ্ণব ও বিবিধ। ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থই লিখিয়াছেন :— "কেবল সংখ্যা ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নহে, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুথির আবিষ্কারেও হরপ্রসাদে- এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং ইহাই হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট্ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি। একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত।"

কিন্তু হরপ্রসাদের নিকট ইহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত কতকগুলি দুর্লভ সংস্কৃত পুথি প্রধানতঃ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

ইং ১৮৮৮-৯৭	: বৃহদ্ ধর্ম্মপুরাণ (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা, নং ১২০)
১৮৯৪-১৯০০	: বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ (বি. ই. নং ১৬৩) (নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্রের বিবরণ-সম্বলিত বৌদ্ধপুরাণ)
১৮৯৮	: 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' (জর্নাল ১৮৯৮)
১৯০৪	: আনন্দভট্ট-কৃত 'বল্লালচরিত' (বি. ই. নং ১৬৪)
১৯১০	: সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড নং ১)
১৯১০	: রত্নকীর্ত্তি, পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকরশান্তি-রচিত খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি (বি. ই. নং ১৮৫)
১৯১০	: অশ্বঘোষ-কৃত 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য (বি. ই. নং ১৯২)
১৯১০	: কুমায়ুন-রাজ রুদ্রদেব-কৃত বাজপক্ষী-শিকার সম্বন্ধী 'শ্যৈনিক-শাস্ত্র', ইংরেজী অনুবাদ সহ (বি. ই. নং ১৯৩)
১৯১৪	আর্য্যদেব-কৃত 'চতুঃশতিকা' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড নং ৮)
১৯২৭	: 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' (গায়কবাড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ৪০)

এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। এই পুথিগুলি অবলম্বন

করিয়া বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।… প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত, ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলির গুণগ্রাহিতা।…প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় *Epigraphica Indica* প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।…পথিকৃত হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিতসমাজে এই জ্ঞান-তপস্বীর মর্য্যাদা কোন কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি সাধারণ পণ্ডিত বা সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার মূলপত্তন করিয়াছিলেন।…তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছিলেন: He, of all people, has been the real father of Oriental Research in North India." (ডঃ সুশীলকুমার দে: 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৫৫)*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাবী

হারিয়ে গেছে আমার অনেক, হারিয়ে গেছি আমি,
ছেঁড়া খাতায় ক্ষতির হিসাব লিখছি দিবস-যামি।

---

* অনবধানতাবশতঃ গত বারে এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে দু-একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। পৃ. ২৩৪, পংক্তি ১২: "নবেম্বর" স্থলে "অক্টোবর" পড়িতে হইবে। পৃ. ২৩৪, প. ২৬: "১৮৬১, ৯ই জানুয়ারি" প্রকৃতপক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ; ঐদিন ১ম খণ্ড (Fas. 1) 'বৈশেষিকদর্শন' প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হয়; প্রকাশকাল বোধ হয় কিছু পূর্ব্বে।

কবিতাগুচ্ছ

বন্যার মৃত্তিকা দিয়ে যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গড়া

বন্যার মৃত্তিকা দিয়ে যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গড়া,
সে রাষ্ট্রের বাসিন্দা আমরা ;
এ বন্যার ধ্বংস থেকে জাগে নাকো ক্রন্দনের রোল,
শহীদের রক্তস্রোতে এ বন্যার তরঙ্গ নিটোল,
মানুষ মরে না কোন, সম্পদের নেই অপচয়—
কিষাণের চালাঘর এ বন্যায় অটল অক্ষয়,
শুধু মরে—
লুব্ধ বাজ মাংসলোভী শকুনের দল
নিরন্নের অন্ন লুঠে গ'ড়ে ওঠে যাদের মহল।

যাযাবর বৃত্তি কেন—জীর্ণবস্ত্র পেটভরা ক্ষুধা,
কেন রোগ, কেন শোক—কে বলে সে কৃপণ বসুধা !
অনেক উর্বরা মাঠ—
সোনার ফসল ঢেউ তোলে,
তবুও মেলে না ঘর—
ভেসে যাও অশ্রুর কল্লোলে ?
আজ তাই তীক্ষ্ণ অস্বীকার
কাকুতি মিনতি নয়, রক্তে তোল বন্যার ঝঙ্কার !
কিছু যাবে— ?
যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি !
দধীচি দেয় নি হাড় ?
মৃত্যু দিয়ে জন্মের আরতি।

শক্তি আর সম্পদের আত্মঘাতী তৃষ্ণা দূর করে,—
সে বন্যার গান কবি লেখো আজ অক্ষরে অক্ষরে ;
শিল্পী তুমি মুক্ত-প্রাণ—
জীবনের আঘাতে আঘাতে—
লেখনী হয়েছে অস্ত্র—

শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৫৫

অনেক দিনের পাপ অনেক ক্ষতির বোঝাপড়া,
মাংসলুব্ধ শ্বাপদের চালিয়াৎ বৈষ্ণবী আখড়া,—
এ বন্যায় ডুবে যাবে।
তিলে তিলে মেলে তিলোত্তমা ;
হাজারো ক্ষতের মুখে এ বন্যার মিলেছে উপমা।

কর্ণফুলি

নবজন্মের প্রভাতে দেখেছি কর্ণফুলি,
শ্যাম তটরেখা ইঙ্গিতে যাই সকলি ভুলি ;—
অনেক কথার—
অনেক গানের পাপড়ি খুলি,
এসেছি আবার ওগো বিদেশিনী কর্ণফুলি !
বৈশাখী-রাতে তোমার বুকেতে আমার গান,
শুনেছি তাই তো আজকে বন্ধু—
এ অভিযান ;
বহু জীবনের প্রত্যাশাটুকু
পেতেছে কান
বন্ধু, আমার ধরবে না হাত দেবে না দান ?
জীবন-মরুর পথচারী আমি—
ভরসা নাই,
বাণীহারা প্রাণে তাই তো মুখর—
তোমারে চাই ;
তোমার চোখেতে ছুটি চোখ রেখে দীর্ঘকাল—
পার হয়ে যাব,
কাটবে না জানি ছন্দতাল।
লক্ষ বাহুর বেদনার তুমি
একটি সুর,
আমার প্রাণেতে তাই মায়াবিনী
এত মধুর ;
ঘুচুক দূর !

এক মুঠো ফুল এক ঝাঁক পাখি তোমার দূত,
কি অদ্ভুত !
আমায় টেনেছে আমার বাহিরে অকস্মাৎ,
অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে ফেলে দাও অন্ধরাত ।

উপলব্ধি

স্মরণের বাতায়নে প্রিয়তমা আসে চুপিসাড়ে,
বিরহের খরতাপে জ্ব'লে যায় বসন্তসম্ভার ;
কোথা যাই কি যে করি—মুখ ঢাকি কোন্ অন্ধকারে,
প্রিয়ার সজল চোখে আনাগোনা দুর্বোধ্য ভাষার ।

দিনের হাজারো কাজে অস্বীকার প্রেমের বেদনা—
মাটির পুতুল নয় খেলাঘর ভেঙে দিলে শেষ—
আকাশের সূর্য ঘোরে—অস্তরাগে আরক্ত চেতনা,
জীবন-দেবতা দাও মিলনের অমোঘ নির্দেশ ।

নির্জন রাত্রির কোলে কেঁদে-মরা এ নহে পৌরুষ,
জয়ের পৃথিবী মোর বিদ্রোহের কোথায় নিশান—
প্রেমের শাসন নেই হার মানে সকল অঙ্কুশ,
বুক-জোড়া অগ্নিতাপ অশ্রুসিক্ত বিহ্বল আহ্বান ।

প্রমত্ত জীবন-স্বপ্নে মন্দাক্রান্তা ছন্দ কেন কবি,
বন্যার দুর্জয় স্রোতে বাঁধ দেওয়া সে নহে সম্ভব ;
ছবি সে তো ছবি নয়—ধ্যানমগ্ন তাপসী ভৈরবী
বেদনার গ্রন্থিগুলি টান দেয় জাগে কলরব ।

সকল কামনা আজ কেন্দ্রীভূত একটি হিয়ায়,
আকাশে অনেক তারা জ্যোতিহারা একা শুধু জাগে ;
লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোক বিলায়
আমার প্রিয়ার মুখ—আলোড়িত দীপ্ত অনুরাগে ।

সীমানা সংকীর্ণ নয়—তবু শোন বিরহীর বাণী,—
প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি—নির্বিকার আমাদের মন ;

আনন্দের অনুভূতি প্রতীক্ষার ভরে পাত্রখানি,
সত্যের নির্লিপ্ত রূপ আমাদের হৃদয়-স্পন্দন।

পথের আবর্ত থেকে এ প্রেমের প্রচণ্ড উন্মেষ,
গৃহতীর্থে মুক্তি এর সুনিশ্চিত উপলব্ধি সখী ;
একমাত্র অন্ধকারে চাঁদ পারে করিতে নিঃশেষ—
অনাবিল জ্যোতিঃপুঞ্জ,—সে কথা কি জান না ক্রৌঞ্চকী ?

শ্রীসমর সোম

ডানা

৭

অপ্রত্যাশি তভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয় নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না: কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায় নি। অথচ সেটা যে ঠিক কি, তা-ও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই তুচ্ছ করার মত নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতরে। আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু—দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্যে উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিচ্ছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চ'লে যান কোথায় যেন চরের উপর দিয়ে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইঁটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায় ডানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মত কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করে নি একদিনও সে। বরং উলটো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত ক'রে রেখেছে তাঁকে।...

... সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল। শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবে- করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, আমার দেরি হ গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়।

হ্যাঁ।

আচ্ছা, তা হ'লে শুরু করা যাক এবার।

হাতে হাত ঘ'ষে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক' অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, আনন্দবাবুর আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি।

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হ'ল, এঁর সং সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা একটু যেন গ্রন্থিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কো রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কো জেগে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন। ডিক্‌টেশ নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বল পারতেন। তা কিন্তু বলেন নি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবে বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সম আপিসে রোজ হাজিরা দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবা বললেন, ইয়ে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি।

কি বলুন?

ইংরেজীতে একটানা ডিক্‌টেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কো দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা ব'লে যেতে পারি। হয়ে অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লি যান, পারবেন কি, তারপর আমি সেটা দেখে দেব না হয়। পারবেন?

তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখি একবার।

পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন, তা হ' ইংরেজী করা আর শক্ত কি! বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দি দেব আমি। নোট ক'রে এনেছি সব।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই; পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে।

আমি তা হ'লে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি।

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল বানিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

আপনার এত দেরি হয়ে গেল যে?

আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?

কিসের শোভা?—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

প্রকৃতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল, তার ইয়ত্তা নেই! লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন? পাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে ব'সে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন? সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমরা দেখি না—

হ্যাঁ, তা তো বটেই। ভাল ক'রে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?

আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় ব'সে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?

ডিমের রঙ ?

বেশ, শোনাই যাক একটু।

বেশ বেশ।—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার নে এক ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, দেখুন, এ বিষয়ে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার ডিমের এত বর্ণবৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারে নি এখনও। রা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত ;, ইংরেজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মত সমর্থন রবার মত প্রমাণ খুঁজে পান নি। এই ধরুন না, কাকের ডিম eenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে রিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক য় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের লোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও হ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হ'ত, তা হ'লে যে সব পাখি গাছে বাসা নিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হ'ত। তা কিন্তু হয় না তো। ার একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে রঙের সম্বন্ধ আছে। পিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই ারণে, তাঁদের মতে যে সব ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল য়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে ন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা, কিন্তু অনেকের াবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ ঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন ঘুঘু পায়রা হাঁস মুরগী। সুতরাং ক নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখিদের এটা বোধ হয় artistic impulse র্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ বসিয়ে। এটা বশ্য কবিত্ব।

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে

পায়। আপনারা কেবল আঁকুপাঁকু ক'রে মরেন, তাতেও আনন্দ কম নেই।

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট ক'রে ধরা যায় না। লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির রঙের বা স্টোন কলার্ড (stone coloured) তাদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustard, Curlew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ ক'রে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু ফাঁক রেখে দেবেন রঙের কটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস ক'রে বার করেছেন Sorby; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—

আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন।—কবি উঠে পড়লেন।

আচ্ছা, বেশ।—অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

আমি এটা শেষ ক'রে ফেলব এখুনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!

কবি চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন? ডানা বললে, রঙগুলো স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস ক'রে বার করেছেন Sorby; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—

ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি, তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ওই ডিম শুষে

চ্ছ। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, ৱটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে ়র। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ বজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ়মর রঙের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন আর বাইল পিগ্‌মেণ্টের যে সম্বন্ধ আছে, তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চ'লে গেল। বৈজ্ঞানিক ়ম গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন?

হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো?

কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত, নয়? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কার ধ্বনি ব'লে ়টা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন।

যে কোন কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কার ধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের ়কেই ক্রেঙ্কার ধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা।

ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত?

সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর।—মৃদু হেসে ডানা বললে।

তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন? দেখেন নি? ভারি চমৎকার ়তে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে। এইটে হয়ে যাক, তারপর ়নো যাবে, কি বলেন? আমি কয়েকটা ফর্দ ক'রে এনেছি ডিমের রঙের। ়খিগুলোর বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা ়নও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি? বাংলাতেই প্রথমে ়খে ফেলুন, পারবেন?

পারব না কেন? বাংলা ইংরেজী দু রকমই লিখে দেব।

বাঃ, গ্র্যাণ্ড হবে তা হ'লে।

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর ়লেন, হ্যাঁ, লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে ়লো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও ড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখি ়। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা, নিছক একরঙা ়ম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ

দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বা বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে।

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ ক'রে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

হ'ল ?

হয়েছে। আপনি ব'লে যান না !

নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোঁচ-বক।

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, খয়রা কি পাখি ?

ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (Snake bird), অনেকটা হাঁসের মত। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। ঝিলে প্রায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা ব'লে বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপোর পাতের মত। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা। ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত ব'লে যাবেন ইনি।

ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি ?

আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন-তোলা দুধের রঙের মত। ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।

রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে
।-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে,
বার মিউট সোয়ানও (Mute Swan) রাজহংসরূপে চিত্রিত
খেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে
ল গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা বাংলা নামকরণ
তে পারেন যদি—

পাখিটা দেখতে কি রকম?

দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা,
টিও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।

পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?

খুব।

তা হ'লে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণর মত লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায়
ায়াসে।

বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজী নামটা দিন।

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি
তাস্ত তুচ্ছ করবার মত নয় তো। বাঃ! তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো
লের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই
কম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—। হঠাৎ ডানা
খ তুলে বললে, তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?

আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle), দেশী নাম
পমার। এদের ডিম ধবধবে সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব—
রা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের
মও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন
কম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে
পয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম
lotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার
বুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও। গ্রে হেরনের (Grey
Heron) ডিম সী-গ্রীন।

গ্রে হেরনের বাংলা কি?

কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখছেন? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয়—দেখেছেন কখনও?

দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি?

কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল-বক নামে পরিচিত। নীল-বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের···আপনি এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা লিখে দিন···অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দু রকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis, দেশী নাম কালো কোল) এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোনও স্থিরতা নেই। কালী-শ্যামার সাদা, পীতাভ, ফিকে সবুজ—তিন রকম ডিম হয়। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙয়ের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে সবুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish green। আগে হয়েছে greenish blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল ক'রে ফেলবেন না। কাক, দাঁড়কাক, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। কাক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের উপর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মত এক রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো জিনিস মাখানো আছে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন?

একটু বাকি আছে।

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে ডানা বললে, হয়েছে, বলুন। কিন্তু বাধা প'ড়ে

একজন কনস্টেব্‌ল সমভিব্যবহারে দুটো কুলি এসে হাজির হ'ল। দুটো
লির মাথায় দুটো বাক্স। কনস্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম ক'রে চিঠি দিলে একটা।
পচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন।
ামাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি
াল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হ
াইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি তোমা
াছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লো
াকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি— আর. সি.

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার ?

রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও, বেশ তো। আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠি
দেব এখন।

ডানা কনস্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, ভিতরে রাখিয়ে দাও ?

কনস্টেব্‌ল কর্তব্য সমাপন ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, নিন, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে এটা
আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে।

আবার শুরু করলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

নিজের কথা

সংগ্রাম

খোঁচার প্রণালীতে মজা দেখার আয়োজন বহুমুখী। প্রশ্ন শুনতা
আপনি ছবি আঁকেন, আবার কুস্তিও লড়েন ? আশ্চর্য! কেউ জিজ্ঞাসা করতে
আচ্ছা, বাঘ মারেন কেন ? বনের জানোয়ার তো আপনার কোন ক্ষতি ক
নি ! তারপরেই আসত ছোরা নিয়ে শার্দুল হত্যার প্রস্তাব।

বীরত্ব দেখার আশায় আত্মহত্যার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট থাকলেও প্রতিবাদ চ
না, কারণ শ্রোতা চায় কথোপকথনে আনন্দ। তাঁর খোরাক যোগাতে গি

আমি মরি আর বাঁচি, তাতে কার কি গেল এল! রজকের কাপড় কাচার মত, কার কাপড় ছিঁড়ল, কিছু যায় আসে না। ধোপার কাজ হ'ল পরিষ্কার করা, ওইটুকু কাজ সারতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ। দর্শকের উপদেশে কাপুরুষ যদি বীরের ধাপে উঠে যায়, তা হ'লে উপদেশদাতার কিছু বলার থাকে।

কেউ কেউ ঘরোয়া কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব, বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞাসা ক'রে সতেন, কেন আপনার একটি মাত্র ছেলে? আপনার স্ত্রী কেন অত রোগা? আমার চারিত্রিক উন্নতি সম্বন্ধেও অনেকের অসাধারণ আগ্রহ দেখেছি। মদ্য-পানের খরচ কমিয়ে ভাল কাজের ফর্দ ধ'রে দিয়েছেন, তারপরেই প্রতিশ্রুতি চয়ে বসেছেন, অমন দুষ্কর্মের দিকে যেন আর না ফিরি। হিতৈষীদের অনুরোধ অনেক ক্ষেত্রে এমনই জুলুম জাতীয় হয়ে পড়ত যে, গত্যন্তর না থাকায় 'লে ফেলতাম, কাল থেকেই ছেড়ে দেব। প্রতিশ্রুতি, বার তিনেক সত্যের া ঘেঁষে গিয়েছে, বাস্তবিকই ঘটনাচক্রের ফলে প্রায় ছেড়ে দেবার যোগাড় করেছিলাম। পরিবর্তন যা এসেছিল, তাতে সাধুবাবা হয়ে যেতে পারি নি।

যাঁরা কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আমাকে উদ্‌ব্যস্ত করতে আসতেন, তারা সব সময় নিরাপদ কেন্দ্র গুছিয়ে নিতে পারতেন না। পেশাদার ভদ্রলোককে আমি নখী শৃঙ্গীর মতই সন্দেহের চক্ষে দেখতাম, ওদের গুপ্তি মার সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না থেকে উপায় নেই। দু-চার কথায় তাঁরা বিদায় না নিলে আমি বাক্‌-অস্ত্র চালাতাম, ভোঁতা কৌশলের সাহায্যে, চেষ্টা থাকত—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো, কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই দেখতাম, মার সোজাই যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। বউ নিজে মাথা এগিয়ে দিলে, মারের গতির পর ব্রেক কষা যায় কেমন ক'রে? এই প্রথায় অনেক নিরীহ দর্শকও হয়তো মার খেয়ে থাকবেন, তাঁদের জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত।

আত্মরক্ষার জন্য কঠোরোক্তি ক্রমে আমাকে মার্জিত দুর্মুখ ক'রে দল। যাঁরা মজা দেখার জন্যে আমাকে কটুভাষী ক'রে তুললেন, তাঁরা কলেই ভদ্রজন। মজার দাম আমাকেই দিতে হ'ত।

সামাজিক অনুষ্ঠানে এই সব মানুষের সঙ্গেই মেলামেলা বেশি। বিকেলের কে পাড়া ঘুরতে বার হ'লে, চৌকাঠ পার হবার আগেই মন্ত্রজপ শুরু ক'রে তাম, ওদের যেন বাড়িতে না পাওয়া যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে

গার সামনেই "Not at home"-এর প্যাটরা দর্শন হয়ে যেত। অর্ঘ্য দিয়ে গতাম তিনটি ভিজিটিং কার্ড।

প্রতিকূল অবস্থায় নাজেহাল হয়ে যেতাম। গ্রীষ্মকালেই বিপদ বেশি। লাপের প্রথমেই "ব্যারোমিটার হান্‌ড্রেড অ্যাণ্ড ইলেভেন ইন দি শেড" ব'লে হুতাশ না করতে পারলে আহাম্মক ব'নে যেতে হ'ত। তাপের উগ্রতাই স্পরের সমবেদনার সহায়ক, সুতরাং আকাশের জ্বর না মেপে ঘর থেকে র হবার উপায় নেই। এইখানেই কি শেষ? মেয়েদের পরিচ্ছদ ও গঠনশ্রীর শংসা আগে থাকতে গুছিয়ে রাখতে হয়, যথা—What a shapely figure d how you retain it, is simply a wonder! Oh, you are a rling! যাঁর উপর ছাঁকা বিশেষণগুলির বর্ষণ হ'ল, তিনি হয়তো বেধড়ক াটা অথবা অস্থিচর্মসার কৃশাঙ্গী।

স্বচক্ষে দেখেছি, এক ঘণ্টায় তিনবার দেহের রঙ বদলে যেতে। ঙ্গর প্রসাধনের পোঁটলা, ইঞ্জিনে জোড়া কয়লার গাড়ির মতই, ক্ষণে ক্ষণে হের বর্ণে ইন্ধন দিয়ে চলে। প্রসাধনের আড়ম্বরে সাজাটাই ওদের র্বস্ব, আসল রূপ থাকে আড়ালে। সহজ ও সরলের প্রকাশ হয়, ইচ্ছাকৃত বহেলার দ্বারা; দেহাবরণ দাঁড়ায় গোছালো শ্লথবেশ, সোজা কথায় তাক বুঝে গ্নতার উঁকি।

প্রসাধনের শেষে যে রূপ বাহ্যদৃশ্য, তা কতটা ফাঁকি আর কতটা আসল, ঠিক খবর জানতে হ'লে ছুটতে হয় দর্জী-বাড়ি, তার সঙ্গে রুজ ও ড্রাই মেডেব বিলের হিসাবও প্রয়োজন। আবেষ্টনী রসিকের প্রাণান্ত করিয়ে াড়ে। সদাই সন্দিগ্ধ না থাকলে যে কোন মুহূর্তে দৃষ্টিভ্রম, নকলকে আসল 'লে চালিয়ে দিলে পস্তাবারও অবসর পাওয়া যায় না। এই আবেষ্টনীর ঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় অনেক সময় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তথাপি ঙ্গীর খাতিরে সবজান্তা হবার চেষ্টা করতাম, আবহাওয়ার খবর থেকে আরম্ভ 'রে প্যারীসের অতি-আধুনিক ফ্যাশন পর্যন্ত অধ্যয়ন, গীতাপাঠের ন্যায় ধর্ম ংক্রান্ত ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সবেরই সীমা আছে, উপদ্রব গা-সওয়া ক'রে নেওয়া গেল না। হুকষ্টে যে ছদ্মবেশটি সংগ্রহ করেছিলাম তাও ছিঁড়তে শুরু করল, তাপ্পি বড়েই চলল, ছেঁড়ারও কামাই নেই, শেষ পর্যন্ত পোশাক ছাড়তে হ'ল।

আমি মরি আর বাঁচি, তাতে কার কি গেল এল! রজকের কাপড় কাচা মত, কার কাপড় ছিঁড়ল, কিছু যায় আসে না। ধোপার কাজ হ'ল পরিষ্কা করা, ওইটুকু কাজ সারতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ। দর্শকের উপদে কাপুরুষ যদি বীরের ধাপে উঠে যায়, তা হ'লে উপদেশদাতার কিছু বলা থাকে।

কেউ কেউ ঘরোয়া কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব, বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞাসা ক'রে সতেন, কেন আপনার একটি মাত্র ছেলে? আপনার স্ত্রী কেন অত রোগা মামার চারিত্রিক উন্নতি সম্বন্ধেও অনেকের অসাধারণ আগ্রহ দেখেছি। মদ্য পানের খরচ কমিয়ে ভাল কাজের ফর্দ ধ'রে দিয়েছেন, তারপরেই প্রতিশ্রুতি চয়ে বসেছেন, অমন দুষ্কর্মের দিকে যেন আর না ফিরি। হিতৈষীদে অনুরোধ অনেক ক্ষেত্রে এমনই জুলুম জাতীয় হয়ে পড়ত যে, গত্যন্তর না থাকা 'লে ফেলতাম, কাল থেকেই ছেড়ে দেব। প্রতিশ্রুতি, বার তিনেক সত্যে া ঘেঁষে গিয়েছে, বাস্তবিকই ঘটনাচক্রের ফলে প্রায় ছেড়ে দেবার যোগাড় করেছিলাম। পরিবর্তন যা এসেছিল, তাতে সাধুবাবা হয়ে যেতে পারি নি।

যাঁরা কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আমাকে উদ্ব্যস্ত করতে আসতেন, তাঁরা সব সময় নিরাপদ কেন্দ্র গুছিয়ে নিতে পারতেন না। পেশাদার ভদ্রলোককে আমি নখী শৃঙ্গীর মতই সন্দেহের চক্ষে দেখতাম, ওদের গুপ্তি মার ম্বন্ধে হুঁশিয়ার না থেকে উপায় নেই। দু-চার কথায় তাঁরা বিদায় না নিলে আমি বাক্‌-অস্ত্র চালাতাম, ভোঁতা কৌশলের সাহায্যে, চেষ্টা থাকত—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো, কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই দেখতাম, মার সোজাই থাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। বউ নিজে মাথা এগিয়ে দিলে, মারের গতির পর ব্রেক কষা যায় কেমন ক'রে? এই প্রথায় অনেক নিরীহ দর্শকও হয়তো মার খেয়ে থাকবেন, তাঁদের জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত।

আত্মরক্ষার জন্য কঠোরোক্তি ক্রমে আমাকে মার্জিত দুর্মুখ ক'রে দল। যাঁরা মজা দেখার জন্যে আমাকে কটুভাষী ক'রে তুললেন, তাঁরা কলেই ভদ্রজন। মজার দাম আমাকেই দিতে হ'ত।

সামাজিক অনুষ্ঠানে এই সব মানুষের সঙ্গেই মেলামেলা বেশি। বিকেলের কে পাড়া ঘুরতে বার হ'লে, চৌকাঠ পার হবার আগেই মন্ত্রজপ শুরু ক'রে তাম, ওদের যেন বাড়িতে না পাওয়া যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে

জাব সামনেই 'Not at home"-এর প্যাটরা দর্শন হয়ে যেত। অর্ঘ্য দিয়ে আসতাম তিনটি ভিজিটিং কার্ড।

প্রতিকূল অবস্থায় নাজেহাল হয়ে যেতাম। গ্রীষ্মকালেই বিপদ বেশি। আলাপের প্রথমেই "ব্যারোমিটার হান্ড্রেড অ্যাণ্ড ইলেভেন ইন দি শেড" ব'লে হা-হুতাশ না করতে পারলে আহাম্মক ব'নে যেতে হ'ত। তাপের উগ্রতাই পরস্পরের সমবেদনার সহায়ক, সুতরাং আকাশের জ্বর না মেপে ঘর থেকে বার হবার উপায় নেই। এইখানেই কি শেষ? মেয়েদের পরিচ্ছদ ও গঠনশ্রীর প্রশংসা আগে থাকতে গুছিয়ে রাখতে হয়, যথা—What a shapely figure and how you retain it, is simply a wonder! Oh, you are a darling! যাঁর উপর ছাঁকা বিশেষণগুলির বর্ষণ হ'ল, তিনি হয়তো বেধড়ক মোটা অথবা অস্থিচর্মসার কৃশাঙ্গী।

স্বচক্ষে দেখেছি, এক ঘণ্টায় তিনবার দেহের রঙ বদলে যেতে। সঙ্গের প্রসাধনের পোঁটলা, ইঞ্জিনে জোড়া কয়লার গাড়ির মতই, ক্ষণে ক্ষণে দেহের বর্ণে ইন্ধন দিয়ে চলে। প্রসাধনের আড়ম্বরে সাজাটাই ওদের সর্বস্ব, আসল রূপ থাকে আড়ালে। সহজ ও সরলের প্রকাশ হয়, ইচ্ছাকৃত অবহেলার দ্বারা; দেহাবরণ দাঁড়ায় গোছালো পথবেশ, সোজা কথায় তাক বুঝে নগ্নতার উঁকি।

প্রসাধনের শেষে যে রূপ বাহ্যদৃশ্য, তা কতটা ফাঁকি আর কতটা আসল, সঠিক খবর জানতে হ'লে ছুটতে হয় দর্জী-বাড়ি, তার সঙ্গে রুজ ও ড্রাই ক্লিনিং-এর বিলের হিসাবও প্রয়োজন। আবেষ্টনী রসিকের প্রাণান্ত করিয়ে ছাড়ে। সদাই সন্দিগ্ধ না থাকলে যে কোন মুহূর্তে দৃষ্টিভ্রম, নকলকে আসল ব'লে চালিয়ে দিলে পস্তাবারও অবসর পাওয়া যায় না। এই আবেষ্টনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় অনেক সময় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তথাপি জীব খাতিরে সবজান্তা হবার চেষ্টা করতাম, আবহাওয়ার খবর থেকে আরম্ভ ক'রে প্যারীসের অতি-আধুনিক ফ্যাশন পর্যন্ত অধ্যয়ন, গীতাপাঠের ন্যায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সবেরই সীমা আছে, উপদ্রব গা-সওয়া ক'রে নেওয়া গেল না বহুকষ্টে যে ছদ্মবেশটি সংগ্রহ করেছিলাম তাও ছিঁড়তে শুরু করল, তাপ্পি বেড়েই চলল, ছেঁড়ারও কামাই নেই, শেষ পর্যন্ত পোশাক ছাড়তে হ'ল

ডলীকে জানিয়ে দিলাম, তোমাদের ভদ্রাচার আমার ধাতে সইছে না। শীঘ্র নিজের মত ক'রে বাঁচার ব্যবস্থা না হ'লে মাথার রোগ এসে যেতে পারে। পাগল হবার সম্ভাবনা জেনেও ডলী বিশেষ চিন্তিতা হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল না, সমবেদনার পরিবর্তে দেখলাম ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির প্রকাশ।

ভদ্রবেশী ছদ্মরূপ বর্জন ক'রেও পরিত্রাণ পেলাম না। আমার আসল চেহারা লোকের সামনে বার করার উপায় নেই। সমাজরক্ষণশীল ব্যক্তিরা আমার খ্যাতি ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছেন। খবর কৌতূহল ডিঙিয়ে আতঙ্কের কিনারায় এসে পড়েছে, সকলেই আমাকে পাশ কাটাতে পারলে বাঁচে। এই সময় সোনায় সোহাগা এসে জুটল, আমি সুরাসক্ত হয়ে পড়লাম।

যে লোকের এক কালে মদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল, আত্মবিস্মৃত মদ্যপকে কৃপার চক্ষে দেখত, সেই ব্যক্তির নিকট পূতিগন্ধযুক্ত পানীয় মধুর হয়ে উঠল কেমন ক'রে, জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

সাহেবী খানায় রাত্রি-ভোজনের জন্যে ডাক পড়েছিল ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে। নিমন্ত্রিতদের ভিতর আমরাই প্রধান অতিথি। অভ্যর্থনার জন্য বহু প্রকারের প্রাচীন সুরা সাজানো ছিল, সর্বাগ্রের পাত্রটি বেজায় খর্বাকার। শাস্ত্রসম্মত পানের বিধি ওই খর্বাধার থেকে শুরু।

সুস্থ মানুষকে মাতলামি করতে দেখেছি, করুণার দৃশ্য। কোন্ জাতীয় মদ কতটা খেলে সুস্থ মানুষ বেসামালের অবস্থায় এসে পড়ে, জানা ছিল না। ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম, ওই জিনিস ভিতরে ঢুকলেই মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভয় ছিল মনে।

গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিয়ত অনুরোধ সত্ত্বেও ইতস্তত ভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। ডলী আমার বেহায়াপনায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, নিজে যৎসামান্য খেয়ে দেখিয়ে দিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি সাহেবী চালের অনেক কিছুই জানতেন। ডাইওসেসন কলেজে খাঁটি বিলাতী মেম শিক্ষা দিয়েছিলেন, টেবিলে ছুরি চালানো থেকে এ দিকটাও বোধ হয় এগিয়ে দেওয়া ছিল। এ ছাড়া অত্যুগ্র পাশ্চাত্য-পন্থী আত্মীয়দের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট, সুতরাং সাহেবী চালে মেলামেশায় অবর্জনীয়কে জানাটাই স্বাভাবিক। তাঁর দুঃসাহসিক কীর্তির প্রতিক্রিয়া কি রকম

দাঁড়ায়, লক্ষ্য করছিলাম। তিনি দেখলাম কাজটা নিশ্চিন্ত মনেই পারলেন এবং বেমালুম হজমও ক'রে ফেললেন। তাজ্জব ব্যাপার!

দৃশ্যটি আমার পৌরুষকে ক্ষুণ্ণ করছিল। ভাবতে লাগলাম, যে কাজ অবলা নারী অবলীলাক্রমে করতে পারে, তা আমার মত একজন সাজোয়ান পুরুষ পারবে না কেন? ডলী এরই ভিতর আর একটি ঢোক গিলে, বাংলায় বললেন, একটু সিপ ক'রে রেখে দাও, তা নইলে হোস্টরা অসুবিধায় পড়ছেন।

ওইটুকু তো পাত্র, তাতে আবার ঢোক গেলার স্থান কোথায়? পৌরুষকে বাঁচাবার জন্যে এক চুমুকেই পাত্র খালি ক'রে দিলাম। ডলী আমার কাণ্ড দেখে অবাক। আমি ভাবলাম, একটা মহৎ কীর্তি ক'রে ফেলেছি।

তরলাগ্নি ভিতরে গতিশীল হয়ে উঠতে নতুনের সাড়া পেতে লাগলাম। অনতিবিলম্বে বয়স কাঁচার দিকে এগুতে শুরু ক'রে দিলে। বেগশীল গতি, ক্ষণিকেই চিত্ত ভাবময় হয়ে উঠল, যৌবন এল এগিয়ে। সুদীর্ঘকাল পরে নিজের স্ত্রীর মধ্যেই পরকীয়ার আকর্ষণ খুঁজে পেলাম। উয়িং (Wooing) নয়, একেবারে ভুলে যাওয়া দুর্দান্ত রোমান্স ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ডলীকে মনের কথা বলতে চেয়েছিলাম বোধ হয়। অশুভ ইঙ্গিতে দ'মে গেলাম।

ইতিমধ্যে ভোজন শুরু হয়ে গিয়েছে, কাঁটা চামচে দিয়ে মনের মত ক'রে গ্রাস তুলতে পারছিলাম না। হাত দিয়েই আসল কাজটা সেরে নেবার চেষ্টা ছিলাম, খাটি স্বদেশী ধমক খেলাম, করছ কি? ভাল কাজই করছিলাম কিন্তু ধমকে বাড়ন্ত হাত থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রসের গুণে বামাকণ্ঠের তিরস্কারও এত মধুর হয় জানতাম না. একেবারে গ্রামের খেঁদীর মা ব পাঁচকড়ির বউয়ের ভাষা। গদগদভাবে বধূর দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কি নির্ম প্রতিদান! এই ঘটনায় একটি পরম সত্য আবিষ্কার করলাম, সভ্য সমাজে ধর্মপত্নীর নিকট প্রেমনিবেদন অনধিকার চেষ্টা।

আহারান্তে চাকাযুক্ত চলন্ত টেবিল রঙিন রস নিয়ে হাজির। আমা উপরেও রঙ চড়েছিল, নিঃসঙ্কোচে ব'লে ফেললাম, সেই সবুজ রঙের বস্তু চাই। তখন আমি "সবই সবুজ ও কাঁচা" দেখছি, কেবল "পুচ্ছ তুলে নাচার বাকি। বিদুষী কড়া দৃষ্টি আমার উপর রেখেছিলেন, তাঁর চাউনি স

কিছু ফাঁসিয়ে দিলে। বুঝলাম, ওদিকে আমার পাওনার দাবি শেষ হয়ে গিয়েছে, আমার এখন কেবল দেখার পালা।

যে সময় বিদুষীর চাহনির খপ্পড়ে পড়েছিলাম সেই সময় দেখলাম, অন্য নিমন্ত্রিতেরা ঢালার কাজে সকলেই উদ্‌যোগী হয়ে উঠেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দেওয়া ও নেওয়ার কাজে উদার। 'সে, হোয়েন'-এর বিপদ-সঙ্কেত পুনঃ পুনঃ শুনছি, অথচ আমার সম্বন্ধে সকলেই নির্বিকার। রাত গভীর হয়ে আসছিল, ডলী বললেন, এবার আমাদের উঠতে হয়। ওঠার পিছনে যে গূঢ় রহস্য জড়িয়ে ছিল, তা বুঝতে বাকি রইল না। সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাকেই ঠাওরালেন—কাজ গুছিয়েছি। ওদের ঢালা তখনও চলছে, আমরা উঠলাম।

দীক্ষার কিছুদিন পরেই আমি খ্যাতনামা সোমরসিক হয়ে গেলাম। মানুষ মহৎগুণসম্পন্ন হ'লেই, গুণের ব্যাপক প্রচার অবশ্যম্ভাবী। আমার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

ঝানু কারবারীর দল আমার খ্যাতির সম্পদকে নিজেদের ব্যবসার মূল-ধন ক'রে নিলেন। পরের ধনে পোদ্দারি সুচিন্তিত হিসাবের ব্যাপার, স্বল্প চেষ্টাতেই তাঁদের জমার দিক পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পুষ্টির প্রচারে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা আমাকে মাটির দেশে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ক'রে ছাড়লেন। সারা পৃথিবীতে মাতাল বলতে আমাকেই বোঝাত। অনেকে রাস্তার গন্ধেই আমার ঠিকানা আবিষ্কার করতেন। যাঁরা কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে বেসামাল দেখতেন, দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলতেন, লোকটা কি হতে পারত, আর কি হ'ল! তাঁদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগও পাই নি। ঘরের বাইরেও আমাকে দেখবার উপায় নেই, কারণ আমি ঘর থেকে বার হই না।

যাঁরা পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে ছোঁয়াচে রোগ স্বেচ্ছায় গায়ে মাখতেন তাঁরা জানতেন না, আমার মদ্যপানের কেরিয়ারে ঐখানেই গলদ থেকে গিয়েছে। গুণগ্রাহীরা বলেন, আমার পানশক্তি একটা গিফ্‌ট্। মাতালের কাছে নেশার আসল লাভ টলা, দুর্ভাগ্যক্রমে এই দিকটায়ই লোকসান দিয়েছি বিস্তর। অভাবে নিজের খরচায় পরের টলা দেখে আত্মসান্ত্বনা সংগ্রহ করেছি। মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরা আমার খরচায় বেসামাল হতেন, তাঁরাই দেখতেন আমার টলা।

আমার নামের প্রচারকরা সঠিক খবর চেপে গিয়েছিলেন।

কেরিয়ারের গলদ সম্বন্ধে প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আজও আমার শিকারের বাক্সে তোলা আছে, বস্তুটি একটি থ্রী-ক্যাসেল সিগারেটের টিন। শিকারের ঘটনায় এটি সংগ্রহ করেছিলাম।

রাত দুটোয় বেজায় ভারি এবং অতি বৃহৎ রাইফেল দিয়ে প্রায় একশো ফুট দূর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ওই টিনটি ঠিক মাঝখানে ছেঁদা করি, সাধারণ বৈদ্যুতিক টর্চের সাহায্যে। এইটুকু বলতে পারি, বিনা রেস্টে নিশানা করা তো দূরের কথা, সাধারণ বাঙালী যুবকের পক্ষে ওয়েস্টলি রিচার্ডসের '৪২৫ বোর হাই ভেলসিটি রাইফেল কাঁধের উপর সোজা বসানোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঘটনাটি বাজির তাকমারি থেকে। ডিণ্ডভামেটায় বাঘ মারার উৎসবে কয়েকজন ফরেস্ট অফিসার যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে চান না, বাঘের মাথার খুলি নিশানার দ্বারা উড়েছিল। তাঁদের ধারণা, দৈবাৎ লেগে গিয়েছে। লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আমার অহমিকাকে নত করতে পারি নি। বাজি মেনে নিয়েছিলাম। শর্ত ছিল, দেড় বোতল ব্র্যাণ্ডি শেষ ক'রে লক্ষ্যভেদে নামব। যাঁরা বাজি ধরেছিলেন, তাঁদের ভিতর একজন ছাড়া কেউই বাজির খেলা দেখবার জন্যে ব'সে থাকতে পারেন নি। এবং যিনি কোন প্রকারে টাকার মায়া আগলাচ্ছিলেন, তাঁকেও নির্ভরশীল সাক্ষী ভাবা চলে না, কারণ তিনি চোখ বুজেই সব কিছু দেখছিলেন।

প্রহিবিশনের যুগে কেউ যদি এই সত্যটি আস্ফালন মনে করেন, তা হ'লে পুনরায় পূর্ববর্ণিত অবস্থায় এই কেরামতি দেখাতে পারি, অবশ্য ছাড়পত্র দরকার, এ ভার সন্দিগ্ধ সুযোগদাতাদের উপর ছাড়াই ভাল।

পান-সাধনাতেও বাহবার লোভ ছিল বইকি, তা নইলে কেরিয়ারের কথা উঠল কেন? সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত 'ননস্টপ রিভিউ' চালিয়ে যে লোকের ভারী রাইফেল দিয়ে অতি ক্ষুদ্রাকার লক্ষ্য ফুটো করতে হাত কাঁপে না, তারই পা টলতে দেখায় দিব্য-দৃষ্টির ক্ষমতা থাকা দরকার। হয়তো যাঁরা আমার কাছে আসতেন, তাঁদের এদিকটায় চর্চা ছিল। তাঁদের সাধনায় বাধা দিতে চাই না। আমার বক্তব্য, সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে ঘরে চড়াও দর্শকের দল কখনও আমাকে টলতে দেখেন নি। এতটা জোর দিয়ে লিখলাম, কারণ আমার উপরওয়ালা বিদুষীর কাছে টলার কেরামতি

এখন লায়াবিলিটিস হয়ে আছে, ব্যবসাবুদ্ধি না থাকায় অ্যাসেট ক'রে নিতে পারেন নি। বিদুষীকে এই জাতীয় লায়াবিলিটিসের ভার নিতে বলার সাহস অন্তত আমার নেই।

স্বীকারোক্তিতে নামি। চলতি দর্শক যা দেখে নি তা কখনও ঘটে নি—এমন কথা বলি কেমন ক'রে? স্থান, কাল ও পাত্র বিচারে, গণ্ডির বাইরে গিয়ে মজা দেখেছি বইকি। দেহ খানায় না পড়লেও মন ট'লে গিয়েছে; উপরওয়ালার (বর্তমান ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী) শাসনের ভয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

স্বীকার যখন করলাম, তখন পানের সমর্থনেও কিছু বলা দরকার; তা না হ'লে নেমকহারামি হয়ে যাবে। মদ অনেক দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে, দুরারোহ স্থানে ওঠবার সাহস দিয়েছে, বোকা হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির সহায়তা পেয়েছি, বহু নীতির ব্যভিচারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি, নিজেকে এখন অভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারি, সুতরাং দাতার দানকেও অস্বীকার করা চলে না।

পানের উদ্দেশ্যই তো একটু কি-রকম হওয়া, কাঁটা-বনে ফুল ফোটানো, যে ফুল সহজ চোখে দেখবার উপায় নেই তাকেই রঙিন মনে চাক্ষুষ করা, সাদার মড়কে রঙ দিয়ে প্রাণ দান। ফুলের মিষ্টি গন্ধে মশগুল হবার সময় দুটো কাঁটা গায়ে বিঁধে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু বেদনার অনুভূতি আসে ভোগচরিতার্থতার পরে। হোক না আনন্দ ক্ষণিকের, আসুক না আনন্দ বেদনাকে পিছনে নিয়ে, তবু ক্ষণিকের আনন্দকে কি তুচ্ছ করার উপায় আছে? ভোগ করেছি, দাম দেব না? দিলাম না হয় বেদনা-ভোগে আনন্দের দাম। কবির কথা এখানে কাজে লাগিয়ে দিই।—ছোট মেয়ে বললে, দেখ দেখ মা, কি এনেছি দেখ! কুড়ানো রত্নকে মা দেখলেন, তুচ্ছ পাখির পালক, রঙিনের রস-ভোগ-শক্তি না থাকায় সুন্দর পেল অবজ্ঞার স্থান। খুকী এসেছিল ভাগ দিতে তার আনন্দের অনেকটা অংশ মাতাকে, প্রতিদানে পেল তাচ্ছিল্য, নির্মম আঘাতে শুকিয়ে ফেলল তার আনন্দের খোরাক। আনন্দের উৎস যেখানে নিরীহ সেখানে গোপনে ভোগস্পৃহার ইচ্ছা আসত না, আরও পালক জড় হ'ত না যদি খুকী ভোগের চূড়ান্ত প্রকাশ্যেই করতে পেত। হয়তো সে নতুন রত্নের সন্ধানে নিজে থেকেই নোংরা পালক ফেলে দিত।

...স্তু ভোগের পূর্বেই ত্যাগের তাড়নায় রূপরসিক সুন্দরকে আঁকড়ে ধরলে। ...বজ্ঞার বস্তুর ভিতরেও যে সুন্দর লুকানো থাকতে পারে, আনন্দের স্রোত ...'য়ে চলে, আনন্দ ক্ষণিকের হ'লেও তার জের যে সারা জীবনব্যাপী চলতে ...ারে—এ খবর সংস্কারের তাড়নায় মাতার কাছে পৌঁছায় নি। যা তুচ্ছ, যা ...বজ্ঞার বস্তু, তাও যে ব্যবহারের পার্থক্যে এবং পাত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ...ানন্দের উৎস হতে পারে, তা সন্ধানের জিনিস। সন্ধানের অবসর বা ...াহস থাকে কজনের? মলিন অঙ্গার থেকেই হীরকের উৎপত্তি, ভোগীর প্রয়োজনীয়তাতেই হীরকের আত্মপ্রকাশ। পালকের নোংরা আবরণের ভিতর খুকী দেখেছিল সুন্দরের উজ্জ্বল রূপ, রূপভোগে চেয়েছিল আনন্দের খোরাক, সুতরাং অস্পৃশ্যের মধ্যেও এমন গুণ থাকতে পারে, যা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পানবিরোধী যে সংস্কার বা অভিজ্ঞতা থেকেই নীতিকে কঠোর ক'রে তুলুক, তা মাত্র সাময়িক বিচারের সন্তুষ্টি; চিরন্তন নিয়ম নয়, কারণ সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য যুগে যুগে নীতির পরীক্ষা হয়েছে, পরীক্ষার ফলে নীতির পরিবর্তনও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। পরিবর্তনের যদি ফাঁক থাকে, তা হ'লে বিচারও নিরপেক্ষ ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাতালের সহজ অর্থে বুঝি, কারণের প্রতিক্রিয়ায় মনের সমাধি অথবা অসাধারণ চঞ্চলতা, সংক্ষেপে নিজের চিন্তায় বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। এই সূত্র অবলম্বনে মাতাল যদি ঘৃণ্য হয়, তা হ'লে দেখা যাবে, দার্শনিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক থেকে দাবার খেলোয়াড় পর্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর মাতালের গা ঘেঁষে চলেছে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই, জনরব—শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত দার্শনিক প্রথম কথাতেই জানতে চাইলেন, যার শ্রাদ্ধে এলাম তাকে তো কই দেখছি না! দাবার খেলায় মাতাল সর্পাঘাতে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কাদের সাপ? সবই তো কোন না কোন কারণের প্রতিক্রিয়া, সকলেই নিজের তালে বেহুঁশ, সকলেই সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নির্লিপ্ত।

সুতরাং ন্যায্য বিচার সম্ভব হ'লে দেখা যাবে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছে, নীতির ধ্বজা টিকে আছে ঝাণ্ডা বদলাবার জন্য।

আমার এখানে যাঁরা সান্ধ্য-ভ্রমণের আড্ডা গেড়েছিলেন, তাঁদের ভিতর একদল ছিলেন 'খাই যদি হয় পরের পয়সায়', আর একদল হিতৈষী

সেজে আসতেন। আর্থিক অনটনে যখন অতিথি-সৎকারে বিঘ্ন ঘটতে লাগল, তখন প্রথম দলভুক্তরা আমাকে অভদ্র ব'লে বসলেন। বিচারে অপমানকর কিছু ছিল না। ন্যায্য পাওনা ব'লেই মেনে নিয়েছি। আড্ডার কথা ছেড়ে দিই. যে সব ছাত্রের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছি, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আর্থিক সাহায্য করেছি, সুখদুঃখের ভাগ নিয়েছি, সর্বোপরি স্বাধীনভাবে রূপসন্ধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই দাতার দান স্বীকার করতে রাজি নয়, তাদের শিল্পী হিসাবে অস্তিত্ব যে আমার পথনির্দেশ ব্যতীত হ'ত না, এ কথা তারা না স্বীকার করুক, আমি কথাটা সত্য ব'লেই জানি; কারণ সারা ভারতের মধ্যে এইখানে একটি শিক্ষাপীঠ আছে, যেখানে গোঁড়ামির দাপট এখনও কিছু করতে পারে নি। যথেচ্ছাচারিতার সহানুভূতি দেখাতে না পারলেও, আমার চালে তাদের দাসখৎ লিখতে বলি নি। এখানে নিজের দানশীলতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি না, হৃদয় ভেঙে যাবার কারণ দেখাবার চেষ্টা করছি মাত্র। মানুষ কেমন ক'রে রূঢ় হয়ে যায়, তারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে—আমার দান মাঠে মারা পড়ে নি, বাংলায় এবং বাংলার বাইরে রূপরাজ্যে নতুনের আগমন যদি সুস্থতার পরিচয় দিতে পারে, তা হ'লে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের নাম নিজের স্থান খুঁজে নেবে। ইতিমধ্যে বয়েসের জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক, অনেক মাসিক-পত্রিকাতে দেখি, আমার নামের ডগায় শিল্পাচার্যের খেতাব এসে পড়েছে। আধুনিক যুগে ভারতের মধ্যে শিল্পাচার্যের যোগ্যতা একমাত্র গুরু অবনীন্দ্রনাথের আছে। তিনি জানেন, রসের কথা বলতে গিয়ে কোথায় থামতে হয়। আমার বয়স পঞ্চাশের কিনারায় এলেও এখনও শিখছি, সুতরাং আচার্যের দাবি থেকে আমি কেন, আরও অনেককে বাদ দিতে হয়।

আড্ডার দ্বিতীয় দলভুক্তদের কথা বলি। তাঁদের নিয়েই আমি অসুবিধায় পড়েছিলাম। তাঁরাই গোপনে আমার খ্যাতির সম্পদ নিয়ে কারবার চালাচ্ছিলেন। মাল-মসলার অভাব ঘটলেই আমার কাছে হাজিরা দিতেন। যাঁর নেতৃত্বে ব্যবসা ফেঁপে উঠছিল, তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। রাজা উজির মন্ত্রী থেকে মডেলের খবুরীর সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশতে পারতেন। শিল্পী সাজার শখ ছিল যথেষ্ট, যতটা না পারতেন হাতের কাজ, কথার প্যাঁচে সেরে নিতেন। আমাদের দেশে এই প্রথাতেই প্রতিষ্ঠা

প্রশস্ত। সুতরাং লোকে যদি তাঁকে শিল্পী ব'লে জেনে থাকে তো :ভিযোগ তোলার ফাঁক নেই। গুণধর যে বাস্তবিক একজন বিশিষ্ট ়াতিভাবান, তা ধরা পড়ল তাঁর সদিচ্ছা আত্মপ্রকাশ করায়, প্রিন্‌সিপ্যাল ়াহেবকে গদীচ্যুত করার মামলায়। সত্যের উদ্ঘাটনে দেখলাম, খর্বাকার ়ানুষের ভিতরই লুকানো রয়েছে পিশাচের বিরাট প্রতীক। এই লোকটি ়তি কুচক্রী, নিজেকে তিনি সবজান্তা ব'লে প্রচার ক'রে থাকেন, এবং ়নেকেই তা মানেন। তবে আর যাই হন, লোকটি ভদ্র। জনরব—পদি-পিসী ়লেন, ছেলে আমার চোর হোক, ছ্যাঁচোড় হোক, কিন্তু তার উঁচু নজরটি নই বাপু, ছেলেটা ভাল। সুতরাং উঞ্ছবৃত্তি থাকলেও ভদ্র হতে বাধা ়কোথায়?

যে সময় ভদ্রলোক নিজের প্রতিভা কাজে লাগাচ্ছিলেন, সেই সময় আমার সংগ্রাম বাঁচা ও মরার সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কর্মকৌশল এমনই আটঘাট বাঁধা যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিস লাগিয়ে দিলেও তারা তাঁকে সেলাম ঠুকে পিছিয়ে পড়ত। কোন দিক দিয়েই প্রতিভার নাগাল পাবার উপায় নেই, অথচ জানি, কোন্ লোকের নির্দেশে কি ঘ'টে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণ্যমান ঘটনাচক্র এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল যে, আত্মসম্মান বাঁচাতে হ'লে দুটি পথ খোলা দেখলাম। একটি চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া, আর একটি উপরওয়ালার সঙ্গে লড়াই। চাকরি ছাড়তে হ'লে একটা কিছু যোগাড় ক'রে নিতে হয়, সংসারের বোঝা ঘাড়ের ওপর। পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিলাম তা খরচের তাড়ায় বেশির ভাগই উপে গিয়েছিল, নিজের উপায়ের নগদ টাকাও বহুবার ছয় অঙ্কের ধাপে খরচ করায় ব্যাঙ্ক খালি। ভাবলাম, সিনেমাতে ঢুকতে না পেলে শেষ পর্যন্ত রিকৃশা টানতে আরম্ভ ক'রে দেব। সব প্রস্তুত, সিনেমার দু-চারজন অধিকারীর সঙ্গে দেখাও করলাম, তাঁরা এমন সমীহের সঙ্গে কথা বললেন যে, ভিন্ন প্রকারে জানিয়ে দিলেন—তোমার সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ চলবে না। দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। ডলী বললেন, জঘন্য অপবাদ থেকে খালাস না হওয়া পর্যন্ত চাকরি ছাড়া চলবে না, তোমাকে লড়তে হবে; আমি জানি, তোমার দ্বারা জঘন্য কাজ সম্ভব নয়, যেমন ক'রে পার সত্যকে লোকের সামনে ধরতে হবে। শীর্ণকায়া মহিলা

আমার সামনে শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন। বাস্তবিক, সেদিন তাঁর অপূর্ব রূপ দেখেছিলাম। ভাবলাম, চাকরি ছাড়লে সব অপবাদ মাথায় নিয়েই বার হতে হবে। কলঙ্কের ভার শুধু আমার উপর থাকবে না, আমার একমাত্র সন্তান তাকেও সারাটা জীবন বহন করতে হবে। ছেলের বয়স তখন ১৬, জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা যায় বল তো ? কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত না হয়ে ব'লে দিলে, You must fight and assert the spirit of a Bengali। (ছেলে ভাল বাংলা জানে না, ওর মাতৃভাষা তামিল হযে গিয়েছে।)

পথ ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু লড়ব কার বিরুদ্ধে, যে রক্ষক সেই যে ভক্ষক ! বিচারপ্রার্থী হব কার কাছে, যে বিচার করবে সেই তো নরপিশাচের পৃষ্ঠপোষক ! দণ্ডের ব্যবস্থা যেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানে বিচারের সময় কোথায় !

ডলীর সাহসে দ্বিধা কেটে গেল, কলম চালালাম প্রভুর বিরুদ্ধে। বৎসরাধিককাল ধ'রে উভয় তরফ থেকে পালটা জবাব চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পীড়নকারীকে বিদায় হতে হ'ল। এ বিষয়ে অনেক লেখবার ছিল, কিন্তু Wild-এর ভাষায় বলি—Details are vulgar।

এতকাল রসের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ছবির রাজ্যে বিপ্লবের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে originality-র দাঙ্গা। উদ্ভট বিকট বীভৎস, সব কিছুই নীচে থেকে উপরে উঠে আসছে, সুন্দরের নবতম আদর্শ তৈরির জন্যে। রসগ্রাহী ও রূপস্রষ্টার উপাস্য দেবতা পিকাসো, ভ্যানগগ্, গোঁগেঁ, শিয়ান, ম্যাটিসি ইত্যাদি।

ইউরোপে ইতিমধ্যে কিউবিজ্‌মের যুগ ঝিমিয়ে যাওয়ায় সুর্‌রিয়েলিজ্‌ম প্রাধান্য পেয়ে বসেছে। চারধারে একটা নতুন কিছু করার ধুয়ো। বিদেশী হুজুগের ঝড় এদেশেও এসে পড়ল। বাংলায় দেখা গেল নানা নামে গ্রুপের আবির্ভাব। আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গীতে অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পড়লেন পুরাতনের আবর্জনায়।

পিকাসোর কোলে মানুষ, নবজাত পোটোইজ্‌ম, ডিম্বায়তন মুকুট প'রে মাথা খাড়া করল, হরিজন-আর্টের খিচুড়ি পরিবেশনের জন্যে। দৈন্যই হ'ল দরদের প্রধান আকর্ষণ।

এই সময় ওরিয়েণ্টাল ডিজাইনের চাহিদা বেড়ে উঠেছে বিদেশীদের

২। জনরব, মার্কিন দেশে বালিশের খোল ও দরজার পর্দায়, ভারতীয়
তির কিছু নথি দেখানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ডিম্বাকৃতির ফরমা
দি ছাপমারার সুবিধা ক'রে দিলে। পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে জানার আড্ডায়,
পোটোইজমের কেরামতিতে ব্যক্তিগত শিল্পীর কাজ থাকল না, রসের
বারে কারখানা খুলে গেল। ওরিজিনালিটির একই ফরমায় বহুর
র্ভাব অভিনব প্রথায় শুরু হ'ল। ছবির ড্রইং থেকে নাম সই পর্যন্ত
ভিন্ন শিল্পীর কাজ, কর্ণধার ব'সে থাকেন শেষের দিকে ওরিজিনালিটির
টফিকেটে দস্তখৎ মারবার জন্য। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ছবি শেষ হয়, ওজন-
র রপ্তানির জন্যে।

যাঁরা পটচিত্রে গোময়-লিপ্ত মাটির গন্ধ এড়াতে চাইলেন, তাঁরা ভিন্ন
থায় দ্রুত কাজ সারার পথ খুঁজে নিলেন, ঝটপট আঁচড় কেটে ইঙ্গিতময়
র্টের প্রবর্তন হ'ল। নকশার ফর্ম নেই, বক্তব্যের উদ্দেশ্য নেই, ফরমায়
লা কতকগুলি প্যাঁচালো রেখা ছন্দের আশায় হুড়োমুড়ি লাগিয়ে দিলে।
ার কথা যদি কিছু থাকে তো তা ভিড় জমানোতেই শেষ। বাকি যা
ব্যক্ত রইল, তা ভেবে নেবার জিনিস। শিল্পী, রসগ্রাহীর চিন্তাশীলতার
ম্ভা ক'রে দিয়েই খালাস। ইংরেজীতে এই চালাকিকে শুদ্ধ ভাষায় বলা
র—scope of imagination। নবতম সমঝদার সুবিধা পেলেন প্রচুর,
বিতে যা নেই তারই আবিষ্কারের ব্যাখ্যায় আর্ট অব হিজিবিজি কৃষ্টি-
াধনের বিরাট অঙ্গ হয়ে উঠল। কৃষ্টির ক্রুরতা এইখানেই শেষ নয়,
bstractness-এ গোলোক-ধাঁধার ধুয়ো আমাদের মত অবুঝদের মাথায়
রকিবাজি ঘুরিয়ে দিলে, মাথার ভিতরে বারুদ ফাটায় চোখে তুবড়ির খেলা
খতে লাগলাম, ছবির কোনখানে পাত্তা নেই।

নির্দিষ্ট আদর্শের অভাবে অথৈ পাথারে প'ড়ে গেলাম। ভেসে থাকার
দ্দেশ্য নেই, তবু বাঁচতে হয়, স্রোতের টানে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। ভাসমান
বস্থায় দেখলাম, ঢেউয়ের ঠেলায় পিছনের জিনিস সামনে এগিয়ে আসছে,
বই মড়া। স্রোতের টান বাঁচা আর মরার কোন প্রভেদ রাখে না, টানের
ামনে যা পড়ে তাই ব'য়ে নিয়ে যাওয়া বেগশীল স্রোতের কাজ। দম
ঃশেষিত হবার উপক্রমে কত বার অগ্রগামী মড়াকেই আঁকড়ে ধরার ইচ্ছা
েসেছে, কিন্তু মড়া কিছুকালের জন্য প্রাণধারণের আশ্রয় হ'লেও পূতিগন্ধ

লড় করার অভ্যাস না থাকায় পিছিয়ে পড়াকে অধিকতর বরণীয় মনে করেছি।

স্রোত পরিবর্তনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে মড়া ছাড়া কিছু নেই। ভাসমান অবস্থাতেই ভাবতে থাকি, পরিবর্তনকে বাধা দেবে কে? স্রোতবহ সান্ত্বনা দেয়, ওরাও যাবে চ'লে, ওরাও পড়বে পিছিয়ে। কাজে আন্তরিকতা সুন্দর ও সত্য থাকবে বেঁচে। বাঁচার প্রয়োজন থাকলে আপন চেষ্টাতেই বাঁচবে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে নিজেকেই আঁকড়ে থাক, বাঁচার ব্যবস্থ তোমার নিজের কাছে।

ভাসতে ভাসতে উঠলাম এক দেশে। চোখ খুলতে দেখি, আমারই বাংলা স্রোতের টান নতুন জায়গায় নিয়ে যায় নি, ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে গিয়েছিলাম পাড়ে উঠে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি, আর্টের আয়োজনে গাজন তলার ভিড়। মেলায় বেচাকেনার ব্যাপারে সস্তার মাল ভরা। ক্রেতা ও বিক্রেতার বোঝাপড়াও সহজ ও সরল কথায়। এক দাম, এক কথা, ফাঁকি বিচার মাল বিক্রিব পরে। সোজা হিসাবই বটে, এক পক্ষকে অন্তত ঠকাবার উপায় নেই।

সরল, সস্তা ও এক কথাব ত্র্যহস্পর্শে কাববারস্থান পুণ্যভূমি হয়ে উঠেছে ঘুরতে লাগলাম সরলের কাছে, দেখলাম, শিশুর মনে ভাগ বসাতে চায় পব পাকা বুড়ো। বুড়ো কোন কালে ছিল নৃত্যকলাবিৎ, কোমর ভাঙায় তা নাচ হয়ে গেল সরল। সুরের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তাল বেসামাল, লোকটা নেচে গেল খোকনের নাচ।

নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ফাঁকিতে পড়ল কে, দর্শক, না নট? উত্তর পাই কেউ না, ওদের কাজ ছিল ভিড় বাড়ানো, কাজ সেরেছে উভয়েই, ফাঁকির ভাগ যা রইল প'ড়ে তা আর্টের আয়োজন। মাঝখান থেকে কতকগুলো বিশেষণ হ'ল ঘায়েল। মরণকামড় কামড়ে দিলে ছাপার অক্ষরে আত্মজাহিরের জন্য। চিন্তিত হয়ে পড়লাম, বিশেষণে বিশেষণে কামড়া-কামড়ি—সে আবার কেমনতর দৃশ্য? রসের বাজারে টিটকারি ওঠে, নেপথ্যে কে ব'লে যায় লোকটা কোথাকার মানুষ, নতুনের খবর রাখে না! বিশেষণের ঠোকাঠুকি হ'ল প্রশংসার লড়াই, এ বলে—আমাকে দেখ, ও বলে—আমাকে। রসের দাম বাড়ে কি মন্ত্র দিয়ে? দেখলে না, খোকনের নাচ তারিফ ক'রে গেল

ের মতই আর এক বুড়ো ? রামুর কোমর ভাঙুক, তবুও চোখে দেখে, আর যে
রিফ করলে সে একে কানা তায় আর একটা চোখও যেতে বসেছে। ভিক্ষের
ার মন্দা, আজকাল আবার যাচাই ক'রে দয়া ফাটে, তাই তো নতুন আর্টের
া। সামলে চলতে পারলে বাজারে সবই চ'লে বাবু, একটু নতুনত্ব
তে শেখো। অর্থ বোঝার চেষ্টায় ভিড়ের মাঝ থেকে স'রে দাঁড়ালাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

আগামী পথের যাত্রী

৪

আপ পাঞ্জাব মেল পশ্চিম-বাংলা, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ পেরিয়ে এসে
ৌছল পূর্ব-পাঞ্জাবে। আম্বালা, জালন্ধর প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে সৈনিক
স উপস্থিত হলেন অমৃতসরে। পূর্ব-পাঞ্জাবের কোন স্টেশনে অথবা
াড়িতে সহযাত্রী হিসাবে কোন মুসলমানের দর্শন না পেয়ে সৈনিক নিজের
ন ভাবতে লাগলেন, সত্যই কি পূর্ব-পাঞ্জাব আজ মুসলমানশূন্য ?
নুসন্ধানে জানলেন, সমাজ-জীবনে বহু অসুবিধা ভোগ করছেন পাঞ্জাবের
ধিবাসীবৃন্দ। কাপড় কাচবার ধোপা নেই, চুল কাটবার নাপিত নেই,
ারখানার সস্তা মজুর নেই, তবু পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দু এবং শিখের জাতীয়
সভূমি তো বটে। পাঠানকোটের গাড়ি ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরি
ল, তাই সৈনিক অমৃতসর শহর ঘুরে দেখবার সুযোগ পেলেন, অঞ্জলি দিয়ে
লেন চোখের জল শত শহীদের স্মরণে শহীদভূমি জালিয়ানওয়ালাবাগে,
গাম ক'রে এলেন মোগলযুগে মহাভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞের ঋত্বিক্
িখগুরুদের উদ্দেশ্যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে।

পাঠানকোট থেকে কনভয়ে যাত্রা হ'ল শুরু ডোগরা-রাজের শীতকালীন
াজধানী জম্মু শহরের উদ্দেশে। জম্মু এবং কাশ্মীর সামন্তরাষ্ট্রের জম্মু বিভাগ
িন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং অধিবাসীবৃন্দ ডোগরা নামে অভিহিত। সামরিক
াতি হিসাবে এরা ভারতবিখ্যাত।

পাহাড়ের আঁকবাঁকা পথ অতিক্রম ক'রে সৈনিক কনভয়ে এগিয়ে
লেন। কোথাও চোখে পড়ে পাহাড়, কোথাও ক্ষুদ্রকায়া কিন্তু বেগবতী

গিরিনদী, কোথাও অনাবাদী পতিত জমি। জম্মুর উদ্দেশে এগিয়ে চলতে চলতে সৈনিক ভাবছিলেন—পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত শস্যশ্যামলা বাংলা যেমন তাঁর একান্ত নিজস্ব, জম্মু এবং কাশ্মীরের জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলেও তেমন তাঁর চির আপনার। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অবধি, পাঞ্জাব থেকে আসা অবধি বিস্তৃত অঞ্চল মহাভারতের প্রাকৃতিক পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি। মহাভারতে এই স্বাভাবিক রূপ যুগযুগান্তর ধ'রে আমাদের বীরচূড়ামণি, দেশপ্রেমিক এব দার্শনিকদের অন্তরে প্রেরণা জাগিয়েছে। তাই মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত গান্ধার থেকে জলধি-শেষ অবধি মহাভারতকে কৃপাণদন্তে একত্রিত ক'রে গেছে। দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অবধি মহাভারতকে সমজাতীয়তাবাদের সঞ্চয় দিয়ে গেছেন, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ শতশতাব্দী দাসত্বের পরেও মহামিলনেব সঙ্গীতে পাঞ্জাব থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত মহাভারতকে সেই শাশ্বত সত্যের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মাস দুয়েক পরে আবার কনভয়ে যাত্রা হ'ল শুরু জম্মু এবং কাশ্মীরে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশে, ভূভারতেব স্বপ্নপুরী শ্রীনগরে উদ্দেশে ভারতমাতার শিরোশোভা শ্রীনগরের উদ্দেশে।

কাশ্মীরীদের মধ্যে রূপ আছে, কিন্তু রুচি নেই। জনসাধারণ অত্যন্ত অশিক্ষিত এবং অপবিছন্ন। ঝিলাম নদীর তীরে শ্রীনগর শহবের প্রাকৃতিক অবস্থিতি সত্যই অপূর্ব। বিধাতা যেন নিজের হাতে ভারতমাতার মুকুট চিত্রিত ক'রে রেখেছেন অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, তাই মনে হয়, কাশ্মীর ব্যতীত ভারতবর্ষ অপূর্ণ থাকত, শেখ আবদুল্লা তাই পারেন নি ভারত-কাশ্মীর সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে, কাবণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, প্রাকৃতিক ভৌগোলিক এবং মানসিক দিক থেকে ভারত-কাশ্মীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

শ্রীনগর শহরের রাজপ্রাসাদ মন্দ নয় এবং দশম শতকে নির্মিত শঙ্করাচার্যের মন্দির শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। শ্রীনগরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, কিন্তু শিক্ষা এবং রুচিহীন দেশবাসী পারে নি বিধাতার দানকে জগতের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে। কাশ্মীর উপত্যকার শত-করা নব্বই জন মুসলমান এবং তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, শতাব্দীর গোলামির ফলে এরা হারিয়েছে মানসিক বল এবং চরিত্রের দৃঢ়তা। হিন্দুদের সংখ্যা শত-করা দশ জনেরও কম এবং তারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। হিন্দুর

ার সকলেই শিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন।' বিধাতার দেওয়া রূপের বিচারে ানকার প্রায় সকলেই সুন্দর, কিন্তু বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণেরা অপরূপ। ়থিবীর যে কোন জাতির সঙ্গে এদের রূপের তুলনা চলতে পারে।

প্রাচীন কিম্বদন্তীর চিত্রসেনের গন্ধর্বলোক এবং শেরে-কাশ্মীর শেখ ়বদুল্লার বর্তমান কাশ্মীর অভিন্ন। হিন্দুযুগে কাশ্মীর সংস্কৃত-শিক্ষার একটি ়ধান কেন্দ্রভূমি ছিল, মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সে দিনের হিন্দু পণ্ডিতদের এবং ়রবর্তী যুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ছিল। আজও সংস্কৃত-়িক্ষার বদলে যুগোপযোগী শিক্ষায় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা খুব পিছনে প'ড়ে নেই। ়াদেরই রক্ত বইছে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত নেহেরু এবং তেজবাহাদুর ়প্রুর ধমনীতে। বীরত্বের গৌরবও রেখে গেছে কাশ্মীর ভারতের ইতিহাসে। ়াশ্মীররাজ ললিতাদিত্য সপ্তম শতাব্দীতে আসাম এবং বাংলা ছাড়া গোটা ়ত্তর-ভারত জয় করেছিলেন।

মুসলমানী যুগ আনল কাশ্মীরের শিক্ষা এবং সভ্যতার উপর প্রবল ঢেউ। ়াঠান-আমলে সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্রগুলি হ'ল ভস্মীভূত এবং মন্দিরগুলি হ'ল ়চৗচির। কিন্তু আজও ভগ্ন জীর্ণ অস্তিত্ব বহন ক'রে মার্তণ্ডদেবের মন্দির এ যুগের ঐতিহাসিকদের জানিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুযুগে কাশ্মীর কত উন্নত ছিল।

পরবর্তী মোগলযুগে সম্রাটেরা গ্রীষ্মবাসে আসতেন কাশ্মীর উপত্যকায়। সঙ্গে তাঁদের থাকত সাধারণ সৈনিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের আমির ওমরাহ এবং ফৌজদারের দল। দিল্লী এবং আগ্রার কর্মমুখর জীবনে পরিশ্রান্ত শাসকশ্রেণী তাঁদের কামনা এবং বাসনাকে বিকৃত ক'রে তুলতেন ঝিলাম নদীর তীরে শ্রীনগরে। সৈনিকেরা ভোগ করেছেন সাধারণ মহিলাদের, আমির-ওমরাহকুল শক্তির অপব্যবহার করেছেন অভিজাতবংশীয় মহিলাদের উপর অত্যাচার ক'রে। হিন্দু-সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাবে মোগলের অত্যাচারিতা রমণীরা স্থান পান নি হিন্দু-সমাজে। ফলে দিনের পর দিন বেড়ে গেছে মুসলমানের সংখ্যা। এখানকার প্রায় সকল মুসলমানের শরীরে বইছে হিন্দুরক্ত। তাই বোধ হয় পাঠানের ক্ষাত্রতেজ এঁদের নেই, রয়েছে শূদ্রসুলভ মনোবৃত্তি এবং চিন্তাধারা।

মোগল-পাঠানেরা রণকুশলী ছিলেন, তাঁদের চরিত্রে স্বধর্মপ্রীতি একতাবোধ এবং সৈনিকসুলভ নিয়মানুবর্তিতাও ছিল, কিন্তু ছিল না

মানবিকতার বিকাশ, আর ছিল না ন্যায় এবং নীতি বোধ। তাই তাঁরা ভেঙেছেন মহানালন্দা, ধ্বংস করেছেন সোমনাথ, ধূলিসাৎ করেছেন মার্তণ্ড-দেবের মন্দির। কিন্তু ইসলামধর্মাবলম্বীরা পরস্পর পরস্পরকে ভাইয়ের সম্মান এবং আদর জানিয়েছেন, কিন্তু অমুসলমানদের বলেছেন—কাফের। তাই বিধর্মীর রক্তে, বিধর্মীর মন্দির ধ্বংস ক'রে এবং বিধর্মীর নারী লুণ্ঠন ক'রে স্পেন থেকে দ্বীপময় ভারত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরবীয় সামরিক সাম্রাজ্যবাদ। আর হিন্দুরা বলেছেন, যত মত তত পথ, বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই নীতিবোধ এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ মুসলমানদের অজ্ঞাত ছিল, তাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের মুখে ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ, জৈন-পারসিক, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সকলের সম-অধিকারের মহাভারতীয় জাতীয়তাবাদ, আর অপর পক্ষে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান পণ্ডিত ডাঃ ইকবালের কলমে প্রতিফলিত হয়েছে সেই একদর্শী ইসলামিক চিন্তাধারা। চীন ও আরব আমার, হিন্দুস্তাঁ আমার, আমি মুসলমান, সারা বিশ্বের মুসলমানের ঘরই আমার ঘর। তাই সাত শো বছর ভারতবর্ষে বাস ক'রেও মুসলমানরা হতে পারেন নি ভারতীয়, উপরন্তু হিন্দু-সমাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু ভারতীয়কে করেছেন আরবীয়। তাই ভারতবর্ষে ব'সে মিঃ জিন্নাকে সম্মান জানাতে প্রয়োজন হয়েছিল আরবের বালির বেদী এবং মরুভূমির খেজুর, মুসলমানেরা ভারতকে খণ্ডিত করেছেন তাঁদের চিরন্তন একদর্শী বিকৃত মনোবৃত্তি দিয়ে, আর অতিরিক্ত মানবপ্রীতি এবং আদর্শবাদের রাজনীতি ক'রে ঠকেছেন হিন্দুরা, তাঁদের ধর্ম, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে।

কাশ্মীরেই হয়তো প্রমাণিত হবে, যুগ কি চায়—ধর্মকেন্দ্রিক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র, না, গণতন্ত্রসম্মত যুগোপযোগী জনরাষ্ট্র! তবে এ কথা সত্য যে, সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলের প্রয়োজন মহাভারতের আছে বিশ্বসভায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বীয় আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কারণ কাশ্মীর যদি ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তা হ'লে শুধু আফগানিস্তান, তিব্বত এবং মধ্য-এশিয়ায় ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবই বিস্তৃত হবে না, এই পার্বত্য অঞ্চলের বহুবিধ কাঁচা মাল সাহায্য করবে ভারতকে অধিকতর সমৃদ্ধ হতে, এবং ধর্মোন্মত্ততা থেকে মুক্তি পাবে ভারতীয় গণতন্ত্রের শীতল ছায়ায় অতি প্রাচীন একটি মহাঅঞ্চল; অন্য দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সত্তা হবে

ণ্য, পরিণত হবে তা শক্তিহীন 'বাফার স্টেটে'। আর যদি রাজনৈতিক পর্যায়ে কাশ্মীর পশ্চিম-পাকিস্তানের কবলিত হয়, অসীম ক্ষমতাপন্ন হবে পশ্চিম-পাকিস্তান—সম্পদে, শক্তিতে এবং জনবলে। তুরস্ক থেকে আফগানিস্তান র্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির তা হ'লে শুধু নেতৃত্বই পাকিস্তান করবে না, হয়তো সুলতান মামুদ এবং মহম্মদ ঘোরীর অভিযান আবার ঘনিয়ে আসতে পারে ারতের ইতিহাসে। তাই কাশ্মীর-সমস্যা আজ আর শেখ আবদুল্লা এবং হারাজ হরি সিংহের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, মহাভারতের অন্যতম প্রধান মস্যা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল জম্মু এবং কাশ্মীরে বস্থিত প্রত্যেক ভারতীয় ইউনিটে। সৈনিকের ইউনিটেও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'ল জনগণমন সঙ্গীতধ্বনিতে বাঙালী যুবকদের সহযোগিতায়। উচ্চতম অফিসার থেকে শুরু ক'রে নিম্নতম সিপাই পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার সৈনিকগণ সম্মিলিতভাবে অভিবাদন জানালেন জাতীয় পতাকার সামনে।

প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ফেরবার পথে সৈনিকের একজন সহকর্মী মারাঠী বন্ধু সৈনিককে বললেন, সত্যিই ভাই, আন্তরিক স্বীকার করছি, তোমরা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা না হ'লে হয়তো আজ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না পতাকা উত্তোলনের সময়। তোমরা শুধু জাতীয় সঙ্গীত লিখেই ক্ষান্ত হও নি, অন্তরে উপলব্ধি করেছ তার মর্মার্থ। শুধু এই কেন, বহুলপ্রতিভার বিভিন্নমুখী বিকাশ আধুনিক কালে ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলায়ই সম্ভব হয়েছে। তোমরা কবিতা লিখেছ, গান গেয়েছ, নৃত্যকলার সৃষ্টি করেছ, বিজ্ঞানেও তোমাদের দান কম নয়, আবার নিশীথরাত্রে বিদ্যুৎ-শিখার হাতছানিতে তোমরাই দলে দলে ছুটে গেছ ফাঁসির মঞ্চে অথবা দ্বীপান্তরে। দুর্যোগরাত্রে ভাসিয়ে দিয়েছ তরী দুস্তর পারাবারে। আকাশে ঝড় দেখে ভয় পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থেকে সময়মত সুযোগ গ্রহণ করতে চাও নি, ফলে আজ ভাগ্যচক্রে তোমরা খানিকটা বিপন্ন হয়ে পড়েছ হয়তো, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, তোমাদের প্রাণসত্তা অপরিসীম।

সৈনিক হেসে বললেন, বন্ধুবর, আজ তোমার ভিতরে এতটা বাঙালী-প্রীতি উপচে উঠল কেন?

উত্তরে মারাঠী ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, পরিহাস রাখ, বঙ্গ-মারাঠার আন্তরিকতাবোধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বকবির "শিবাজী" কবিতার ভিতর দিয়ে, স্বীকৃত হয়েছে পাঁচ সালের কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে লোকমান্য তিলকের তীব্র প্রতিবাদে। আর তা ছাড়া তোমার প্রদেশের সঙ্গে আমার প্রদেশের সীমা-পুনর্বণ্টন নিয়ে কোন তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা যখন নেই এবং আমার সত্য-ভাষণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন লাটসাহেবী মসনদ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাও আমার নেই। তবে দুঃখ হয় কি জান—এত জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত এবং দেশ-প্রেমিকের জন্ম তোমরা দিলে, কিন্তু গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়ে আজ যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাংলার নগণ্য সন্তান হ'লেও বাঙালী-জন্মের দাবিতে সারা বাঙালী জাতির তরফ থেকে তোমার মত বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আজ সর্বত্রই যেন বাঙালী জাতি নিজেকে বন্ধুহীন মনে করছে, তবে একটা কথা কি জান, আগামী সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসী মন বলছে, ভগবান সম্ভবত চাইছেন, বাঙালী জাতি অতীতের চাইতে ভবিষ্যতে আরও বেশি জ্ঞানে, গুণে, বিজ্ঞানে সাফল্য লাভ করুক। তাই একের পর এক বিপর্যয় দিয়ে বাংলার ভাগ্য-বিধাতা বাঙালী জাতির জীবনীশক্তিকে অধিকতর প্রখর ক'রে তুলছেন।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বনের পাখী

এমন ক'রে ডাকিস নে আর
ওরে গহন বনের পাখী,
স্বরে ডাক দিয়ে সে
পালিয়ে গেছে দিয়ে ফাঁকি!
তারই কথা পড়ছে মনে
খুঁজে বেড়াই সঙ্গোপনে
বল্ সে কোথায় লুকিয়ে আছে
আপনাকে আজ আড়াল রাখি?
ব্যাকুল হয়ে খুঁজি তারে
আর সে ফিরে আসবে নাকি?

বসন্ত যে আসছে ফিরে
যৌবনেরি উন্মাদনে,
ছড়িয়ে রঙিন উত্তরীয়
দিকে দিকে নীল গগনে।
বিরহে ভোর ছিল যারা
ফুলের সাজি ভরল তারা
ধুলায় প'ড়ে আমার ডালি—
ভরবে কে হায় তায় যতনে?
তারি মতন এমন ভালো
বাসতে পারে বল্ কজনে।

কে বাজায় এ ব্যাকুল বাঁশী
ফাটিয়ে ছাতি আকুল সুরে,
হারিয়ে গিয়ে বনের মাঝে
এমনি খরা ভর্-ছুপুরে ?
রাখাল ছেলে চরায় ধেনু—
সে কি বাজায় মোহন বেণু ?
ওরে পাগল আগল ভেঙে
কেন ঘুরিস পথটি জুড়ে,
মনের কথা শুনাস কারে ?
যাক্ সে ভেসে অনেক দূরে।

বনের পাখী যাস রে যদি
ভিন্‌দেশে সে সাগর পারে
দেখতে পেলে বলিস শুধু,
এই কথাটি শুনিয়ে তারে।
রয়েছি তার আশায় ব'সে
ক্ষমি আমার সকল দোষে
নেয় যেন সে আবার ডেকে
ভালবেসে ঘরছাড়ারে,
চৈতী হাওয়া ডুকরে কাঁদে—
আছড়ে প'ড়ে ব্যথার ভারে।

বুকের কাছে পেয়েও তারে
কেন গো হায় পেলাম নাকো,
তারি পরশ না পেলে কে
ভাঙা বাঁধে বাঁধবে সাঁকো ?
বসন্তে আজ বসুন্ধরা
হ'ল নতুন স্বয়ম্বরা
ফুটছে কুসুম থরে থরে
উড়ছে মধুপ লাখোলাখো
বনের পাখী লুকিয়ে থাকি
তুমি আমায় তাই কি ডাকো।

দিনের আলো ঝিমিয়ে এল
আকাশ জুড়ে ফুটল তারা,
অন্ধকারের নীরবতায়
দেবে কি কেউ আমায় সাড়া ?
তারি লাগি প্রহর গনি
শুনি আলোর আগমনী
তোমার সুরে বনের পাখী
হয়েছি তাই আত্মহারা
পলাতকায় ফিরিয়ে দিয়ে
ধন্য কর সুরের ধারা।

শ্রীশান্তি পাল

রুবাই

কি যে আমি, কেন আমি, কিসে মোর পরিচয়,
এ জীবন-অর্ণবে কে আমার তরী বয়—
কিছুই জানি না ঠিক, খুঁজে মরি ঠিকানা
ঘোর মাঝে জানা আর না-জানার পরিচয়।

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

জীবনপঞ্জী

১৮৭০, ১০ ডিসেম্বর	... জন্ম, করচমাড়িয়া গ্রাম, জেলা রাজশাহী। পিতা—রাজকুমার সরকার।
১৮৯১, মার্চ	... বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী ও ইতিহাসে অনর, মাসিক ৫০৲ বৃত্তি লাভ।
১৮৯২, ডিসেম্বর	... এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম, (with record marks)।
১৮৯৩, জুন	... রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৬-১৮৯৮, মার্চ	... বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৭, ডিসেম্বর	... প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ।
১৮৯৮, জুন—১৮৯৯, জুন	... প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৯, জুলাই—১৯০১, জুন	... পাটনা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৯০১, জুলাই—ডিসেম্বর	... প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক
১৯০২, জানুয়ারি—১৯১৭, আগস্ট	...পাটনা কলেজে প্রথমে ইংরেজী, পরে ইতিহাসের অধ্যাপক।
১৯১৭, আগস্ট—১৯১৯, জুলাই	... কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতেতিহাসের প্রধান অধ্যাপক।
১৯১৮	... আই. ই. এস. স্তরে উন্নীত।
১৯১৯, জুলাই—১৯২৩, অক্টোবর	... কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ইতিহাসের, তথা ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৯২৩, এপ্রিল	... রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেনের 'অনরারি মেম্বর' বা সম্মানিত সদস্য।
৯২৩, অক্টোবর—১৯২৬, আগস্ট	...পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।
৯২৬, জানুয়ারি	... সি. আই. ই.
৯২৬-১৯২৮	... কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।
৯২৯, জুন	... 'নাইট' (Kt.) উপাধি লাভ।
৯২৩, জুলাই	... রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বাই শাখার সার্ জেম্‌স ক্যাম্পবেল স্বর্ণপদক লাভ।

৩৫-৩৬, ১৯৪০-৪৪, ১৯৪৮ ... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি।
৩৬ ... ডি. লিট্ (ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়)
৩৮ ... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য'।
৩৯, ৪ সেপ্টেম্বর ... এশিয়াটিক সোসাইটির "অনরারি ফেলো"
৪৪ ... ডি. লিট্ (পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়)।

বাংলা গ্রন্থাবলী

। সিয়ার্-উল্-মুতাখ্খরীন্ : অনুবাদক গৌরসুন্দর মৈত্র (সম্পাদিত) কার্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৪০—অসম্পূর্ণ।

। শিবাজী। (নবেম্বর ১৯২৯)। পৃ. ২৬৪।

। মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। আষাঢ় ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)। পৃ. ৪৮। সূচী : মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা-ইতিহাসের ধারা, মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

৩০২, বৈশাখ ... 'সুহৃদ্' · হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্ব্বে
৩১১, কার্তিক ... 'প্রবাসী' · আওরাঙ্গজিবের আদি লীলা
৩১২, আষাঢ় ... 'নবনূর' · সাধু-বচন
অগ্রহায়ণ 'প্রবাসী' · কবি-বচন-সুধা
পৌষ ... ঐ · চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ
মাঘ 'নবনূর' · একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর
৩১৩, জ্যৈষ্ঠ ... 'প্রবাসী' শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার
অগ্রহায়ণ ... ঐ · শাহজাহানের রাজ্য-নাশ।
· "সোনার তরী"র ব্যাখ্যা।
৩১৪, আষাঢ় ...'ভারত-মহিলা' · সতি-উন্-নিসা
ভাদ্র ... 'প্রবাসী' · দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
৩১৫, ভাদ্র ... ঐ · সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীন্
আশ্বিন ... ঐ · খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর
৩১৬, ফাল্গুন ... ঐ · মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ
· বঙ্গভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন (মথুরানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত)

ফাল্গুন ...ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ ...মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ

১৩১৭, মাঘ ... 'প্রবাসী' ... বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য

২য় সংখ্যা...'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ

১৩১৮, আশ্বিন ... 'প্রবাসী' ... বাদশাহী গল্প

অগ্রহায়ণ ... 'জাহ্নবী' ... ৺রজনীকান্ত সেন

১৩২০, শ্রাবণ ... 'প্রবাসী' ... পূর্ব্ব-বঙ্গ (সমালোচনা)

১৩২১, কার্তিক ... ঐ ... মুর্শীদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়

১৩২২, বৈশাখ ... ঐ ... বর্ধমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ (১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)

শ্রাবণ ... ঐ ... বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা)

৩২৩, বৈশাখ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ... আওরংজীবের পরিবারবর্গ

আষাঢ়-শ্রাবণ ... 'ভারতবর্ষ' ... উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস.

মাঘ ... 'প্রবাসী' ... পাটনায় প্রাচীন চিত্র

ফাল্গুন ... 'ভারতবর্ষ' ... পাটনার কথা

২৪, আষাঢ় .. 'প্রবাসী' ... প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্য

শ্রাবণ ... ঐ ... বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ

ভাদ্র ... 'ভারতবর্ষ' .. 'বাঙ্গলার বেগম', ২য় সংস্করণ (সমালোচনা)

২৬, আশ্বিন ... 'প্রবাসী' ... প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ (১৩৫৫, আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)

কার্ত্তিক ... ঐ ... মুসলমান আমলের ভারতশিল্প

অগ্রহায়ণ ... 'ভারতবর্ষ' ... রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি

চৈত্র ... ঐ ... মুঘল ভারতেতিহাসের লুপ্ত-উপাদান

৭, কার্তিক	... 'প্রবাসী'	... প্রতাপাদিত্যের পতন (১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
নিদাঘ সংখ্যা	... 'প্রভাতী'	... নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ
৮, বৈশাখ	... 'ভারতবর্ষ'	... অরাজক দিল্লী (১৭৪৯-৮৮)
আষাঢ়	... 'প্রবাসী'	... প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী (১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
শ্রাবণ	... ঐ	... বোকাইনগর কেল্লা ও উস্‌মান
আশ্বিন	... ঐ	... আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি ?
		... কেজো রসায়নের ওয়ার্কশপ
২৮, অগ্রহায়ণ	... 'প্রবাসী'	... বঙ্গের শেষ পাঠান বীর
মাঘ	... 'শিক্ষক'	... শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ?
নিদাঘ সংখ্যা	... 'প্রভাতী'	... দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
শীত সংখ্যা	.. ঐ	... আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক
২৯, বৈশাখ	... 'প্রভাতী'	... বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার
আষাঢ়	... 'ভারতবর্ষ'	আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ
ভাদ্র	... 'প্রবাসী'	বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন
ভাদ্র	... 'প্রভাতী'	ভারতের ঐশ্বর্য্য
পৌষ	... ঐ	· ঐতিহাসিক ভীমসেন
ফাল্গুন	... 'প্রবাসী'	· বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী
৩০, পৌষ	... 'প্রভাতী'	· সম্রাট্ শাহ্‌জহানের দৈনন্দিন জীবন
মাঘ	... ঐ	· মুঘল শাহ্‌জাদার শিক্ষা
১৩৩, বৈশাখ	... 'প্রবাসী'	· কুমার দারার বেদান্ত চর্চ্চা
১৩৫, চৈত্র	... ঐ	· মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি
১৩৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ	'প্রবাসী'	· পিতাপুত্রে
১৩৭, বৈশাখ	... ঐ	· আওরংজীবের জীবন-নাট্য

১৩৩৭ শ্রাবণ ... ঐ ... নাদির শাহের অভ্যুদয়

আশ্বিন ... ঐ ... ভারতে মুসলমান

চৈত্র ... ঐ ... বঙ্গে বর্গী

১৩৩৮, বৈশাখ-আষাঢ় ঐ ... বর্গীর হাঙ্গামা

জ্যৈষ্ঠ ... 'ভারতবর্ষ' ... বিদ্যাসাগর

১৩৩৯, আশ্বিন 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-
লেখমালা' ২য় খণ্ড ... শিবাজী ও জয়সিংহ

১৩৩৯, পৌষ ... 'ভারতবর্ষ' ... 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'
(সমালোচনা)

মাঘ ... 'বঙ্গশ্রী' ... মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস

চৈত্র ... ঐ ... মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান।

১৩৪০, শ্রাবণ ... 'ভারতবর্ষ' ... নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য
('সংবাদপত্রে সেকালের কথা'
২য় খণ্ডের সমালোচনা)

১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ ... ঐ ... জাতীয় নাটকের বিকাশ ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র সমালোচনা)

কার্ত্তিক-পৌষ ... 'বুলবুল' ... ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব (কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ১২শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন-বক্তৃতা)—১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

১৩৪২, জুন 'রজত-জয়ন্তী ভারত-সাম্রাজ্যের ২৫ বৎসর' ... আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ

পৌষ ... 'ভারতবর্ষ' ... 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৩য় খণ্ড
(সমালোচনা)

১৯৩৬, ২৪ জানুয়ারি 'নূতন পত্রিকা' ... ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ কি?

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রীঃ

১৩৪৩, ৩০ আশ্বিন 'এডুকেশন গেজেট' ... বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা

চন্দননগর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ ... ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ
(৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

৪৪, আষাঢ়	... 'ভারতবর্ষ'	...	বেকার
৪৫, আষাঢ়	...'মাসিক বসুমতী'	...	বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ
৪৫, আষাঢ়	...'শনিবারের চিঠি'	...	বঙ্কিম-প্রতিভা
আশ্বিন	... 'অলকা'	...	যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য
২য় সংখ্যা	.. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	...	মুঘল ভারতের ঐতিহাসিকগণ
১ম সংখ্যা	... ঐ	..	মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ
৪৬, ২য় সংখ্যা	... ঐ	...	ঐ
৪৭, ১ম সংখ্যা	.. ঐ	...	রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা
৪র্থ সংখ্যা	... ঐ	...	মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা
৪৮, আশ্বিন	...'শনিবারের চিঠি'	...	রবীন্দ্রনাথের একটি দান
পৌষ	'প্রবাসী'	.	মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী-স্মৃতি
৪৯, ১ম সংখ্যা	...'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	...	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৫০, ৩য় সংখ্যা	.. ঐ	...	দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি
৫১, ১ম সংখ্যা	... ঐ	...	নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?
চৈত্র	... 'প্রবাসী'	...	আকবরের আমল
৫২, মাঘ	... ঐ	...	আর্য্যা নিবেদিতার আদর্শ
		...	গবেষণার প্রণালী
ফাল্গুন-চৈত্র	... ঐ	...	পত্রাবলী
৫৪, আশ্বিন	... ঐ	...	স্বাধীনতার উষায় চিন্তা (১৫ আগস্ট ১৯৪৭)
৫৫, আশ্বিন	... ঐ	...	দেশের ভবিষ্যৎ
কার্ত্তিক	... প্রাচী (শান্তিপুর)	...	বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান
পৌষ	... 'প্রবাসী'	...	আমার জীবনের তন্ত্র

যদুনাথ-লিখিত বাংলা ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প	...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	... পৌষ	১৩১৯
প্রতাপসিংহ (৩য় সং)	...	সতীশচন্দ্র মিত্র	... মে	১৯১৭
মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... আষাঢ়	১৩২৬
জহান্‌-আরা	...	ঐ	... জ্যৈষ্ঠ	১৩২৭
শিবাজী মহারাজ	...	ঐ	... ফাল্গুন	১৩৩৫
ওমর খৈয়াম	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	... ভাদ্র	১৩৩৬
আনন্দমঠ	...	পরিষৎ-সংস্করণ	... আষাঢ়	১৩৪৫
দুর্গেশনন্দিনী	...	"	... পৌষ	১৩৪৫
দেবী চৌধুরাণী	...	"	... ভাদ্র	১৩৪৬
রাজসিংহ	...	"	... শ্রাবণ	১৩৪৭
সীতারাম (২য় সং)	...	"	... ফাল্গুন	১৩৫২
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ		রেজাউল করীম	... মে	১৯৪৪
ছেলেদের বাবর	...	শ্রীবাণী গুপ্ত	... বৈশাখ	১৩৫২

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. *India of Aurangzib* : Topography, Statistics, and Roads ... 1901
2. *Economics of British India* ... 1909, Mar.
3. *History of Aurangzib* :

Vol. I	...	July 1912
II	...	"
III	...	1916
IV	...	Nov. 1919
V	...	Dec. 1924

4. *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays* ... 1912, Nov.

১৯২৫, জুলাই মাসে ইহার ২য় সংস্করণ *Anecdotes of Aurangzib* নামে প্রকাশিত হয়; একমাত্র Life of Aurangzib ছাড়া প্রথম বারের সকল প্রবন্ধই এই সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

Chaitanya : his Pilgrimages and Teachings (afterwards *Chaitanya's Life and Teachings*, 1922) ... 1913

Shivaji and His Times ... 1919, July

Studies in Mughal India ... 1919, Oct.
(*Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays* পুস্তকের ১০টি ও নূতন ১২টি প্রবন্ধের সমষ্টি)

Mughal Administration :

1st Series	...	Cal. 1920
2nd Series	...	1925 (Patna Univ.)
Combined volume		1924

Later Mughals, 1707-1739 :
By Wm. Irvine, ed. and continued by J N. Sarkar. Vols. I-II ... 1922

India Through the Ages ... 1928

Short History of Aurangzib ... 1930

Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire ... 1932

Fall of the Mughal Empire

Vol. I	...	1932
II	...	1934, Sep.
III	...	1938, Nov.

Studies in Aurangzib's Reign ... 1933

House of Shivaji ... 1940, May

Maasir-i-Alamgiri (Bib. Indica)
Eng. trans. by J. N. S. ... 1947, Oct.

Poona Residency Correspondence (EDITED) :

Vol. I	...	1936
Vol. VIII	...	1945
Vol. XIV	...	(in the press)

18. *Ain-i-Akbari*, Bib. Ind. (EDITED) :
    Vol. III, Eng. tr. by Jarrett ... 1948
    Vol. II, Do. (in the press)

* * *

ইহা ছাড়া *Cambridge History of India* (Vol. IV, 1937 গ্রন্থের ৮, ১০-১৯ ও ১৩শ অধ্যায় যদুনাথের লিখিত। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal* (Vol. II, May 1948) গ্রন্থখানি তিনি কেবলমাত্র সম্পাদনই করেন নাই, ইহার দুই শতাধিক পৃষ্ঠা নিজে লিখিয়া দিয়াছেন।

যদুনাথ-লিখিত ইংরেজী ভূমিকা

1. *History of the Jats* : K. R. Qanungo ... 1925, Aug.
2. *Begam Samru* : Brajendra Nath Banerjee 1925, Septr.
3. *Mirat-i-Ahmadi*, ed. by S. Nawab Ali ... 1927
4. *Aitihasik Patren Yadi wagaire Lekh* (2nd ed.) : G. S. Sardesai ... 1930, June
5. *Tarikh-i-Mubarak Shahi* : Eng. trans. by K. K. Basu ... 1932
6. *The First two Nawabs of Oudh* : Ashirbadi Lal Srivastav ... 1933
7. *Malik Ambar* : Jogindra Nath Chowdhuri 1934, Feb.
8. *Shindeshahichin Rajakaranen* :
    Vol. I (Satara 1934)
    Vol. II (Satara 1940)
9. *Malwa in Transition* : Raghubir Sinh ... 1936
10. *Historical Papers relating to Mahadji Sindhia* : ed. by G. S. Sardesai ... 1937, Dec.
11. *Badshah Begam* : Md. Taqi Ahmad ... 1938
12. *A Bibliography of Mughal India* : (1526—1707 A.D.) : Sri Ram Sharma 1939

13. *History of the Sikhs, 1739-'68* :
Hari Ram Gupta ... 1939
14. *History of Medieval Vaishnavism in Orissa* : Prabhat Mukherjee ... 1940
15 *Marathi Riyasat*,
Vol. 5, Baji Rao : Sardesai ... 1942
16. *Begams of Bengal* :
Brajendra Nath Banerjee ... 1942, Oct.
17. *Peshwa Baji Rao I* : V. G. Dighe ... 1944
18. *Sardar Sakharam Hari* : Y. R. Gupte ... 1946
19. *Humayun in Persia* : Sukumar Roy ... 1948

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা

সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় যদুনাথের বহু ইংরেজী রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার অতি অল্প অংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সকল রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা সংকলন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি পত্রিকার নামোল্লেখ করিতেছি :—

Calcutta University Magazine, Modern Review, Bihar & Orissa Research Socy.'s Journal, Bengal : Past and Present, Journal of the Asiatic Socy. of Bengal, Islamic Culture (Hyderabad), Muslim Review, Indian Historical Quarterly, Hyderabad Arch. Socy.'s Journal, Hindusthan Review, Indian Review, Ravenshavian (Cuttack), Presidency College Magazine, Prabuddha Bharat, Bombay University Journal, Times of India, Science and Culture, Patna College Magazine, Calcutta Municipal Gazette.

ইহা ছাড়া Proceedings of the Indian Historical Records Commission, B. C. Law Commemoration Vol., Sardesai Commemoration Vol. (1933), Birla Park Annual প্রভৃতিতে তাঁহার রচনার সন্ধান মিলিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা

কথায় কথায় উচ্চারে কারা মহাত্মাজীর নাম,
ওরা কি সবাই মহামানবের মন্ত্র-শিষ্য দল ?
উপদেশ দেয় সবারে গাহিতে—জয় জয় রাজারাম,
রহিতে সদাই মহাত্মাজীর আদর্শে অবিচল ?

কালোবাজারের আলো-আঁধারের চোরা-গলিপথ দিয়ে
করে না কি ওরা কদাপিও কেউ চুপিচুপি আনাগোনা,
শ্রমীর শোণিত বলে কৌশলে যত পারে শুষে নিয়ে
সিন্দুক ভ'রে পুঁজি ক'রে যায় তাল তাল কাঁচা সোনা ?

মদে ও সিগারে শাড়িতে গাড়িতে ব্যয় করে যাহা রোজ,
এক-শতাংশ স্বেচ্ছায় তারা করে কি কখনো দান,
সেই সব হরিজনদের,—যারা দু বেলা দু মুঠি ভোজ
প্রাণপাত ক'রে পারে না তবুও ক'রে নিতে সংস্থান ?

ওদের কাছে কি মানুষ তাহারা—অর্থ যাদের নাই
পীড়ন করিয়া সেবা নেয়া ঠাঁই পায় নাকো মনোমাঝ
চাষী ও মজুরে ভাই ভেবে কভু ঘরে দিতে পারে ঠাঁই,
ছিন্নবসনে রাজপথে যেতে পায় নাকো মনে লাজ ?

নারীর দেহেরে ভাবে না পণ্য, ভাবে—নারী মহিয়সী,
বিরাম-বাসর রচে না কখনো বাগানবাড়ির মাঝে ;
পরকাল ভেবে অস্থির হয় টাকার গদিতে বসি,
ক্ষতির ভয়েও অমিল হয় না কখনো কথায় কাজে ?

ব্যবসা জাঁকাতে ছাড়ে না কখনো মিথ্যা বিজ্ঞাপন,
মজুরের টাকা মেরে তাই দিয়ে কেনে না রঙিন মদ,
চোর হয়ে কভু করে না চোরের বিচারের প্রহসন
ঘুঁষ পেলে কভু করে না মানুষ খুনের মামলা রদ ?

দেবতা শুনেছি রসিক পুরুষ, দেখি নি শ্রীমুখখান্,
দানবকণ্ঠে শোনান সবারে আপনার জয়গান।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

হিন্দী বনাম বাংলা

(৩০৪ পৃষ্ঠার পরে)

সেই দারুণ ভয়ে অগ্রসর না হয়ে আমার বন্ধু শ্রীসজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীঅমল হোমকে ভাগ ক'রে এ কাজ করতে অনুরোধ করেছিলুম। কেবল অন্নদাশঙ্করবাবু উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি ইংরেজী লিখতে অভ্যস্ত নন। আমাদের মধ্যে যাঁরা পারেন তাঁদের এমন সুন্দর কাজ হাতে নেওয়া উচিত। 'শনিবারের চিঠি'র মত পত্রিকার দরকার হিন্দী মারাঠী তামিল গুজরাতী সাহিত্যের গতিবিধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তা থেকে গ্রহণ করা। ইংরেজ লেখক এ বিষয়ে সতর্ক। আমি বিখ্যাত তামিল কবি ত্যাগরাজের রচনা নিজের ভাষায় পাই নি, ইংরেজ অনুবাদকের দয়ায় পেয়েছি। অজানাকে জানার, নূতনকে ডাকার অনেক মূল্য আছে।

ভাল বাংলা সাহিত্য হিন্দীতে ভাষান্তরিত ক'রে প্রচার করার শুভ মুহূর্ত এসেছে। বাজার নূতন। ব্যবসার দিক দিয়ে বাজারটা যে খুব বিস্তৃত তা বলতে পারব না। বই ঘাঁটতে এ. এইচ. হুইলার কোম্পানির অফিসে আমি নিত্য যাই। সেখান থেকে জানা যায় যে, হিন্দী বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে কিন্তু এখনকার সমস্ত বই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। সম্প্রতি আমি আমার দুটি প্রকাশককে হিন্দীর দিকে নজর দিতে অনুরোধ করেছিলুম। বাঙালী প্রকাশক সে কথা কানে তোলেন নি। কিন্তু ইংরেজ প্রকাশকরা হিন্দীতে বই প্রকাশ করবার বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধি হিন্দীভাষী প্রদেশে বেড়িয়ে হিন্দী পাঠকদের ক্রয় করবার ক্ষমতা কতটা তা আন্দাজ নিয়ে গেছেন। পরে এই বৃহৎ ইংরেজ কারবারের ডাইরেক্টর এখানে নানাস্থানে ঘুরে গেছেন। হিন্দী পাঠকদের কেনবার শক্তিটা এখন বড় নয়। তবুও এই ইংরেজ প্রকাশক পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য কিছু হিন্দী বই প্রকাশ করবেন। আমি ভাল বাংলা বই বাছাই করবার পরামর্শ দিয়েছি।

হিন্দী লেখকেরা আমাদের মতই দরিদ্র। সিনেমা-কোম্পানিরা কত টাকা লেখক ও অনুবাদককে দেয় তা আমার জানা নেই। কিন্তু পত্রিকাগুলির দেবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। যা দেয় তা অকিঞ্চিৎকর, তাও সকল পত্রিকা দিতে পারে না।

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

সনাতন

জবরদস্ত দেশীয় রাজ্যের দরিদ্র কৃষক সনাতন। বর্গাচাষী। বৃষ্টিতে ভেজে, রৌদ্রে পোড়ে, জমি চাষ করে। ফসল কাটিয়া অর্ধেক বাড়িতে আনে, অর্ধেক জমির মালিকের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয়।

স্ত্রী স্বর্ণবালা ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাউল করে।

সুখেই আছে।—সনাতনের বিশ্বাস।

সনাতন, আছ কেমন?

আজ্ঞে, ভালই আছি সরকার মশায়।

সনাতনের চিরাচরিত জবাব। আ-র ভাল!—বলিয়া চলতি ভণ্ডামি করে নাই কোন দিন।

কিন্তু বড় ছেলে মাধব গোলমাল বাধাইয়াছে। বলিতেছে, আসলে তারা সুখে নাই। অতিশয় দুঃখে আছে।

কে বলেছে তোকে?

বলবে কেন? আমি নিজেই জানি।—মাধব বিজ্ঞের মত জবাব দেয়।

এঃ! ভারি জান্‌নেয়ালা রে!—সনাতন ভেঙচাইয়া উঠে।

কিন্তু মাধব ছাড়ে না।—শহরের সেই বাবুটা এসেছে তো। সে-ই বলছে যে!

বলুক। তার কাছে তোর যাবার দরকার কি?—সনাতন ধমক দিয়া থামাইয়া দেয়।

মাধব সরিয়া গেল, কিন্তু ব্যাপারটা থামিল না। শহরের বাবু নবকিশোর নির্বার্যভাবে আসিয়া দেখা দিল। মোলায়েম মিষ্ট ভাষায় বুঝাইতে লাগিল।

সনাতন ভাই, আজকে ভাববার দিন এসেছে। ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। পেছিয়ে থাকলে চলবে না।

বহুব্যবহৃত বক্তৃতার শব্দগুলি আগে আসিয়া পড়ায় নবকিশোর নিজের উপর বিরক্ত হইল। কিন্তু থামিল না।

কত কষ্টে আপনারা আছেন—আমরা আছি! সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে ধান দিয়ে আসতে হয় জোতদারের গোলায়। দু বেলা দু মুঠো ভাতও নিজেদের জোটে না।

সনাতন হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া রহিল। কারণ সনাতনের ভাতের ব্যাপারে মুঠোর প্রশ্ন উঠে না। সে অনেক ব্যাপক ব্যাপার।

ভাত জোটে তো দুধ জোটে না, মাছ জোটে না—

মাছের কথাটা খাঁটি কথা বলেছেন বাবু মশায়।—সনাতন সায় দিয়া বলিল।—কানা বিলটা শুকিয়ে যাবার পর থেকে মাছের কষ্ট খুব হয়েছে।

নবকিশোর বলিয়া চলিল, পরনে কাপড় নেই, শাড়ি নেই, জুতোও নেই একজোড়া—

আছে, চটিজুতো আছে একজোড়া।—সনাতন বিনীত গৌরবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল।

নবকিশোর তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়া সনাতনকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। বলিল, চটিজুতো! হুঁঃ! জানেন? বড়লোকের একজোড়া জুতোর দামে আপনার একজোড়া বলদ হতে পারে?

সনাতন চক্ষু বিস্ফারিত করিল।—তাই নাকি?

তবে?

এবারে আঘাতটা সনাতনের বিস্ফারিত চক্ষুর ভিতর দিয়া মর্মে ঠেকিল। বড় বলদটা বছর খানেকের বেশি হইল মারা গিয়াছে। আর কিনিতে পারে নাই। একটা বলদের সঙ্গে একটা গাভী জুড়িয়া কোন রকমে কাজ চলিতেছে।

সনাতন ভাবিতে লাগিল।

সত্য কথা। ভাল খাইতে পায় না, ভাল পরিতে পায় না। হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সমস্তই সত্য। নবকিশোর ভাবিতে সময় দিয়া চলিয়া গেল।

তামাকের কলিকায় আগুন লইতে আসিয়া সনাতন কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। মাধব মাকে বুঝাইতেছে,—দেশে স্বরাজ হয়েছে। এখনও যদি আমাদের ঢেঁকিতে ধানই ভানতে হয়, তবে আর স্বরাজ হয়ে লাভ হ'ল কি?

ধান ভানব না তো খাওয়া আসবে কি সগ্‌গ থেকে?—স্বর্ণবালা খা-খা করিয়া উঠিল।

স্বরাজ আবার হ'ল কবে রে?—সনাতন জিজ্ঞাসা করিল।

ও হরি! তাও তুমি জান না?

সনাতনের মনে পড়িয়া গেল।—ও-হো, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই যে স্বদেশী লো এসে ব'লে গেল যে, রাত-দুপুরে শঙ্খ বাজাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাগও হইল।—স্বরাজ হয়েছে তাতে তোর কি রে শুয়োর কাজ নেই, কম্ম নেই, ধেই-ধেই ক'রে নাচা হচ্ছে?

স্বর্ণবালা ঢেঁকি বন্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, স্বরাজ হ'লে হয় কি শুনি?

দেশের লোকে রাজা হয়, আবার কি হয়?—মাধব বলিল।—আ ইংরেজরা রাজা ছিল তো? এখন দেশের লোক রাজা হয়েছে।

সনাতন বলিল, যে দেশে হয়েছে, সেই দেশে যা না তুই—যা। এখা আগেও মহারাজা ছিল। এখনও আছে।

মাধবের চক্ষু নাচিয়া উঠিল। হঠাৎ চাপা গলায় বলিল, সেই জন্যে তো! ও— এখন বলব না।

এক হাতে মুখ বন্ধ করিয়া ছুটিয়া সরিয়া গেল।

সনাতন আর স্বর্ণবালা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

পরের দিন নবকিশোর আবার আসিল। সনাতন ধান মাড়াই করিতেছিল। বন্ধ রাখিয়া আদর করিয়া বসাইল। বলিল, আমরা কষ্টেই আছি—বুঝলাম। কিন্তু এর ওষুধ কি?

ওষুধ আছে।—নবকিশোর আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—ওষু আপনাদের হাতে, আমাদের হাতে। আমরা যা বলি, সেই মত কাজ করুন, দেখবেন, জোতদার জমিদার মায় রাজা মহারাজা পর্যন্ত টিট হয়ে যাবে। কিন্তু রুখে দাঁড়াতে হবে। ভয় করলে চলবে না।

সনাতন চিন্তিত মুখে বলিল, আচ্ছা, দেশে তো এখন স্বরাজ হয়েছে? দেশের লোক রাজা হয়েছে? তা হ'লে—

নবকিশোর লুফিয়া লইল। উল্লাসে বলিয়া উঠিল, তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এ স্বরাজ স্বরাজ নয়। এ স্বরাজ গরিবের নয়, এ স্বরাজ বড়লোকের। আমাদের স্টেটের দিকে চেয়ে দেখুন। যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। স্বরাজ কোথায়? আজ আমাদের—

বাড়ির মধ্যে স্বর্ণবালা চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রোতা বক্তা উভয়েই ছুটিয়া ভিতরে গেল। ঢেঁকির নীচে পড়িয়া স্বর্ণবালার হাত কাটিয়া গিয়াছে। কাপড় চাপা দিয়া হাতটা ধরিয়া সে আর্তনাদ করিতেছে।

বড় মেয়ে সরস্বতী এক দলা লঙ্কাবাটা আনিয়া ছেঁড়া কাপড় দিয়া হাতটা বাঁধিয়া দিল। স্বর্ণবালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

নবকিশোর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, এই তো স্বরাজ!

ক্রোধ সংক্রামক। সনাতনও ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, দেখুন স্বরাজের অবস্থা!

নবকিশোর আর দাঁড়াইতে পারিল না। সনাতনের হাত ধরিয়া বলিল, সনাতন ভাই, মনে থাকে যেন, সামনের হাটের দিন রাত্রিতে মীটিং আছে, আমাদের নেতা নিজে আসছেন।

নিজে আসছেন নাকি?

হ্যাঁ।

দেখব তো কেমন!

নিশ্চয় দেখতে হবে। আচ্ছা, আবার আসব আমি।

নবকিশোর চলিয়া গেল।

সনাতন সরস্বতীকে তামাক দিতে বলিয়া স্বর্ণবালার কাছে বসিল।

দেখ্ দেখি, কি ভোগান্তিটা ক'রে নিলি? কাজকর্মের কি ব্যবস্থা হবে বল্? একা সরোর কাজ নাকি?

স্বর্ণবালা খিঁচাইয়া উঠিল। ওরে আমার কাজ রে! হাতের জ্বালায় মরি আমি, উনি আছেন কাজের চিন্তায়! গোল্লায় যাক তোমার কাজ!

গোল্লায় গেলে খাবি কি?

খাব ছাই।

তাই খাস।—বলিয়া সরস্বতীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া টানিতে টানিতে সনাতন উঠিয়া গেল।

পরের দিন মাধব গোপন কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। চুপিচুপি কহিল, বাবা, শোন। আমরা বিপ্লব করব। সারা তালুক জুড়ে বিপ্লব হবে। বিপ্লব ক'রে নিজেরা দেশের মালিক হব। তারপরে যার লাঙলে যত জমি আবাদ হয়, সব পাওয়া যাবে। টাকা দিতে হবে না, পয়সা দিতে হবে না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

ও আবার কি রে?

মানে—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

কি হোক ?

দীর্ঘজীবী হোক। মানে—চিরকাল বেঁচে থাক্।

সনাতন বুঝিল, কিন্তু পছন্দ করিল না। বলিল, চিরকালই ওই বিলুপব থা কি তাই করতে হবে নাকি ?

মাধব একটু গোলমালে পড়িয়া গেল। না না, চিরকাল করতে হবে কেন ? চিরকাল করতে হবে না।

মাথা চুলকাইতে লাগিল। অবশেষে সরিয়া পড়িল।

হাটের দিন রাত্রিতে সভা হইয়া গেল। প্রচণ্ড আগুন-জ্বালানো বক্তৃতার উত্তাপ সনাতনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পরের দিন নবকিশোর আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেতাকে দেখলেন ?

সনাতন গাঢ়স্বরে বলিল, একেবারে দেবতা।

অথচ অতি সাধারণ লোক।—নবকিশোর বলিল, চকচকে পোশাক নেই, গাড়ি নেই, বাড়ি নেই। আপনার আমার মতই গরিব।

তবে নেতা হলেন কি ক'রে ?—সনাতন সহসা প্রশ্ন করিল।

বুদ্ধির জোরে, পাণ্ডিত্যের জোরে। ওঁর মত ভাল বক্তৃতা এ দেশে আর কেউ করতে পারেন না।

সনাতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝলাম। এখন বুদ্ধির যুগ !

নবকিশোর বলিতে লাগিল, ওই জঙ্গলের মধ্যে কত কষ্ট ক'রে উনি আছেন। শুধু উনি কেন, আমাদের সকলেই আছেন। কিসের জন্যে ? শুধু আপনাদের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু আপনারা যদি ভয় পেয়ে পেছিয়ে থাকেন, আপনাদের ভাল সংসারে আর কেউ করতে পারবে না। বড়লোকের গভর্মেণ্ট গরিবের ভাল কোনদিনই করবে না, ঠিক জানবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সনাতন খাড়া হইয়া উঠিল।—কবে ?

আর দেরি নেই। সব প্রস্তুত। সময়মত খবর পাবেন সকলে, আমাদের নেতা যেদিন আদেশ করবেন।

অপ্রয়োজনে নবকিশোর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না।

ভীতি এবং ভয়াবহ প্রত্যাশার মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। বিদ্রোহী কৃষক নবকিশোরদের নেতৃত্বে একসঙ্গে পাঁচটি থানা আক্রমণ করিয়া দখল করিল। জোতদারের বাড়ি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিল, লুণ্ঠন

করিল, হত্যা করিল। পরিচালক দলের নেতাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয় স্বাধীন হইল।

স্বর্ণবালার হাতের ঘা সারিয়া গিয়াছে। ঢেঁকির কাজ আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু কাজের চাপ এত বেশি পড়িয়াছে যে, সরস্বতী আর সে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। নবকিশোররা রাগ করে ধমকায়। স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদের জন্য চাউল এবং খাদ্যবস্তু অংশমত সময়মত যোগান দিতে পারে না। না পারিলে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে পারে পুনঃ পুনঃ তাহাদের সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্টেটের সৈন্য আসিয়া মারিয়া কাটিয়া পুড়াইয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে।

শুধু কি তাই? আরও থানা দখল করিতে হইবে, ক্রমে জেলা, অবশেষে গোটা রাজ্যটাই দখল করিতে হইবে। কিন্তু খাদ্য না পাইলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে যে!

কি করব?—সখেদে এবং সভয়ে স্বর্ণবালা বলে—মানুষের শরীরে এর বেশি আর হয় না যে বাবু মশায়!

হয় না বললে হবে না।—নবকিশোর সক্রোধে বলিল।—চাই! বুঝলে?

ইস্, হুকুম!—সরস্বতী খোঁচা দিয়া উঠিল।

হ্যাঁ, হুকুম!—নবকিশোর মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল। ভুলো না যে, হুকুম তোমাদেরই ভালর জন্যে।

রাত্রিতে সনাতন বাড়ি আসিলে স্বর্ণবালা কাঁদিয়া বলিল, আমি পারব না আর চাল দিতে। ধান নিতে হয়তো নিক, না হয়তো গোল্লায় যাক।

নূতন কথা নয়।

ফ্যাচফ্যাচ ক'রে কাঁদিস নে। কি হয়েছে আগে বল্।—রুক্ষকণ্ঠে সনাতন বলিয়া উঠিল।

স্বর্ণবালা রাগ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সনাতন সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল, ভাত দে তুই।

ভাত নেই।

কি?

সব চাল ওরা নিয়ে গেল যে! তাতেই কত রাগ।

নূতন কথা নয়। সনাতন গুম হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, দ থাকে তো ডালের সঙ্গে তাই জ্বাল দিয়ে নামা।

সরস্বতী খুদের সন্ধানে গেল।

দিন কয়েক পরের কথা। একটা মৃতদেহ বহন করিয়া নবকিশোর এবং ারও তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সনাতনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। সনাতন ামাক খাইতেছিল। হুঁকার টান এবং রক্তচলাচল সনাতনের একসঙ্গে বন্ধ ়িয়া গেল। অবশ দেহটা যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে অগ্রসর রইল।

কে?

শহীদ মাধব।—শব নামাইয়া নবকিশোর জবাব দিল।

সনাতন নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া মাধবের মুখের পানে স্থির দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল। অবশেষে ভাঙিয়া পড়িল।

স্বর্ণবালা ছুটিয়া আসিয়া মৃতদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আবার ইয়া নবকিশোরের পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল,—আমার মাধুকে এনে ও তোমরা, এনে দাও। এনে দা-ও।

কিন্তু নবকিশোর সৈনিক। সে অত্যন্ত অটল চিত্তে বুঝাইতে লাগিল, ধব শহীদ হয়েছে। এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে? এর চেয়ে ল মৃত্যু মানুষের হয় না। মাধব তো অমর হয়ে থাকবে। প্রতি বৎসর বের আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল দেবে লোক। সে নিজে ম'রে আমাদের মরতে খিয়ে দিয়ে গেল। মাধব তোমাদের—আমাদের চিরকালের গৌরব হয়ে ল।

স্বর্ণবালা ততক্ষণে একটা কাঠের খণ্ড লইয়া নিজের মাথায় মারিতে শুরু িয়াছে। সরস্বতী চীৎকার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং পাড়ার লোক মিলিয়া শহীদ মাধবের শেষকৃত্যের য়োজন করিতে লাগিল।

নবকিশোর সনাতনের কাছে মাধবের বীরত্ব-কাহিনী বিবৃত করিল। টর সৈন্যরা যেখানে ঘাঁটি করিয়াছে, সেখানে মাধব গভীর রাত্রিতে একা য়া পর পর পাঁচজন সৈন্য হত্যা করিয়া অবশেষে নিজেও শত্রুর গুলিতে ণ দিয়াছে। প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু বন্দুক দেয় নাই। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কারে লুকাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। এমন পুত্র কয়জন পিতার

আছে? তা ছাড়া এখন শোকের সময় নাই। শত্রুরা প্রস্তুত হইয়াছে। শীঘ্রই তাহারা আমাদের আক্রমণ করিবে। আমাদের কৃষক-রাষ্ট্র সমস্ত শক্তি দিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

ভাল কথা, নবকিশোর হঠাৎ কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল।—একটা খবরও আছে। আমরা আরও তিনটে থানা দখল করেছি।

সনাতন মুখ তুলিয়া চাহিল। নবকিশোর বাক্‌রুদ্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

* * *

সব মিটিয়া গিয়াছে। এতবড় দুঃখের রাত্রিও সনাতনের প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণবালার হয় নাই। দিন আর রাত্রি স্বর্ণবালার একাকার হইয়া গিয়াছে।

পুত্রশোক সনাতনকে অতি শীঘ্র ভুলিতে হইল। শোকের অবসর নাই। কর্তব্য আগে। কৃষক-রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের নির্দেশ, অমান্য করিলে দণ্ডনীয় হইবে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ কৃষকদের নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে শোকের স্থান নাই। আলস্যের স্থান নাই।

সনাতন ভুলিয়াছে। বিপদ হইয়াছে স্বর্ণবালাকে লইয়া। ঢেঁকিতে সে আর উঠিবে না। না উঠুক, অংশমত চাউল দিতে হইবে—সর্বাধিনায়কের নির্দেশ। সনাতন ক্ষিপ্ত হইয়া মারধোরও করিয়াছে। কোন লাভ হয় নাই। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সরস্বতী ঢেঁকি চালায়, সনাতনই সাহায্য করে। চাউল দিতেই হইবে।

একদিন রাত্রিতে পাড়ার ছেলে মহেশ চুপিচুপি আসিয়া দাঁড়াইল। অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, সোনাকাকা, একটু কথা ছিল।

একটু দাঁড়া।—সনাতন হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিয়া আসিল। কি রে?

মহেশ চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পরে বলিল, সরকারী সৈন্যরা দুটো থানা উদ্ধার ক'রে ফেলেছে। দু-তিন দিনের মধ্যে আমাদের থানেও এসে পড়বে। জান তো, আমাদের স্টেট এখন কংগ্রেসের হাতে গেছে? মহারাজার আর কোন ক্ষমতা নেই এখন। কাজেই এখন আর আমাদের ভয়ের কিছু নেই। আমাদের ভালর জন্যেই তারা সৈন্য পাঠিয়েছে।

।।মাদের উদ্ধারের জন্যে। এই জংলী রাজত্বে আর বেশি দিন থাকলে আমরা প্রাণে মারা যাব কাকা, সে তো বুঝতেই পারছ!

মরবার আর বাকি কি আছে এখন?—সনাতন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল।

আর একটা কথা,—মহেশ ফিসফিস করিয়া বলিল, এদের হয়ে যারা লড়েছে, তাদের উপর কিন্তু ভয়ানক অত্যাচার হবে, মনে রেখো। কথাবার্তায় এদের সঙ্গেও অবশ্য ভাব রাখতে হবে, নইলে এরাও কমে ছাড়বে না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া বাহিরে যাইবার সময় দরজার সম্মুখে সনাতন কতগুলি বিজ্ঞাপন কুড়াইয়া পাইল। কিসের বিজ্ঞাপন? আগের দিন তো ছিল না! বিভ্রান্ত সনাতন কাগজগুলি লইয়া মহেশের কাছে গেল।

মহেশ পড়িয়া শুনাইল—

বন্ধুগণ! আপনাদের উদ্ধারের জন্য আমরা আসিতেছি। আমাদের রাজ্যে কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ স্থাপন হইয়াছে। আপনারা দেশদ্রোহীদের ফাঁদে পড়িয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা আপনাদের উদ্ধার করিবই। দেশ-দ্রোহীদের কবলমুক্ত করিয়া আপনাদের মঙ্গল সাধন এবং দেশে শান্তি স্থাপনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছা কামনা করি।

কি রাজ্য লিখেছে?—সনাতন জিজ্ঞাসা করিল।

কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ। মানে—কৃষক আর মজুর এই সব প্রজারাই দেশের রাজা হয়েছে।

তাই আবার হয় নাকি?

হবে না কেন, খুব হয়।

সনাতন চুপ করিয়া গেল। কিন্তু সন্দেহ গেল না।

মাত্র একদিন পরেই বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত হইল। সরকারী ফৌজ আসিয়া এলাকাটা দখল করিয়া ফেলিয়াছে। নবকিশোরদের কোন খবর নাই। কোন সংঘর্ষ হয় নাই। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যে যাহার বাড়ির মধ্য হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বাহিরের দৃশ্যটা মাঝে মাঝে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

তারপরের অংশ গতানুগতিক। ধরপাকড়, মারধোর, চীৎকার, সৈন্য এবং পুলিসের সামান্য বাড়াবাড়ি যেটুকু আশা করা যায় সমস্তই গতানুগতিকভাবে ঘটিয়া গেল।

সনাতন এবং সরস্বতীও বাদ যায় নাই। মাধবের পিতা এবং ভগ্নী হিসাবে টুকু বেশি পাওনা ছিল, তাহাও পাইয়াছে।

মহেশ দেখা করিয়া সান্ত্বনা দেয়।—এসব ব্যাপারে একটু আধটু বাড়াবাড়ি য়ে থাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের ভালর জন্যেই হ'ল।

সনাতন অবোধের মত চাহিয়া থাকে।

সরস্বতী আজ কেমন আছে?—মহেশ সসংকোচে জিজ্ঞাসা করে।

কি জানি! কাজকম করছে তো।—সনাতন জবাব দেয়।

স্বর্ণবালাও এখন কাজ করে। চারিদিকে হাহাকারের মধ্যে স্বর্ণবালা যেন মাধবের হত্যার প্রতিশোধ দেখিতে পাইয়াছে। এখন কাজ করে।

একদিন মহেশ আসিয়া প্রস্তাব করিল—সোনাকাকা, চল, শহর থেকে বেড়িয়ে আসি। খুব ভারি সভা হবে। আমাদের নেতা আসবেন।

সনাতন চমকিয়া উঠিল। নেতা? কোন্ নেতা?

দেখবে চল। উনিই তো রাজ্য চালাবেন এখন।

সেই কাগজের লেখার কথাটা সনাতনের মনে পড়িয়া গেল। বলিল, কি রাজ্য? কিষ—কিষ—

মহেশ হাসিয়া বলিয়া দিল, কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ।

চল্, যাব। সনাতন রাজী হইল।

সভায় যেন সারা দেশের লোক জমা হইয়াছে। সনাতন অবাক হইয়া গেল।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রচুর মাল্যভূষিত এক ব্যক্তি বক্তৃতামঞ্চে উঠিলেন। মহেশ কানে কানে বলিল, ইনি।

সনাতন কেমন যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফিসফিস করিয়া কহিল, মহারাজা নাকি? সেইরকম মুখ!

সোনাকাকার একেবারে বুদ্ধি নাই।—বিরক্ত হইয়া মহেশ কহিল, রাজার ওই রকম পোশাক? দেখছেন না, খদ্দরের ধুতি চাদর?

ওঃ, কিষক?

বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহেশ আর জবাব দিল না।

ফিরিবার পথে সনাতন প্রশ্ন করিল, খুব বড়লোক নাকি রে?

মহেশ বলিল, টাকায় বড়লোক কি না জানি নে। তবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বক্তৃতায় তো খুবই বড়।

সনাতন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ঠিক। বিদ্যাবুদ্ধিরই যুগ। আর বক্তিতা।

বাড়ি ফিরিয়া সনাতনের শহরের উত্তেজনা জল হইয়া গেল। বলদটার কি অসুখ হইয়াছে, কিছুই খাইতেছে না। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে। চক্ষু দিয়া যেন জল পড়িতেছে। সনাতনেরও চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

বলদটা ভোরের দিকে মারা গেল। কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সনাতন গ্রাম্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি করে নাই।

বর্গাচাষ বন্ধ হইয়া গেল। সনাতন এখন দিন-মজুরিতে খাটে।

স্বর্ণবালার ঢেঁকির কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। এখন শুধু নিজের নয়, পরের ধানও ভানে। এক মণ ধান ভানিয়া দিলে তিন সের চাউল মজুরি পায়।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সম্বর্ধনা হইয়া গেল। সেদিন এই কথাটাই বিশেষ ভাবে ঘোষিত হইল যে, ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ বিপুল কীর্তির মধ্যেই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ নহে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, যদুনাথও তেমনই বহু ঐতিহাসিক শিষ্যমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। আর একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি নিজে পুরাতন হইয়াও নূতনের প্রতি কখনও বিমুখ হন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রদত্ত মানপত্রে এই দুই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই। বহু শিষ্য সমভিব্যহারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার জয়যাত্রা, তুমি স্বদেশের কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ। তোমার অনুপ্রেরণায় তাঁহারা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস ধীরে

ধীরে উদ্ধার করিতেছেন। তুমি একা একশত হইয়া আজ ইতিহাস-অনুশীলন-কার্যকে ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছ। তোমার শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলীর সাধনার ধারার মধ্য দিয়া তোমার কীর্তিকে অবিনশ্বর রাখিয়া তুমি চিরজীবী হইয়াছ……

"তুমি প্রবীণ হইয়াও জরাগ্রস্ত হও নাই। তোমার মনের সতেজ তারুণ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, দুঃখে তুমি নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখে তুমি বিগতস্পৃহ, হে কর্মযোগী, তুমি তরুণের সঙ্গে, নূতনের সঙ্গে নিজের যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন কর নাই, প্রবীণের জ্ঞান লইয়া নবীনের উদ্যমকে বরাবরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশের নবজাগ্রত যৌবনের অভিযানে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে, তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্য নূতন প্রয়াসকে তুমি আশীর্বাদের দ্বারা জয়যুক্ত করিয়াছ……"

আচার্য্য যদুনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও রচনাপঞ্জী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলন করিয়া এই সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধির কতকটা পরিমাপ করিতে পারিব, বুঝিতে পারিব তাঁহার নিরলস কর্মসাধনা ক্ষুদ্র বৃহৎ [কো]নও কারণেই একদিনের জন্যও ব্যাহত থাকে নাই, তাঁহার প্রতিভার [সহ]িত অধ্যবসায় মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেশবরেণ্য করিয়াছে।

যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সত্যই সেদিন বলিয়াছেন—

"তিনি আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্রণী। তিনি [দেখা]ইয়াছেন, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা নিজের দেশের ইতিহাস নিজে [লি]খিতে পারি। তিনি পিষ্ট-পেষণ করেন নাই, পরস্ব অপহরণ করেন নাই, [নি]জ ফারসী ও মরাঠী মাতৃকা অধ্যয়ন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন [করি]য়াছেন।…

"অতীতকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান দাঁড়াইয়া আছে। যিনি অতীতকে [প]থ দেখাইতে পারেন তিনি বর্তমানের গন্তব্য নির্দেশ করিতে পারেন। অতীতের প্রতিরূপ যথাসম্ভব ভ্রমশূন্য হইবে, মিথ্যার আড়ম্বরে কলুষিত [হই]বে না, সে ঐতিহাসিক প্রতিরূপই আমাদের কাম্য, আমাদের উপদেষ্টা [হই]তে পারে। অল্প সাধনায় তর্কবিদ্যাশ্রিত ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি জন্মে না।

শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের ইতিহাস গ্রন্থ কামনা-দুষ্ট নহে, এই হেতু প্রামাণিক হইয়া থাকিবে।"

—

আচার্য যদুনাথের সম্বর্ধনা-সভায় পরিষৎ-সভাপতি আচার্য যোগেশচন্দ্র-প্রেরিত প্রশস্তিতে এবং যদুনাথের ভাষণে একটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, অন্তত চিন্তাশীল বাঙালীমাত্রেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের জাতীয় চরিত্র সংক্রান্ত একটা গুরুতর ত্রুটির কথা। যোগেশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বাঙালীর মেধা আছে, কিন্তু ধৈর্য নাই ; কুশাগ্রবুদ্ধি আছে, কিন্তু অধ্যবসায় নাই। এই কারণে বাঙালী কোন হিতকর স্থায়ী কর্ম করিতে পারে না।"

আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা কল্পনা ও ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা পারি না। এজন্য আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেকবার বলেছেন যে, অর্থাগম ও মানব-সুখ বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-চর্চা তো সব দেশেই আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে তার উপর অন্য এক কারণে এ আবশ্যক। সেই বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান শিক্ষার সংযম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন শক্ত ও বিচিত্র করা সম্ভব নয়।

"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগে একদল মনীষী যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সূর্যসিদ্ধান্ত, রেকসাহিত্য এবং মানসার বা স্থপতিশাস্ত্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাবপ্রবণ কল্পনা-বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? শত সহস্র বৎসর ধরে আমাদের চিন্তার নেতারা, আমাদের গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভুলে শুধু ভাব ও দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিধর্মী রাজার অধীনতা, অত্যাচার, অবমাননা ও দারিদ্র্য সহ্য ক'রে বাঙালীর জর্জরিত প্রাণ বেদান্তচর্চায় ও ভক্তিসাধনায় আশ্রয় নিয়ে চিত্তের একমাত্র শান্তি ও সুখ পেয়েছে।

"কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব, আজ যে সব দেশেই মানবজীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে। এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয়, সাহিত্যের সব বিভাগেই প্রকাশ্যে হোক অপ্রকাশ্যে হোক এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হচ্ছে।

"প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়। এই কাজের জন্যে চাই ন্যায়ের তর্কের জন্যে আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়—যা শুধু শুক্‌নো খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্মত্ত বা ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—যা মাটিতে গড়াগাড়ি দেয়, তাও নয়। এখন বাঙালীর চাই ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি, অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না ক'রে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে খাঁটি নির্যাস বের করব এই মন্ত্রে দীক্ষা।"

আমরা গতবারে দেখিয়াছি যে, বাঙালী চরিত্রের এই শোচনীয় দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ প্রবলবিক্রমে বাঙালীদূষণে লাগিয়াছে। শুধু সুদূরস্থিত বল্লভভাই বা বাবুরাও প্যাটেল নয়, প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই শুধু দূষণে সন্তুষ্ট নন—নানাভাবে নিষ্পেষণ ও নির্যাতনও শুরু করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে ফাঁকা চীৎকার করিয়া লাভ নাই, কারণ আমাদের বর্তমান শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উক্তির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে—আমরা চরিত্রে শ্লথ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপ যে সদ্য সদ্য অদ্যই ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিদ্যাসাগরের আমলের বাঙালীদের কথা বলিতে গিয়া আজ হইতে তেপ্পান্ন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও আমাদের জাতীয় চরিত্রের ঠিক এই দুর্বলতাগুলি লইয়াই ধিক্কার দিয়াছিলেন। তিনিও সেদিন বলিয়াছিলেন—

'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের

ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্ এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।"

বিগত অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বুদ্ধিমান বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতা বিন্দুমাত্র সংশোধিত হয় নাই। একজন বিদ্যাসাগর, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া লতাগুল্মপরিবেশে বনস্পতি-মাহাত্ম্যমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছেন—গুল্ম বৃক্ষে এবং বৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হইবার কোনও প্রণালী এই দুর্ভাগ্য দেশে কার্যকরী হয় নাই। আচার্য যোগেশচন্দ্র ও যদুনাথ এই মহীরুহ-সম্প্রদায়ের শেষ নিদর্শনমাত্র হইয়া রহিলেন। যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ ও প্রবর্তন করিয়া আচার্য যদুনাথ বাংলা দেশের চিন্তায় ও সাহিত্যে দৃঢ়তা সত্যনিষ্ঠা ও বাক্‌সংযম আনিতে প্রয়াস করিয়াছেন, আজ বাংলা দেশের দিকে দিকে তাহারই অনুশীলন ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা যতই তীব্র ও আর্ত চীৎকার করি না কেন, নববঙ্গ সমিতি স্থাপন করিয়া আবেদন নিবেদন ও আস্ফালনের মাত্রা যতই কেন না বাড়াই, যতক্ষণ ভাবাতিশয্য পরিহার করিয়া আমরা কর্মপরায়ণ না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের কল্যাণ নাই। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। জাতির সম্বন্ধেও সেই কথা। দেশের মহৎ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই আত্মদূষণ গত শতাব্দীকালের মধ্যেও আমাদের জড়চিত্তে চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না, ইহাই সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। যে বৃহৎ সূচনা বৃহত্তর নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয় তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই, সামান্য সামান্য ব্যাপার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি আমরা নিষ্পন্ন করিতে শিখি, তবেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আমরা সফলতা অর্জন করিয়া বাঙালী চরিত্রের এই শোচনীয় কলঙ্ক অপনোদন করিতে পারিব।

এলাহাবাদের শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার বর্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "হিন্দী বনাম বাংলা" নিবন্ধে হিন্দীওয়ালাদের প্রশংসনীয় তৎপরতা ও আমাদের

নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিবন্ধটির প্রতি বাঙালী লেখক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলা দেশে অনেক স্থলে আজ হিন্দী-আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। এই আতঙ্ক অমূলক এবং লজ্জাকর। হিন্দী শিখিলেই বাংলা ভাষা উচ্ছন্নে যাইবে, যাঁহারা আজ এইরূপ মনে করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দী অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষা শিখিতে কোনও দিনই ভয় পান নাই। ইংরেজী ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের হাতে মাতৃভাষা বাংলা নানাদিগ্‌দেশ-প্রসারী ও শক্তিশালী হইতে পারিয়াছিল। মধুসূদন ও বঙ্কিম যে পরিমাণ ইংরেজীনবিস ছিলেন, সেই পরিমাণ হিন্দীনবিস আজিও কোনও বাঙালী হইতে পারেন নাই। শুধু রাষ্ট্রভাষা অপেক্ষা রাজভাষা+রাষ্ট্রভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক অধিক হইবার কথা। সে কঠিন প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বাংলা ভাষাকে পুষ্ট ও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজী-স্কুলে পড়া মানুষ। তাঁহাদের বংশধর আমরা কি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, গোষ্পদপরিমাণ হিন্দীর ভয়ে আমাদের হাত-পা অসাড় হইয়া পড়িতেছে? আজ যদি জাপান অথবা জার্মানি আমাদের রাষ্ট্রিক ভাগ্যনিয়ন্তা হইত ও তাহাদের ভাষার নিগড়ে আমাদের বাঁধিয়া ফেলিত, তাহা হইলেই কি আমাদের ভাষা ও সাহিত্য শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা পড়িত? পুরুলিয়ার বাঙালী ছেলেরা ও তেজপুরের বাঙালী মেয়েরা যদি যথাক্রমে হিন্দী ও আসামী ভাষা: লায়েক হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেই কি তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য জাহান্নামে চলিয়া যাইবে? নীতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবি লইয় ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন আমরা নিশ্চয় করিব। প্রয়োজন হইলে যেমন লড়া স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে করিয়াছি, তেমনই লড়াই করিব; কিন্তু 'ভাষ গেল, সাহিত্য গেল' বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইব কেন? কারণ এই ধ্রুবসত্যে আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখিতে হইবে যে, এত সামান্য পীড়নে ভাষা সাহিত্য যায় না। আমাদের সতর্ক হইতে হইবে বইকি! হিন্দীর প্রচারে হিন্দীওয়ালারা যে একতা দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠা দেখাইতেছেন, শচীন্দ্রবাবু তাহা কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন। এইগুলি আমাদের অনুকরণ করিতে হইবে কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আক্রমণাত্মক প্রচারের দ্বারা ভাষা সাহিত্য কখনই প্রসার লাভ করে না। তরবারির সাহায্যে ধর্মপ্রচা

ভারতবর্ষ কোনও দিনই আস্থাবান ছিল না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম প্রেম ও প্রীতির সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যও আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র সেই ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে হিন্দীওয়ালারা প্রচারে ইসলামীয় রীতি অবলম্বন করিতেছেন তাঁহারাও বাংলা সাহিত্যকে এতখানি ভালবাসেন যে, শুধু মাত্র ভাষান্তরিত করিয়া সেই সাহিত্যই তাঁহারা আজও পর্যন্ত প্রচার করিতেছেন। হিন্দী-আতঙ্ক আর যাহারই হউক, সর্বভুক ও সর্বগ্রাসী বাঙালীর শোভা পায় না।

আমরা বাংলা দেশে বসিয়া অকাতরে দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাল মন্দ ও মাঝারি হিন্দী-হিন্দুস্থানী চালাইতেছি, রাষ্ট্রিক প্রয়োজনসাধনে হিন্দী প্রয়োগে আমরা পিছ পা হইব কেন? বিগত চৌষট্টি বৎসর ধরিয়া আমরা চোস্ত ইংরেজীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইয়াছি, আজ চোস্ত হিন্দীতেই বা তাহা চালাইতে পারিব না কেন? ভাষা ও সাহিত্যের অত বিপুল সমৃদ্ধি লইয়া ইংলণ্ড বহু শতাব্দীর শাসনে ও নির্যাতনে যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাষা ও সাহিত্যকে কাবু করিতে না পারিয়া থাকে—অপেক্ষাকৃত অনেক হীন হিন্দী কি মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বাংলাকে ঘায়েল করিতে পারিবে?

তবে আমরা ছুৎমার্গী উন্নাসিক হইয়া নিশ্চয়ই থাকিব না, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গ্রহণযোগ্য যদি কিছু থাকে তাহা আমাদিগকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজরা সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। হিন্দী মারাঠী তামিল তেলেগু গুজরাতী উড়িয়া আসামী ভারতবর্ষেরই ভাষা, ভারতীয় চিন্তাধারা এই সকল ভাষার সাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে এবং সে চিন্তাধারা ভারতবর্ষের সর্বত্রই এক। বাঙালীরা সামান্য পরিশ্রমে সেই সকল চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নূতন রসধারায় সিঞ্চিত করিতে পারিবে। ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়া বাঙালী যদি মাতৃভাষার গৌরব বিস্মৃত হইয়া ভিন্নভাষাবলম্বী হইয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরাজয়ের কারণ বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আছে। দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতি আমাদের তৃষ্ণা স্বাভাবিক নহে, আমরা চিরদিন এই বর্ণমালাকে শুধু শ্রদ্ধা ও সমীহ করি নাই—নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়াছি। আজ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর

রাগ করিয়া সেই বর্ণমালাকে বর্জন করিলে ভারতবর্ষকেই বর্জন করা হইবে। এবং যে ভারতবর্ষেব কথা আমরা বলিতেছি, তাহা বাঙালীরই সৃষ্টি। সমস্ত ভারতবর্ষে এই বোধ বাঙালীই জাগাইয়াছে। বাঙালীর মনীষা, বাঙালীর চিন্তা, বাঙালীর প্রেম পুবাতন ভারতবর্ষকে ছানিয়া এই নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকাবের "পরিভাষা-সংসদ" কর্তৃক ভাষান্তরিত শব্দগুলির প্রথম স্তবক প্রকাশিত হওযায় একটি সুফল এই হইয়াছে যে, শব্দের মৌলিক অর্থ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন হইযাছেন, এবং বহু স্থলে নানা পণ্ডিত কর্তৃক বিভিন্ন শব্দের কুলজী-কোষ্ঠী বিচার চলিতেছে। ইহাতে আমাদের ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বহু বহু-ব্যবহৃত শব্দেব যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে আমবা অবহিত হইতেছি। কেহ কেহ তৎসম শব্দের বিচারে নিছক সংস্কৃত রীতিরই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, কেহ কেহ প্রচলিত প্রয়োগকে সমর্থন করিযা অর্থের দিক দিয়া গোল-যোগ সত্ত্বেও সেগুলি বহাল রাখিতে চাহিয়াছেন। আমবা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহি, তথাপি এই ধরনের আলোচনার সমর্থন করি। বাংলা সংস্কৃতের সন্তান হইলেও জীবন্ত চালু াষা। মাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে এখন আলাদা সংসার পাতিয়াছে, চ্ছন্দবিহারের অধিকাব তাহার হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের আধুনিক ীবনযাত্রার সর্ববিধ কাজের উপযোগী শব্দসম্পদ এখনও তাহার অভিধানভুক্ত য় নাই। এই কারণে এখন নিছক সংস্কৃতশুচিতা ক্ষতিকর হইতেও পারে। রিভাষা-সংসদের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষ র সহিত অধুনা শব্দতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন। এই বিষয়ে পারদর্শী ণ্ডিতেরা এই সময়ে পরামর্শ করিয়া যদি বাংলা শব্দধারার গতি ও বৈদেশিক র স্থান নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাষার প্রাণশক্তি বৃদ্ধিই হবে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি হইয়াও এই আলোচনায় যোগদান য়াছেন, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পেশাগত শব্দগুলি লইয়া আলোচনা রতেছেন। এবারেও এখানে তাঁহার একটি আলোচনা আমরা পত্রস্থ রলাম। আশা করি, শব্দতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার আলোচনায় পাত করিয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হইবেন। যতীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"সম্প্রতি এক সংখ্যা 'কলিকাতা গেজেটে' দেখিলাম, বহু অবর-নিবন্ধকের (Sub-registrar) নিয়োগ, অবসর ও বদলি সংক্রান্ত ঘোষণা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে প্রতি গেজেটেই তিন-চারিটি ঘোষণা এইভাবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল; এবার দেখিলাম, একটি সমগ্র বিভাগের সমস্ত ঘোষণা সম্পর্কে ওই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে—

'বীরভূম জেলার সিউড়িস্থিত সদর নিবন্ধ করণের সংশ্লিষ্ট অবেক্ষাধীন অবর-নিবন্ধক শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, তাঁহার হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অস্থায়ী অবর-নিবন্ধকের কার্য অন্তে শ্রীসিদ্ধার্থপ্রকাশ বড়ুয়া কর্তৃক ভারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার ঘাটেশ্বরস্থিত কাকদ্বীপের যুক্ত অবর-নিবন্ধক পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।'

ইহার পর যথারীতি ইংরেজী ঘোষণা মুদ্রিত হইয়াছে।

গত ১২ই জানুয়ারি তারিখের দৈনিক পত্রিকায় দেখিলাম, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, গেজেটে যে সমস্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইবে তাহার অধিকাংশ যেন বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, পরিভাষা-সংসদ যে পরিভাষা প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্মেণ্ট তাহাই বিনাপরিবর্তনে গ্রহণ করিয়াছেন,—অন্তত গেজেটে প্রকাশ করিবার উপযোগী মনে করিয়াছেন। হয়তো আশা করিয়াছেন যে, এইভাবে মুদ্রিত হইয়া কান-সহা হইয়া গেলে ইহা ক্রমে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে Engineering বিভাগ সম্পর্কীয় পরিভাষার যে সামান্য আলোচনা দেখিলাম, তাহা হইতে মনে হয়, এ সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। Engineer শব্দটির পরিভাষারূপে গৃহীত হইতে পারে এমন একটি বাংলা শব্দ সংসদ-প্রস্তাবিত পরিভাষার প্রথম স্তবকে পাওয়া যায় না। সেখানে কোথাও 'বাস্তুকার' কোথাও 'যন্ত্রবিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কলিকাতা গেজেটে'র ঘোষণার পক্ষে ইহাই কি উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অথচ Engineer শব্দের একটি সাধারণ বাংলা প্রতিশব্দ রচনা করা গেল না, ইহাও তো গৌরবের কথা নহে। বিশ্বকর্মা শব্দটির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া অবধি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, Engineer-এর পরিভাষা 'কর্মা' বা

কর্মবিৎ' হইতে পারে। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন নির্মাণবিৎ'। স্বল্পাক্ষর করিবার উদ্দেশ্যে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রস্তাবিত হইয়াছে—'নির্মাণী'। 'বাস্তু' শব্দের পুরাতন আভিধানিক অর্থ যখন একমাত্র গৃহ' নয়, গৃহক্ষেত্র তড়াগ সেতু ইত্যাদি অনেক কিছু, তখন পূর্বপ্রচলিত পূর্তকার' অপেক্ষা 'বাস্তুকার' যে Engineer-এর পরিভাষা হইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ইহা স্বীকার্য। অতএব 'পূর্তকার' বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Mechanical বা Electrical Engineer-কে বাস্তুকার বলা চলে না—ইহাও স্বীকার করিতে হয়, এবং সেইজন্যই সংসদ ইহাদের জন্য একটি পৃথক শব্দ, যন্ত্রবিৎ, প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার উপর 'বাস্তু' কথাটি বাংলায় যেভাবে প্রচলিত তাহাতে উহার মধ্যে কোন শুভ ইঙ্গিত নাই। ভিটা, ঘুঘু ও সাপ এই তিন ভিন্ন বাস্তুর সহিত আর কোন কিছুর বড় একটা সম্পর্ক এখন দেখা যায় না, এবং এ তিনই ধ্বংসের প্রতীক। যুগটাও বাস্তু-ত্যাগের যুগ। Port অর্থে 'বন্দর' শব্দটি বাংলায় সুপ্রচলিত ও সর্বজনবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও ইহা Port শব্দের পরিভাষারূপে সংসদ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। ইহার যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, এই বৈদেশিক শব্দটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা সকল ভারতবাসীর নিকট সমান নহে। 'কলিকাতার বন্দরমহাধ্যক্ষ' বাংলায় খুব ভালই চলে; কিন্তু বেহারের লোক পাছে মনে করে—কলিকাতার কোন গোদা বাঁদরের কথা হইতেছে, সেইজন্য 'বন্দর' শব্দটির উপর জোর না দিয়া পরিভাষায় দীর্ঘবিস্মৃত পৌরাণিক 'পত্তন' শব্দের পুনঃপত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে। পশ্চিমের মান বাঁচাইতে যদি সুপ্রচলিত বাংলা শব্দ বাংলা পরিভাষার অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তবে কৌটিল্য শাস্ত্রে যাহাই বলুক বাঙালীর কান বাঁচাইতে 'বাস্তু' শব্দটি ত্যাগ করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। শব্দটির ব্যঞ্জনা বাঙালীর কানে বেশ শ্রদ্ধা জাগায় না।

'কার'-শব্দযুক্ত যে সব পদ বাংলাতে সাধারণত প্রচলিত, সেগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রয়োগ। যেমন—কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, মালাকার ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা স্বহস্তে কাজটা করে। Engineer বাস্তু করে না, করায়। সে বাস্তুবিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞ। সুতরাং 'কার' অপেক্ষা বিৎ-যোগে Engineer-এর পরিভাষা রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'নির্মাণবিৎ' শব্দটি সাধারণ Engineer-এর পরিভাষা রূপে গৃহীত হইবার

উপযোগী। পূর্তকার বা বাস্তকার অপেক্ষা নিঃসন্দেহে ভাল। কিন্তু "Scientist-কে যেমন বিজ্ঞানী বলা হয়, সেইরূপ "Engineer-কে 'নির্মাণী' বলা চলে" চিঠির এই যুক্তি সুপ্রযুক্ত হয় নাই। Scienist-কে আমরা তো বিজ্ঞানী বলি না, বৈজ্ঞানিক বলি। তবে স্বল্পাক্ষর শব্দ হিসাবে 'নির্মাণী' বলায় সুবিধা আছে। এ শব্দটিও সংসদের বিবেচনাযোগ্য।

এইবার একটু technical কথার অবতারণা করি; কারণ বিষয়টাই technical। Engineer মাত্রই জানেন engineerieeg ব্যাপারের দুইটি প্রধান শাখা। একটি construction বা নির্মাণ, অপরটি repair বা সংস্কার। অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের কাজই বিশ্বকর্মাকে করিতে হয়—সৃজন ও পালন। বড় বড় বাদশাহী সড়ক নির্মাণ করার পর বহু engineer বহুদিন যাবৎ তাহাদের সংস্কার (repair) ও পালন maintenance) করিয়া আসিতেছেন, এক্ষেত্রে তাহারা নির্মাণী না হইয়াও engineer। এই কথা গৃহ সেতু তড়াগ প্রাসাদ এবং সর্ববিধ যন্ত্র সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। সৃষ্ট বস্তু ভাঙিয়া ফেলা অবশ্য শিবের এলাকায় পড়ে। কিন্তু বিনা তাণ্ডবে অর্থাৎ হিসাব করিয়া ভাঙিতে হইলে (dismantling) বিশ্বকর্মারই প্রয়োজন। নূতন হাওড়ার পোল নির্মাণ করিতেও engineer, পুরাতনটিকে ভাঙিয়া ফেলিতেও engineer। সেইজন্য engineer শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, নির্মাণবিৎ বা নির্মাণীর মধ্যে সেই ব্যাপকতার অভাব। কর্মবিৎ শব্দটির ব্যাপকতা আবার প্রয়োজন অপেক্ষা কিছু অধিক, কারণ কর্মমাত্রই engieer-এর এলাকায় পড়ে না, যদিও বিশ্বকর্মা বলিতে তাহাই বুঝি এবং কর্ম-শব্দটির মধ্যেই বিশ্বকর্মার চেলাদের প্রাণবস্তু নিহিত।

প্রস্তাবিত শব্দ কয়টি লইয়া কিছু আলোচনা করিলাম। পরিষৎ ও সরকার একটা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নির্দেশ দিলে, গেজেটে যাঁহারা ঘোষণা প্রকাশ করেন তাঁহাদের কর্তব্য সহজ হয়। অনুপযোগী শব্দ কান-সহা হইয়া গেলে ভাষায় যে বিভ্রাট ঘটে, তাহার নমুনা 'শনিবারের চিঠি'র মারফৎ আমরা জানিতে পারিতেছি।"

* * *

শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত (মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ) ভুল হউক শুদ্ধ হউক প্রচলিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত সংস্কারে রাজি নহেন। তিনি লিখিতেছেন—

"গত অগ্রহায়ণের পত্রিকায় "সংবাদ-সাহিত্য" পর্যায়ে অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য-কৃত কয়েকটি শব্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সম্পর্কে প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, যে ভুলগুলির আর সংশোধনের উপায় নেই সেগুলো বার বার কচলিয়ে লাভ কি? বাংলা ভাষা বা সাহিত্য যে সংস্কৃত অভিধান ও সাহিত্য মাফিক চলে না, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সংস্কৃত ভাষাও যে চিরকাল স্থাণু ছিল এ রকম মনে করবারও কোন কারণ নেই। বৈদিক সংস্কৃত ও কালিদাসের যুগের সংস্কৃত কি উচ্চারণে কি শব্দ-সম্ভারে যে এক নয়, সেজন্য কেউ নালিশ করেছেন ব'লে শুনি নি। অপ্রয়োজনীয় ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টায় শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু গঠনমূলক কিছুর আভাস থাকে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের আলোচনা পড়লে মনে হয়, তিনি বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে বুঝি বা ঠিক সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালতে চান। কিন্তু তা হয় না। ইংরেজী শব্দতত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন Analogy দ্বারা বহুতর শব্দের সৃষ্টি হয়। ইংরেজী Sovereign ও Speargrass এ পর্যায়ের ক্লাসিকাল উদাহরণ। কিন্তু এ আলোচনা শব্দতত্ত্বের বইতেই নিবদ্ধ, কোনরকম বিদ্যা জাহির করবার জন্য ব্যবহৃত নয়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কতকগুলি শব্দের আলোচনা প'ড়ে মনে হয়, তিনি সংস্কৃত শব্দের অর্থও সহজবুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করার চাইতে প্রামাণিক প্রয়োগের দ্বারা বিচার করতে তৎপর। যেমন "আঙ্গিক" ও "আন্তর্জাতিক" শব্দবিচারে করেছেন। সংস্কৃতে অভিনয় সম্বন্ধে "আঙ্গিক" (অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা ভাবপ্রকাশক) শব্দ ব্যবহার হয়েছে ব'লেই বাংলায় আর অর্থান্তর করা যাবে না, এ যুক্তিতে আর যাই থাক্ সারবত্তা নেই। অঙ্গ অর্থে "form"ও হতে পারে। যেমন অনঙ্গ হলেন "formless" কিংবা দেহহীন। সেই হিসেবে বহিরঙ্গ রূপটিকে "অঙ্গ" বলা চলে, সংস্কৃতে প্রয়োগ না থাকলেও। সুতরাং বহিরঙ্গ রূপবিকাশের কৌশলটিকে আঙ্গিক (relating to form) স্বচ্ছন্দে বলা চলে। বলা বাহুল্য "প্রযুক্তবিদ্যা" "Direction"-এর সমার্থসূচক হ'লে, technique-এর সমার্থসূচক কিছুতেই নয়। বহিরঙ্গকৌশল অন্তরঙ্গকৌশল দুটিই প্রযুক্তবিদ্যার মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রযুক্তবিদ্যা বললে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ শিল্পকে বোঝানো চলে না।

'আন্তর্জাতিক' শব্দবিচারেও অধ্যাপক অনুরূপ শুষ্ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে 'অন্তর্গেহ' মানে গৃহের মধ্যে। ভাল কথা। কিন্তু "গৃহগুলির মধ্যে" এই অর্থে অন্তর্গেহ ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের যাই দোষ থাক্, বাংলা ব্যাকরণে দোষ কই? মূলত জাতিক বা জাতীয় বলতে জাতি-মধ্যস্থ, ও আন্তর্জাতিক বলতে জাতিসমূহের মধ্যস্থ এইরূপ ব্যবহার বাংলায় চলে ও চলা উচিত। অন্তঃপূর্ব পদের এই বিশেষ রীতি বাংলার নিজস্ব মনে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু সংস্কারকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। অধ্যাপকের সংস্কৃত pre-disposition তাঁকে একদেশদর্শী করেছে। তাঁর মিশ্র-প্রাদেশিক শব্দ তত্ত্বের কবরেই স্থান পাবে, বাগানে নয়।

জাতীয়করণের পরিবর্তে তিনি যে শব্দ দুটির প্রয়োগে তৎপর, সেগুলোও পণ্ডিতি ও কেতাবী। রাষ্ট্রসাৎ বললে প্রথমেই আত্মসাৎ করার কথা মনে পড়বে। বাংলায় সাৎ শব্দটি খারাপ অর্থেই প্রযুক্ত। নস্যাৎ থেকে আরম্ভ ও আত্মসাৎ-এ শেষ। বরং রাষ্ট্রায়ত্ত তবু চলে।

আবহসংগীত সত্যই ভ্রম-সংকুল। এক্ষেত্রে আবহমান বোধ হয় দায়ী। সেই হিসেবে যে সংগীত প্রসঙ্গানুক্রম সুরটিকে বহন ক'রে আনে, এই রকম অর্থে আবহসংগীত চলছে বোধ হয়। আমার মনে হয় নেপথ্য-সংগীত চালানো উচিত।

ইতিকথা। "ওয়ি ইতিবৃত্তকথা ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ" রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ। সিংহ-চিহ্নিত আসনের 'সিংহাসন' হতে বাধা না থাকে তা হ'লে 'ইতিবৃত্তকথা'কে 'ইতিকথা'য় পর্যবসিত করলে দোষ কি? এক্ষেত্রে সংস্কৃত আভিধানিক প্রয়োগই কি একমাত্র প্রামাণ্য বিষয় হবে?

এই প্রসঙ্গে 'সমাবর্তন' শব্দটি আধুনিক convocation-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে শেষ করি।

সমাবর্তন শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, অথচ convocation শব্দটি কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন। সম্যক আবর্ত হওয়া সমাবর্তনের মূলকথা। আর আহ্বান করা হচ্ছে convocation-এর গোড়ার কথা। অবশ্য সংস্কৃতে সমাবর্তন কথাটির বিশেষ প্রয়োগ আছে। সেটি হচ্ছে উপনয়নে ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসা। কিন্তু ডিগ্রী লাভের সভাকে ঠিক এইভাবে ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসার রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ

convocation শব্দের বাংলা করেছিলেন পদবীসম্মান-বিতরণী সভা। অবশ্য বিস্তারিত, কিন্তু অর্থবোধক। আমার মনে হয় কোন বার্ষিক অনুষ্ঠানকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বলা চলে। Convocation-এর বাংলা বোধ হয় সমাহ্বান্ করা যেতে পারে।"

—

তবে আমাদের ভয় নাই। বঙ্গভারতী বাক্‌দেবী বীণাপাণির নৈষ্ঠিক ভক্ত সেবকেরা বৎসরে বৎসরে তাঁহার পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বিচিত্র বাক্‌বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রেরিত নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি মারফৎ তাহা অবগত হইয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। ইহাতে ভাষার শব্দসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গীসম্ভারও বাড়িতেছে। যথা—

সুধী, চলতি মাসের ২১শে তারিখের নির্মল প্রভাতে মায়ের পায়ে দু'টী ফুল দেবার জন্য যে সামান্য আয়োজন করেছি, আপনাকে সেজন্য সপরিবারে সাদর আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

আমাদের বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ দিনগুলি হঠাৎ যেন কার আগমনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শীতের শেষে নোতুন পাতার শ্যামলিমায়, আম্র-মুকুলের গন্ধে গন্ধে, নব-বসন্ত আবার এল বুঝি আমাদের মনের দুয়ারে আনন্দোচ্ছল জীবনের বাণী নিয়ে। তাই দেবী-ভারতীর দেউলে তার সম্বর্দ্ধনা উৎসবের আয়োজনের মাঝে সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল জীবনের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখবার আমাদের এই প্রচেষ্টা। একুশে মাঘ শ্রীপঞ্চমীতে সেই উৎসব। এ আনন্দের অংশ নিতে আপনাকেও ডাকছি।

জাগ্রতা ভারতীর 'এ' অভ্যুদয় লগ্নে আগামী ২১শে মাঘ শুক্লা পঞ্চমীতে আমরা আমাদের মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুন্দশুভ্রা বাণীর আবাহন করবো। আপনার সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের এই উৎসবকে মহীয়ান্ করে তুলুক—ইহাই কামনা করি।

বসন্তের পূর্বাভাষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে, আমরা জ্ঞানদাত্রীকে আবাহন করবার সঙ্কল্প করেছি।

—মাগো—অন্ধ মোরা—ঘুমন্ত বিবেক—গতিশক্তিহীন তমসার তীর হতে লয়ে যাও টানি—উজ্জ্বল আলোকে, জাগাও মোদের মা পূর্ণ চেতনা।

সৌম্য, শুক্লা পঞ্চমীর শুভ প্রভাতে শুক্লাবসনা মঞ্জুভাষিণীর চরণে দেবো

আমাদের হৃদয়ের রক্ত শতদল। আপনার উপস্থিতিতে ভ'রে উঠুক উৎসব-রসের পাত্রটুকু।

যুগান্তের সঞ্চিত বেদনার অবসান ক'রে, জগত আজ ছুটে চ'লেছে পরিপূর্ণ স্বাধীন সত্ত্বার দিকে—সেই সত্ত্বাকে উপলব্ধি করবার জন্যে; বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের কালিমা বিধৌত ক'রে, জ্ঞান-রশ্মির আলোকে উদ্ভাসিত হ'তে আমরা বাণী কল্যাণীর চরণতলে অর্চ্চনার অর্ঘ্য নিবেদন করতে চাই।

আয় মা বাণী, বীণাপাণি, শূলপাণির শূলহাতে;
আদর্শ আর শিল্পকলার রূপ কি ফোটে এই কাল রাতে?
অলক্ষীর ঐ কালপেঁচারা ডাকছে চোরা গলি পথে,
ভোরের আলোয় আয় মা নেমে নবযুগের লাল রথে।

আমরা বন্দনা করবো জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর,—প্রার্থনা করবো—মানুষ যেন সত্যকারের জ্ঞানোজ্জ্বল কল্যাণময় দর্শনের অধিকারী হয়।

মাঘ শুক্ল পঞ্চমী

বিশ্বরূপা ভারতীর অর্চনায়, হে সম্বোধি, সভ্যুয়সমুত্থানে সার্থক করুন বিশ্বরূপার প্রাংগণ।

মাঘের একুশে পঞ্চমী তিথি—বন্দনা হবে যার;
মোদের দেউলে বাণী অর্চ্চনা—তাইতো এ উপচার।
আসবেন কোথায়? একান্ন, —রোডে
কবে? একুশে, বাইশে ও তেইশে মাঘ তেরোশ পঞ্চান্ন

মা সরস্বতী স্নান করে এসে নিজের বাগানের তোলা ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলেন নিজের সমস্ত অঙ্গকে। তারপর আস্তে আস্তে বীণা হাতে করে বসলেন কুঁড়ের দাওয়ায়; সুরু হোল তার বীণা বাজানো।

কিন্তু হঠাৎ একি হোল? বীণার তার গেল ছিঁড়ে, সুর গেল থেমে। বিষাদের ছায়ায় ভরে গেল চারিদিক। গোধূলির সাথে সাথেই নেমে এল চির অন্ধকার।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বি—৩

শুধু গল্প ১৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকদে‍র

আটটি গল্প

পট ও ভূমিকা ১৲

নেতাদের চরিত্র-চিত্র। 'যুগান্তর' কর্তৃক উচ্চপ্রশংসি‍ত

১৩৫৫র গল্প ১৲

মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদে‍র

নয়টি গল্প

২২।১, কর্নওআ..., ষ্ট্রীট, কলিকা ।—৬

[illegible]

বই ও কাগজ সংক্রান্ত একমাত্র মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক—৬৲, ষাণ্মাসিক—৩।৷০, প্রতি সংখ্যা-

লেখক, পাঠক ও গ্রন্থালয়গুলির গ্রাহ‍ক হও‍য়া অবশ্যকর্তব্য।

পৌষ মাস (২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা থেকে) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র-মন্থন' প্রকাশিত হচ্ছে। পাঁচটি সংখ্যায় শেষ হবে। আরও দুটি উপন্যাস—সুভো ঠাকুরের 'সঙ্গম' (অগ্রহায়ণ থেকে) ও ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিরথের সারথি' ধারাবাহিকভা‍বে চলছে।

কার্যালয়

আপার ... ভা—৯

।।৬৭১।২৩৯।৮১

২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৬

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ

এক

বিংশ শতকের প্রথম দশকে পরাধীন ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন জনমত উপেক্ষা করিয়া বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনার মূলে ছিল ...ণশীল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পলিটিশিয়ানের কূট-বুদ্ধির প্রেরণা। ...ৎকালে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস জনপ্রিয় হইয়া ...ঠিতেছিল। কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ভারতবাসীগণের মধ্যে রাজনৈতিক ...তনা সঞ্চার হইতেছে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহারা ...ঘবদ্ধ হইতেছে—বুঝিতে পারিয়া এই বিদেশী শাসক কংগ্রেসের ...তি বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও দেখিতে ...ইলেন যে, বাংলার ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করিয়া ইংরেজী-...ক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা প্রধানত ভারতের রাষ্ট্রীয় ...ন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ...ালীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ...গ্রেসকে ধ্বংস করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল লর্ড কার্জনের ধারণা। ...দুরভিসন্ধিকে সফল করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইল বঙ্গ-বিভাগের ...কল্পনায়। ইহার দ্বারা বঙ্গভূমির অখণ্ডতা বিলুপ্ত হইবে, বঙ্গভাষা-...ী বাঙালী জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং বাঙালীর নবজাগ্রত ...তি-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। এই দুরাশাই লর্ড কার্জনের দৃষ্টিপথে ...া-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ হইতেই উদ্ভব হইল বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশজাত দ্রব্য ...ণর আন্দোলন। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা ...শী আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলনকে ...ার জাতীয় জীবনে 'রিন্যাসেন্স' বা নবজাগৃতির যুগ বলা যাইতে ...। ইহার ফলে বাংলার রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, অর্থনীতি, ...বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে অল্পকালমধ্যে এক বৈপ্লবিক ...র্তন সংঘটিত হইল।

স্বদেশী আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করিবার জন্য যে সকল বরেণ্য বাঙালী আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের অনুপম রচনার মধ্য দিয়া দেশপ্রেমের জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত হইল। তাঁহার লেখনী-মুখে নির্গত হইল নব নব বাণী ও ভাবধারা এবং তাঁহার কণ্ঠে গীত হইল নব নব সঙ্গীত। সে বাণী নিদ্রালস বাঙালীর শ্রবণে ঝঙ্কৃত হইল রক্তিম উষায় প্রভাত-কাকলীর মত, সে ভাবধারায় বাংলার মরা-গাঙে বান ডাকিল, সে সঙ্গীত বাঙালীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিল।

দুই

বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনার প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩১২ বঙ্গাব্দ ২২এ শ্রাবণ) কলিকাতা টাউন-হলে বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। টাউন-হলের দ্বিতলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিম্নতলে দ্বিতীয় সভা এবং নিকটস্থ ময়দানে তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিনটি সভা একই সময়ে তিন জন সভাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইল এবং তিনটি সভায় বঙ্গবিভাগের সঙ্গে বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। কলিকাতা পুলিসের বিবরণ অনুসারে তিনটি সভায় অন্যূন পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। দ্বিতলের মূল সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। জাতীয় আন্দোলন উপলক্ষ্যে ওই দিন সর্বপ্রথম শোভাযাত্রা বাহির করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। শোভাযাত্রায় ও সভাস্থলে সেদিন বাঙালীর মিলিত কণ্ঠে সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল নবজাগ্রত জাতির নিজস্ব জয়ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্'। ৭ই আগস্টের সেই ঐতিহাসিক দিবসে ভারতবর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবোন্মাদনার যে বন্যা-প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল, উত্তর কালে উহারই প্লাবনধারা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। সে প্রবহমাণ ধারা বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুদূর পাঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও পৌঁছিয়াছিল।

স্বদেশী যুগে আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ চারণ-রূপে গান

হইয়া দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, কখনও তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতেছেন কিংবা প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, আবার কখনও জনসভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ আগস্ট (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শুক্রবার) কলিকাতা টাউন-হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের জন্য এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বনামখ্যাত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। টাউন-হলের দ্বিতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি ইংরেজের রাজনীতি এবং আমাদের দুর্গতির নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। রাজ-দরবারে প্রার্থনা করিয়া ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রাপ্তির চেষ্টাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐরূপ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জাতীয় উন্নতি ও স্বদেশের অগ্রগতি যে সম্ভবপর নহে, তাহা তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তির নিষ্ফলতা এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভরের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র পালের পূর্বে আর কোনও ভারতীয় নেতা অনুভব করিয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁহাদের পূর্বে যে এই নব ভাব এবং জাতীয়তার নূতন আদর্শ আর কেহ প্রচার করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে যখন গ্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হইল এবং মডারেট বা মধ্যপন্থী দলের সহিত পূর্বোক্ত দলের বিরোধ ঘটিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্রের প্রচারিত পূর্বোল্লিখিত ভাব ও আদর্শই ছিল জাতীয়তাবাদী দলের মূল কথা। পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance-এর) নীতিও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা" এবং "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। প্রবন্ধ দুইটি যথাক্রমে 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১২ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই অতুলনীয় প্রবন্ধ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল:—

ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

"এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে।..."

তারপর তিনি বিভিন্ন কর্মপন্থা দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

"দেশের কাজ বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সেদিন নাই,—আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।

"এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব, তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব, তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব, তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

"...কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েত-বিধি পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া

গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন করিতে এবং গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মামলা-মকদ্দমার সালিশী বিচার প্রভৃতি কার্য নিজেদের হাতে লইতে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তিনি গান্ধীজীরও অগ্রগামী। পঞ্চায়েত গঠনের কাজ গবর্মেণ্ট হাতে লইলে ইহার ফল যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে, সে সম্বন্ধেও তিনি দেশ-বাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী কালে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বিদেশী সরকারের রচিত গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসন-আইনের বিধান অনুসারে গঠিত ইউনিয়ন-বোর্ডগুলি সুদৃঢ় সরকারী ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সমুদয় বোর্ডের মধ্য দিয়া গ্রাম্য জীবনে অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল এবং এইগুলি গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া গ্রামের শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

"অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তান-দিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই অনুপম প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এই ভাবে :—

"ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনওই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনই ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু

চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনই ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ১৩১২ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তিন

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ যে সকল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সে যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত কখনও বাঙালীর প্রাণকে স্বদেশ-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে, কখনও অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম গহন পথের যাত্রীকে আলোক-বর্তিকা জ্বালাইয়া পথের সন্ধান দিয়াছে, কখনও বা পথচারী যাত্রা-পথে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িলেও নির্ভয়ে একা চলিবার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু সুলেখক নহেন, একজন সুগায়ক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাংলার নিজস্ব বাউল সুরে তিনি আমাদের শুনাইলেন "সোনার বাংলা" গানখানি। "সোনার বাংলা" গানের আরম্ভ এইরূপ :—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

সঙ্গীতের শেষ চরণ এই ঃ—

"ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে ;
দে গো তোর পায়ের ধুলো সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥"

কলিকাতা টাউনহলে ২৫এ আগস্টের যে সভায় রবীন্দ্রনাথ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সভায় "সোনার বাংলা" সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দ ২২এ ভাদ্র) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার অতিরিক্ত পত্রে পূর্বোক্ত "সোনার বাংলা" গানটি এবং রবীন্দ্রনাথের "নব বর্ষের গান" নামক আর একটি গানও প্রকাশিত হয়। "সোনার বাংলা" ১৩১২ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩০এ আশ্বিন) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত করিয়া বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগকে অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিভক্ত বঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য পরিকল্পিত হইল রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় মিলন-যজ্ঞের হোতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত ঃ—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥"....

এই সঙ্গীতটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৬এ আশ্বিন) তারিখের 'সঞ্জীবনী'তে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে তৎকালের রচিত নিম্নলিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতও প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ—

(১) "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমন অভিমান।"

(২) "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥"

(৩) "আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার॥"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত সঙ্গীতগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি সঙ্গীত সে সময় রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে আরও দুইটির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।"

(২) "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না॥"

রবীন্দ্রনাথের রচিত নিম্নোদ্ধৃত জাতীয় সঙ্গীতগুলি ১৩১২ সনের আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) "নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ ক'রে থাকিস
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।"

(২) "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস নে ভাই।

শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই ॥"

(৩) "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না ॥"

(৪) "ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ।"

চার

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে গিরিধির এক স্বদেশী সভায়ও উপস্থিত দেখিতে পাই। সেই সভা কার্য সম্পাদনে তিনি সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে বিব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গা ৫ই আশ্বিন) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় পূর্বোক্ত সভার যে বিবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"দেশী দ্রব্যের সরবরাহ

"গত ১৮ই ভাদ্র তারিখের গিরিধির জনসাধারণ সভার মন্তব্য কা পরিণত করিবার জন্য যে একটি কার্যসভা গঠিত হইয়াছিল, গত ২৭শে ভা তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান ও কার্যনিরূপণে সহায়তা করিয়া গিরিধিবাসিগণকে উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন দশ হাজার টাকা মূলধনে এখানে একটি "স্বদেশী গোলা" স্থাপনার্থে সভ উদ্যোগী হইয়াছেন। শীঘ্রই উহার কার্য আরম্ভ হইবে। স্বদেশী দ্রব প্রচলনার্থে উহাতে আপাতত করকচ লবণ, দেশী চিনি, কাপড়ের সুতা ও সম্ভব হইলে দেশী কাপড় ও তাঁত রাখা হইবে।

"বড় সুখের বিষয় গিরিধির প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোক বিলাতী চিনি ও লবণ পরিত্যাগপূর্বক দেশী চিনি, সৈন্ধব ও করকচ ব্যবহার করিতেছেন

কুলিদিগের মধ্যেও দেহাতে (দূরবর্তী গ্রামসমূহে) যাহাতে স্বদেশী চিনি ও করকচ প্রচলন হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রেরা বিলাতী কলম ভাঙিয়া খাক ও বোনের কলম ধরিয়াছে। আমরাও খাক ও বোন ব্যবহার করিতেছি। কুমোর বাড়ি মাটির দোয়াতের ফরমাস গিয়াছে।"...

আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের বিলাতী কাপড়ের "লক্ষ্মী অর্ডার" (বিজয়া-দশমী দিনের প্রদত্ত অর্ডার) বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় মাড়োয়ারী ও বাঙালীদিগের কয়েকটি সম্মিলিত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে আসীন দেখিতে পাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দ ১২ই আশ্বিন) বৃহস্পতিবার তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এই সম্পর্কে প্রকাশিত একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"মাড়োয়ারীদের "লক্ষ্মী" অর্ডার বন্ধ

"রবিবার চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে দ্বিসহস্রাধিক মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীর সভা হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরল বঙ্গভাষায় এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় সকলকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। একজন মাড়োয়ারী মহাজন সুরেন্দ্রবাবুর গলায় মাল্য অর্পণ করেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে চারিদিকে বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হয়। এই সভায় মাড়োয়ারী মহাজনগণ ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা এবার ম্যাঞ্চেষ্টারে "লক্ষ্মী অর্ডার" দেওয়া বন্ধ করিবেন। বিজয়া দিন তাঁহারা বিলাতী মালের যে নূতন চুক্তি করেন এবার তাহা রহিত করিবেন। এই সম্বাদে সভা মধ্যে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। মাড়োয়ারী তাঁহাদের এই সংকল্পের কথা শীঘ্রই তারযোগে ম্যাঞ্চেষ্টারে জানাইবেন। এই সভায় বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই দিন বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তারকনাথ প্রামাণিকের বাটীতে আর এক সভা হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি পদে বরিত হন। শ্রীযুক্ত জে, এন, রায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।"

বঙ্গবিভাগের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত হইল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের

১৬ই অক্টোবর। ওই দিবস রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত অপরাহ্ণে কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে সারকুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী মাঠে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। রোগ-শয্যা-শায়ী জননায়ককে কাষ্ঠাসনে বসাইয়া সভাস্থলে বহন করিয়া আনা হইল। সভায় অন্যূন পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে সেদিন যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, তাহা সভায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ঘোষণা

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

এই উপলক্ষ্যে সেই দিন একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ-সভার অবসানে জনগণ দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির বিরাট ময়দানে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তথায় আর একটি সভার অধিবেশন হয় এবং সভাস্থলেই জাতীয় ধনভাণ্ডারের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য পরবর্তী মাসে (কার্তিক) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে বাংলার প্রধান প্রধান নেতার স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র প্রচারিত হয়। এই আবেদন-পত্রে রবীন্দ্রনাথেরও স্বাক্ষর ছিল। পূর্বোক্ত আবেদন-পত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৯ই কার্তিকের (১৩১২ বঙ্গাব্দ) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ধনভাণ্ডার

"বন্দেমাতরম্

"ভগিনীগণ, ভাইদ্বিতীয়ার আর বিলম্ব নাই। ঈশ্বরের কৃপায় এই বৎসর হইতে তোমাদের ভাইদ্বিতীয়ার যজ্ঞ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে। এবার রাখীসূত্রে সমস্ত বাঙ্গালী ভাই হইয়া মিলিয়াছে। এবারে তোমরা ভাইকে নিমন্ত্রণ করিবার বেলায় দেশ-ভাইকে ভুলিও না। ভগিনি! আমরা তোমাদের দেশ-ভাই, সেই শুভদিনে সমস্ত বঙ্গরমণীর কোমল হৃদয়ের কল্যাণ কামনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেদিন তোমাদের ঘরের ভাইয়ের অন্নের থালায় যখন অন্ন পরিবেশন করিবে, তাহাদের বস্ত্রের থালায় যখন বস্ত্র সাজাইয়া রাখিবে, তখন হে কল্যাণি মনে রাখিও, ভাই তোমাদের একটি দুইটি নহে —সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বহু কোটি তোমাদের ভাই; তাহাদের অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, তাহাদের শরীর রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানে বস্ত্রটুকু সমুদ্রপার হইতে আহরণ করিতে হয়। তাহারা অন্নবান হউক, তেজস্বী হউক, নীরোগ হউক, তাহারা নিজের দুঃখ নিজে মোচন করিবার শক্তি লাভ করুক, এই কামনা করিয়া, ভগিনীগণ সেই দেশ-ভাইদের অন্ন ও বস্ত্রের উদ্দেশ্যে সেদিন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিও। তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাঁটা পড়িবে—এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়া বাঙ্গালীর ভগিনী করিয়াছেন, তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে। ইতি শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীআনন্দ মোহন বসু। শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়। শ্রীনলিনবিহারী সরকার। শ্রীমতিলাল ঘোষ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি এমন অনেক জিনিসের উপর পড়িতে লাগিল, যে-সমুদয় ভারতবর্ষে তৎকালে প্রস্তুত হইত না। কলমের হ্যাণ্ডেল এবং নিব সেই শ্রেণীর জিনিস। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য বিলাতী হ্যাণ্ডেল ও নিবের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ খাগড়ার কলম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে স্বনামখ্যাত দেশসেবক মনোরঞ্জন গুহ

ঠাকুরতা 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার স্তম্ভে দেশবাসীর নিকট নূতন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন। হ্যাণ্ডেল ও নিবের সমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপ হয়। বিলাতী দোয়াত-কলম ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য মনোরঞ্জনবাবু 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি এই সম্পর্কে তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেন। ২৯এ ভাদ্র (১৩১২ বঙ্গাব্দ) তারিখের 'সঞ্জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের পত্রের উদ্ধৃতিসহ মনোরঞ্জনবাবুর পূর্বোক্ত পত্রখানি প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রদত্ত হইল :—

"...অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে লোহার কলমেই লেখা ভাল হয়। এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। রবিবাবু লিখিয়াছেন :—

" 'যখন সাধ্যমত দেশী জিনিস ব্যবহারের সংকল্প আমার মনকে অধিকার করিল তখন কলম লইয়া মনে খটকা বাধিল। চিরদিন নিবওয়ালা কলমে লেখা অভ্যাস, অথচ নিব্ এদেশে প্রস্তুত হয় না। মনে করিলাম যদি সংকল্পের খাতিরে লেখা ব্যাপারে আমি অসুবিধা স্বীকার করি তবে সেটা আমার পক্ষে সাধনা স্বরূপ হইবে। এই মনে করিয়া আমি খাগড়ার কলমে লিখিব স্থির করিলাম। খাগড়ার কলম আনাইয়া এক লাইন লিখিতেই দেখিলাম ইহার মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন লেশমাত্র নাই, বিলাতী কলমে এমন আরামে কোন দিন লিখি নাই। এই কলম কাগজের উপর এমন মোলায়েম ভাবে সরে যে লিখিয়া সুখ হয়। কাহারো ধারণা আছে ইহাতে ইংরাজী লেখা ভাল হয় না, আমি তো তাহার প্রমাণ পাই নাই। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কলম দর্শন হইতে এই কলমে লিখিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে কলমটি বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি বাড়ী লইয়া গেলেন। এই কলমের আর একটি গুণ এই যে এরূপ দস্যুবৃত্তিতে গৃহস্থ ব্যক্তির বিশেষ ক্লেশের কারণ হয় না—ইহার মূল্য এতই সামান্য। এরূপ কলমের ব্যবহার যে দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইল ইহা নিতান্ত অনুকরণের ফলে।'

'মহাজন যেন গতঃ স পন্থা ভাবিয়া জগদীশচন্দ্রের অনুকরণে আমিও রবীন্দ্রনাথের একটি কলম অপহরণ (অবশ্য বলিয়া কহিয়া) করিলাম।

খাগের কলমে লিখিয়া বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, বস্তুতঃ এরূপ আরামে অনেক দিন লিখি নাই।"

পাঁচ

দ্রুতগতিতে আন্দোলন প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া বৈদেশিক সরকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং জাতীয় অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন। রাজপুরুষদিগের শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হইল প্রথমত ছাত্র-সমাজের উপর। উভয় বঙ্গের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-দলনের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। ছাত্রগণকে রাজনীতিতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া সরকারী সার্কুলার জারি হইল। স্কুল-কলেজের পরিচালকগণের উপরও নানা প্রকার পরওয়ানা জারি হইতে লাগিল। ১৯০৫ সনের শেষ দিকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আবার দেশের সর্বত্র সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতে লাগিল। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-গণের এক প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯০৫ সনের ২৬এ অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ১০ই কার্তিক) শুক্রবার অপরাহ্ণে পটলডাঙায় স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে এই ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতিবাদ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"স্কুল কলেজের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে গবর্নমেণ্ট সম্প্রতি যে সার্কুলার জারি করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে আমাদিগকে স্বদেশসেবাব্রত হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা কখনই সম্মত হইতে পারি না বা ভবিষ্যতে পারিব না। অতএব আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে যদি গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।"

রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে ছাত্রদিগের সংকল্পের সমর্থন করেন। তাঁহার অভিভাষণের আরম্ভ এইরূপ:—

"এখন বোধ হয় উত্তেজনার দ্বারা আপনাদের উত্তপ্ত রক্তকে আর উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা যে সংকল্প গ্রহণ করিলেন কর্তৃপক্ষ হয়ত তাহা অসঙ্গত মনে করিবেন। তাঁহারা খোঁচাও মারেন, আবার জল বাহির হইলে দোষও ধরেন। শুধু কর্তৃপক্ষ নয় আমাদের দেশে অনেক বিবেচক লোক আছেন তাঁহারা মনে করেন যে বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রগণের অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত হওয়া অন্যায়। অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হওয়া যায় ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে এবং এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি।"...

এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষকে নির্ভীকতার সহিত অথচ সংযত ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"গবর্নমেণ্ট নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন, তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব। আমরা ভারি দুর্বল ভারি অসহায় এই ভেবেই আমরা একদিন আমাদিগকে এরূপ অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর আমরা ভয় পাই না, গবর্নমেণ্ট নিজের জিনিস চূর্ণ করুন, আমরা এই অপমানের মূলোচ্ছেদ' করিবার জন্য ভারতের সরস্বতীকে আবার ভারতের নিজের মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব।"...

পূর্বোক্ত সভার প্রস্তাব এবং সভাপতির অভিভাষণের উদ্ধৃতি ১৩১২ সনের ১৬ই কার্তিক (১৯০৫ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর) তারিখের 'সঞ্জীবনী' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সভা-সমিতিতে যে বক্তৃতা দিতেন, তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই লিখিত ভাষণ। স্বদেশী আন্দোলনের বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কলিকাতায় কতকগুলি জনসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল

কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের জন্য। এই সকল সভায় জনসমাগম খুব বেশি হইত। স্বদেশী যুগে সর্বপ্রথম তিনি জনসভায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ ("অবস্থা ও ব্যবস্থা") পাঠ করেন ২৫শে আগস্ট (১৯০৫ খ্রীঃ) কলিকাতা টাউন-হলে। মহিলাদিগের জন্য লিখিত তাঁহার "ব্রতধারণ" নামক প্রবন্ধটি তিনি নিজে কোন সভায় পাঠ করেন নাই। কলিকাতায় একটি মহিলা-সভায় জনৈক মহিলা কর্তৃক ইহা পঠিত হইয়াছিল। "ব্রতধারণ" ১৩১২ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে:—"কোন স্ত্রীসমাজে জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত"। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে "আত্মশক্তি" নামক পুস্তকাংশে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে-সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি, যে এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

"নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড় দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ-কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা, তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, দৈবকৃপায় যখন আজ আমাদের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা হইয়াছে, তখন তাহাকে "কাজে খাটাইতে হইবে"। নতুবা ইহা "তিরোহিত হইয়া যাইবে"। মাতৃভূমির দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিতেছেন:—

"আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ-কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না? আমরা ভাল হউক, মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।"

"যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছেন'—ভারত-ইতিহাসের সেই গর্ব ও গৌরবের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বঙ্গনারীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ব্রতগ্রহণের জন্য বঙ্গরমণীদের আহ্বান করিয়া বলিতেছেন:—

"আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোন ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।"

স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত মহিলা-সভার বিবরণে দেখিতেছি মফস্বলের কোন কোন সভায়ও "ব্রতধারণ" প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বৎসর কলিকাতায় বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে বিজয়া-দশমীর পর-দিবস যে সাধারণ সম্মিলন-সভা আহূত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে "বিজয়া সম্মিলন" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩১২ সনের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনবদ্য সন্দর্ভের শেষাংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কবি কহিতেছেন:—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিন হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, যে রাখাল ধেনুদলকে

গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও,—আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরং গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড়ে ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান॥"...

গোটা গানটি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণ লিখিয়াছেন এবং কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই-জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার সহজ মননশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় তো থাকিতই, তদুপরি কাজের কথা, সুযুক্তি এবং পথের নির্দেশও থাকিত। তাঁহার নিজস্ব লিখন-রীতি ও স্বকীয় বাচন-ভঙ্গীর দরুন শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনা যত তীব্র ও তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহা কখনও সংযম ও শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া যাইত না। বিপক্ষকে যে-স্থলে তিনি আঘাত করিয়াছেন, সে-স্থলেও ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হিংসার লেশমাত্র অভিব্যক্তি নাই। এই বিষয়ে কবিগুরুর তুলনা একমাত্র গান্ধীজীর সহিতই হইতে পারে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও অভিভাষণ ব্যতীত তাঁহার তৎকালে রচিত এই সম্পর্কীয় সঙ্গীত এবং কবিতাবলীতেও একই ভাবের পরিচয় মিলে। তাঁহার একটি সঙ্গীতে আছে:—

"শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড় আছেন ভগবান ॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হ'লেই ডুববে তরীখান ॥"

ইহার মধ্য দিয়া কবি স্বৈরতান্ত্রিক শাসককে তাহার শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং শক্তির অপপ্রয়োগের পরিণামফল স্মরণ করাইয়া দিয়া সতর্কবাণী শুনাইয়াছেন। আর একটি সঙ্গীতে কবি গাহিয়াছেন :—

"তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে ॥"

রাজরোষের ভয় উপেক্ষা করিয়া মুক্তি-তীর্থের যাত্রীদল নিঃশঙ্ক-চিত্তে যেন অগ্রসর হয়, সেই অনুপ্রাণনা যোগাইয়াছেন কবি তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া। কিন্তু সঙ্গীতের পূর্বোক্ত চরণগুলির মধ্যে কোথায়ও ঘৃণা, বিদ্বেষ, উষ্মা বা উত্তাপের প্রকাশ নাই। এই শ্রেণীর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা হইতেও নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি। "নমস্কার" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নির্যাতিত লোকপ্রিয় দেশনায়ক অরবিন্দকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই অনুপম কবিতা রচিত হইয়াছিল ১৩১৪ সনের ৭ই ভাদ্র—ইংরেজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে বিদেশী রাজার দমন-নীতির প্রয়োগ প্রচণ্ড-বেগে চলিতেছিল। দেশবাসীর মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষোভও ছিল প্রবল ও প্রচুর। এইরূপ অবস্থার মধ্যে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রচিত কবিতায় কোথাও সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। অথচ ইহাতে অত্যাচারীর প্রতি নির্ভীক সাবধান-বাণী রহিয়াছে এবং মুক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে রাজদণ্ডের ব্যর্থতার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কবি কহিতেছেন :—

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণ-বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।...

*   *

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,—
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।"...

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-যুগে লিখিত ও জনসভায় পঠিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন বলপূর্বক ভাঙিয়া দেওয়ার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ মে (১৩১৩ সনের ১৫ই বৈশাখ) কলিকাতায় বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। সভায় অনূ্ন পনেরো হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী, ডাক্তার এম. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বসু, ব্যারিস্টার বি. চক্রবর্তী প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

সভার নির্ধারিত কার্যের অবসানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেশনায়ক" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসের (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তাঁহার "সমূহ" গ্রন্থে প্রবন্ধটি গ্রথিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 'পিটিশন বা প্রোটেস্ট'-এর পথ ছাড়িবার জন্য দেশনায়কদের বলিয়াছেন এবং নায়কের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য।"—এইরূপ অভিমত তিনি একাধিকবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নায়কের কর্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

"...নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম-সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব মোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি ফললাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহু দিনের বিফলতা গুরুর মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে। আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয়, মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার, সকল সদ্গতির বাহিরে।

"অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, এক জনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

"...একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাদিগকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের

সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।"

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ "শিক্ষা সমস্যা" এবং "জাতীয় বিদ্যালয়" ১৩১৩ সনের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করিয়াছেন কলিকাতায় ওভারটুন হলে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের আহূত জনসভায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে ২৯এ শ্রাবণ কলিকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠিত জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের প্রারম্ভিক উৎসবে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা-দান-পদ্ধতি, শিক্ষার ভার জাতির নিজ হস্তে গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুবিবেচিত আলোচনা এই দুইটি প্রবন্ধে রহিয়াছে। "শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধে এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"...অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

"যদি সম্ভব হয়, তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে, কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

"অনুকূল ঋতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার আকাশে তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীত-চর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"

"জাতীয় বিদ্যালয়" প্রবন্ধটি হইতেও নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আজ জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে—আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে।...

"...আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য, এবং কর্ম্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড় হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা নহে—কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে। এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহা রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।"

সাত

"ততঃ কিম্" নামক রবীন্দ্রনাথের আর একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পঠিত হয় ১৩১৩ সনের কার্তিক মাসে "ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে"। পরবর্তী মাসের (অগ্রহায়ণ সংখ্যা) 'বঙ্গদর্শনে' ইহা প্রকাশিত হয। স্বদেশী যুগে লিখিত ও পঠিত তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক সন্দর্ভটিরও উল্লেখ এ ক্ষেত্রে করিতেছি। ইহাকে নির্বিরোধে রাজনৈতিক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, রাজনীতি বলিতে রবীন্দ্রনাথ পিটিশন, প্রোটেস্ট এবং অ্যাজিটেশন বুঝিতেন না। তাঁহার রাজনীতির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তাহা ছিল বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত। রাজনীতি বলিতে তিনি বুঝিতেন,—জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, স্বদেশ ও জাতির অকৃত্রিম সেবা, বিদেশী সভ্যতার অবাঞ্ছনীয় প্রভাব হইতে

স্বদেশী বেশ-ভূষা, স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্য এবং স্বদেশী সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, আত্মশক্তির উদ্বোধন দ্বারা জাতিকে আত্মনির্ভর করিয়া তোলা, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী দেশবাসীর বহির্মুখ গতিকে অন্তর্মুখী করা, আধুনিক নাগরিক জীবনের মোহ হইতে জাতির মনকে মুক্ত করিয়া প্রাচীন ভারতের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পল্লী-জীবনের প্রতি আকর্ষণ করা।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। তৎকালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিখিল-ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইত। কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনকালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে একটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ওই বৎসরই বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে একই মণ্ডপে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক রাজার শোষকগণ রাষ্ট্রীয় সম্মিলন বলপ্রয়োগে ভাঙিয়া দেওয়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনও সম্ভবপর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি সংক্ষেপে সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"...তারপর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম সকল সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্মের কর্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে।...

"কিন্তু কলিকাতা বড়োই কঠিন স্থান। এ তো বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ির শানবাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে

একটি মাত্র, সর্বদাই নানা প্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার এক শত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি এক শত এক।

"জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না, এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।"

তারপর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে হঠাৎ বন্যার মতো একরাত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। আসল কথা এই যে, সমস্ত বাংলা দেশে একটা মিলনের দক্ষিণ-হাওয়া দিয়াছে।

" স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান পড়িতেই মাতৃকক্ষের ছোটোবড়ো সমস্ত দরজাজানালা খুলিয়া গেছে। কে আমাদিগকে চলিতে বলিতেছে। উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যদি বানাইয়া বলিতে বল, তবে বড়ো বড়ো নামওয়ালা উদ্দেশ্য বানাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কুঁড়ি যে কেন বাধা ছিঁড়িয়া ফুল হইয়া ফুটিতে চায়, তাহা ফুলের বিধাতাই নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া দিলে সাধ্য কি সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার কোনো কৈফিয়ত নাই, তাহার একমাত্র বলিবার কথা, আমি থাকিতে পারিলাম না। বাংলা দেশের এমনি একটা খ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রশি ধরিয়া উঁচুনিচু পথের কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন—আর আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই?

"সে কী কথা? নাই তো কী? এ-যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্যাদা দাবি করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব।"...

অতঃপর তিনি স্বদেশের মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে এবং বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে বাংলা সাহিত্যের দানের উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহিত্যের উন্নতি সাধন ব্যতীত যে স্বদেশের প্রগতি সম্ভবপর নহে এবং স্বদেশ ও সাহিত্যের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারও আলোচনা প্রবন্ধে করা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রটি যে বঙ্গ-সাহিত্যেরই দান, তাহা তিনি স্বদেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

পূর্বোক্ত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল ১৩১৩ সনের ৪ঠা ও ৫ই মাঘ তারিখে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১০ই মাঘের (১৯০৭ সনের ২৪এ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় "শিল্পপ্রদর্শনীতে সারস্বত সম্মিলন" শীর্ষক সংবাদে সেই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবরণের সম্পূর্ণ অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শিল্পপ্রদর্শনীতে সারস্বত সম্মিলন

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং শিল্পপ্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে গত শুক্র ও শনিবার প্রদর্শনীর মধ্যে এক সারস্বত সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোখলে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারা-কুমার কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর

বরপুত্রগণ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দুই দিন কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, কৌতুকাবৃত্তি, নাটকাভিনয়, তরবার ক্রীড়া, ব্যাণ্ড, বায়স্কোপ, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি দ্বারা সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের চিত্ত-বিনোদন করা হইয়াছিল। শনিবার অপরাহ্ণে যে সাহিত্য সম্মিলন হয়, উহার প্রারম্ভে মহাকালী পাঠশালার বালিকাগণ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করেন। তদনন্তর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাবের গভীরতায়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী ভাষার মাধুর্য্যে এবং বর্ত্তমান অবস্থার সুনিপুণ বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বক্তৃতা কেবল উপভোগের যোগ্য, সার সঙ্কলন করিতে গেলে তাহার সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আমরা সে বিফল চেষ্টা করিব না, কেবল দুই চারি কথায় মূল বিষয়টি প্রকাশ করিব। তিনি বলেন যে সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন করা এই সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যসেবিগণ সমষ্টিভাবে কখনও সাহিত্যসেবা করেন না। কিন্তু এই যে ঐক্যবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা, এটি বর্ত্তমান কালের একটি বিশেষ লক্ষণ। বিচিত্র আকারে আমাদের মধ্যে উহা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাতৃভূমির সেবা করিতে হইলে প্রথমে তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক, প্রথমে জ্ঞান, তারপরে প্রেম ও কর্ম্ম। আজ বাংলা দেশে দুই বিভিন্ন যুগের উদয়াস্ত সময়ে প্রত্যেক ছাত্রের কর্ত্তব্য দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প, আচার ব্যবহার প্রভৃতির সহিত পরিচয় সাধন করা এবং 'সাহিত্য পরিষদে'র অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে তাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে স্বদেশপ্রেম কখনও দৃঢ়মূল হইবে না। তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত মত বাঙ্গলা ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। আমরা নিম্নে যথাসাধ্য সুরেন্দ্র বাবুর ভাষায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

"সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা

"সভ্যমহোদয়গণ, একটা কথা আছে 'ঢাকের কাছে ট্যামটেমি'। আমার বন্ধুপ্রবর রবীন্দ্র বাবুর কাছে আমিও তাই। রবীন্দ্র বাবুর ঢাকের মত চেহারা আমি এ কথা বলছি না, তাঁর বক্তৃতার কথা বলছি। রবীন্দ্র বাবুর

পরে বক্তৃতা করতে দাঁড়ান আমার ভীষণ বেয়াদবি। কিন্তু এর জন্য আঁ মোটেই দায়ী নই। আমি এই platformএ এই মঞ্চে দুই চারি জ ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা আমাকে জোর ক'রে এনে উপস্থিং করেছেন। এ বক্তৃতার দায়িত্ব তাঁদেরই ওপর। আমি সাহিত্যসেবং নই। মাতৃভাষার সেবা করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় আমার ভাগ্যে তাহ ঘটে নাই। আমি আজীবন বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেছি, বিদে গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি, বিদেশী রাজার সঙ্গে বাকবিতণ্ড ক'রে বেড়িয়েছি। আর কতদিন যে এ করতে হবে তা জানি না। কিং এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে—আর তা যদি না করি তবে আমি বাতুল—এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশের সাহিত্যই দেশের গৌরব দেশের প্রাণ, দেশের মান, দেশের আশাভরসা স্থল। যখন দেশের লোকেং মনে কোন নতুন ভাবের আবির্ভাব হয় কিম্বা দেশের মধ্যে কোন নতুং আবেগ উপস্থিত হয় তখন জাতীয় সাহিত্যে তা প্রকাশিত হইয়া পড়ে সাহিত্যে সেই ভাব সেই আবেগ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। ইতিহাসেং পৃষ্ঠায় এর অনেক প্রমাণ আছে। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রাং যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন আমাদের সাহিত্য নতুন প্রাণে অনুপ্রাণিত হয় আবার যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার দুঃখে কাতর হইয়া বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করেন তখন তাহাও আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। আবার দেখুন এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের কি উপকার হচ্ছে। তাই বলছিলুম, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

"বাংলা সাহিত্য আমাদের নিজেদের জিনিস—উহা পরের নয়। কালের পরিবর্তন হবে, রাজার পর রাজা আসবে, সমাজ বদলে যাবে, কিন্তু আমাদের এই সাহিত্যের নাশ নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই। এই সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক মনে, এক প্রাণে, এক চিত্তে যদি আমরা ইঁহার পূজা করি তবে ইনি পুনরুজ্জীবিতা হবেনই হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

"আমি কাল এই প্রদর্শনীতে ভ্রমণ করছিলুম। আমার সঙ্গে একটি বন্ধু ছিলেন। তিনি এই প্রদর্শনীর একজন সহকারী সম্পাদক। তিনি আমায় গুটিকতক জিনিস দেখালেন। দেখে মনে বড় আহ্লাদ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে

হৃদয়ে অনেক নতুন ভাবের উদয় হ'ল। ভাবলুম—আমরা কি ছিলুম—কি হলুম। আরও ভাবলুম—অতীতে যদি আমরা এত বড় ছিলুম, তবে ভবিষ্যতে কেন হব না? আমাদের আত্মমর্যাদা, আমাদের গৌরব, আমাদের শক্তি আবার কেন ফিরে আসবে না? ব্রাহ্মণের বক্ষে পূর্বের সেই অগ্নি, সেই তেজ, সেই ঋষি তপস্বীর হোমানল আবার জ্বলে উঠবে। বুঝলুম আর্যজাতির সেই গৌরব আবার ফিরে আসবে।

"আমি পূর্বেই বলেছি আমি সাহিত্যসেবক নই। আমি রাজনৈতিক-স্রোতে নিমগ্ন রয়েছি। কিন্তু আমি বেশ জানি, সাহিত্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ডান হাত, জাতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি। তাই আমি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সমবেদনা এবং সহানুভূতি প্রকাশ কচ্ছি।

"আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। আপনারা রবীন্দ্র বাবুকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন—যিনি আমাদের সাহিত্যগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নাই। গদ্যে পদ্যে তাঁহার অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার উদ্যম অপরিসীম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন এবং আমাদের সমাজে তিনি যে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন চিরদিন সেই স্থান অধিকার ক'রে থাকুন।"

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় নেতা না হইলেও স্বদেশী যুগে তাঁহার জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুরোবর্তী দেশ-নায়কগণের ন্যায় মর্যাদা ও সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় বৎসরে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পাবনা-অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন করে। তৎকালে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় নেতার অভিভাষণের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার অভিভাষণ যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিবদমান বিভিন্ন দলের নিকট সমাদর পাইয়াছিল, তাহাতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বাংলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের কোন সভাপতি ইতিপূর্বে মাতৃ-

ভাষায় অভিভাষণ লিখিয়া পাঠ করেন নাই। সেই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-সংগঠনের আবশ্যকতার প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেন। তিনি তৎপূর্বেও একাধিক প্রবন্ধে পল্লী-উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। দেশের লোককে আধুনিক কালের নাগরিক জীবনের মোহ হইতে মুক্ত করিয়া গ্রামাভিমুখী না করিতে পারিলে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন যে সম্ভবপর হইবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন ভারতীয় নেতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন কি না জানি না। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"...দেশের সমস্ত গ্রাম নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"

এই কল্পনাকে রূপায়িত করিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যন্ত বলবতী ছিল। উত্তরকালে তিনি বোলপুরে বাংলার সুদূর পল্লীর ছায়া-শীতল শান্ত পরিবেশের মধ্যে "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রামোন্নয়ন ও কুটীর-শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী"ও তাঁহার সংগঠনী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বতোমুখী।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

ডানা

১৪

রত্নপ্রভার কাণ্ড দেখে ডানা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবুও হয়েছিলেন। তিনি আশা করেন নি যে, রত্নপ্রভা নিজে মরা কাকের ডানা, পা, লেজ, ঠোঁট মাপতে বসবেন। রত্নপ্রভা কিন্তু বেশ উৎসাহ সহকারেই মাপতে বসেছিলেন। যদিও এতে অমরবাবুর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছিল, কারণ রত্নপ্রভা সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপতে পারছিলেন না, ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও গোলমাল ক'রে ফেলছিলেন মাঝে মাঝে, তবু অমরবাবুর বেশ লাগছিল। ডানা এক ধারে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মাপের অঙ্কগুলো টুকে নেবার জন্যে বসেছিল। তার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছিল; শুধু তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল, এতগুলো প্রাণী হত্যা ক'রে কি লাভ হবে শেষ পর্যন্ত? অমরবাবু সত্যিই যদি এ অঞ্চলের কাকেদের (Corvus Spendens) আর একটা উপ-শ্রেণী (Sub-species) বার করতে পারেন, তাতেই বা কি? হয়তো বিজ্ঞান-জগতে ওঁর একটু নাম হবে; কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, না, ঠিক নামের জন্যে উনি এত করছেন না, উনি করছেন নিজের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে। একটা অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল মাতিয়ে রেখেছে ভদ্রলোককে। ছোট ছেলের মত ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছেন সর্বদা। একটা কাকের পেটে কয়েকটা ডিম পাওয়া গেছে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন যেন উনি। ডিমসুদ্ধ গোটা কাকটাকেই উনি বড় একটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছেন একটা ওষুধে চুবিয়ে। এমন বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার। জারে লেবেল লাগিয়ে অমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার রত্নপ্রভার দিকে। শেষ কাকটির মাপ নিচ্ছিলেন তিনি।

না না, ভুল হচ্ছে, ল্যাজের মাপটা ক্যালিপার্স্ দিয়ে নাও। ছড়িয়ে নাও বেশ ক'রে আগে। হ্যাঁ। তারপর ওই মাঝখানের পালক দুটোর মাঝখানে একটা পয়েণ্ট নাও, তারপর সবচেয়ে লম্বা পালকটার টপ পর্যন্ত মাপ। হ্যাঁ, হয়েছে। ঠোঁটটা ঠিক ক'রে মেপেছ তো

বেস অভ দি স্কাল (Base of the skull) থেকে সোজা লাইনে? দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি আমি।

নিজের ভুলের জন্যে রত্নপ্রভা খুব যে বেশি অপ্রস্তুত হয়েছেন, তা মনে হ'ল না। তাঁর মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল শুধু। ক্যালিপার্‌স্‌ দিয়ে কাকের লেজটা মেপে পাশের কাগজে টুকে রাখলেন। অমরবাবু সেগুলো ঠিক হয়েছে কি না দেখে তবে ডানাকে টুকতে দেবেন।

হাত ধুয়ে এসে অমরবাবু নিজে হাতে আবার মাপতে লাগলেন।

আর নেই তো?—রত্নপ্রভা বললেন।

না, এইটেই শেষ।

তা হ'লে আমি চায়ের চেষ্টা দেখি একটু।

এইখান থেকেই ব'লে দাও না কাউকে। ভিখারী করুক না।

ভিখারী পারবে না। এত খাটুনির পর ভাল ক'রে চা খেতে হবে একটু। কড়া ক'রে। কি বলেন?

ডানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চ'লে গেলেন রত্নপ্রভা। বৈজ্ঞানিক মাপজোক শেষ ক'রে ডানার দিকে ফিরে বললেন, ঠিকই আছে। আপনি টুকে নিন এ ফিগারগুলো।

পুরুষ-কাক—ডানা ২৬৬ মিলিমিটার; ঠোঁট ৫০.৫ মিলিমিটার; ল্যাজ ১৬৪ মিলিমিটার, নখ—মানে টারসাস্‌ ৪৮ মিলিমিটার। সব শুদ্ধ কটা হ'ল দেখুন তো।

ডানা গুনে বললে, পুরুষ-কাক কুড়িটা, স্ত্রী-কাক ষোলটা।

সনাতন মল্লিক উঁকি দিলেন দ্বারপ্রান্তে।

আরও কাক কি মারতে হবে?

না। কোনও পাখিই মারবার দরকার নেই আর। এটা যে ব্রীডিং সিজ্‌ন্‌ তা খেয়াল ছিল না আমার। আসছে বছর আবার দেখা যাবে। মরা কাকগুলো কি করলেন?

পুঁতিয়ে দিয়েছি।

যে পাখিওলাগুলো এসেছে, তারা কিছু ধরতে পেরেছে কি?

ফেরে নি তারা এখনও। তবে সেদিন যে পেঁচাটা দেখে এসেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে ডিম সুদ্ধ।

অ্যাঁ, তাই নাকি! কোথায় সেটা?

বার-বাড়িতে। আনতে বলব?

নিশ্চয়।

কিন্তু অমরবাবুর আর তর সইল না। নিজেই তিনি বেরিয়ে গেলেন হুড়মুড় ক'রে।

ডানা বসে রইল। তার আগেকার চিন্তার সূত্র ধ'রেই ভাবতে লাগল, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেও কি জীবহত্যার সমর্থন করা চলে? সে জানত না যে, এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও স্বাধীনভাবে ডানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে যথাসম্ভব অহিংস হতে হবে। হিংস্র হবার চরম ক্ষমতা আছে ব'লেই হতে হবে। সে শক্তিশালী ব'লেই সংযমী হতে হবে তাকে। যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রাণীহত্যার কারণ, সে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সম্বরণ করাটাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হওয়া চাই অন্য কোনও কারণে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। সে কোথায় যেন পড়েছিল—কোন পাঠ্য পুস্তকেই সম্ভব—যে, জীবজগতে জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত যে, তার বেশি রকম ওলট-পালট করতে গেলে সমগ্র জীবজগতেরই সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অদরকারী ব'লে কিছু নেই। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও কিছু ধ্বংস করা মানেই প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেওয়া এবং তার পরিণাম শুভ নয়, অশুভ। যে 'ফাংগাস' (চলতি ভাষায় যাকে আমরা 'ছাতা' বলি) এতদিন নানা রকম ঘৃণ্য রোগের হেতু ব'লে গণ্য হচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রোগ সারাবারও উপাদান আছে। মানুষ যদি ইতিপূর্বে কোনও উপায়ে এই 'ফাংগাস'দের নির্মূল ক'রে দিতে পারত, তা হ'লে 'পেনিসিলিন' বা ফাংগাস-জাত অন্যান্য মূল্যবান ওষুধগুলি মানবসমাজ পেত না। মানুষের নিজের প্রয়োজনের জন্যই হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণী-

বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা আজ জানা যায় নি ব'লেই অনেক জীবকে আমরা অদরকারী বা অনিষ্টকারী মনে করি, পরে হয়তো জানা যাবে যে, তারা উপকারীও। এই জন্যেই, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাই সভ্য মানুষ স্বভাবত অহিংস। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর একটা স্বাভাবিক হার প্রকৃতির প্রয়োজনবশতই ঠিক হয়ে আছে। অস্বাভাবিক উপায়ে সে হার নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য মানুষ হয়তো নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। হঠাৎ রূপচাঁদের চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায় নি সে। এ ধরনের চিঠি ইতিপূর্বে পেয়েছে সে আরও দু-একবার, বর্মায় থাকতে। সে জানে, এর একমাত্র প্রতিষেধক ঔদাসীন্য। যেন কিছুই হয় নি, এ রকম তো হয়েই থাকে—এই গোছের একটা ভাব দেখানো। রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে খুব সহজভাবেই সে কথা কইবে ভেবে রেখেছে। রূপচাঁদ প্রশ্ন না করলে চিঠিটার উল্লেখও সে করবে না। প্রশ্ন যদি করেন, তখন যা হোক একটা উত্তর দিলেই হবে। চিঠিটা পেয়ে সে যে বিব্রত বা বিচলিত হয়েছে, এটা সে কিছুতে প্রকাশ করবে না। চিঠিটার কথা এখন মনে প'ড়ে গেল, কারণ রূপচাঁদবাবু চিঠিতে স্বাভাবিক কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন বেশ জট পাকিয়ে গেল ডানার মনে। জীবনে স্বাভাবিক হতে চাওয়াটাই যদি কাম্য হয়, তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। আর অস্বাভাবিকতাই যদি সভ্যতা হয়, তা হ'লে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে। অমরবাবুর পক্ষী-নিধনে আপত্তি করা চলবে না। তার মন পরস্পরবিরোধী দুটো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে কেন—স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা দুটোই বিস্বাদ লাগছে কেন? তৃতীয় একটা কিছু আছে না কি, যা স্বাভাবিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়, যা শুধু মনুষ্যোচিত। কি সেটা?…সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।…

সোরগোল করতে করতে বৈজ্ঞানিক ঢুকলেন দুজন লোককে নিয়ে। দুজনের মাথায় দুটো প্রকাণ্ড খাঁচা। মুরগি-ব্যবসায়ীরা বাঁশের

তরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সব খাঁচায় মুরগি রাখে, সেই রকম দুটো খাঁচায় বেশ বড় দুটো পেঁচা রয়েছে।

বুঝলেন, একটা নয়, দুটো পাওয়া গেছে। আর আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, কেটুপাই ঠিক। লক্ষ্য ক'রে দেখুন—পা পালক দিয়ে ঢাকা নয়। আর ওই ডিমটাও দেখুন—একটি মাত্রই ছিল, এরা একটার বেশি পাড়েও না সাধারণত, বড় জোর দুটি। ডিমের রঙ কেমন চমৎকার দেখেছেন? সাদার উপর একটু ক্রীমের আভাস। প্রায় দু ইঞ্চি হবে, নয়? একেই বলে ব্রড ওভাল (Broad Oval), এটাকে রেখে দিতে হবে ভাল ক'রে।

কোণের আলমারি থেকে কার্ড-বোর্ডের বাক্স বার করলেন একটা। তার ভিতর তুলো দেওয়া ছিল। তুলোর উপর ডিমটি সন্তর্পণে রেখে আরও খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ফিরে এসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন পেঁচা দুটোকে। ডানাও দেখতে লাগল। এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেঁচা সে দেখে নি কখনও।

কেটুপারা হচ্ছে ফিশ আউল, বুঝলেন। কয়েক রকম কেটুপা আছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের চেহারা, রঙ আর পা। টারসাসগুলো উলঙ্গ, মানে পালকহীন। বাইরে থেকে কোন্‌টা স্ত্রী কোন্‌টা পুরুষ বোঝবার উপায় নেই। এদের বাসা থেকে বার করলে কি সেই চামড়ার দস্তানাটা প'রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—সনাতন মল্লিক বললেন, ভাগ্যে দস্তানাগুলো দিয়েছিলেন, তা না হ'লে বার করাই যেত না।

আমি জানি কিনা।

রত্নপ্রভা প্রবেশ করলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। অমরবাবু সনাতন মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন, মল্লিক মশাই, আপনিও একটু চা খেয়ে যাবেন তো?

আজ্ঞে না, আমার এখনও আহ্নিক হয় নি।

ও, তাই নাকি, তা হ'লে আপনি বাড়ি যান, বাড়ি যান। এতক্ষণ কষ্ট ক'রে আপনার থাকবার কোনও দরকার ছিল না তো।

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন অমরবাবু।

সনাতন একটু হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আজ্ঞে না, কষ্ট কি ?

যান আপনি। আজ আনন্দবাবু আসেন নি দেখছি। তিনি বলেছিলেন, পেঁচাটা যদি ধরা পড়ে, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। আপনি তো ওই দিকেই যাচ্ছেন— না, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, একটা চাকর পাঠিয়ে দিন বরং।

আমিই যাবার পথে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আমার রাস্তাতেই তো পড়বে।

সনাতন মল্লিক চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা চায়ের আসর পেতে ব'সে প্রথমেই একটি সুখবর দিলেন।

আমাদের আস্তাবলের আলসেতে একটা শালিক বাসা বাঁধছে বোধ হয়। খড় মুখে ক'রে ক'রে নিয়ে আসছে দেখলা ম।

তাই নাকি ?

বৈজ্ঞানিক উৎসাহিত হয়ে উঠে পড়লেন।

কবি বাড়িতে ছিলেন না।

তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শহরের বাইরে একটা বাগানে। বসন্ত শেষ হচ্ছে, তারই শোভা দেখছিলেন তিনি। সবাই যেন এবার ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। অনেক আমগাছ এখনও মুকুলে ভরা, আমও ধরেছে অনেক গাছে। সজনে গাছে কচি কচি ডাঁটা ঝুলছে, ফুলের স্তবকও রয়েছে এখনও। দূরে রাংচিত্তিরের বেড়া, তাতেও ফুল। ঘনশ্যাম সোজা ডাঁটাগুলোর গাঁটে গাঁটে ছোট ছোট আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে যেন। কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। কর্ণিকার গাছে পাতা দেখা যায় না, আপাদমস্তক সোনার ফুল। কত রকম পাখিই যে ডাকছে! দোয়েলের গিটকিরি-ভরা গান আকুল ক'রে তুলেছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতকে। যে রিক্তাভরণা বসন্তশ্রী চ'লে যাবার আগে ফুলে ফলে কিশলয়ে সালঙ্কারা হয়ে উঠেছে, সহসা দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত যেন মাদকতার সঞ্চার করেছে তাতে। কোকিলও ডাকছে। ক্রমাগত ডাকছে, বিরাম নেই! তার অবিরাম আহ্বানকে ব্যঙ্গ ক'রে

মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়ে উঠছে তীক্ষ্ণকণ্ঠী কোকিলার ভর্ৎসনা—কিক্ কিক্ কিক্। পাপিয়ার সুরলহরী আকাশ স্পর্শ করছে যেন। মনে হচ্ছে, মর্ত্যের আকুতি অমর্ত্যলোকে গিয়ে পৌঁছল বুঝি। ট্রু, টুরু টুরু—কয়েকটা বুলবুলি উড়ে গেল। ছোট্ট একটু জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন একবার। একটু দূরের একটা গাছে ভারি চমৎকার একটা সুর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন কবি। কাছে গিয়ে দেখেন, ফিঙে এবং ফিঙে-গিন্নী প্রেমালাপ করছেন। মিষ্টি সুরের মাঝে মাঝে কেররর-গোছের মিষ্টি ঝনৎকারও আছে একটু। দূর থেকে শুনলে মনে হয়, দু রকম পাখি ডাকছে বুঝি। ছাতারেগুলো কচবচ করছে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিতর। লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বকর-বকর করছে ক্রমাগত। শালিক-দম্পতী খড় কুটো মুখে তুলে বাসা বানাতে ব্যস্ত। দূরের একটা প'ড়ো বাড়ির কার্নিসে বার বার উড়ে উড়ে যাচ্ছে খড় মুখে নিয়ে। ছোট্ট ভগীরথও একটা গাছের ডালে ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গর্ত করছে কুরে কুরে। বাসা তৈরি করছে। দূরের আমগাছটায় টিয়া বসল এসে এক ঝাঁক।

হঠাৎ কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা লোক গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। মানুষ নয়, মার্জার যেন একটা। হঠাৎ জালটা ঘুরিয়ে ফেললে সে একটা ঝোপে। সমস্ত পাখি উড়ে গেল আশপাশের গাছগুলো থেকে।

কে তুমি হে, কি করছ এখানে?

এগিয়ে গেলেন কবি। লোকটা জাল গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোনও জবাব দিলে না প্রথমে।

কি করছ, জাল ফেলছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখি ধরব?

কেন।

অমরবাবুর চাই। পাখি পিছু এক টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।

ও।

পাখি-ওলা জাল কাঁধে ফেলে অন্য দিকে চ'লে গেল। কবি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার প্রস্থান-পথের দিকে। জাল দিয়ে পাখি

ধরার কথা ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন তিনি, খাঁচার ভিতর বন্দী পাখিও দেখেছেন, তবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ আবার কিক্ কিক্ ক'রে উঠল কোকিলা সুন্দরী। খিক খিক ক'রে হেসে উঠল যেন। টুররর ক'রে সাড়া দিলে বুলবুলি। এক ঝাঁক গো-শালিক কলরব ক'রে উঠল। কবির মনে হ'ল, ওই পাখি-ওলাকে উদ্দেশ্য ক'রে ওরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলছে যেন প্রত্যেকেই। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে ওদের বক্তব্যটা যেন নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। একটা গাছের তলা একটু পরিষ্কার ছিল, সেইখানে বসলেন আবার। পকেট থেকে খাতা কলম বেরুল। পাখিদের বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মনে হ'ল, পাখিরা যেন বলছে—

১

তোমাকে চিনি…
আমাদের তুমি চিনিতে চাও কি ও পাখি-ওলা ?
দূর হ'তে তুমি কারও শোন গান,
কারও দেখ রঙ, কাহারও দোলা,
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি
মোদের সুনীল উদার আকাশটি ?
আকাশ খোলা ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

রঙ বা সুরের তুফান তুলিয়া
কেউবা টিয়া,
বাহার দিয়া,
কেউ বা কোয়েল, কেউবা দোয়েল, কেউ পাপিয়া
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা

ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কথনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৩

সুরের নেশায় কেউবা হারায়ে ফেলেছি দিশা,
কাহারও ফটিক-জলের তৃষা,
কেহবা জাগিয়া কাটাই নিশা—
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কথনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৪

কাহারও পালকে ইন্দ্রধনুর বরণ-ঘটা
কাহারও রূপালী, কাহারও আবার
সোনার ছটা
সরল জটিল অনেক ধরণ
বিবিধ বরণ চঞ্চু চরণ
লাল, নীল, শাদা, কালো বা কটা
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কথনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

হয়তো একদা প'ড়ে যাব ধরা ফাঁদেতে তোমার,
খাঁচাটি তোমার জানি না কেমন
হয়তো লোহার, হয়তো সোনার
হয়তো একদা ভুলাব তোমারে পেখম তুলি
হয়তো শিখিব তোমারি বুলি

খাইব তোমারি ছাতু বা ছোলা
তোমারি দাঁড়েতে দুলিব দোলা
দয়া ক'রে শুধু যেও না ভুলি
ছিল আমাদের আকাশ খোলা,
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। ডানার কথা মনে পড়ল। সেদিন রঙ মাখিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে আর তিনি ডানার কাছে যান নি। রঙ দিতে দিতে মনে হচ্ছিল. ডানা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে নিরুপায় হয়ে রঙ দেওয়াটা সহ্য করছে। উৎসবটা উপভোগ করে নি। তাঁরও উৎসব তাই জমে নি সেদিন। এটাও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন যে, জোর ক'রে উৎসব জমানো যায় না। আনন্দটা স্বতোৎসারিত না হ'লে তা নিরানন্দের চেয়েও পীড়াদায়ক। ডানা কেন অমন ক'রে আছে? পাখিগুলো পাখিওলাটাকে যে চক্ষে দেখছে, ডানাও হয়তো ঠিক সেই চক্ষেই দেখছে আমাকে। ভাবছে, আমি কবি নই, আমি একটা ফাঁদ। তার ভুল যেদিন ভাঙবে, সেদিন সে উৎসবে যোগ দেবে হয়তো। প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে। প্রতীক্ষাতেও আনন্দ আছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যিকার উৎসব কবে জমবে? কবে ডানা বুঝতে পারবে যে, অপরকে বঞ্চিত করলে নিজেকেও বঞ্চিত হতে হয়? প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিত্য নব উৎসবের যে ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়ছে অহরহ, ঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখে কতকাল তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে সে? দ্বার একদিন খুলতেই হবে। কিন্তু কবে?…

চিঠ্‌ঠি হুয়।

চমকে উঠলেন কবি। ফিরে দেখলেন, চন্দনচর্চিত তাঁর মৈথিল ঠাকুরটি একটি চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে এখানে থাকবেন, তা ঠাকুরটিকে ব'লে এসেছিলেন। চিঠিটি সনাতন মল্লিকের।—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আনন্দবাবু, আপনাকে এক জোড়া হুতোম পেঁচা দেখাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অমরেশবাবু বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম। আপনার দেখা না পাইয়া এই চিঠিটি লিখিয়া যাইতেছি। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়

শ্রীসনাতন মল্লিক

চিঠিটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি উঠে পড়লেন। হয়তো সোজা অমরবাবুর বাড়িই যেতেন, কিন্তু ঠাকুরটি অদ্ভুত ভাষায় আর একটি খবর দিলে।

রেন্না হোইয়ে গিয়েসে।

কটা বেজেছে ?

বারহ্ বজ্ গিয়া।

তবে চল, বাড়িই যাই।

ক্রমশ

"বনফুল"

অন্যপূর্বা

নয়

কথা। কথা। শুধু কথা।

কিছু দিন পূর্বে পর্যন্ত কথার উপর দেবেশের ছিল অচলা ভক্তি। কথার উপাসক ছিল সে। কথাস্বাধীন চিন্তা বা অনুভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তার গভীর সন্দেহ ছিল। মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেওয়া মানেই সেই সব মনে অনুভূতি দেওয়া। নীরব বেদনা এবং ভাষাহীন পুলক নিয়ে কবিগণ যে এত বাগ্‌বিস্তার করতে পেরেছেন, তার কারণ, তাঁদের কারোই ভাষার অকুলান ঘটে নি। যার ভাষা নেই, তার ভাবও নেই ; অর্থাৎ মূর্তি নেই, আকার নেই। অর্থাৎ অস্তিত্বই নেই। এই ছিল দেবেশের যুক্তি এবং বিশ্বাস। আজকের সাহিত্যিকরা মজদুর-মার্কা গল্পে চাষী-মজুরের যে দুঃখের কথা লেখেন, দেবেশ তা প'ড়ে চিন্তিত হয়। ওদের দুঃখ দেবেশের অজানা নয়।

পথে একজন ভিখারী দেখে এলে সেদিন তার খাদ্য রোচে না, নিদ্রা ঘোচে। নিজেকে কেবলই বলে, এতে আমার কি অধিকার যা ওদের নেই? কিন্তু মাঝে মাঝে দেবেশের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই দুঃখগুলি সত্যি আছে কি না।

দুঃখের উৎস তো মন। সেই মনই যদি না জানল, তা হ'লে দুঃখই বা কোথায় আর সুখই বা কোথায়? যে সিগারেটই খায় না, সে কি কাঁচি-মার্কা সিগারেটের বিজ্ঞাপন প'ড়ে বিলাপ করবে? কখনই না। আমি যা জানি নে, তা আমি হারাই কেমন ক'রে? যে বিলাস আমার আছে এবং প্রোলিটারিয়টের নেই, তা নিয়ে শেষোক্তের অজ্ঞ শান্তির ব্যাঘাত তো ঘটবে শুধু তখনই, যখন তার অজ্ঞতার অবসান হয়েছে। তার আগে নয়। সেই বিলাসগুলির অনবিমিশ্র আশীর্বাদের কথা শ্রমিকদের গোচরীভূত করা উচিত কি উচিত নয়, সে আলাদা তর্ক। হয়তো উচিত, হয়তো উচিত নয়। মোহমুক্ত হ'লে পরশ্রমজীবী-শ্রেণী যে যন্ত্রসভ্যতার বিলাস পরিহার করতে উন্মুখ হ'য়ে উঠবে ব'লে দেবেশ নিশ্চিত জানে, তার প্রলোভনে শ্রমিক-চাষীকে উন্মত্ত না করবার পক্ষে নিশ্চয়ই অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু সে আলাদা তর্ক। আসল কথা হচ্ছে, শ্রমিক-চাষী যে দুঃখ সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন, তা নিয়ে আজকের সাহিত্যরচনা অসাধুতার সামিল নয় কি? শ্রমিককে দিয়ে অননুভূত দুঃখের কথা বলানো কি পরোক্ষে অনৃতভাষণ নয়? অবাস্তব, অনস্তিত্ব অভাব নিয়ে সাহিত্যরচনা নিশ্চয়ই রিয়েলিস্ট সাহিত্যের পরিচয় নয়।

কলকাতার পথে দেখা যায়, লৌহকণ্টকের শয্যায় শায়িত সন্ন্যাসীদের। দিব্য আরামে শুয়ে আছেন। ব্যথা লাগলে নিশ্চয়ই অমনভাবে শুয়ে থাকতেন না, কেন না কোন আইন নেই অমন শয্যায় শুতে কাউকে বাধ্য করবার জন্যে। তাঁদের দেখে কি অশ্রু বিসর্জন করতে হবে? আর অশ্রু বিসর্জন করলে সে কি পাঞ্জাবী শিখের পাগড়ী দেখে সদয়া বিদেশিনীর অনুকম্পার মত অলীক ও হাস্যকর হবে না? কাঁটা সেই সন্ন্যাসীর কাছে কাঁটা নয়, পাগড়ী শিখের মাথার ব্যাণ্ডেজ নয়।

দেবেশ বলত Cogito ergo sum-এর চাইতে সত্য হচ্ছে Dico

ergo sum। আমি ভাবি, তাই আমি আছি নয়। দেবেশ বলত, আমি বলি, তাই আমি আছি। বেতারবক্তার জীবিকার প্রশ্ন নয় এটা,—যদিও ওর উক্তির এই হাস্যকর দ্বিতীয় অর্থ ওর দৃষ্টি এড়ায় নি,—প্রশ্ন হচ্ছে ভাষাহীন, ভাব আছে কি নেই। দেবেশ বলত, নেই। আমাদের সকল চিন্তার বাহন ভাষা। বাহন বাদে ভাব অচল। অনস্তিত্ব না হলেও অপাংক্তেয়।

বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে কথার গুরুত্ব আগের চাইতে অনেক বেশি। অন্তত সংখ্যার দিক থেকে কথা নিশ্চয়ই বেড়েছে। বেসিক ইংলিশ নিয়ে যতই আন্দোলন হোক, পপুলার খবরের কাগজের ভাষা যতই অশিক্ষার নিম্ন স্তরে নেমে আসুক, কথার সংখ্যা বাড়ছে। যত কথা লোকে ভুলে যাওয়ায় অচল হয়ে পড়ছে, তার চাইতে বেশি কথা প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে প্রতি ভাষার কথাশালে। না, দেবেশ নিশ্চয় জানত, ভাষার বাইরে, কথার বাইরে কিছু নেই। কথাই সব।

বস্তুত আজকের জীবনই তো বাক্‌সর্বস্ব! মুশকিল হচ্ছে এই যে দেবেশের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় অত্যন্ত পরিমিত। এ কথা আমি দেবেশকে বহুবার বলেছি। সে মানে নি। তবু কথাটা সত্যি। তখন, নিরুপায় হয়ে, দেবেশ বলবে, আচ্ছা, জীবন তো আর্টের বিষয়বস্তু ছাড়া কিছু নয়। আধুনিক উপন্যাসের দিকে তাকাও একবার। দেখবে, একমাত্র মম ব্যতীত দ্বিতীয় আর পাঠযোগ্য কোন লেখক নেই, যার উপন্যাসে কথা ছাড়া আর কিছু আছে। ওয়র্ডস্, ওয়র্ডস্, ওয়র্ডস্!

কথাটা যে মিথ্যা নয়, তা এই দেবেশ-মালতী কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে ব'সে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি।

ঘটনা ব'লে কোন বস্তু নেই আজকের নাগরিক জীবনে; আছে শুধু কথা। বৃহৎ কোন বিপদ এখানে নায়ককে এনে দেয় না নায়িকার সান্নিধ্যে, বৃহৎ কোন বিপদ তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয় না চিরদিনের জন্যে। পথিক এখানে পথও হারায় না, আর কেউ এসে হাত ধ'রে জিজ্ঞাসাও করে না, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' সত্য বলতে কি, এখানে এমন কিছুই ঘটে না, যাকে ঘটনা বলতে পারি। এখানে

একজন ভাল কথা বলে আর অপর জন তার ভাল উত্তর দেয়, তাই নিয়ে হয় প্রেম। পরে অপর জন ভাল কথা বলে এবং প্রথম জন ভাল উত্তর দেয় না, তাই নিয়ে হয় বিচ্ছেদ।

কথা। শুধু কথা।

সম্প্রতি কিন্তু দেবেশের একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ জেগেছে। সে যেন অত্যন্ত গভীর অনমুমোদনের সঙ্গে এমন কয়েকটা অনুভূতির আভাসের সন্ধান পাচ্ছে, যার যথাযথ কথারূপ সে খুঁজে পাচ্ছে না। ভাষা নেই, তবু ভাবগুলিকে কিছুতেই যেন অস্পষ্টভাবে স্বীকার না ক'রে পারছে না।

দশ

বাড়ি ফিরে দেবেশ অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, সময় দিল মালতীকে বাড়ি পৌঁছবার। তারপরেই টেলিফোনে ডাকল মালতীকে।

মালতী তার ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই শুনল টেলিফোনের ডাক। সে ফিরেছিল নৈরাশ্যের বোঝা নিয়ে। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা মালতীর ভাল লাগে, কিন্তু সে রেডিওর বক্তৃতায় বা মুদ্রিত রচনায়। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে সে চায় না মৃত চিন্তানায়কদের মৃত গবেষণার মৃত ফলাফল নিয়ে কথা ব'লে সময়ের অপচয় করতে। অথচ দেবেশ কি তাই করে নি? একবারও দেবেশ বলে নি নিজের কোন কথা, জিজ্ঞাসা করে নি মালতীর কোন কথা। মালতী তো কলেজের ক্লাসে যায় নি, গিয়েছিল আকাঙ্ক্ষিত এক পুরুষের আহ্বানে সাড়া দিতে। অথচ ফিরতে হ'ল তাকে এক রাশি বক্তৃতা নিয়ে। আর কিছু নয়।

মালতী টেলিফোন তুলল। অপরিসীম অনিচ্ছা গোপন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে বলল, হ্যালো!

হ্যালো!

মালতীর হাত থেকে টেলিফোন যে খ'সে পড়ল না, তার জন্যে মালতী দায়ী নয়। একবারও সে কল্পনা করে নি যে, বিদ্যাসর্বস্ব ওই বাগ্‌যন্ত্রটা সহসা হৃদয়বান হয়ে এখনই তাকে টেলিফোন করবে। আর

কিছু ভেবে না পেয়ে, আপন কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে মালতী আবার বলল, হ্যালো।

দেবেশ ট্রাম-লাইন থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অনেক ভেবেছে। সে জানত, সে কি করছে। তার কণ্ঠে ছিল সন্দেহমুক্ত নিশ্চয়তার সুর। মালতীর নির্ভুল স্বর শুনেই বলল, আপনাকে এত বাজে কথা ব'লে বিরক্ত করলেম এতক্ষণ ধ'রে, অথচ সব চাইতে জরুরী, সব চাইতে আগে যেটা জিজ্ঞেস করবার কথা, সেই কথাটাই ভুলে গেছি।

মালতীর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠ থেকে যে উত্তর এল, তার একমাত্র মুদ্রণযোগ্য রূপ—'?'

দেবেশ আর কিছুর জন্যে অপেক্ষা করল না, বলল, সেই কথাটা হচ্ছে, কাল আপনি কি করছেন?

কাল মালতীর অনেক কাজ। নৈনিতাল যাবার ব্যবস্থাটা পাকা করতে হবে দাদাকে টেলিফোন ক'রে। তার পরে কিনতে হবে নানা ছোটখাট কিন্তু অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র। ছোট ভাইবোনদের জন্যে কিনতে হবে তাদের মনোমত উপহার। কিনতে হবে মার জন্যে শাড়ি, বাবার জন্যে একটা পাইপ আর কিছু বিশেষ একটা ব্র্যাণ্ডের তামাক। ঝি-চাকরদের কথাও ভুললে চলবে না। এত দিন পরে দিদিমণি ফিরবে শ্বশুরবাড়ি থেকে, ওরা পথ চেয়ে থাকবে কত আশা নিয়ে। তারপর যাবার আগে দেখা ক'রে যেতে হবে বহু আত্মীয় এবং তার চাইতেও বেশি বান্ধবীদের সঙ্গে। কলেজের পালা ঘুচল, আবার কবে কোথায় কার সঙ্গে দেখা হবে বা আদৌ হবে কি না, কে জানে! এবারেই তাই দেখা ক'রে যেতে হবে। কাজের অন্ত ছিল না মালতীর। তবু বলল, বিশেষ কিছু নয়, কেন বলুন তো?

দেবেশ তার আগের দিন একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল। রেডিওতে তার চিত্র-সমালোচনা করতে হবে সেইজন্যেই। তা নয়তো সাধারণত ছবি দেখে না দেবেশ। ভাল লাগে না। সিনেমাকে এখনও সে সীরিয়স্ আর্ট ফর্মের মর্যাদা দেয় না। আর দেবেশের আনন্দ তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতি থেকে এমনই অভিন্ন ও অবিভাজ্য যে, ওই দুটো জিনিস বিস্মৃত হয়ে সে আনন্দ আহরণ করতে জানে না চলচ্চিত্রের

বুদ্ধিবিরহিত তথাকথিত প্রমোদপরিবেশন থেকে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার পরিমিতি সম্বন্ধে সে সজাগ। ইংরেজি এবং মার্কিন ছবি ছাড়া বড় একটা দেখে নি সে। শুনেছে যে, ফরাসী এবং রুশ ছবি নাকি অনেক উচ্চ স্তরের। তাই দক্ষিণ কলিকাতার একটা ঘরে যখন নামকরা রুশ ছবি Road to Life দেখাবে ব'লে জানল, দেবেশ তখনই স্থির করল তার পরবর্তী চিত্রসমালোচনায় সেই ছবির অন্তর্ভুক্তি।

আগের দিনের ছবিটা দেবেশের ভাল লাগে নি। শুধু তাই নয়, তার সম্বন্ধে বলবারও বিশেষ কিছু ভেবে পাচ্ছিল না দেবেশ। তার চেয়েও যা বিস্ময়কর, দেবেশের ছবিটা দেখবার সময় নিজেকে ভয়ানক একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। তার সামনের সারিতেই বসেছিল একটি তরুণ আর একটি তরুণী। দেবেশের উপায় ছিল না মাঝে মাঝে তাদের দিকে না তাকিয়ে। তাদের কারই চোখ ছিল না পর্দার দিকে। দুজনে সম্পূর্ণ ব্যস্ত ছিল দুজনকে নিয়ে। পর্দায় যা প্রদর্শিত হচ্ছিল, তার তুলনায় চোখের সামনের অভিনয় অনেক বেশি উপাদেয় ছিল। দুজনের হাত ছিল দুজনের মুঠির মধ্যে, দুজনের আনন্দোদ্ভাসিত আনন্দের মধ্যে দূরত্ব ছিল সংক্ষিপ্ততম। দেবেশের তখনই মনে হ'ল, সত্যি, একা ছবি দেখার মত বিড়ম্বনা আর নেই। বিশেষ ক'রে যদি বাজে ছবি হয়, যেমন ছিল আগের সন্ধ্যার ছবিটা।

তাই আজকের টেলিফোন।

দেবেশ বললে, বিশেষ কিছু যখন করবার নেই, তখন তখন—অনেক ইতস্তত ক'রে, ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে শেষ করলে, তখন, কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা রুশ ছবি দেখে আমাকে সম্মানিত করবেন কি? আপনি নিশ্চয় এর আগে কোনও রুশ ছবি দেখেন নি, যেমন আমি দেখি নি।

না, দেখি নি। মালতী দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলে সহজেই, কিন্তু প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। দেবেশ চুপ ক'রে রইল, টেলিফোনটা কানের সঙ্গে চেপে ধ'রে।

কিন্তু···।—মালতী ভেবে পেলে না, কি বলবে। যা চাই, যখন তা দ্বারে এসে নাড়া দেয়, তখন কেন দ্বার খুলে দিতে পারি নে বিনা

দ্বিধায়? তখন কেন নানা চিন্তা নানা ভাবনা এসে ভিড় করে মনের মধ্যে? চাইবার আগে কেন মনে আসে না সে সব কথা?

কিন্তু···।—মালতী বিপদে পড়ল।

দেবেশ নিরতিশয় নিরাশ হ'ল। আহত হ'ল। বলল, অবিশ্যি আপনার যদি কোনো অসুবিধে বা আপত্তি থাকে, তা হ'লে জোর করব না। আপনাকে বিরক্ত করলেম ব'লে ক্ষমা করবেন। নমস্কার।

মালতীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দেবেশ খট ক'রে সজোরে টেলিফোন রেখে দিলে। সেই সঙ্গে মালতীকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললে সর্বকালের জন্যে। অন্তত দেবেশ তাই ভাবল। শোপেনহাওয়ারের রচনা-সঞ্চয়ন নিয়ে বসল। এখানে মতে না মিললে তা নিয়ে মনোমালিন্য হয় না। অনৈক্য এখানে মনকে মুষড়ে দেয় না, সতেজ করে। পড়াই ভাল। মালতী থাক তার আপন জগতে, কাজ নেই দেবেশের সেখানে প্রবেশ ভিক্ষা করবার। প্রয়োজনও নেই। দেবেশ জোর ক'রে হাত দিয়ে মালতীকে সরিয়ে দিল তার মন থেকে, হাত মিলাল শোপেনহাওয়ারের সঙ্গে। নারী-জাতির বুদ্ধিগত দৈন্য নিয়ে লেখকের তিক্ত উক্তিগুলিকে দেবেশের অত্যুক্তি ব'লে মনে হ'ল, কিন্তু সেগুলি পাঠ ক'রে তার সাম্প্রতিক নৈরাশ্য বহুলাংশে শান্ত হ'ল।

আর মালতী? টেলিফোন রেখে দেওয়ার উগ্র শব্দটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগল। প্রথমে সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সত্যি কি কেউ এমন অভদ্র হ'তে পারে? বিশেষ ক'রে দেবেশ? মালতীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। নিজেকে মনে হ'ল অপমানিত ব'লে। আর, এ অপমান মালতী তো যেচে নেয় নি। দেবেশ টেলিফোন করেছিল, মালতী নয়। তবে সে টেলিফোন রেখে দিল কোন অধিকারে? মালতীর একবার মনে হ'ল, তখনই সে আবার টেলিফোন ক'রে জিজ্ঞাসা করে দেবেশের এই অভদ্রতার অর্থ। আবার ভাবল, থাকগে, কি হবে জানতে চেয়ে? কাজ নেই অমন অভদ্রের সঙ্গে খামকা কথা বাড়িয়ে।

মালতী চেষ্টা করল অন্য দিকে মন দিতে। রুণুর শেষ চিঠিটার জবাব দেওয়া হয় নি। বসবে কি এখন তাই নিয়ে? ভাল লাগল না। তবে কি মামীমার ছেলের জন্যে ওই পুলোভারটা বুনে শেষ ক'রে ফেলবে? কাঁটা দুটো নিয়ে বসল, অমনই কোল থেকে গড়িয়ে প'ড়ে গেল উলের বলটা। সেটাকে তুলে নেবার ধৈর্য আর রইল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধে আছে দেবেশের অপমান, হাতের কাঁটা অচল হ'ল। সরিয়ে রাখল বুনবার সরঞ্জাম।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, দেবেশের দোষ নেই, সে টেলিফোন রাখে নি, টেলিফোন হঠাৎ কেটে দিয়েছে। টেলিফোনের মেয়েগুলি যা হয়েছে আজকাল, কিছুই বিশ্বাস নেই ওদের। হয়তো ওরাই কেটে দিয়েছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই।—মালতী নিজেকে বলল বারবার।

কিন্তু, মালতীর নিশ্চয়তা শিথিল হ'ল, সেই কেটে দেওয়া ঠিক দেবেশের 'নমস্কার' বলবার পরেই হবে, এটা কি একটু বিস্ময়কর নয়? না, এই অদ্ভুত সাদৃশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেবেশই টেলিফোন রেখে দিয়েছে। মালতীর অপমানাহত মন টেলিফোন-অপারেটরদের দোষ দিয়ে সান্ত্বনা পেল না।

কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছে মালতী? সে তো 'না' বলে নি। তবে কেন? মালতীর দেবেশকে দোষ দিতে ভাল লাগছিল না। সন্ধান করতে লাগল নিজের দোষ হয়েছে কি না। তার মনে হ'ল, 'না' সে বলে নি, সে কথা সত্যি; কিন্তু 'হ্যাঁ' তো বলে নি। পরদিন সন্ধ্যায় তার বিশেষ কোনও কাজ ছিল না, এ কথা মালতী নিজেই জানিয়েছিল দেবেশকে। অতএব, অসুবিধার প্রশ্ন অবান্তর। বাকি থাকে আপত্তি। সত্যি, মালতী যে বারবার 'কিন্তু' ব'লে ইতস্তত করেছে, তাইতে দেবেশ নিশ্চয়ই মনে করতে পারে যে, মালতীর আপত্তি আছে। আর তা হ'লে অপমানিত বোধ করবার কথা তো দেবেশের, মালতীর নয়। তারপরে যদি দেবেশ টেলিফোন রেখে দিয়ে থাকে—যদি অপারেটররা সত্যি কিছু না ক'রে থাকে—তার জন্যে দেবেশের দোষ কি? দোষ তো মালতীর। মালতী নিজেকে নিঃসংশয়ে বোঝাল

যে, দেবেশ তাকে অপমান করে নি, বরং সে-ই অক্ষমণীয় অভদ্রতা করেছে।

তবে কি টেলিফোন করবে আবার? মালতী মন স্থির করতে পারল না। আচ্ছা, যদি টেলিফোন কেটে গিয়ে থাকত তা হ'লে দেবেশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে আবার ডাকত মালতীকে। কই, ডাকে নি তো! না, অপারেটরদের অপরাধ নেই। অপরাধের সবটাই মালতীর। এখন টেলিফোন করবার কথা তারই। করল।

হ্যালো!

দেবেশ বই থেকে চোখ তুলে সাড়া দিল। শোপেনহাওয়ারকে সরিয়ে দিয়ে বার বার তার মনে এই আশা জাগছিল যে, হয়তো মালতী তার অসৌজন্য ক্ষমা করবে, হয়তো সে আবার টেলিফোন করবে। করা উচিত তার নিজেরই। কিন্তু পৌরুষে বাধল যেন। অন্যায়ের স্বীকারে অপৌরুষ নেই, এই কথাটা নিজেকে বোঝাতে যাবার আগেই টেলিফোন বাজল।

হ্যালো!

মালতীর স্বর শোনা মাত্র দেবেশের ক্ষমা চাইবার সব চিন্তা মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল। শোপেনহাওয়ারের সহায়তায় যে নৈরাশ্য বিরক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তারই সুর ছিল তার উত্তরে। বলল, হ্যালো?

মালতী বলল, তখন হঠাৎ অমন ক'রে টেলিফোন রেখে দিলেন যে?

দেবেশের একটা দুর্বলতা ভাল কথা বলবার; আর একটা চতুর কথা বলবার। দুটোর সমন্বয় সম্ভব হ'লে ভাল, কিন্তু একটাকে বেছে নিতে হ'লে চতুরতার উপরই তার পক্ষপাত। মালতীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, ভারত-সরকারের টেলিফোন বিভাগের যে নির্দেশ আছে—বি ব্রীফ্ অন দি টেলিফোন—তার জন্যে রেখে দিই নি।

মালতীর এই উত্তরটা ভালও লাগল না। উষ্মা গোপন ক'রে বলল, এটা তো নেগেটিভ কারণ হ'ল। আসল কারণটা কি? কি অপরাধ করলেম আমি?

অপরাধের উল্লেখেই দেবেশের সকল তিক্ততা, সকল কঠোরতা দ্রবীভূত হয়ে গেল। অপরাধ যে তার নিজের! নিতান্ত বিব্রত হয়ে বলল, না, না, আপনার অপরাধ কোথায়? অপরাধ তো আমার।

এই পর্যন্ত এসেও দেবেশ স্বীকার করতে পারল না যে, খট ক'রে টেলিফোন রেখে দেওয়াটা অভদ্রতা হয়েছে। বলল, অপরাধ তো আমার যে আপনাকে টেলিফোন ক'রে অন্যায় অনুরোধ ক'রে বিরক্ত করেছি।

পূর্বেকার রূঢ়তার পরে এমন অপ্রত্যাশিত বিনয়ে মালতী বিস্মিত হ'ল। বলল, বিরক্ত মোটেই করেন নি। আমার টেলিফোন-নম্বর আমিই আপনাকে দিয়েছিলেম, নইলে টেলিফোন করবার কথা মনেও আসত না আপনার।

তা হ'লেও আপনাকে এমন অনুরোধ তো করেছি, যা আপনি রাখতে অনিচ্ছুক। সেটা তো অপরাধ।

অনিচ্ছা আর অক্ষমতা বুঝি আপনার কাছে সমার্থক?

না, তবে—

থাক, আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই। কোন ঘরে কি ছবি বলুন। কোথায়, কখন দেখা করব?

আপনার উপর অন্যায় জোর করা হচ্ছে—

টেলিফোন রেখে দেওয়ার সময় বুঝি মনে ছিল না অন্যায়ের কথা? বলুন, কোথায় আর কখন।—মালতী অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটার দ্রুততম সমাপ্তি ঘটাতে চাইল।

কিন্তু আপনি যে আপত্তি—

মালতী দেবেশের কথা শেষ হতে দিল না। বলল, আপত্তি নয়, ইতস্তত। এবং তা কেন করছিলেম তা যখন এখনও বোঝেন নি, আর বুঝে কাজ নেই। বলুন, কোথায় এবং কখন।

দেবেশ বলল। টেলিফোন রেখে দিয়ে গবেষণা করতে বসল মালতীর মৌলিক আপত্তির উৎপত্তি নিয়ে। ভেবে পেল না কিছু। অচিরেই আদি আপত্তির নৈরাশ্য নিমজ্জিত হ'ল পরবর্তী স্বীকৃতির আনন্দের সাগরে। সেই সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হ'ল শোপেনহাওয়ার। মনে

আর কানে বাজতে থাকল মালতীর কণ্ঠের সুর। সে সুরে ঝর্নার গতি আছে, আছে সরোবরের স্থিতি। দেবেশ চোখ মুদে অবগাহন করল সেই সরোবরে, ভেসে চলল সেই ঝর্নার সঙ্গে।

দেবেশ মালতীকে সোজা সিনেমায় যেতে বলেছিল। ভেবেছিল, নিজেও আপিস থেকে সোজা যাবে। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেল ছটার অনেক আগে। তাই বাড়ি ফিরল পাঁচটার কাছাকাছি।

মাকেও বলা ছিল যে, দেবেশ সন্ধ্যায় ছবি দেখতে যাবে। তাই ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে মা বললেন, কি রে দেবু, তোর না ছবিতে যাবার কথা?

এই একটু বাদেই বেরুব।

এই দিকেই কোথাও ছবি দেখবি বুঝি? না কি আবার এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে হবে?

না মা, এই দিকেই।—দেবেশ আর কিছু বলল না। বলার প্রয়োজন ছিল না। মা কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নি। কিন্তু দেবেশের অভ্যাস মাকে সব কথা বলা, কি ছবি, কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, ইত্যাদি সব কিছু। আজও দেবেশ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন থেমে গেল। মাও কিছু না ব'লে চা আনতে গেলেন দেবেশ হাত ধুতে গেল।

খাবার কিছু খেল না দেবেশ। চা-পানেও অত্যধিক ত্বরা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিকেই যখন যাচ্ছিস, তখন এত তাড়া কেন? সময় আছে বেশ।

দেবেশ আবার বিব্রত বোধ করল। কিন্তু কিছু বলল না। চা-টা শেষ ক'রে কোটটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, আসি মা।

সিনেমায় যখন পৌঁছল, তখন ছটা বাজতে অন্তত পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি। বিদেশী ছবি। ভিড় নেই বেশি। রাশিয়া বলতে যারা—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—ইগ্‌নোর‍্যান্ট, তারা আগেই ছবিটা দেখেছে। বাকি কারও বিশেষ কৌতূহল নেই বিদেশী পুরানো ছবি

নিয়ে। দেবেশ তাই সিনেমার বাইরে দাঁড়িয়েছিল প্রায় একা। একা থাকলেই, বিশেষ ক'রে কারও জন্তে অপেক্ষা করতে হ'লে, সময় চলে অসহ্য ধীর গতিতে। সামনের ঘড়িটার কুঁড়েমি যন্ত্রণা দেয়। মনে হয়, যেন ঘড়িটার হাতগুলির পায়ে বাত হয়েছে!

ঘড়ির হাতের পায়ে বাত! অতি-আধুনিক গদ্য কবিতা থেকে উদ্ধৃত উৎকট একটা লাইন যেন! দেবেশের হাসি পেল। টিকিট কিনে এনে আবার যখন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘড়ির দিকে তাকাল, তখন আর গদ্য কবিতার কৌতুক রইল না। মালতীর দেরিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সিনেমার সামনে প্রত্যেকটা ট্রাম এসে থামছে, আর দেবেশ খুঁজছে তার আকাঙ্ক্ষিত যাত্রীকে। অথচ মালতীর দেখা নেই। তবে কি মালতী আসবে না? দেবেশের মন দ'মে গেল এমন সম্ভাবনার কথা ভাবতেই। না, আসবে নিশ্চয়ই—দেবেশ নিজকে বলতে থাকল ট্রামের দিকে আর না তাকিয়ে।

হঠাৎ পিছন থেকে মালতী বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না?

মালতীর মধুর হাসিতে দেবেশের সকল বিরক্তি মুহূর্তে অপনীত হ'ল, বলল, তেমন বেশি নয়, কিন্তু দেরি করলেন কেন?

বা রে, দেরি কোথায়? এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি!

তা অবিশ্যি। চলুন।

দুজনে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ ক'রে আসন গ্রহণ করবার অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো নিবল এবং ছবি শুরু হ'ল। দেবেশ মন দিল পর্দায়। মালতী চেয়ারের বাঁ দিকে ব্যাগটা রাখতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারে ভাল দেখতে না পাওয়ায় তার হাতটা চ'লে এসেছিল দেবেশের চেয়ারে। দেবেশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে তার আসনের অন্তিম বামে এমন আড়ষ্ট হয়ে বসল, যা মালতীর ভাল লাগল না। যাই হোক, দু'জনে ছবি দেখতে থাকল।

দেবেশের একা ছবি দেখে অভ্যাস। তার নিয়তই চেষ্টা ক'রে মনে রাখতে হচ্ছিল যে, আজ সে একা আসে নি। কিন্তু সবাক চিত্র দেখতে গিয়ে কথা বলতে দ্বিধা করছিল। হয়তো মালতী বিরক্ত

হবে। হয়তো তার ছবি দেখায় ব্যাঘাত ঘটবে। দেবেশ ছবি দেখতে গেলে ছবিই দেখে, ছবিঘরটা তার কাছে অন্তরঙ্গতাবর্ধনের পটভূমি নয়। কেউ কথা বললে দেবেশ বিরক্ত হয়। আজ কি সে তাই করবে? কিন্তু পুরানা নিউজ রীল দেখতে ভাল লাগছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল, আস্তে আস্তে মালতীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলবার। অনিচ্ছায় এবং চেষ্টা ক'রে দেবেশকে নীরব থাকতে হ'ল।

মালতী প্রচুর ছবি দেখে; বেশির ভাগই সরোজের সঙ্গে। দুজনের কাছেই ছবিটা উপলক্ষ্য মাত্র, একান্ত গৌণ। মালতীর উদ্দেশ্য সময় কাটানো, সরোজের বাসনা মালতীর কাজে আসা। ওরা তাই ছবিতে গেলেই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে না, অনেক কথা বলে, বিশেষ ক'রে মূল ছবি শুরু হবার আগে পর্যন্ত। মালতী তাই অস্বস্তি বোধ করছিল চুপ ক'রে থেকে। বলল, আমার আর একটু দেরি হ'লেই আপনি বুঝি চ'লে যেতেন, যেমন সেদিন টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন?

দেবেশ সেদিনের অসৌজন্যের কথা স্মরণ ক'রে আবার লজ্জিত হ'ল, বলল, সেদিনের কথা মনে করিয়ে লজ্জা দেবেন না। অন্য সময় হয়তো পারব না, এখন এই অন্ধকারে আপনার কাছে কবুল ক'রে ফেলি, সেদিন টেলিফোন রেখে দিয়ে নিজেকে কতবার ধিক্কার দিয়েছি আপনি জানেন না।

তা হ'লে তো আবার টেলিফোন করতে পারতেন! সেই টেলিফোন আবার আমাকেই করতে হ'ল। লজ্জা বুঝি কেবলই আপনার, না?

দু'জনেই অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলছিল, যাতে প্রতিবেশী চিত্রামোদীদের অসুবিধা না হয়। আস্তে কথা বললে দেবেশের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে অসাধারণ গম্ভীর শোনায়। মালতীর তা ভাল লাগে। আর মালতীর কপটক্রুদ্ধ অভিযোগ দেবেশের কানে সুধাবর্ষণ করে।

মালতীর মনে একটা সন্দেহ ছিল। সে জানত না, দেবেশ তার মাকে আজকের একত্রে ছবি দেখার কথা বলেছে কি না। লুকিয়ে

কোনও কাজ করতে মালতীর বাধে। কিন্তু মাসীমা জানলে মালতীর সম্বন্ধে কি ভাববেন, তা নিয়েও তার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। বিরামের সময় আলো জ্বললে মালতী জিজ্ঞাসা করল, সোজা আপিস থেকে এসেছেন ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

না, বাড়ি হয়ে এসেছি।

তবে কি মাসীমা জানেন? মালতী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা না ক'রে পারল না। বলল, মাসীমাকে কি বলেছেন যে, আমিও ছবিতে আসছি।

না তো! মা জিজ্ঞাসা করেন নি তো।—দেবেশ যতটা নিশ্চিন্ত স্বরে বলল, ঠিক ততটা নিশ্চিন্ত বোধ করল না বোধ হয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বলল, আজ আপনার কটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে?

এই ছবি শেষ হ'লে যাব। মারাত্মক তাড়া নেই কোনও।

দেবেশ আর কিছু বলতে পারার আগেই ছবি শুরু হ'ল এবং আবার সবাই তাকাল পর্দার দিকে।

ছবিটা সম্বন্ধে দেবেশ পড়েছিল অনেক আগে। প্রাক্-সোভিয়েট আমলের অনাথ বালকদের নিয়ে নতুন রাষ্ট্র কি রকমের নতুন নাগরিক নির্মাণ করেছে, ছবিটা তারই প্রচার-ইতিহাস। চিত্রে প্রচারের ইঙ্গিত পেলেই দেবেশ সন্দেহী হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে সে ছবি যদি নীতির প্রচার না হয়ে বিশেষ রাষ্ট্রের প্রচার হয়। কিন্তু দেবেশ বার বার নিজকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, চিত্রের বক্তব্যের বিষয় যেন তার চিত্রের বিচারকে প্রভাবিত না করে। চিত্রনির্মাতার বক্তব্যকে গ্রহণ ক'রে নিয়ে তারপরে তাকে চিত্রের গুণাগুণ বিচার করতে হবে—এই নাকি আলোচনার মান। এই মানটা পুরোপুরি মানে না দেবেশ। মালতীর বুদ্ধি সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা হয়েছিল প্রথম দিনেই, ভাবল, ছবির শেষে একবার এই নিয়ে আলোচনা করবে মালতীর সঙ্গে।

দেবেশের বেতার-বক্তৃতা সম্বন্ধে তার অনুরাগীরাও একটা মৃদু অভিযোগ এই ক'রে থাকে যে, তার সব আলোচনায় আমি-টা নাকি বড় বেশি প্রকট। আলোচক নাকি অনেক ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তুকে অতিক্রম ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে। এই মৃদু

অভিযোগের প্রবল প্রতিবাদ করে দেবেশ। সে বলে, পরিপূর্ণ বিষয়মুখীন আলোচনা ব'লে একটা ফাঁকি আছে, কোনও বস্তু নেই। থেকে থাকলেও তা নিম্নস্তরের। তার মতে আলোচনা হচ্ছে আলোচকের বিদগ্ধ মনে আলোচ্য বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিফলনের সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ প্রকাশ। আলোচনা নয় তবলা-বাজানোর মত অপর শিল্পীর সহায়তা করা, আলোচনা আপন অধিকারে নিজেই শিল্প। দেবেশ আলোচনা-শিল্পী। তার কাজ আপন মত ব্যক্ত করা, পরের মতের গ্যালপ্ পোল্ রাখা নয়।

আজ কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে দেবেশ মনে মনে স্থির করল মালতীর মতের খোঁজ নিতে। সে মত সে নিজে গ্রহণ না করলেও রেডিওতে তাই ব'লে মালতীকে উপহার দেবে। মালতী খুশি হবে, এই কথাটা ভেবেই দেবেশ খুশি হ'ল।

ছবি দেখতে দেখতে দেবেশের অনেক কথা মনে হ'ল। কিন্তু বলা স্থগিত রাখল ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। মালতী ছবি দেখছিল মন দিয়ে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্তেও বিস্মৃত হয় নি দেবেশের সান্নিধ্যের কথা। এত কাছে বসে নি কখনও এর আগে। মাঝে মাঝে মালতী দেখছিল দেবেশের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তবু ভাল লাগছিল তাকাতে। দেবেশ যে কাছে আছে, এইটেই ভাল লাগছিল, দেখা না গেলেও।

একবার হঠাৎ কি ক'রে যেন মালতীর মনে হ'ল যে, দেবেশ কিছু বলছে। শুনতে না পেয়ে, অজ্ঞাতসারে, একেবারে কিছু না ভেবে, মালতী তার মাথা এগিয়ে বলল, কি?

দেবেশ কিছু বলে নি। হঠাৎ মালতীর চুলের মৃদু স্পর্শে চমকে উঠে সে তৎক্ষণাৎ নিজের মাথা সরিয়ে নিল। বলল, কই, কিছু বলি নি তো!

আবার দুজনে ছবি দেখতে থাকল। দেবেশ ছবিটাকে বিচার করছিল একাধিক দিক থেকে। চলচ্চিত্রের টেকনিকের দিক থেকে Road to Life-এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। অনেক বিষয়ে চিত্রটি পথিকৃৎ ব'লে গৌরব করতে পারে। কিন্তু কোন মান দিয়ে

তার বিচার হবে? সৃষ্টির কালের, না আজকালের? সে কেমন আর্ট, যা আপন কালকে অতিক্রম করতে পারল না? সে কেমন সৃষ্টি, যার আবেদন পঞ্জিকার দাসত্বে সীমাবদ্ধ? দেবেশের চিন্তা এমনই নানা প্রশ্নে জর্জরিত হ'ল। পার্শ্ববর্তিনীর কথা তখন মনেই ছিল না।

মালতীর তখন চোখ ছিল পর্দার উপর, কিন্তু মন ছিল গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। ক্ষুদ্র ব্যাপার। দেবেশ হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—কিছু না ভেবেই তার মাথা সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মালতীর মন সে চিন্তায় সান্ত্বনা পেল না। কেবলই মনে হতে থাকল যে, দেবেশ তাকে অবহেলা করেছে, অপমান করেছে। মালতী ইচ্ছা ক'রে দেবেশের কাছে যায় নি, মাথা এগিয়ে নেয় নি স্পর্শের অভিসন্ধি নিয়ে—এমন কথা মালতী কল্পনাও করতে পারে না—কিন্তু তবু, তবু, দেবেশের নির্বিকার ঔদাসীন্য মালতীকে ব্যথা দিল। হোক দৈবাৎ, হোক অনিচ্ছাকৃত, মালতীর কেশের স্পর্শ কি এমনই অপ্রীতিকর একটা শিহরণ দেয় যে, দেবেশের অমন অশোভন ত্রস্ততায় স'রে না গিয়ে উপায় ছিল না?

মালতীর আর ছবি দেখবার উৎসাহ ছিল না। শেষ হ'লে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু আলো জ্ব'লে উঠতেই দেবেশ এমন আনন্দিত হাসির সঙ্গে মালতীর দিকে তাকাল যে, মালতীর অস্বস্তির অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। তারপরে দেবেশ যখন ট্রাম-লাইনের কাছে এসে বলল, অনুমতি করেন তো আপনাকে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি পৌঁছে দেব, মালতী তখন আবার খুশি হ'ল।

মালতী ট্যাক্সিতে আগে উঠে এক কোণে গিয়ে বসল। দেবেশ পরে উঠে বসল আর এক কোণে। মাঝের দূরত্বটা মালতীর ভাল লাগল না, কিন্তু কিছু বলল না মালতী।

কথা শুরু করল দেবেশই।—এবারে বলুন, ছবিটা আপনার কেমন লাগল।

আপনার কেমন লাগল, বলুন।—মালতী আগে তার মত প্রকাশ

করতে সংকোচ বোধ করল, যদি সে মত দেবেশের মতের সঙ্গে না মেলে!

দেবেশ বলল, আপনাকে আগে জিজ্ঞেস করেছি আমি।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। দেবেশ এবারে হাসতে হাসতে তার সংকল্পের কথা নিবেদন করল, জানেন, আমার সম্বন্ধে একটা অভিযোগ হচ্ছে এই যে, আমি নাকি কেবল আমার নিজের মত জাহির করি। এবারে তাই স্থির করেছি যে, আপনার মতই বলব পরশুর বক্তৃতায়।

মালতী জানত না যে, দেবেশ ছবি দেখতে গিয়েছিল বেতার-বক্তৃতার প্রয়োজনে। কথাটা শুনে ভাল লাগল না। দেবেশের নিমন্ত্রণে মালতী সাড়া দিয়েছিল এই ধারণা নিয়েই যে, ছবিতে যাবার একমাত্র লক্ষ্য উভয়ের সাথীত্ব। আসলে দেবেশ যে মালতী না এলেও এই ছবিটা দেখতে আসত, মালতী না হ'লেও চলত, সে যে উপরি মাত্র, এই কথাটা মালতীর আনন্দের আরও অনেকখানি নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিল। দেবেশের কাছে আপন অপ্রয়োজনীয়তার চিন্তা মালতীকে আঘাত করল।

মনের দ্বন্দ্ব গোপন ক'রে মালতী বলল, আমরা ছবি দেখি ছবি দেখার জন্যেই। আমার মতের আবার মূল্য কি? ভাল লাগলে বলি ভাল, মন্দ লাগলে মন্দ। কোনটারই কারণ ভেবে দেখি নে।

এখন দেখুন। অন্তত আমি অনুরোধ করছি ব'লে।

সিনেমা থেকে মালতীর বাড়ি দূরে নয়। দেবেশের প্রস্তাবিত আলোচনা শুরু হবার আগেই ট্যাক্সি প্রায় বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। মালতীর পক্ষে সেইটেই হ'ত ভাল। কিন্তু তার মনে অন্যান্য আশঙ্কা ছিল। একেবারে বাড়ির সামনে দেবেশের ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে কেউ দেখে ফেললে তখন? প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীদের কথা বাদ দিলেও, বাড়িরই কেউ যদি দেখে ফেলে, তা হ'লে মালতী বলবে কি? কি অজুহাত দেবে? দিলেও কে তা বিশ্বাস করবে? কেউ না। মালতী তাই বাড়ির কাছের মোড়ের

ধারে আসতেই ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলল। দেবেশকে বলল, আসুন, এইখানে নেমে পড়া যাক।

দেবেশ এই অনুরোধে বিসদৃশ কিছু দেখল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পেভ্‌মেণ্টে দাঁড়িয়ে আলোচনার পুনরারম্ভ করল। বলল, কই, ছবি কেমন লাগল, তা তো বললেন না!

মালতী ছবি নিয়ে এত ভাবে না। বিশ্লেষণ করে না। ভাববার সময় নেবার জন্তেই বলল, কোন কোন জায়গায় ভাল আছে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে—

দেবেশ মালতীকে তার কথা শেষ করতে দিল না। পরমোৎসাহে বাধা দিয়ে বলল, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলেম। যখনই ছবিটা ছবি হিসেবে ভাল হতে যাচ্ছিল, অমনই যেন প্রচার এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, ছবিটা গৌণ, বক্তব্যটাই মুখ্য। ছবি করবার জন্তেই ছবি করবে বুর্জোয়ারা। আমাদের উদ্দেশ্য মন-ভোলানো নয়। আমাদের উদ্দেশ্য—

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা লোক বক্তৃতা করছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে একটি মহিলা,—দৃশ্যটা বহু কৌতূহলী পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেবেশের সেদিকে অল্পই খেয়াল ছিল, এমন কি এটাও তার লক্ষ্যে আসে নি যে মালতী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। এদিকে মালতীর তখনই বাড়ি যাবারও ইচ্ছা ছিল না। দেবেশের বক্তৃতায় সহাস্যে বাধা দিয়ে বলল, চলুন, ওই পার্কটায় গিয়ে ব'সে কথাটা শেষ করা যাক।

দুজনে পার্কে গেল। বেঞ্চিতে বসতে দুজনেরই আপত্তি। তাই গিয়ে বসল একটা গাছের তলায়। মালতী গাছে হেলান দিয়ে বসল, দেবেশ তার মুখোমুখি। আলোচনায় ছেদ পড়ায় দেবেশ তখনই আবার ছবির কথা শুরু করতে পারল না। দুজনেই চুপ ক'রে রইল। অন্ধকারে কেউ কাউকে ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছিল না। দেখবার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কথারও না। দুজনে যে বসেছে, এইটেই বুঝি দুজনের কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে দেবেশের ক্লান্ত বোধ হ'ল। সে হেলান দিয়ে

অর্ধশায়িত অবস্থায় ডান হাতটাকে ভাঁজ ক'রে তার উপর মাথা রাখল। কিন্তু দূরত্বটা রইল সমান। মালতী একবার তার ব্যাগটা দিতে চাইল দেবেশের শিরস্থাপনের জন্যে। কিন্তু দেবেশ তা নিল না। মালতী আবার আহত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল ব্যাগ দিতে চাইবার জন্যে।

দূরের একটা দোকানের বিজলী-ঘড়িতে নটা বাজতে দেখে মালতী উঠল। বলল, দেবেশের আর এগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, বাকি পথটুকু সে একাই যেতে পারবে।

দেবেশ মালতীকে মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে রাশিয়ার অনাথ-সমস্যার অতি-সহজ সমাধানের অপর্যাপ্ততার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল। মনে মনে লেখা হয়ে গেল বক্তৃতার অনেকখানি।

মালতীর সন্ধ্যাটা সব মিলিয়ে মন্দ লাগে নি। কিন্তু সেই মৃদু ভাল লাগার অন্তরালে অবিশ্রাম ধ্বনিত হচ্ছিল কি একটা অনির্দিষ্ট আশার অনির্দেশ্য ব্যর্থতার করুণ সুর। সেই ব্যর্থতা যেন তার মালতীত্বের পরাজয়। এ পরাজয় মেনে নেবার মেয়ে মালতী নয়। ধীর পদে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মালতী আপন মনে দুর্জয় দৃঢ়তার সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকল, **Nathaniel, I will teach you fervour. Nathaniel, I will teach you fervour.** তুমি আমাকে জাগিয়েছ, আমি তোমাকে ঘুমোতে দেব না।

ক্রমশ

"রঞ্জন"

দধীচির আত্মদানে

দধীচির আত্মদানে সকলেই হ'ল লাভবান,
দৈত্যেরা উদ্ধার পেল ; স্বর্গ পেল সঙ্কটেতে ত্রাণ ;
মুখরেরা বিদ্রূপের বস্তু পেল পর্বত-প্রমাণ—
কবিকুল হৃষ্ট অতি,—ছন্দে সুরে রচিবেন গান,
সবচেয়ে শান্তি পেল পেটরোগা দধীচির প্রাণ॥

অসিতকুমার

কোটি

অবশেষে কর্মজীবন হইতে অবসর লইলেন হরিপ্রসাদ। যে সমস্ত কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন তিনি, সকলেই বিদায়-সভা করিয়া আশ্বাস দিল যে, তিনি ছাড়িলেও তাহারা ছাড়িবে না। তাঁহার অমূল্য উপদেশ এবং পরামর্শ হইতে কোন দিনই যেন বঞ্চিত না হয়— ভগবানের কাছে এই তাহাদের প্রার্থনা।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরিলেন হরিপ্রসাদ। বার্ধক্যের উপর মানুষের কোন হাত নাই। নহিলে মানুষের উপর হরিপ্রসাদের হাত ছিল।

সকালবেলায় প্রাতভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আগে খোঁজ করেন, কেউ এসেছিল? ছোট মেয়ে লাবণ্য বলে, এসেছিল। আবার আসবে ব'লে গেছে।

কজন?

চার জন।

হরিপ্রসাদ প্রসন্ন হইয়া জলযোগ অন্তে অপেক্ষা করেন। লোক-জন অনেক আসে। অনেক পরামর্শ এবং উপদেশ লইয়া যায়।

কেহ না আসিলে ভ্রূকুঞ্চিত করেন।

কিন্তু আসে। অনুগ্রহ-প্রার্থী, চাঁদা-প্রার্থী, পরামর্শ-প্রার্থীরা অনবরতই আসে। তৃতীয় বস্তুটা হরিপ্রসাদ মুক্ত হস্তে দিয়া দেন। অনুগ্রহ আর চাঁদার ব্যাপারে কিছু গড়িমসি করেন।

কাল এস। দেখব।—অনুগ্রহ-প্রার্থীকে বলেন।

পরশু এস।—চাঁদা-প্রার্থীকে বলেন। টাকা নেই হাতে।

পরশু দিন আসিতে বিলম্ব হয় না।

ও-হো! ভুলেই গেছলুম।—বলেন। রেখেওছিলুম। খরচ হয়ে গেল।

পরের দিন আর বিমুখ করেন না। চাঁদার পরিমাণকে চার দিয়া ভাগ দিয়া ভাগফল দিয়া দেন। এটা হরিপ্রসাদের জীবনের একটা মূলসূত্র। কখনও ভঙ্গ করেন নাই।

টাকা পয়সা এখন আর নিজের হাতে বড় নাড়াচাড়া করেন না।

সংসারের খরচের টাকা স্ত্রীর হাতে থাকে, গোমস্তা নীলমণি খরচ করে। বাহিরের লেন-দেন ব্যাঙ্কের চেক কাটিয়া করেন।

আসল টাকার চেহারা প্রায় ভুলিয়া আসিতেছেন।

কারণ হরিপ্রসাদের আসল টাকা কোম্পানির ডিভিডেণ্ড আসে চেকে। নীলমণি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসে।

বৎসরান্তে মোট জমার পরিমাণটা হিসাব করেন নিজে। সন্তোষজনক হইলে মনে মনে হাসেন। বৎসর কয়েক বরাবরই হাসিতেছেন।

কিন্তু ধমকাইতে ছাড়েন না।

ব্যাপার কি তোমাদের? এবারকার বাজারেও মোটে পঁচাত্তর পার্সেণ্ট?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লজ্জিত হইয়া নিবেদন করেন, নতুন মেসিনারি কিছু কিনতে হ'ল, ফ্যাক্টরি বাড়াতে হ'ল। এসব করতে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল কিনা!

না না। ভাল কথা নয়।—হরিপ্রসাদ গম্ভীর সুরে বলেন। যতই খরচ হোক, তা ব'লে পঁচাত্তর পার্সেণ্ট? না না। ভাল কথা নয়। একটু নজর রেখো।

একা হরিপ্রসাদ এই কোম্পানির এক-তৃতীয়াংশ শেয়ারের মালিক। ম্যানেজিং ডিরেক্টর নজর রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া যান।

দেড় লক্ষ টাকার চেক একখানা সময়মত আসিয়া পড়িল। এপিঠ ওপিঠ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া নীলমণিকে চেকখানা দিয়া দিলেন। বলিলেন, জমা দিয়ে এস।

নীলমণি জমা দিয়া আসে। বছরের দিন কতক উপর্যুপরি বিভিন্ন অঙ্কের চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিতে নীলমণি সিদ্ধহস্ত।

অপুত্রক হরিপ্রসাদের সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ছোট মেয়ে লাবণ্যর বিবাহ। দুই বছর কলেজে পড়িয়া বসিয়া আছে লাবণ্য। বিবাহের বয়স হইয়াছে।

সম্বন্ধ অনেক আসে। লাবণ্য নিজে ভাঙিয়া দেয়। গোঁ ধরিয়াছে, বিবাহ করিবে না। কেন করিবে না হঠাৎ একদিন বলিয়া বসিল।

বাবা, আমাদের একটা এরোপ্লেন কেনো।

এরোপ্লেন! হরিপ্রসাদ অবাক হইলেন। এরোপ্লেন কি হবে?

পৃথিবী ঘুরে বেড়াব।

কি?—হরিপ্রসাদ ধমক দিলেন। বলে কি পাগলের মত! যাও, ভেতরে যাও। পাগলামি করে না। যাও।

আর কালবিলম্ব না করিয়া লাবণ্যর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। বড় বোন শেফালি লাবণ্যকে কহিল, এইবার পৃথিবী নয়, ত্রিভুবন দেখবি।

আগের দিন পালিয়ে যাব আমি।—লাবণ্য বলিল, ত্রিভুবন তোমরাই দেখগে।

অতবড় বড়লোকের ছোট মেয়ের বিবাহ। অজস্র অর্থব্যয় হইবে স্বতঃসিদ্ধ কথা। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, এবার কিছু খসবে বুড়োর।

সমুদ্র থেকে এক ঝিনুক জল তুলে নিলে যা হয়।—একজন বলিল। ফিক্সড্ ডিপোজিটে আছে কত জান?

বাট লক্ষ জমেছে শুনেছি।

কচু শুনেছ। এক কোটি পার হয়ে গেছে দু বছর আগে।

এক—কো-টি! এত টাকা দিয়ে কি করবে বুড়ো?

ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে তো! টাকা দিয়ে আবার করে কি লোকে?

তা হ'লে তিন চার লাখ টাকা বছরে সুদই পায়?

বেশি ছাড়া কম নয়।

ঈস্‌স্!

হরিপ্রসাদের অনুগ্রহভাজন কোম্পানির ডিরেক্টরেরা আসিয়া দেখা করিল। হরিপ্রসাদ বলিলেন, লাবণ্যর বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনেছ বোধ করি? ছেলেটা ভাল। অবশ্য টাকাটা কিছু বেশি লাগছে।

শুনিয়াছে। একজন প্রস্তাব করিল, আপনাকে একবার কিন্তু আমাদের বাগান পরিদর্শন করতে হবে। আমাদের সকলেরই অনুরোধ একবার গিয়ে উপদেশ দিয়ে আসবেন।

আর একজন তাহাদের মিল পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। পর পর গোটা দশেক পরিদর্শনের অনুরোধ আসিল।

হরিপ্রসাদ এই বৃদ্ধ বয়সেও সকলেরই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে দূর হইতেও দেওয়া চলে। পর পর গোটা দশেক চেক অবাধে আসিয়া পড়িল।

নীলমণি বলিল, জমা দিয়ে আসব?

হরিপ্রসাদ বলিলেন, না। এগুলো খরচ হবে।

কিন্তু এই দশখানা বাদেও কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে কিছু চেক হরিপ্রসাদকে কাটিতে হইল।

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। হরিপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হইলেন। লাবণ্য চলিয়া গেল, কিন্তু শেফালী রহিয়া গেল। হরিপ্রসাদ নাতিদের লইয়া লাবণ্যর অভাব ভুলিতে চেষ্টা করিলেন।

বড় নাতি একদিন জিজ্ঞাসা করিল, দাদু, তুমি এই শহরটা কিনে ফেলতে পার?

হরিপ্রসাদ মিটিমিটি হাসিতে লাগিলেন।

বল না? পার?

হরিপ্রসাদ মনে মনে বলিলেন, তা পারি বোধ হয়। মুখে বলিলেন, কিন্তু বেচবে কে দাদু?

না বেচুক।—নাতি অধীর হইয়া উঠিল।—পার তো?

নীলমণি জবাব দিল।—মায় মানুষ সুদ্ধু কিনতে পারেন।

হরিপ্রসাদ হাসিতেই লাগিলেন। গ্যাঁট ভাব।

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আবার ডিভিডেণ্ডের চেক আসিতে এবং জমা হইতে লাগিল। মোট জমার পরিমাণটা হিসাব করিয়া হরিপ্রসাদ খুশি হইয়া উঠিলেন।

স্ত্রীকে ডাকিয়া আদর করিয়া কাছে বসাইলেন।—একটু ব'স। তুমি আর আমার কাছে এখন আসই না।

স্ত্রী নয়নমণি এদিক ওদিক তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, এখনও কি আগের মতই আসতে বল?

বৃদ্ধ হরিপ্রসাদ বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, এলেই বা!

এই তো এলুম, বল এখন, কি হবে?

শোন। একটা খবর আছে।—হরিপ্রসাদ হাসিমুখে কাজের কথায় আসিলেন।—আজ আমার দেড় কোটি পুরল। পঞ্চাশ বছর আগে যখন প্রথম আসি এখানে, দেড় টাকা ছিল আমার।

নয়নমণি আনন্দে উঠিয়া পড়িলেন।—ওদের বলিগে। ওরাও আনন্দ করুক।

বলবে? আচ্ছা, বল।

নয়নমণি কন্যাদের কাছে বলিলেন। কন্যারা জামাতাদের কাছে বলিল। জামাইরা বলিলেন, তবে আর কি! তোমরা বহু টাকার মালিক হবে।

কন্যারা বলিল, আমাদের মালিক আবার যে তোমরা।

এসব আনন্দের বাদ-প্রতিবাদে দেড় কোটি অঙ্কটা নড়চড় হইবে না—এ সত্যটা সকলেরই মনে জাগিয়া রহিল।

হরিপ্রসাদের বার্ধক্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন আর প্রাতর্ভ্রমণ করিতে দূরে যাইতে পারেন না। বাড়িতেই উঠানে একটু পায়চারি করেন। একটা চাকর একখানা চেয়ার মাথায় করিয়া সঙ্গে থাকে। যখনই বসিতে ইচ্ছা করিবেন, মুহূর্ত বিলম্ব হইবে না, বসিবেন।

ডাক্তারদের নিষেধে বাহিরের লোকের আনাগোনা কম হইয়াছে। কোন গুরুতর পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাকে আর ব্যস্ত করা চলিবে না। অনুগ্রহ এবং চাঁদা প্রার্থীরাও সোজাসুজি সাক্ষাতের অনুমতি পায় না।

সহজ হালকা কথা বলিবার লোক সঙ্গে থাকা প্রয়োজন এবং থাকে।

নাতিরা মাঝে মাঝে আসে কাছে। অদ্ভুত রকমের এক-একটা সমস্যা লইয়া আসে। একজন একদিন আসিয়া হঠাৎ প্রস্তাব দিল, দাদু! তোমার টাকা তো সব ব্যাঙ্কে থাকে?

টাকা সম্বন্ধে আলাপ করিতে হরিপ্রসাদের কোন আলস্য নাই, বলিলেন, তাই তো থাকে। কেন বল তো দাদু?

আমি দেখতে যাব।—নাতি আবদার ধরিল।—চল না। কত টাকা —দেখব আমি। চল না।

পাগল!—হরিপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন।—টাকা কি দেখা যায়?

নাতির টাকা সংক্রান্ত অজ্ঞতা খানিকটা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আর একটু খুলিয়া বলিলেন।

ব্যাঙ্কে কি টাকা ব'সে থাকে? ব্যাঙ্কওয়ালারা আবার আমাদের টাকা দিয়ে লগ্নি কারবার করে।

লগ্নি কারবার কাকে বলে?

হরিপ্রসাদ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। নাতি মাঝখানে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তা হ'লে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যারা নিয়েছে, তাদের কাছে গেলে দেখা যাবে?

হরিপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, তারাও যে খরচ ক'রে ফেলেছে।

ও—! তবে?

কিন্তু অধিকতর উৎসাহের একটা কাজে আকৃষ্ট হইয়া নাতি আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না।

বৎসর আবার ঘুরিয়া আসিল। দিন কতক অসুখে ভুগিয়া হরিপ্রসাদ এবার প্রায় শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু ডিভিডেণ্ডের চেক আসিতেছে এবং জমা হইতেছে। চেকগুলি নিজে হাতে লইয়া হরিপ্রসাদ ভাল করিয়া দেখিয়া দেন। কিন্তু পড়িতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিশক্তি আর বর্তমানে কাজ করিতেছে না।

দুই মেয়ে এবং জামাইরা সকলেই অসুখ উপলক্ষ্যে আসিয়া আর যাইতে পারে নাই। বাড়ি এখন সরগরম। আনন্দের সংসার।

সহসা একটা নিদারুণ অপ্রত্যাশিত আঘাতে এই আনন্দের সংসার যেন মৃতের রাজ্যে পরিণত হইল।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে—যে ব্যাঙ্কে হরিপ্রসাদের এক কোটি টাকা স্থায়ী আমানত ছিল।

বড় জামাই জগদীশ বাহিরে বসিয়া ছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁহার নিকট খবরটা যেন উড়িয়া আসিয়া কপালে ঠুক করিয়া আঘাত করিয়া অসাড় করিয়া দিল। যখন চেতনা আসিল, খবরটা শেফালীকে দিলেন।

শেফালী 'হায় হায়' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, জগদীশ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, চুপ। তোমার বাবা শুনলে আর এক মুহূর্ত বাঁচবেন না। মাকে ডেকে বুঝিয়ে বলতে হবে। লাবণ্যকেও বল। কিন্তু সাবধান! তোমার বাবা যেন কোনক্রমেই জানতে না পারেন—যদি তাঁকে মারতে না চাও।

শেফালী মায়ের কাছে বলিল। তাঁহারও মুখ চাপিয়া ধরিতে হইল। লাবণ্য এবং ছোট জামাই ছুটিয়া আসিল।

বজ্রপাতে পোড়া বৃক্ষের মত নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল সমস্ত পরিবার। হরিপ্রসাদ এবং নাতিরা কেহই জানিতে পারিল না। হরিপ্রসাদকে এই আঘাত হইতে রক্ষা করাই সমস্ত পরিবারের প্রধান কর্তব্য স্থির হইল। সর্বনাশ যা হইবার হইয়া গিয়াছে। আর বিপদ বাড়াইয়া লাভ নাই। অপরিচিত বা অবাঞ্ছিত বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

হরিপ্রসাদ নিজের অপরিবর্তিত জগতে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। নাতিরা মাঝে মাঝে আসে। তাহাদের সঙ্গে এক-আধটা কথাবার্তা বলেন। মেয়ে, জামাই, স্ত্রী সকলেই আসেন। সকলেই স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করেন। হরিপ্রসাদ এতবড় সর্বনাশের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাইলেন না।

বড় নাতি কলম্বসের গল্প শুনিয়া আসিয়া আবদার করে, দাদু! আমাকে একটা জাহাজ কিনে দাও না।

একটা জাহাজ?—হরিপ্রসাদ খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ।

হরিপ্রসাদ মনে মনে হিসাব করিয়া সগর্বে ভাবেন, তা কেনা যায়। একটা কেন, অনেক জাহাজ কেনা যায়। বলেন, কিন্তু তুমি আর একটু বড় না হ'লে তো জাহাজে তোমাকে যেতে দেবে না। তাড়াতাড়ি বড় হও আগে।

দেড় কোটি অঙ্কটা বৃদ্ধের মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতে থাকে।

জগদীশ শ্বশুরের এই মিথ্যা আনন্দে ঈর্ষান্বিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া

পড়েন। ভাবেন, দেব নাকি ব'লে? প্রাণটা তো একটা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

ছোট জামাই লাবণ্যকে বলে, কি আশ্চর্য, ভাব দেখি! তোমার বাবা বেশ আনন্দেই আছেন। যতদিন না জানতে পারছেন—এক কোটি টাকার আনন্দ ততদিন পেয়ে যাবেন।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে—দূরদর্শী আশাবাদীরা যাহাই বলুন, আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখিতেছি ক্রমাবনতিই ঘটিতেছে। দেশের অবস্থা পর্যালোচনা তাই অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে, সকল দিকে নজর রাখিয়া লিখিতে গেলে দম বন্ধ হইয়া আসে, হঠযোগের কঠিনতম কুম্ভক-প্রক্রিয়াও এত কঠিন নয়। কলিকাতা শহরে চাল ডাল ময়দা চিনি গুড়ের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে করপোরেশন-ধর্মঘট যুক্ত হইয়া সাধারণ ভদ্র মানুষকে এমন ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে যে, সারা শহরটা পাগলা-গারদে পরিণত হইতে আর দেরি নাই। কি লিখিব ভাবিয়া অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। এমন সময় এক চিন্তাক্লিষ্ট বন্ধুর "দোস্‌রা অকটোবর" সম্পর্কিত চিন্তাধারা হাতে আসিল। দেখিলাম, তিনি আমাদের বর্তমান গুরুতর সমস্যাগুলি সম্পর্কে মূলগত আলোচনা করিয়াছেন, সমাধানের ইঙ্গিত দিবারও চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। লেখক শুধু অভিজ্ঞ নন, একজন বিশেষ দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যাহা চারিদিকে ঘটিতেছে তিনি নিজেকে তাহার "দায়ভাগী" বলিতেও কুণ্ঠিত নন।

দোস্‌রা অকটোবর

এবার পূজার ছুটিটা ছোটনাগপুরের এক শহরের কাছে কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কাটাইবার সুযোগ হইয়াছিল। শরতের প্রসন্ন দিন, ছোটনাগপুরের সুনীল আকাশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর নীল হইয়া দূরে বনানীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লাল মাটি এখনও সরস আছে, শ্যামলিমা বিলুপ্ত হয় নাই, দূরে দূরে ছোট ছোট পার্বত্য নদীর

স্রোত বালুকায় নিঃশেষিত হইতেছে না, স্বচ্ছ জলের ধারা তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ ছবির মত দেখাইতেছে। সারাদিন সোনালী রৌদ্র ও সারারাত অঢেল জ্যোৎস্না মিলিয়া প্রকৃতির এমন মায়ালোক সৃষ্টি হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, জগতের মধ্যে যে একটি অনাহত এবং অনাদি সঙ্গীত আছে, সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার আকাশে বাতাসে মানুষের মনে এক সুরে ঝঙ্কারিত হইয়া বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে দিন কাটিতেছিল।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে সেদিন সকালবেলায় রেডিও খুলিতেই হঠাৎ রেডিওর ঘোষণা শুনিয়াই মনে পড়িয়া গেল, আজ ২রা অক্টোবর, মহাত্মার একাশিতম জন্মদিন। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত ভারতবর্ষই বা বলি কেন, ভারতের বাহিরেও বহু দেশ—জাতির জনকের পুণ্য জন্মতিথির উৎসব করিতেছে। সারাদিন কত জায়গায় কত উৎসব হইবে, কত স্মরণ-সভা হইবে, সকলে জাতির জনকের অপূর্ব জীবনকাহিনী শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করিবে, তাঁহার বাণীর আলোচনা করিয়া পুনরায় প্রেরণা লাভ করিবে, জীবনের নানা দিকে নবীন উৎসাহে অগ্রসর হইবে। রেডিও হইতেই জানা গেল, রাজঘাটে সূত্রযজ্ঞ হইতেছে, কলিকাতায় গান্ধীঘাটে স্মরণোৎসব হইবে, বিকালবেলায় দিল্লীর জনসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী, সহকারী প্রধান মন্ত্রী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি নেতারা তাঁহাদের ভাষণ দিবেন।

ঠিকই তো, আজ এই দেশব্যাপী চঞ্চলতার ঢেউ কি এই অখ্যাত পল্লীর কোণে আসিয়া লাগে নাই? জাতির জনকের জন্মতিথি-উৎসব তো কেবল শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নহে। কারণ, মহাত্মাজীর স্বপ্নের যে ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের মধ্যে সকলেরই স্থান আছে, সকলেই সেখানে জাতীয় মহাযজ্ঞে যোগ দিবার জন্য সারি সারি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রথম সারিতে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা তো জামাকাপড়ে সুশোভিত নহে, কটিবস্ত্রমাত্র তাহাদের সম্বল, রৌদ্রে জলে তাহাদের দেহ কঠিন, শিক্ষার পালিশ তাহাদের নাই, কিন্তু তাহাদের অন্তরের নির্মল শ্রদ্ধা

ও অকৃত্রিম ভালবাসা সামাজিক প্যাঁচের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই সবল সরল মানুষগুলি, যাহারা এতকাল অন্ধকারে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সহিয়া আসিতেছিল, আজ মহাত্মার বাণী তো তাহাদেরই জন্য, তাই এই মহাযজ্ঞে তাহারাই প্রথম সারিতে দলে দলে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং আজ যখন মহাত্মাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসব হইতেছে, তখন সে উৎসব শহরের সীমানা ছাড়াইয়া গ্রামে না পৌঁছিলে সে উৎসব তো সম্পূর্ণ হইল না!

নিকটবর্তী পল্লীগুলিতে সন্ধান লইতে গেলাম। প্রথমেই একটি গ্রাম পড়িল, ওঁরাওদের গ্রাম। দেখিলাম, গ্রামের সকলেই উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে, পুরুষেরা বাহিরে কাজে গিয়াছে, অনেকে গ্রামের কাছাকাছি ক্ষেতগুলিতে কাজ করিতেছে, মেয়েরা পসরা সাজাইয়া পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্তী শহরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে, ছেলেরা গ্রামের গরুমহিষগুলি মাঠে চরাইতে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। কিন্তু মহাত্মার জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসবের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। গ্রামের একজন বৃদ্ধ মোড়লগোছের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? সে বলিল, বাবু, আমাদের কেহ তো বলে নাই আজ গান্ধীর জন্মদিন। শহরের বাবুরা তো এ গ্রামে বড় আসেন না। আর গান্ধী মরিয়া গিয়া আমাদের কথা কহিবার কোনই লোক রহিল না, আমাদের কি কিছু উন্নতি হইবে বাবু?

তাহাকে বুঝাইলাম, গান্ধীজী আজ সশরীরে বর্তমান নাই বটে, কিন্তু রাষ্ট্রচালনার দায়িত্ব তো তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য পণ্ডিত নেহরু গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে গান্ধীজীর আরও নিকটতম অনুচর ও সহকর্মীরা রহিয়াছেন। স্বাধীনতা তো নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব শান্তিতে উপভোগ করিবার জিনিস নহে, তাহার প্রাপ্তির জন্য যে সংগ্রাম প্রয়োজন, তাহার রক্ষার জন্য আরও কঠোর চেষ্টার প্রয়োজন। তাহা না হইলে আমরা রাতারাতি নূতন ভূস্বর্গ স্থাপনা করিতে পারিব না। কর্মী হও, নিরলসভাবে কর্ম কর, স্বাবলম্বী হও, পরমুখাপেক্ষী হইও না—ইহাই তো গান্ধীজীর বাণী। স্বাধীনতা লাভের পরই কোথায় দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে নবীন উৎসাহে নূতন কর্মোদ্যম

দেখা দিবে, সারা দেশময় নূতন ভবিষ্যৎ রচনার জন্য বিপুল চঞ্চলতা জাগিবে, তবেই তো দেশ আগাইবে। আর যদি তাহা না হইয়া আমরা ইতিমধ্যেই গান্ধীজীর বাণী ভুলিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া কেবল ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকি আর শহরের বাবু, সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের দিকে তাকাইয়া চাতকবৃত্তি অবলম্বন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার এখনও যায় নাই, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয় নাই।

সে গ্রাম ছাড়িয়া তাহার পরবর্তী গ্রামে গেলাম। এ গ্রামে সামান্য কিছু ওঁরাও থাকিলেও বেশির ভাগ বাস মোমিনদের। দেখিলাম, ইহারা সকালবেলায় সূতা রঙ করিতে ও কাপড় বোনার উদ্‌যোগে লাগিয়াছে। তাহাদেরও জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, আজ কি তোমরা গান্ধী-জন্মতিথি উদ্‌যাপনের কোনও ব্যবস্থা কর নাই? তাহারা সকলেই সাগ্রহে বলিল, হাঁ বাবু, আমরা শুনিয়াছি বটে, আজ গান্ধীজীর জন্মদিন, কিন্তু কিভাবে পালন করিতে হইবে তাহা তো আমাদের কেহ বলিয়া দেয় নাই। তাহাদের কিছু গান্ধীকথা শুনাইলাম, গান্ধীজীর কর্মের বাণী বলিলাম, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ—কৃষাণ-মজুরের ভারতবর্ষ সে কথা শুনাইলাম, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা শুনাইলাম। তাহারা আগ্রহের সহিত শুনিল, বলিল, তাঁহাকে আমরা চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু বিশেষ করিয়া বিহার-দাঙ্গার সময় তাঁহার উপস্থিতির মূল্য আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার চেয়ে আমাদের বড় বন্ধু কেহই ছিল না।

তাহার পর তৃতীয় গ্রামে গেলাম। এই গ্রামটিও মুসলমান-প্রধান, তবে এখানে বাস মোমিনদের নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত জায়গীরদারদের। গ্রামের অনেকেই আমার অপরিচিত নহে, কিন্তু তবুও বিশেষ কোনও সম্ভাষণের চিহ্ন দেখিলাম না। গ্রামের প্রধান রাস্তার উপরে ছেলে বুড়া সারি সারি দাঁড়াইয়া রৌদ্রের আমেজ ভোগ করিতেছে, কাজকর্মের বিশেষ কোনও লক্ষণ নাই। তাহাদেরও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন শুনিয়াই অনেকে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। দুই-একজন পরিচিত জবাব দিল, হাঁ, বিকালে শহরে মীটিং

হইবে, সেইখানে যাহার ইচ্ছা আছে যাইবে, আলাদা করিয়া এ গ্রামে আর কি হইবে? বিশেষত দুঃখের অন্ত নাই, জিনিসপত্রের দাম আক্রা, কয়দিন হইতে চিনি পাওয়া যাইতেছে না—এ অবস্থায় সকলেরই মনে সুখ নাই, কে গ্রামে মীটিঙের ব্যবস্থা করিবে?

বিশেষ কিছু বলিলাম না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলাম। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বেশি করিয়া যাহা মনে হইল তাহা এই যে, আজ শহরে শহরে সভা হইতেছে বটে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে আজ স্মরণ-সভার সমারোহ নাই কেন? ভারতবর্ষের আসল রূপ গ্রামে, এই সত্য তো গান্ধীজী কোনও দিন বলিতে বিরত ছিলেন না। আজ সেই গ্রামগুলির মধ্যে যদি নূতন রস সঞ্চারিত না হয়, সেখানে যদি নূতন জীবন-ধারার সঞ্জীবনী প্রভাব দেখা না দেয়, তাহা হইলে এই পুণ্যদিন উদ্‌যাপনের নিশ্চয়ই অঙ্গহানি হইবে।

বাড়িতে আসিয়া ব্যাটারি-সেট রেডিওটি খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গাতেই গান্ধীজীর নামে গান হইতেছে, আবৃত্তি হইতেছে, সারাদিনই গান্ধী-উৎসব চলিতেছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি রেডিওর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় অনুষ্ঠান অসহ্যরকম নাটকীয়, এবং সেইজন্য এই গম্ভীর উপলক্ষ্যে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও ভল্‌গর। কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিলেও যেগুলি উহার মধ্যেই সুষ্ঠু, সেগুলিও শুনিতে শুনিতে মনে হইল, আজ এই বিরাট যন্ত্রবাণী কতটুকু সফল হইবে, যদি না তাহা পীড়িত ভারতবাসীর অন্তরে নূতন আশার প্রলেপ দেয়? কয়জন ভারতবাসী এখনও এই যন্ত্রবাণীতে অভ্যস্ত?

সন্ধ্যাবেলায় পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ, সর্দার পাটেলের বাণী এবং আরও অনেকের বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার রেডিওতে বিবৃত হইল। অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে পণ্ডিত নেহরু একটি কথা বলিয়াছেন, যাহার মর্ম প্রত্যেক ভারতবাসীরই গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিত। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, গান্ধীজীর জয় উচ্চারণ করিয়া আপনারা গান্ধীজীর মহিমা

কি বাড়াইবেন?—আপলোগ গান্ধীজীকো জয় পুকারকে উন্‌কো ক্যা শান বঢ়ায়েঙ্গে? সুতরাং আপনাদের প্রকৃত কর্তব্য হইল গান্ধীজীর অনুসরণ করা, তাহা না হইলে তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে না। আজ এই কথাটিই বিশেষভাবে আলোচ্য।

২

আজ যখন গান্ধীজীর জন্মদিন কি মৃত্যুদিনের উৎসবের ভঙ্গীগুলি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করি, তখন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, তাহার মধ্যে নানা উপকরণ আছে; কিন্তু সত্য সত্য যে উপকরণ থাকা উচিত, তাহা প্রায় কোথাও নাই। এ কথাটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য। এই সব সভা-সমিতি বক্তৃতা ও বাণী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণত (সাধারণত বলিতেছি, কারণ ইহার যে দুই-চারিটা ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে—ব্যতিক্রম থাকিতে বাধ্য) ইহার মধ্যে পয়লা নম্বর থাকে প্রচলিত ফ্যাশনের তাগিদ। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁশতলা গলির ক্লাব পর্যন্ত সকলেই গান্ধী-উৎসব করিতেছে, এই ঢেউয়ের মধ্যে সকলকেই গান্ধী-উৎসব করিতে হইবে, ইহা প্রচলিত ফ্যাশনের তাগিদ। প্রত্যেক অলিতে গলিতে ছোট ছোট সভা হইবে, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবেন মন্ত্রী না হয় কোনও হোমরা-চোমরা কাহাকেও সভাপতি করিতে, যে কয়জন পেশাদার সভাপতি আছেন তাঁহাদের ব্যস্ততার সীমা থাকিবে না, আধ ঘণ্টা অন্তর সভার সময় স্থির হইবে। ইহার উপর উদ্বোধন-কর্তা ও প্রধান অতিথি আছেন, মালা আসিবে, কোথাও কোথাও ব্যাণ্ডও বাজিবে, রামধুন গান হইবে, উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা হইবে, হাততালি দিয়া সভা শেষ হইবে, সভাপতি প্রধান অতিথি মালা লইয়া চলিয়া যাইবেন, এবং অনুরোধ সত্ত্বেও ছয় টাকা সেরের সন্দেশ খাইবেন না, সেই সঙ্গে সঙ্গে আতসবাজির মত সভার সমস্ত আলো সমস্ত জাঁকজমক শেষ হইয়া যাইবে। এই উপলক্ষ্যে পাড়ার লোকেদের চাঁদাও দিতে হইবে, ক্লাবে ক্লাবে রেশারেশি হইবে, কাহার শামিয়ানা ভাল ছিল, কাহার ব্যাণ্ড বেশি জোরে বাজিয়াছিল ইহা লইয়া তর্কাতর্কি মনকষাকষি হইবে, কিন্তু তবুও সকলে একত্রিত হইয়া এক-একটি পাড়ায় এক-একটি বড়

সভা ডাকিয়া গান্ধীজীর জীবনবেদ ও সাধনার মর্ম বাস্তবিক অন্তরে উপলব্ধি করিবার কোনও চেষ্টা হইবে না। ইহা হইল প্রথম নম্বর উপকরণ, যাহা যে কোনও উপলক্ষ্যে হইতে পারিত। পাড়ার সর্বজনীন (অর্থাৎ বর্তমানক্ষেত্রে পাড়াজনীন, গলিজনীন*) দুর্গাপূজা সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যেও ঠিক এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারিত, ইহার মধ্যে গান্ধী-জন্মদিনের বিশেষত্ব কি রহিল ?

ইহার সঙ্গে আর একটি উপকরণ লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল ঠাকুরপূজার প্রবৃত্তি। ঠাকুরপূজা আমাদের জন্মগত সংস্কার, বহুশতাব্দীর বদ্ধমূল অভ্যাস। সুবিধা পাইলে আমরা নমস্যদের আমাদের প্রতিদিনের কর্মমুখর গৃহের পরিবেশ হইতে দূরে সরাইয়া ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই, দিনে একবার করিয়া চাল-কলা ভোগ চড়াই, গদগদ স্বরে মন্ত্র পাঠ করি, বলি, তুমিই আমাদের উদ্ধারকর্তা, গড় হইয়া প্রণাম করি। কিন্তু সেই যে প্রণাম করিয়া পিছন ফিরি, তাহার পর আর ঠাকুরের কথা তো মনে রাখিই না, বরং ঠাকুরের নির্দেশিত পন্থার বাহিরে যত কিছু অকাজ কুকাজ আছে তাহার সমস্তই পরম উৎসাহে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে করিয়া যাই। প্রাচীনকালে বৈষ্ণবগণ যে সব পুঁথি লইয়া পশ্চিমে গিয়াছিলেন, সেই সব পুঁথি যখন কালক্রমে জয়পুরের মহারাজার মন্দিরে পেটিকাবদ্ধ হইল, তখন দেখা গেল যে, সে পুঁথি আর পড়িবার পুঁথি নাই, তাহার উপর লাল কাপড় জড়াইয়া ফুলতুলসী দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সে পুঁথির বিষয়বস্তু লইয়া আর কেহ চর্চা করিতেছে না। এই প্রবৃত্তির জড় এখনও মরে নাই, বরং কোন কোন দিকে আরও বাড়িয়াছে। আজ আমাদের জাতীয় জীবন বা সামাজিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা

* এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নিকট শোনা একটি গল্প মনে পড়িল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অল্প বয়সে তাঁহারা রসরাজ অমৃতলাল বসুর কোনও একটি প্রহসনে কোন একটি চরিত্রকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, পূর্বে জানিতাম জগন্মাতা। পলিটিক্সের প্রারম্ভে দেখিলাম, ভারতমাতা দেখা দিয়াছেন। তাহার পর দেখা দিলেন বঙ্গমাতা। শেষকালে বৌবাজারমাতা দেখা দিবেন নাকি ? রসরাজ বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন, বাস্তব তাঁহার কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

যাইবে, জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী অমুক ডে (day) তমুক ডে-র সমারোহ অত্যন্তই বেশি, এতই বেশি যে তাহা বারো মাসে তেরো পার্বণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোনও এক বন্ধু বহু বৎসর বিলাতে বাস করিয়া সম্প্রতি এ দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, দুই দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় তফাত কি দেখিতেছেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, দেখিতেছি, তোমাদের দেশে ইতিহাসের **back-wash** এখনও বড় বেশি ; দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই সামনের দিকে প্রসারিত হইবার পরিবর্তে এখনও পিছনে আটকাইয়া আছে। বিলাতে তো শেক্‌সপীয়র ডে, চসার ডে, মিল্‌টন ডে, গ্ল্যাডস্টোন ডে বৎসর বৎসর এইভাবে প্রতিপালিত হইতে দেখি না। বিলাতেও এই রকম উৎসব যে নাই তাহা নহে, তবে তাহার পরিমাণ অল্প এবং সেই উৎসবগুলি অতীতের ভিত্তিতে জাতিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। ইতিহাসের ধারা অভগ্নপ্রক্রমে চলে, তাহার ধারা শাস্ত্রের ভাষায় অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ, তাহার মধ্যে কোনও ফাঁক নাই। আজ যাহা বর্তমান কাল তাহা অতীত, আজ যাহা ভবিষ্যৎ কাল তাহা বর্তমান। সুতরাং অতীতকে অস্বীকার করিব এমন কথা কোনও সমাজশাস্ত্রীই বলিতে পারেন না। কিন্তু সেই অতীতকে আমরা কাজে লাগাইব কি করিয়া? অতীত কালে আমরা এই সব করিয়াছিলাম, এই আনন্দেই কি আমরা নাচিয়া বেড়াইব? অর্থাৎ এককালে আমরা ঘি খাইয়াছিলাম, তাহার গন্ধেই আমরা কি খুশি থাকিব? অথবা, অতীত কেবলমাত্র আমাদের বৃহত্তর ভবিষ্যৎ রচনার সোপানমাত্র, এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অতীতের আলোচনা করিব?

যে জাতির সম্বল যত ক্ষীণ, আহত অভিমান যত প্রবল, অতীতকে লইয়া তাহার উচ্ছ্বাস তত বেশি। ভাগ্যক্রমে যে দুই-চারজন মহাপুরুষকে তাহারা পাইয়াছে, তাহাদেরই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বড় করিয়া তাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহে। সেইজন্যই এই ধরনের সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মধ্যে প্রায়ই যে সুর ধ্বনিত হয়, তাহা এই : তিনি আমাদের সৌভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন এবং তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তেমনটি আর হইবে না। সে কি দেশবন্ধু, কি দেশপ্রিয়, কি গান্ধীজী, সবাই সমান, সকলের বেলাই এক কথা। অথচ আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ জাতির পক্ষে মহাসৌভাগ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু মহাপুরুষের মহত্ত্ব তো জাতির সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, কারণ তাঁহার কর্মের মালমসলা জাতির মানুষগুলি। মহাপুরুষ যেমন জাতিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন, তেমনই মহাপুরুষের মহত্ত্বের সীমাও জাতির বর্তমান উপাদান বহুলাংশে চিহ্নিত করিয়া দেয়, জাতি বড় হইলে দিকে দিকে ক্ষণজন্মা প্রতিভার আবির্ভাবও তো বেশি ঘটিয়া থাকে। সেই সঙ্গে আমরা সাহস করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না, যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দানের মহত্ত্ব আমরা শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করিব, কিন্তু জাতির অনন্ত ভবিষ্যতের পথে তাঁহার চেয়েও বড় কাহাকেও যদি জাতি সৃষ্টি করিতে না পারিল তাহা হইলে মহাপুরুষের দানটাই ছোট হইয়া গেল যে! এ কথা সত্য যে, শেক্‌সপীয়র দুইটা জন্মান না, গান্ধীর দুইবার জন্ম হয় না, রবীন্দ্রনাথ দুইজন পাওয়া যায় না। ইহার নানা কারণ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আক্ষেপ করিব কেন? বরং তাঁহাদের অসীম ও অতুলনীয় দান অবলম্বন করিয়া নূতনতর বিচিত্রতর সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনার কাজে লাগিয়া যাইব না কেন?

অথচ যখন স্মরণ-সভাগুলি দেখি, তখন লক্ষ্য করি, আমাদের দৃষ্টিটা এখনও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত না হইয়া অতীতের জালেই আটকাইয়া আছে। সেইজন্য দেশময় এত উচ্ছ্বাস, এত গদগদ স্বরে স্তবস্তুতি, এত ধূপধুনা-পঞ্চপ্রদীপ-ঘণ্টা-কাঁসরের সমারোহ, এত অশ্রু-সজল রোমান্টিক বক্তৃতা। অথচ বুঝি না যে, ইহার আড়ালে আমরা মহামানবের মানবত্ব ঘুচাইয়া, তাঁহাকে পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত করিতেছি। অর্থাৎ তাঁহার সহিত আমাদের যোগের অন্তরঙ্গতা ও সজীবতা ঘুচাইয়া তাঁহাকে formal করিয়া তুলিতেছি। আমাদের প্রত্যেকের সুখ দুঃখ কষ্ট মর্মবেদনা সজীব হইয়া যাঁহার হৃদয়ে বাজিত, যাঁহার বিরাট অন্তর সমস্ত ব্যক্তির ব্যথাকে গ্রহণ করিয়া রক্তমাংসের

সজীবতায় ব্যথিত ও স্পন্দিত হইতে থাকিত, সেই সজীব রক্তমাংসের স্পন্দনকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ ও অনুকরণ না করিয়া আমরা সেই জায়গায় শিলা-প্রতিষ্ঠা করিতেছি। তাহারই অকাট্য প্রমাণ, আমরা এত স্তবস্তুতি করিতেছি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি গান্ধীচরিত্রের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি? যদি না করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমাদের সভা-সমিতি ব্যর্থ এবং গান্ধীজীর সত্যই অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।—উন্‌কো জয় পুকারকে আপ উন্‌কো ক্যা শান বঢ়ায়েঙ্গে?

ইহা ছাড়া আর যে সব উপকরণ দেখা দিয়াছে, তাহার কথা আর নাই বলিলাম। এক দিকে যেমন কিছু পরিমাণ নৈষ্ঠিক কর্মী আছেন, অন্য দিকে তেমনই বহু লোক কংগ্রেসের আবরণের সুযোগ লইয়া স্বার্থসিদ্ধির মতলবে ভিড় জমাইবার চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মার জয় উদীরণে তাহাদেরই কণ্ঠ সব চেয়ে বেশি উচ্চ। সেইজন্য যে ডাক একদিন ছিল স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষার ডাক, আজ সেই ডাক ইহাদের কণ্ঠে কলুষিত অবমানিত হইতে চলিয়াছে এবং যদি না এই বিপদ হইতে অবিলম্বে সাবধান হওয়া যায়, তাহা হইলে এই ডাক কি যে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে পরিণত হইবে, তাহা মনে করিলেও অন্তর বেদনায় দীর্ণ হইয়া যায়।

সেইজন্য আজ যখন দেশের চারিধারে দৃষ্টিপাত করি এবং তাহার মধ্যে এই সমস্ত সভা-সমিতির সমারোহ দেখি, তখন মন ক্ষোভে ও আক্ষেপে অস্থির না হইয়া পারে না। অন্য কাহারও নয়, স্বয়ং গান্ধীজীর জন্মদিনে কি অধিকার আছে আমাদের, এই পবিত্র দিনের নৈষ্ঠিক শুদ্ধি খর্ব করিতে? সংযম না করিয়া থাকিলে পূজা করা যায় না। কি অধিকার আমাদের আছে যে, সংযম না করিয়া অশুচি অবস্থায় পূজার আসন গ্রহণ করিব? গ্রামগুলি আজ গান্ধীজীবনের প্রসন্ন আভা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে, সভা-সমিতি হইবে পাকা রাস্তার ধারে, শহরে শহরে, সেখানে সভাগুলির পিছনে খানিকটা প্রেরণা থাকিবে প্রচলিত ফ্যাশনের, খানিকটা থাকিবে ঠাকুরপূজার হিস্‌টিরিয়া,—কেবল থাকিবে না গান্ধীজীবনবেদের চর্চা ও উপলব্ধি,

থাকিবে না গান্ধীকর্মসূচীর প্রাত্যহিক অনুশীলন, অথচ অন্য দিকে থাকিবে বহু অসাধুতার স্রোত,—এমন অবস্থায় আজ কেমন করিয়া আনন্দ করিব? সুতরাং বহুদিন রফা করিয়া করিয়া যাঁহাদের মন ভোঁতা হইয়া যায় নাই, চারিত্রনিষ্ঠার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মরিচা পড়ে নাই, তাঁহাদের চিত্ত আজ সবলে স্পন্দিত হইয়া উদাত্ত স্বরে ঘোষণা কেন করিবে না,—আমরা জাতির জনকের এই অবমাননা হইতে দিব না, যেখানে সভা-সমিতি করিব, সেখানে তাঁহার আজীবন সাধনার প্রকৃত মূল্য দিতে পারি এবং সেই সাধনাকে নূতন ভবিষ্যৎ রচনার কাজে লাগাইতে পারি, ইহাই হইবে আমাদের দুর্জয় সংকল্প। আজ এই ধরনের রুদ্র বলিষ্ঠ সংকল্পের দুর্জয় ঘোষণা দেখিতে পাই না কেন? গান্ধীজী যখন চরকা প্রতীক করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বেশির ভাগ লোকই উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু সময় বদলাইতে দেরি হয় নাই। তেমনই আজ যে কথা অন্তর দিয়া অনুভব করি, সেই কথা আত্মশুদ্ধির জন্যই বলিবার সাহস আমরা কেন রাখিব না? সে কথা বেশি লোকে বলিতেছে না বলিয়া? তাহা হইলে গান্ধীজীর বাণীর মর্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না।

সুতরাং গান্ধীচরিত্রের সম্মাননা করিবার অধিকার আমাদের হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কর্মসাধনাকে আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের সম্বল স্বরূপে ব্যবহার করিতে না শিখিব। আজ সেই কথা আলোচনা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩

আজ গান্ধীজীর নশ্বর জীবন শেষ হইয়াছে, তাঁহার ভারতবর্ষেরও পটপরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। যে নীতি ও পদ্ধতিতে আমরা যে লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম, তাহার সব কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে। সে লক্ষ্যও এখন নাই, আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সে নীতি ও পদ্ধতিরও বদল দরকার হইয়াছে, কারণ বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-

মূলক সংগ্রাম, সে সংগ্রামের নীতি স্বভাবতই এখন অচল। এখন তাহা হইলে আমরা কি করিব? গান্ধীজীর সব চেয়ে বড় দান তো আমাদের ভীতি ঘুচাইয়া স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামপরায়ণতা,—ইহারই বাণী তিনি ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যখন আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছি, এবং সেইরকম সংগ্রামও অচল তখন আমরা কোন্ পথে অগ্রসর হইব?

ইহার উত্তর দিবার পূর্বে গান্ধীবাদের কয়েকটি গোড়ার কথা আলোচনা করিতে হয়। ("গান্ধীবাদ" কথাটি loosely ব্যবহৃত, কারণ যে রকম বাঁধা-ধরা কাঠামোর মধ্যে ফেলিলে মতামত মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়, গান্ধীজী তাঁহার মতামতকে সে রকম বাঁধা-ধরা কাঠামোর মধ্যে কোনদিনই ফেলেন নাই।) মনের ভীতি ঘুচাইয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামমুখীনতা—ইহা গান্ধীজীর বৃহৎ দান এ কথা সত্য, কিন্তু ইহাই বৃহত্তম দান এ কথা বোধ হয় বলা চলে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐ দানের মূল্য আমরা খুব বেশি করিয়া দিই। কিন্তু গান্ধীজী তো প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নেতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছিলেন না। গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাবটাই যে সব সময়ে খুব বড় ছিল না, সে কথা তো তাঁহার জীবনে বহুবার দেখা গিয়াছে। রাজনীতির মধ্যে চৌরিচৌরা একটা খুব বড় ঘটনা নহে; বিশাল ভারতবর্ষ যখন আন্দোলনে মত্ত, তখনও কোনও প্রত্যন্ত কোণে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ঘটিবে না এমন আশা কোনও রাজনীতিকই পোষণ করেন না। কিন্তু সেই ঘটনাটাই গান্ধীজীর চোখে এত বড় হইয়া দেখা দিল যে, তিনি আন্দোলনই বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ, গান্ধীজীর আন্দোলন রুক্ষ ক্রোধের আন্দোলন নহে, রাজনীতির প্যাচ-কষাকষিও নহে—তাহা হইল পীড়িত ও পীড়ক উভয়ের মধ্যেই মানবতাবোধ এবং সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। সেই-জন্যই ইহার মধ্যে হিংসা নাই, ক্রোধ নাই, ইহাতে শুধু শোষিতদের মুক্তির চেষ্টাই নাই, শোষকদের প্রকৃত মুক্তির চেষ্টাও আছে। সেই-জন্যই ইহার মানবতা এত অসীম, ইহার মধ্যে প্রেমের এত

প্রাধান্য, ইহার সুষমা এত বেশি। মানবকল্যাণের এই চেষ্টা শুধু রাজনীতিক লাভলোকসানের হিসাবে বোঝা যাইবে না। সুতরাং আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাই লাভ করিয়া থাকি, বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক সংগ্রাম এখন অচল হইয়াই থাক্, তাহাতে গান্ধীজীর শিক্ষার মহিমা কমে না। গান্ধীজী যদি শুধু রাজনৈতিক নেতা হইতেন, তাহা হইলে সে কথা হইত বটে। কিন্তু গান্ধীজী তো তাহা নহেন। আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে—এমন কি রাজনীতিতেও—এমনতর প্রেমের সাধনা ও মানবতার প্রতিষ্ঠার কথা কেহ বলে নাই। ইহাই তো ভারতবর্ষের চিরন্তন মৈত্রী-করুণার বাণী, আজ তাহার নূতন ব্যাখ্যাতা গান্ধীজী এ যুগের জীবনের প্রত্যেক দিকে সেই বাণীর প্রয়োগ করিলেন। রাজনীতি চুলায় যাক না কেন, জীবনের সামগ্রিক শিক্ষা হিসাবে গান্ধীজীর এই বাণী অনুশীলন করিবার পথে কোনও অন্তরায়ই নাই। আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ না করিবার মত অবস্থার বদল তো কিছুই হয় নাই। যতদিন মানুষের মনে হিংসা ক্রোধ, ক্ষুদ্রতা স্বার্থান্ধতা থাকিবে, ততদিন গান্ধীজীর এই বাণীর দ্যুতি অমলিন রহিবে, তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনও দিনই ঘুচিবে না। রাজনীতির যাহাই হউক না কেন, মানব-চরিত্রের এই যে নূতন নির্মিতির বাণী, ইহার সার্থকতা তো আরও গভীর এবং বৃহৎ।

ইহাই গেল প্রথম কথা। কিন্তু যখন আমাদের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখি, তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এমন কিছু বদল হইয়াছে বলিয়া মনে করি না, যাহাতে গান্ধীজীর সমস্ত শিক্ষা বাতিল হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে আমরা কি লাভ করিয়াছি? স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য কৃপালনি বলিয়াছিলেন, ইহা হইল কেবলমাত্র আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করিবার বা গড়িয়া তুলিবার অবাধ অধিকার—freedom to make or mar our future। আমরা যাহাই করি না কেন, কেহই তাহাতে বাধা দিতে আসিবে না। অবশ্য বর্তমানকালে পরস্পরনিরপেক্ষভাবে যাহা খুশি করিবার অধিকার কোনও রাষ্ট্রেরই নাই, এমন কি বড় বড় রাষ্ট্রগুলিরও নাই।

তবুও নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে এখন আমাদেরই হাতে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের তাৎপর্য ইহাই। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যে স্বাধীনতার একমাত্র রূপ নহে, সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য দূর না হইলে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া যায়, এ কথা কংগ্রেস বার বার ঘোষণা করিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এবং বৈষম্য দূর করার কাজের সমস্তই বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। বরং ভাল করিয়া বলিতে গেলে দেখা যাইবে, এই কাজ যে শুধু সমস্তই বাকি পড়িয়া আছে তাহা নহে, এক হিসাবে ইহার জটিলতা ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এতদিন পর্যন্ত ভারতে যে অর্থনীতিক বিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে বড় বড় কলকারখানা হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত সামাজিক-আর্থিক কাঠামোটা ধনতান্ত্রিক হইয়া যায় নাই। সমাজের চেহারা ছিল খানিকটা সামন্ততান্ত্রিক, খানিকটা পাঁচমিশালি খিচুড়ি। কিন্তু এখন—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর—দেখা যাইতেছে, সামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামোটাই বদলাইতে শুরু হইয়াছে। শুধু যে কলকারখানার আরও প্রসার হইয়াছে তাহা নহে, সামন্ততন্ত্র আরও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা নহে, সমাজের ভঙ্গীটাই বদলাইতেছে। অর্থাৎ শুধু **capital** নহে, **capitalism** দেখা দিতে শুরু হইয়াছে। ইহার প্রমাণ আজকাল আমরা কথায় কথায় পাইতেছি। কাপড়ের দর কম স্থির করা হইল, অমনই কাপড় জমিয়া গেল ; চিনির দর কমাইবার চেষ্টা হইল, অমনই রাতারাতি সমস্ত চিনি উধাও হইয়া কালোবাজারে ঢুকিল, ভারতবর্ষময় এই রকম একযোগে কারবার আমরা তো প্রত্যহই দেখিতেছি। তাহা ছাড়া প্রত্যেক দিকেই মূলধন কয়েকজনের হাতে আসিয়া জড় হইতেছে, ধনতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ **concentration of capital** তাহা দেখা যাইতেছে। চাষের জমির মালিকী স্বত্ব সম্বন্ধে ইদানীং যে সব অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, যুদ্ধ মন্বন্তর ইত্যাদি কারণে গরিবদের অবস্থার যত দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে, যাহাদের সামান্য জমি ছিল তাহারা সেই জমি

বেচিয়া ভূমিহীন ভাগচাষীতে পরিণত হইয়াছে, যাহাদের বেশি জমি ছিল তাহারা অনেক জমি বেচিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে—তেমনই অন্য দিকে মাত্র কিছু লোক জমি বাড়াইতেছে। অর্থাৎ ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর লোকের হাতে জমির মালিকানা পুঞ্জীভূত হইতেছে। শিল্পের ও মূলধনের ক্ষেত্রেও তাহাই। এই পুঞ্জীভবন ক্রমেই বাড়িয়া দেশময় ক্যাপিটালিজ্‌মের সমস্যাকে বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষ এখন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত। কোন্ দিকে তাহার পথ? সে কি ক্যাপিটালিজ্‌মের পুরা চক্র ঘুরিয়া বহুকাল পরে সমসমাজে উপস্থিত হইবে? প্রাচীন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এই পথেই সমসমাজের দিকে আগাইতেছে। অথবা ভারতবর্ষ এই পুরা চক্র না ঘুরিয়া সরাসরি সমসমাজের পথে চলিতে শুরু করিবে? বহু নবজাগ্রত দেশ এই পথই অবলম্বন করিয়াছে, কেন না পুরা শিল্পের বিকাশ ও ধনতন্ত্রের বিকাশ না হইলে সমাজতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়, এ মতবাদের ব্যর্থতা বহুদিন আগেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে শিল্পে অগ্রসর ইংলণ্ড-জার্মানি ছাড়িয়া শিল্পে অনগ্রসর রুশিয়া-চীনে বিপ্লব দেখা দিত না। ভারতবর্ষের সামনে সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে, কোন্ পথে সে অগ্রসর হইবে। কাজেই সামাজিক ও আর্থিক দাসত্বমুক্তি যদি আমাদের সংগ্রামের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের সংগ্রাম তো মেটে নাই, বরং আরও তীব্রতর আকারে দেখা দিবার সময় হইয়াছে। পূর্বে যে সমস্যা লঘু ছিল, সেই সমস্যাও এখন তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। আর সেইজন্যই আমাদের শ্রেণীসংগ্রাম ও সংঘর্ষ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, দিকে দিকে সংঘর্ষ ও অশান্তি তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

সুতরাং গান্ধীজীর জীবনবেদ ও কর্মসূচী, ইতিহাসের অধ্যায়স্বরূপে নয়, সক্রিয় কার্যক্রমের ভিত্তিস্বরূপে, ভাল করিয়া আলোচনার অবসর আজও আছে। বরং তাহা আজই বেশি করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, তাহাকে দেশবিদেশের সঙ্গে চুক্তি-সন্ধি করিতে হইতেছে, স্বদেশকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে

হইতেছে। সুতরাং তাহার প্রোগ্রাম ফাঁকা বিরোধীদলের প্রোগ্রাম নহে। এই অবস্থায় আমাদের মুখ দিয়া এমন কোনও কথাই উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়, যাহা আমরা কাজে করিতে পারিব না বা যাহাতে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি না। সেদিনও পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, তিনি আমেরিকায় যে বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহা গান্ধীজীর বাণী। সুতরাং আজ রাষ্ট্রচালনা ও রাষ্ট্রগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর বাণীর পুনর্বিচারের অবসর আছে।

ভারতবর্ষের গত ত্রিশ বৎসর গান্ধীযুগ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এতখানি প্রভাব আমাদের জীবনযাত্রার উপর কেহই বিস্তার করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সেইজন্য আমরা যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি এবং যে যে দিকে অগ্রসর হইতে পারি নাই, সমস্ত কিছুরই মূল এই গান্ধীযুগেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা যে যে দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহা নূতন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ তাহার অন্যতম বৃহৎ নিদর্শন। কিন্তু যে যে দিকে আমাদের গলদ রহিয়া গিয়াছে, তাহার স্বরূপ বিচারই আমাদের বেশি করিয়া করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমরা ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না। বিশেষত রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে যে সব গলদ চাপা ছিল, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং বহু জায়গায় এমন বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে যে, আমাদের মূল ভিত্তিই টলমল।

ইহার কতকগুলি আনুষঙ্গিক, কতকগুলি মৌলিক। অর্থাৎ কতকগুলি ব্যাপারে থিওরির কোন ত্রুটি ছিল না, তাহার অনুষ্ঠানে ত্রুটি ঘটিয়াছিল বলিয়াই গলদ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে মৌলিক গোলমাল আছে, সেখানে অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকিলে গলদ আরও বাড়ে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ত্রুটি না থাকিলেও গোলমাল মেটে না। দুই-একটি উদাহরণ দিতেছি; ইহা উদাহরণমাত্র, ব্যাপক ফিরিস্তি নহে। যেমন কংগ্রেসের নিজস্ব সংস্থার কথা। কংগ্রেসের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ছিল গণতান্ত্রিক। কয়েকটি নীতিতে বিশ্বাসী হইলেই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক সভ্য হইতে পারিত, এবং তাহাদেরই ভোটে

কংগ্রেস-কমিটীগুলি গঠিত হইত। থিওরি হিসাবে ইহাতে কিছুই ত্রুটি নাই। কিন্তু তবু তো অস্বীকার করা যায় না, কাজের বেলায় এই গণতন্ত্রের পরিচয় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পাই নাই। কংগ্রেস-সভ্য-সংগ্রহের ফর্‌ম্‌ ও রসিদ-বই পাওয়া যায় না, নির্বাচন সময়মত ও ঠিকমত হয় না, একবার কেহ কংগ্রেস-কমিটী দখল করিলে সকল নির্বাচনেই তিনি সেখানে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন, এই সমস্ত প্রচলিত অভিযোগ যে সর্বত্রই বাজে তাহা নহে। যেখানে এই সব অভিযোগ সত্য, সেখানে বুঝিতে হইবে, থিওরি ঠিক থাকা সত্ত্বেও কাজের বেলায় ত্রুটি ঘটিয়াছে। অবশ্য যখন শুধুই সংগ্রামের পালা ছিল, মানসিক সন্তোষ ছাড়া কোনও জাগতিক সুখসুবিধা ত্যাগের পুরস্কার ছিল না, তখন কংগ্রেস-কমিটী কে দখল করিলেন না-করিলেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে যখন কংগ্রেসের পদাধিকার স্খলিত-আদর্শ লোকের হাতে বহু অন্যায়ের সূচনা করিতে পারে, তখন যাহাতে উপযুক্ত চারিত্রনিষ্ঠা-সম্পন্ন আদর্শবান্‌ লোক যথাস্থানে থাকেন, কংগ্রেস-সংস্থার মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ থিওরি যেন কাজে পরিণত হয়—তাহার জন্য সুদৃঢ় চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তবুও এ গলদ থিওরির গলদ নহে, কাজের গলদ। যাঁহারা থিওরি কাজে পরিণত করিবেন, তাঁহাদেরই উপর এ গলদ সংশোধনের ভার।

এই সব কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলি না। বরং কংগ্রেস আজ যখন রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, তখন পার্টি হিসাবে ইহার নিষ্কলুষ অমলিন দীপ্তি মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সর্বত্র সব সময় জ্বলিতে থাক্‌, ইহাই সকলে চাহিবেন, এবং ইহার জন্য মাথা ঘামানোর বিশেষ রকম প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে।

ইহার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হইল, রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হইবে, এবং রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক সংস্থা, অর্থাৎ পার্টির সম্বন্ধ কি হইবে। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র আমাদের ছিল না। সেইজন্য আমরা বরাবর

রাষ্ট্রকে শত্রুভাবে উপাসনা করিয়াছি, মিত্রভাবে উপাসনা করি নাই। রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল কেবল সংঘর্ষমূলক, রাষ্ট্রের সহিত সংস্পর্শে আসিতাম কেবল রাষ্ট্রকে ভাঙিবার সময়। যখনই কোনও গড়িবার কাজ আসিত, তখনই আমরা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া নিজেরা নিজেরা একত্রিত হইয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজে"র শিক্ষাও তাহাই। তাঁহার মূল কথাটাই ছিল, এ দেশে বিভিন্ন শক্তি রাজত্ব করিয়াছে, কিন্তু আমাদের প্রাণের মূল ছিল রাষ্ট্রের মধ্যে নহে, আমাদের সমাজের মধ্যে। সুতরাং আমরা যদি সমাজকে সজীব প্রাণবান করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে রাষ্ট্র যাহাই হউক না কেন, আমাদের সেজন্য কোনও বাধা হইবে না।

গান্ধীজীর শিক্ষাও মূলত ইহাই। গান্ধীজীর রাজনৈতিক মত শেষ পর্যন্ত ছিল নৈরাজ্যবাদ, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষকে বিপুল রাষ্ট্র-যন্ত্রের অসংখ্য শাখা-উপশাখা জড়াইয়া ধরিবে, এ রকম রাষ্ট্র তাঁহার পছন্দ ছিল না। থোরোর মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেন, যে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি যত কম, সে রাষ্ট্র ততই ভাল। যেটুকু কাজ নেহাৎ না করিলেই নয়, সেইটুকু কাজ রাষ্ট্র করিবে; বাকি সমস্ত কাজই জনসাধারণ নিজেরা মিলিয়া বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা স্থাপন করিয়া করিবে। আর এই বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার মধ্য দিয়াই প্রত্যেক মানুষ কাজের সুযোগ লাভ করিবে, কাজের মধ্য দিয়া তাহার মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে। তাহা হইলে আমাদের চিরকালকার অভ্যাস চাতকবৃত্তি কাটাইয়া লোকে স্বাশ্রয়ী ও স্বাবলম্বী হইতে শিখিবে। তাহাতে আত্মনির্ভরতা বাড়িবে, কাজেরও সুবিধা হইবে।

যখন রাষ্ট্র পরহস্তগত ছিল, তখন রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এখন কি হইবে? এখন তো রাষ্ট্র আমাদের। এখনও কি আমরা রাষ্ট্রের পাশ কাটাইয়া চলিব? অথবা রাষ্ট্র-যন্ত্রকে ভাঙিয়া-চুরিয়া মেরামত করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া আমাদের কাজের উপযুক্ত চকচকে ঝকঝকে করিয়া লইয়া তাহার মারফৎই কাজ করাইব? ধরুন, একটা দুর্গ আমাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল, তাহা দখল করিবার জন্য আমরা এতকাল

লড়াই করিতেছিলাম। আমরা সেই লড়াইয়ে বোমা মারিয়া দুর্গ ভাঙিয়াছি, কামান দাগিয়া প্রাকার ধূলিসাৎ করিয়াছি। শেষকালে আমাদের দুর্গ দখল হইয়া গেল। তখন আমরা কি করিব? দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহা মেরামত করিয়া নূতন কালের উপযোগী করিয়া তুলিব? অথবা, 'ধুত্তোর' বলিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া গাছের তলায় ছাউনিতেই বসবাস করিবার জন্য যাত্রা করিব? দুর্গ যদি দখল না হইয়া থাকে, সে কথা বুঝি। কিন্তু দুর্গ যদি সত্যই দখল হইয়া থাকে, সে বিষয়ে যদি সন্দেহের কোনও অবকাশ না থাকে, তাহা হইলে দুর্গ দখল করিবার পরই তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা গাছতলায় ছাউনি গাড়িতে যাইব কেন?

বিশেষত আজ জগতের সর্বত্র যে রাষ্ট্র স্থাপিত হইতেছে, এমন কি ভারতবর্ষেও যে রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিকেন্দ্রীকৃত নয়, তাহার কর্মপরিধিও যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখার কোনও ইচ্ছাই তাহার নাই। বস্তুত বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে। বরং দিকে দিকে তাহার কর্মপরিধি বাড়াইবার জন্যই দাবি আসিতেছে এবং বিভিন্ন দিকে তাহার কর্মপরিধি বাড়িতেছেও। এরূপ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কথা যাহাই হউক, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি কমিবে এমন আশা করা উচিত নয়, বোধ করি সঙ্গতও নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাতে রাষ্ট্রের কাজ বাধাই পায়, অগ্রসর হয় না। একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বড়বাঁকড়া গ্রামে হইবে, না, ছোটবাঁকড়া গ্রামে হইবে—ইহা লইয়া যদি লালদীঘির দপ্তরখানায় সাতবার লেখালেখি হইয়া সাত মাস ফাইল আটকাইয়া থাকে; লেক মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে চক্ষু-বিভাগের কুটীরগুলিতে ক্যান্‌ভাসের সিলিং ছিঁড়িয়া গিয়া চক্ষু অপারেশনের কাজ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, অথচ তাহার মেরামতের অর্থের মঞ্জুরী দিল্লীতে দশখানা চিঠি লিখিয়া আনিতে হয় এবং ফলে মাসের পর মাস কাটিয়া যায়; ইহাতে আর যাহাই হউক, কাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় না, লোকজনের মনেও উৎসাহ বোধ হয় না। সে হিসাবে কাজ যত বাড়িবে, ততই শক্তি বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে, তাহা না হইলে সব কাজ জট পাকাইয়া যাইবে কিন্তু এই

যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলিতেছি, ইহা রাষ্ট্রেরই বিকেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া বিকেন্দ্রীকরণ নহে। যেমন যুক্তপ্রদেশে পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে এবং পঞ্চায়েতের হাতে স্থানীয় ব্যাপারে অনেক কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হইয়াছে সে ক্ষমতাও রাষ্ট্রের,—যাহার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও রাষ্ট্র-যন্ত্রের বহির্ভূত নহে, রাষ্ট্র-যন্ত্রেরই অন্তর্গত। যাঁহারা পঞ্চায়েত চালাইবেন, তাঁহারা রাষ্ট্র-যন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত, বাহিরের নহেন। এখন যদি গ্রামের কংগ্রেস-কমিটী বলেন, চুলায় যাউক সরকারী আইনের পঞ্চায়েত, আমরা সেইখানে আমাদের নিজস্ব একটা পঞ্চায়েত গড়িব, তাহা হইলে কি অবস্থা হয়? এরূপ ঘটনা যে ঘটিতেছে না, তাহা নয়। যেমন বর্ধমান বিভাগের কোনও একটি জেলার প্রধান শহরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নিয়ন্ত্রণে একটি রাইফেল ক্লাব স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে, রাইফেলগুলি ঠিক জায়গায় সাবধানে রাখা, পাহারা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। অথচ সেখানকার কেহ বলিলেন, আমরা ওই সরকারী ক্লাব বাদ দিয়া নিজেদের একটি ক্লাব করিব, আমরাও রাইফেল ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম চাই। এ অবস্থায় এখন কি হইবে? আবার সেই পুরানো কথায় ফিরিয়া যাইতেছি। যদি মনে করেন, সরকার ও সরকারী শাসনযন্ত্র ঠিক মনের মত নহে—অর্থাৎ দুর্গ ঠিক দখল হয় নাই, তাহা হইলে সরকার ও সরকারী যন্ত্রকে ঘষিয়া মাজিয়া ঠিক করিয়া লউন, অর্থাৎ দুর্গটিকে মেরামত করিয়া মনের মত করিয়া তুলুন। তাহা না করিয়া সরকার ও সরকারী যন্ত্রকে বাদ দিয়া আমরা আর একটা খাড়া করিতে গেলাম, অর্থাৎ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গাছতলায় কুঁড়েঘরের ছাউনি পাতিতে গেলাম, এ কথা আজ কোন্ যুক্তিতে বলি? প্রয়োজনমত রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকৃত করুন, অর্থাৎ দুর্গের ঘাঁটি বিভিন্ন জায়গায় স্থাপনা করুন, তাহা বুঝি। কিন্তু দুর্গটাকে বাদ দিয়া এখানে ওখানে গোল-পাতার ছাউনি গড়িয়া তুলিব, ফলে বিপদের সময় ছাউনিও উড়িয়া

যাইবে, দুর্গও রক্ষা পাইবে না, এমন বিপদের পত্তন না করিয়া সকলে মিলিয়া দুর্গটাকেই বড় ও শক্তিশালী করি না কেন?

সুতরাং এ বিষয়ে মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন, তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে দ্বিধা থাকিলে চলিবে না। রাষ্ট্র-পরিচালক বলিতে শুধু মন্ত্রী বা আইন-সভার সদস্যদেরই বুঝিতেছি না। সমস্ত কংগ্রেস-সংস্থাই আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই সমস্যাকে গোটা কংগ্রেস-সংস্থার সমস্যা হিসাবেই ভাবিতে হইবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা যে থিওরিতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, এখন তাহার মৌলিক পুনর্বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্র প্রাচীন কালের রাষ্ট্র নহে। প্রাচীন কালের রাষ্ট্র হাজার চেষ্টা করিলেও আমাদের জীবনের কতটুকু জায়গা অধিকার করিতে পারিত? আর একালের রাষ্ট্র এমনই সর্বব্যাপী যে চাল ডাল নুন তেল কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে আমরা প্রত্যেকটি মুহূর্তে রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতেছি। সুতরাং এই রাষ্ট্র কি চেহারার হইবে, তাহার কাঠামোটা কতটা বিকেন্দ্রীকৃত হইবে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা কত লোককে কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিব, অথবা আমরা এখনও রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে সযত্নে দূরে পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিব,—এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই একটা মৌলিক সমস্যার কথা উল্লেখ করিলাম। এখন আর-একটা মৌলিক সমস্যার কথা উল্লেখ করি আজকাল দেশে নানাবিধ দুর্নীতির কথা শুনি। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানও যে দুর্নীতিতে ভরিয়া গিয়াছে—এ কথা কম্যুনিস্ট দলের লোক কেন, স্বয়ং কংগ্রেস-সভাপতি হইতে বহু কংগ্রেস-নেতাই নানা উপলক্ষ্যে বলিতেছেন, এমন কি কারণে অকারণে এইরকম কথা বলাও খানিকটা চলতি ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শুধু দুর্নীতির কথা নহে, ইহা ছাড়াও নানা ধরনের মতিগতি আজকাল ফুটিয়া উঠিতেছে, যাহা এতদিন যে কারণেই হউক চাপা ছিল। তাহার মধ্যে ভৌগোলিক সংকীর্ণতা অন্যতম। সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও

তাহার জড় মরে নাই। বিশেষত শরণার্থীদের মনে ইহার জ্বালা কিছুকাল চলিবেই। তাহার উপরে প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতা দ্রুত বাড়িতেছে। প্রায় বৌবাজার-মাতার আবির্ভাব। অনেক সময় মনে হয়, সকল প্রদেশের উপর সমান ওজনে বিচার হইতেছে না, সেখানে ন্যায়ের নীতি লঙ্ঘিত হইতেছে। যেখানে এরূপ হয়, সেখানে আহত অভিমান ও অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এইরূপ বিশেষ কারণ ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, প্রাদেশিকতা মোটের উপর দ্রুত বাড়িতেছে। পশ্চিম-বাংলার কথাই ধরা যাউক। সেখানে বাঙালী-অবাঙালীর সমস্যা তো মধ্যে মধ্যেই মাথা ঠেলা দিয়া সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হইতেছেই। তাহার উপর কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ঝগড়াতেও ভালরকম শাণ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বিহারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে বাঙালীদের সমস্যা যেমন প্রবল, তেমনই অন্য দিকে আদিবাসী-সমস্যাও কম নয়। তাহার উপর নূতন শাসনতন্ত্রে শুধু তপশীলী জাত নহে, আবার তপশীলী এলাকা নামে যে কিম্ভূতকিমাকার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার ফলে কি বাঙালী কি বিহারী কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই বিপর্যস্ত। কিন্তু যাহাদের জন্য এই পদার্থটির সৃষ্টি হইল, তাহারা কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট নয়—তাহাদের জন্য একটা সম্পূর্ণ অচ্ছুৎ-স্থান না গড়িলে হয়তো তুষ্টি হইবে না। উড়িষ্যার গঞ্জাম কোরাপুট জেলা তো কতদিন হইল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যেই আলাদা অন্ধ্র প্রদেশ হইবার কথা হইতেছে, অমনই এই জেলাগুলিতে উড়িষ্যার বাহিরে যাইবার জন্য কথাবার্তা একটু একটু যে আরম্ভ হয় নাই তাহা নয়। মাদ্রাজের অন্ধ্র ও তামিলদের ঝগড়ার কথা নূতন করিয়া উল্লেখ করার দরকার নাই। তেমনই গুজরাট কর্ণাটক প্রভৃতি বহু জায়গাতেই এইরকম মতিগতি দেখা যাইতেছে, এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীও এ সব বিষয়ে ভাবিতেছেন, ইহার কোন কোনটি সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। (প্রসঙ্গত বলা উচিত মনে হয়, এ সব বিষয়ে সর্বত্র সমান নীতি হওয়া ভাল। হয় কোনও কিছু গ্রাহ্য না করিয়া কেবলমাত্র শাসনকার্যের সুবিধা অনুসারেই প্রাদেশিক

সীমা ঠিক রাখিব, না হইলে সর্বত্রই ভাষার ভিত্তিতে সীমা নির্ধারিত করিয়া দিব, ইহার মধ্যে একটি নীতি বাছিয়া লইতে হইবে। কোনও জায়গায় খানিকটা অগ্রসর হইলাম, অন্যত্র তাহা হইলাম না—এরূপ হইলে প্রদেশগুলিকে আর সামলানো যাইবে না, তখন অভিমান অবিশ্বাস ও ভেদবুদ্ধি এমন প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিবে যে, তাহাকে বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে।) কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এখনকার সমস্যা শুধু দুর্নীতি বা প্রাদেশিকতাতেই সীমাবদ্ধ নহে। তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। তাহার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হইল, কংগ্রেসের মধ্যে নূতন নূতন কর্মীর অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রথম বিপুল উন্মাদনায় যখন সমস্ত কংগ্রেসের চেহারা বদলাইয়া গেল, তখন যাঁহারা ইহার মধ্যে আসিয়াছিলেন, প্রায় তাঁহারাই এখনও বাতি জ্বালাইয়া আছেন। কিন্তু দলে দলে নূতন নূতন কর্মী তৈয়ারি হইতেছে না। আর যে দুই-চারজন নূতন আসিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও রাতারাতি একটা দাঁও মারিয়া লইবার জন্যই অনেক সময় তাহা করেন। এই যে মূক মৌন ভারতবর্ষ এখনও চোখের জলে মর্মের বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছে, কেবল সেই বেদনায় কলিজা টনটন করিয়া উঠে, হৃদয় কূলে কূলে ভরিয়া যায়, শুধু তাহারই তীব্র প্রেরণায় ছটফট করিয়া নিছক কাজের পথে অগ্রসর হইতে চায়,—এমনতর কর্মী আজকাল আর দেখি না কেন? বিশেষত যাঁহারা এই ব্রতে দীর্ঘকাল ব্রতী এবং এখনও ব্রতী আছেন তাঁহাদের দুই-চারজনের কথা ছাড়িয়া দিলে নূতন নূতন এইভাবের কর্মী দেখিতে পাইতেছি না কেন?

তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত হইল কি? মহাত্মা গান্ধীর মত মহাপুরুষের কর্মসাধনা, লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থত্যাগ ও কর্মোদ্যম, এতদিনের আদর্শবাদ, আন্দোলন,—সমস্তই কি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স অ্যাক্ট পাসের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মত উবিয়া গেল? অবশ্য ইহার উত্তরে বলা যায়, এই সমস্ত মতিগতি পূর্বেও ছিল না এমন নহে, এখনই যে রাতারাতি গজাইয়া উঠিয়াছে এমনও নহে। তখন

বৈদেশিক শক্তির সহিত সংগ্রামের ফ্রণ্টে এ সবই চাপা থাকিত, এখন সেই ফ্রণ্ট না থাকায় তাহা আর চাপা থাকিতেছে না, এইমাত্র। মহাত্মাজীর জীবিতকালেও কি বাঙালী-বিহারী সমস্যা দেখা দেয় নাই, না, তাহা লইয়া বিহারে পি. আর. দাশ মহাশয়কে নেতা করিয়া আন্দোলন, সলা-পরামর্শ, রফা—এ সব হয় নাই? পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাটা কি আজই নূতন? ইহা কি বরাবরই ছিল না? হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটাই বা নূতন কি? ইহা তো মুসলমান সাম্রাজ্যের সময় হইতেই আছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূল বাধাই ছিল এই সমস্যা,—ইহাও তো নূতন করিয়া দেখা দেয় নাই। তবে সবের উপরেই তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রাম, তাহার তলায় এ সবই চাপা থাকিত। এখন সেই চাপ সরিয়া যাওয়ায় এ সব জিনিস আর চাপা থাকিতেছে না, উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে—তলানি ঘুলাইয়া উপরে ভাসিতে শুরু করিয়াছে।

কৈফিয়ৎ হিসাবে কথাটা লাগসই হইলেও এই কথা হইতেই মৌলিক সমস্যাটাও খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মানিয়া লইলাম, এই সব সমস্যাই ছিল, কিন্তু চাপা ছিল। এখন সবার উপরের চাপ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট অর্থ হইল এই যে, আমরা এতদিন যে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে এ সব সমস্যাকে কোনরকমে ধামাচাপা দিয়া আসিয়াছি; তাহার কোনও সমাধানের চেষ্টা করি নাই, চেষ্টা করিয়া থাকিলেও সমাধান করিতে পারি নাই। অর্থাৎ আমাদের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত ভাসা-ভাসা; কেবলমাত্র বিদেশী-বিতাড়নের ক্ষীণসূত্রে আমরা সকলকে সাময়িক বাঁধনে বাঁধিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু সকলকে নূতন দেশপ্রেম, নূতন আদর্শবাদের আগুনে গড়িয়া-পিটিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। অথচ মহাত্মাজীর সমস্ত সাধনাই তো ছিল এই রকম সাময়িক জোড়াতালির বিরুদ্ধে। সত্যের কঠিন দীপ্তিতে তিনি সমস্ত জিনিস যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন, অন্তরের গোপনতম কোণেও লুকাচুরি তিনি করিতে দেন নাই,—এইখানেই তো সাধারণ রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁহার একেবারে মৌলিক তফাত।

রাজনীতিকেরা তো সুযোগ বুঝিয়াই দরাদরি প্যাঁচকষাকষি করিয়া থাকেন, ইহাই তো তাঁহাদের ধর্ম। আর মহাত্মাজীর ধর্ম ছিল ঠিক ইহার উল্টা। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য বলিয়া তিনি বুঝিতেন, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাষায় বলিতে মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করেন নাই—তাহাতে যতই সুবিধা বা অসুবিধা হোক না কেন। এই রকম স্বচ্ছ নির্মল সততা, এই রকম অন্তরে-বাহিরে সমতা, এই রকম ন্যায়নিষ্ঠতা,—ইহাই হইল গান্ধীচরিত্রের অসামান্য দ্যুতি, ইহাই হইল গান্ধীজীবনের মনোরম আভা।* তিনি তো রাজনৈতিক লাভক্ষতির চেয়ে মানুষের চরিত্রের উপরই বরাবর জোর দিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং অন্য কোনও নেতার নেতৃত্বে সাময়িক জোড়াতালির কুফল এখন ফলিতেছে—এ কথায় বিস্মিত হইবার খুব বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে এই সব সমস্যা এতদিন সাময়িক ধামাচাপা থাকিয়া এখন আবার এইরকম তীব্র আকারে দেখা দিতেছে কেন? তাহা হইলে আমরা নূতন স্বাধীন জাতির ভিত্তি রচনা করিলাম কোন্‌খানে? কেবলমাত্র ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স অ্যাক্ট পাস করানো ছাড়া এই সুদীর্ঘ আন্দোলনের আর কোন স্থায়ী গভীর মূল্য

---

* পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, কিন্তু মনে হয়, গান্ধীজীবনে এই দ্যুতি অন্তত দুইবার খর্ব হইয়াছে। এই দ্যুতি প্রথম মলিন হইয়াছিল সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি হইবার সময়। সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়া উচিত ছিল কি ছিল না, সে তর্ক করিতেছি না। হয়তো সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হইবার বিরুদ্ধে মহাত্মার যথেষ্টই যুক্তি ছিল, কিন্তু যে যুক্তিই থাক্‌, তাহা সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হইবার পূর্বেই মহাত্মা যদি তীক্ষ্ণ নিষ্কুণ্ঠ ভাষায় জানাইয়া দিতেন এবং পরে বলিতেন না যে, সুভাষচন্দ্রের জয় তাঁহার পরাজয়—তাহা হইলে গান্ধীচরিত্রের মহিমা বজায় থাকিত। পূর্বেও গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের প্রার্থিত্ব অনুমোদন করেন নাই সত্য, কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি পরে যে রকম স্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন, পূর্বে সে রকম বলেন নাই, ইহাও সত্য। বলিলে সম্ভবত সুভাষচন্দ্র নির্বাচিতই হইতে পারিতেন না। এই দ্যুতি আমার মনে হয় দ্বিতীয়বার খর্ব হইয়াছিল তাঁহার শেষ কারারুদ্ধি হইতে মুক্তিলাভের পর যখন তিনি ডাঃ জয়াকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আগষ্ট আন্দোলনের দায়িত্ব তাঁহার কি না, এ বিষয়ে আইনের মতে কি বলে? পণ্ডিত নেহরু কারামুক্তির পর এ ধরনের legalistic approach সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়া আগষ্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রহিল না, মহাত্মার মত অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতীয় চরিত্রে ইহার আর কোনও ছাপ রহিল না ?

এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তথাপি কঠিন বিচারের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে এই সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা একটি গভীর মৌলিক সমস্যা। এই সমস্যার গোড়ার কারণ কি তাহার আলোচনার প্রয়োজন আছে, কেননা সেই গোড়ার কারণগুলি দূর করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হইবে না।

বস্তুত, এই সমস্যা অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়িয়াছিল। যখন প্রথম আন্দোলনের সময় গান্ধী-বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে তাকাইবার অবসরই কাহারও নাই, সেই যুগেও রবীন্দ্রনাথের চোখে এই ফাঁক এড়ায় নাই। তাহার কারণও আছে। স্বদেশী আমলের আন্দোলনের সময়েও এই ফাঁক রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই অপ্রিয় সত্য স্পষ্টভাষায় বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সেই সময় এইরকম সাময়িক জোড়াতালি দিয়া নানা সমস্যাকে, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে, চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার কুফল লক্ষ্য করিয়াই সেই যুগের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, জল জল করিয়া মাটির উপর ঘটি ঠুকিলাম, ধূলা উড়িল, কিন্তু জল বাহির হইল না। এই ইতিহাস তাঁহার জানা ছিল। সুতরাং গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন নেতার কণ্ঠে এবার সম্পূর্ণ নূতন সুর থাকিলেও যখন তাহা জাতির জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইল না, তখনই রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে দেরি করেন নাই। তাঁহার "সত্যের আহ্বান" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব,—হাতজোড় করা ভিক্ষার দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন (অর্থাৎ স্বদেশী আমলে) দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালীর কপালে পোলিটিক্যাল

মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবা মাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়।...বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও বড়।...চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেকদিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি।...প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে।...এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে, এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি ভয়ঙ্কর হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে, এক কাজ করাতে ভয়ঙ্কর তাগিদ দিয়েছে। আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, 'আজ তুমি কিছু বোলো না।' দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে—সে লাঠি সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন।...কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।...এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস।...মহাত্মা তার সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি।...কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হ'লে ফল হ'ল কী?...আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্তে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্পকালের জন্তে। কেনই বা অল্পকালের জন্তে? যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের

কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজসৃষ্টি করতে থাকে।...একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যক্রটি স্মরণ করিয়েছি, আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ-রূপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি।...সে আমাদের ব্যবসায় বুদ্ধিকেই প্রধান ক'রে তুলেছে। এই বুদ্ধি কখনো কোন বড় জিনিসকে সৃষ্টি করে নি।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে অন্য প্রবন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া এই কথাটা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই—অতএব সকলকেই চরকার সুতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই, এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করতে হবে, তারপরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল।...হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দুদিনে বশ মানবে, এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ হতে দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।...আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি, নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়।...দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হ'লে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধ'রে চলে। তা যদি না হ'ত তা হ'লে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তারপরে সেটা ধীরে ধীরে হ'ত হাঁটু

পর্যন্ত পা ; তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। যে জিনিষটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোন-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়, তা হ'লে তার সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে।...যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই।...যে মানুষ বলে, 'আগে ফাউণ্টেন-পেন পাব তারপরে মহাকাব্য লিখব,' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউণ্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তারপর স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দিপরা স্বরাজের রঙ্‌করা কাঠামোটার পরেই।"

রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের নানা রচনার মধ্য দিয়া বার বার বলিতে চাহিয়াছিলেন, স্বরাজসাধনা একটি সম্পূর্ণ সামগ্রিক সাধনা—ইহার মধ্যে শর্টকাট আনিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য। সুতরাং চিত্তের সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন এবং কর্মক্ষেত্রে সুচরিত্রের প্রতিষ্ঠা, ইহা ছাড়া সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া স্বরাজ-সাধনা সম্ভব নয়। আর এই যে চেষ্টা,—সে চেষ্টা আইনগত স্বাধীনতালাভের পূর্বেই করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইব না। অথচ কাজের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এই পথে অগ্রসর না হইয়া সব দোষ সব ত্রুটি পরাধীনতার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা যেটুকু করিতে পারি তাহাও না করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি, এবং কারণে অকারণে সীমাহীন উত্তেজনার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বাস্তবিকপক্ষে মহাত্মাজী যাহাই বলুন না কেন, পলিটিক্সের সর্বাঙ্গীণ চর্চা আমরা করি নাই। এক দিকে যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির

চেষ্টায় আমরা আর সবই ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম, হাজার রকম অন্যায় চোখে দেখিয়াও দেখি নাই, অন্য দিকে তেমনই আমাদের যে সব দোষ আছে সে সবও ইংরেজের ঘাড়ে চাপাইয়া কলঙ্কমুক্তির সহজ অথচ অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ইহার ফলে স্বরাজের ভিত্তিতে ফাটল রহিয়া গিয়াছে এবং দুর্নীতির গোড়াপত্তন হইয়াছে। বাংলা দেশে গত মন্বন্তরের সময় লাভ ইংরেজ গভর্মেণ্ট কিছু করিতে যায় নাই। নীতিটা ছিল তাঁহাদের, কিন্তু প্রত্যেক শহরে বন্দরে গঞ্জে চোরাকারবার ও লাভ করিয়াছে আমাদেরই দেশের লোকে। এখনও সীমান্ত দিয়া চোরাই চালান করিতেছে আমাদেরই দেশের লোক। জেলা-বোর্ড,—এমন কি কংগ্রেস-শাসিত জেলা-বোর্ডেও যে দুর্নীতি হয় নাই, এমন নহে। সেই দুর্নীতি কিছু চার্চিল সাহেবের দূত আসিয়া শিখাইয়া যায় নাই। কর্পোরেশনের কথা না-ই উল্লেখ করিলাম। এই সব আমাদের চোখের সামনেই ঘটিয়াছে। কিন্তু সবই পরাধীনতার অজুহাত দিয়া আমরা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম। বাস্তবিক পরাধীনতার সঙ্গে যাহার কোনই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, যে সম্বন্ধে অনেক আগেই আমাদের রুখিয়া দাঁড়ানো উচিত ছিল, তখন আমরা তাহা করি নাই। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আজ করিতে হইতেছে।

আর সত্য কথা বলিতে হইলে, শুধু দুর্নীতি নিবারণ কেন, আমরা অন্য দিকেও তো জাতীয় চরিত্র গঠন করিবার কোনও চেষ্টা করি নাই। গান্ধীজী যাহাই বলুন, আমরা 'সাধু উপায়ে হউক, অসাধু উপায়ে হউক, ইংরেজ সাম্রাজ্যটাকে দুড়্‌দাড়্‌ করিয়া ভাঙিয়া দাও' ইহা ছাড়া আর কোনও কাজই করি নাই। ইংরেজ-শাসনে আমাদের দেশের উন্নতি হওয়া অবশ্য সম্ভব ছিল না, শিল্পের উন্নতি, দিকে দিকে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা—এ সমস্ত কাজে প্রতি পদে বাধা হইত, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যেটুকু সুযোগ আমাদের সেই অবস্থাতেই মিলিয়াছিল, আমরা কি সেটুকু সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিয়াছি? বই টুকিয়া পরীক্ষা দেওয়া, প্রশ্ন আন্দাজ করিয়া পরীক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি ফাঁকির যত রকম উপায় আছে, ছাত্রেরা তাহা সম্বন্ধে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ফল হইয়াছে কি? শেষ

পর্যন্ত পরীক্ষা ফাঁকি দিতে গিয়া জাতি হিসাবে আমরাই তো ফাঁকে পড়িয়াছি। যেখানে ভাল ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন, ভাল বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন, সেইখানেই আমাদের অভাব। দুই-চারজন অসাধারণ ব্যক্তির কথা বলিতেছি না। জেমস্ জীন্স্, রমন, মেঘনাদ সাহা সব সময় কেন আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছেন না—এমন অভিযোগ করি না। কিন্তু এ দেশের সাধারণ ছাত্রের প্রতিভা অন্য দেশের সাধারণ ছাত্রের প্রতিভার চেয়ে কিছু কম না হইলেও সাধারণ বিশেষজ্ঞদের বেলাতেও আজ এত তফাত দেখি কেন? শুধু সাধারণ ছাত্রদের কথাই বা বলি কেন? ভারতবর্ষের কুলীন চাকুরিয়া তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি আই-সি-এস্‌দের কথাই ধরা যাক। বিদেশ হইতে ঝানু সিভিলিয়ানরা আসিয়া এ দেশে জোর দাপটে রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিই ইংরেজ সাম্রাজ্যের ক্ষতির সব চেয়ে বড় কারণ। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী ঝানু সাহেবদেরই অনেকে সাত সাগর পার হইয়া আসিয়া এ দেশ সম্বন্ধে এমন গভীর চর্চা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের পরিশ্রম ও বিদ্যাবত্তার ফল এখনও আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই সম্বল হইয়া আছে। হাণ্টার সাহেবের রচনাগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনকার ও'ম্যালি সাহেব পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পশুপক্ষীতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি কত ।বষয়ে সিভিলিয়ানদের রচিত গ্রন্থ অনেক সময় এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া আছে; ইংরেজের প্রতি যতই বিদ্বেষ থাক্ না কেন, এ কথা বুদ্ধিজীবী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতীয় সিভিলিয়ানরাও বুদ্ধির জোরে ইঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্থানলাভ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে এইরকম নানা বিষয়ে রচনা দেখিতে পাই না কেন? সাহেব সিভিলিয়ানদের বই না লিখিলে মাহিনা-বৃদ্ধি বন্ধ হইবার কোনও ভয় ছিল না, ইঁহাদেরও নাই। তবে এই তফাত কেন? আবার ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যেই প্রাচীনকালের সঙ্গে একালের পার্থক্য তুলনীয়। রমেশচন্দ্র দত্তের কথা উল্লেখ করিতেছি। চাকরি করিতে করিতেও কোন্ দিকে তিনি প্রতিভার বিস্ময়কর ছাপ না

রাখিয়া গিয়াছেন? তাঁহার ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আজও বিস্ময়ের বস্তু—এখনও ঐরকম বই রচিত হওয়া দুর্লভ। বেদের অনুবাদ, রামায়ণের ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ, বাংলা উপন্যাস রচনা, সাহিত্য-পরিষদে উৎসাহ দান—দিকে দিকে তাঁহার প্রতিভার বিস্ময়কর উন্মীলনের পরিচয় আমরা পাই। সুরেন্দ্রনাথও প্রথমে এই সিভিলিয়ান-কুলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একালের সিভিলিয়ানদের তুলনা করা যাইতে পারে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যে সব ভারতীয় সিভিলিয়ান বড় বড় পদ অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চাকরি বজায় ও ফাইলে নোট লেখা ছাড়া আর কি করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফিরিস্তি করা উচিত। জ্যাক সাহেব তো বিদেশী; কিন্তু তিনি ফরিদপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় সেখানকার লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এখন পর্যন্ত কোনও এ-দেশী ম্যাজিস্ট্রেট অন্য আর একটি জেলায় নিজের আগ্রহে ঐ রকম কিছু করিয়াছেন? শুধু ছাত্রেরাই ফাঁকি দেয় না, শ্রেষ্ঠ ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ ও কুলীন চাকুরিয়া সিভিলিয়ানরাও ফাঁকি দিতেছে, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ খুঁজিতে বেশি দূর যাইতে হইবে না। অপরকে ঠকানো আমাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সকলেই যদি দুধ-সরোবরে এক ঘটি করিয়া জল ঢালে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত যে দুধ-সরোবর জল-সরোবর হইয়া যায়—এ কথাটা কেহই মনে রাখি না। কাজেই সকলেই অপরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিলে এই সর্বজনীন ঠকাইবার চেষ্টায় জাতিই শেষ পর্যন্ত ঠকিয়া যায়। ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। আমার মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুকে প্রাণপণে মাজিয়া ঘষিয়া নিরলস কর্ম ও অবিরাম সাধনার মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠভাবে দেশকে আমি তাহা দিতেছি কি? প্রত্যেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহার জ্ঞান ও কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে দিবার জন্য ফাঁকি-বিহীন চেষ্টা করিতেছে কি? তাহা নাই, বরং উল্টা প্রচেষ্টা আছে। সেইজন্যই দেশময় এইরূপ গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা। কোনও কাজ অগ্রসর হয় না, বড় বড় কাগজের পরিকল্পনা হয়, বাস্তবে কিছুই হয় না।

এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে—দুই-তিনটি জিনিস সম্বন্ধে মন স্থির করিতে হইবে, কোনরকম ইতস্তত করিলে চলিবে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কর্মযোগ হয় না। ইহার প্রথম জিনিসটির কথা পূর্বেই বলিয়াছি, সেটি হইল রাষ্ট্রের স্বরূপ ও কর্ম-পরিধি নির্ধারণ। এই প্রসঙ্গে সেই পুরানো কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। এই যে সমস্ত অসুবিধার কথা উল্লেখ করিলাম, এ সমস্ত যখন ঘটিয়াছে তখন মহাত্মার প্রভাব অসীম, আর তিনি তাঁহার গঠনমূলক কর্মসূচীর কথাও বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলা সত্ত্বেও জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে সেই কর্মসূচী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জাতীয় সপ্তাহের সময় একদিন হয়তো হরিজন-দিবস পালন করা হয়, কিন্তু হরিজনদের উন্নতি আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, তখন যদি বা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া এই রকম কর্মসূচী গ্রহণ করা চলিতে পারিত, এখন আর তাহা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, তাহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং বর্তমান অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আগে যে ভুল আমরা করিয়াছি, সে ভুল আমাদের করিলে চলিবে না। জাতীয় চরিত্রকে মজবুত করিয়া গড়িতে না পারিলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেইজন্য প্রথমেই দৃঢ়নিশ্চয় করিতে হইবে, যাহাতে জাতীয় চরিত্র ব্যাহত হয় এমন কোনও রফাই করিব না, তাহাতে যতই অসুবিধা হউক না কেন। দ্বিতীয়ত, জাতির নেতাদের এমন ব্যাপক ক্ষেত্রে উদাত্ত আহ্বান করিতে হইবে, যাহাতে চিত্তের সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ঘটে। দেশপ্রতিমার এই মহাপূজায় কুমোরে ঘট গড়িবে, প্রতিমা তৈয়ারি করিবে, মালাকর সাজ তৈয়ারি করিবে, ঢুলী বাজনা বাজাইবে, ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়িবে, মালী ফুল যোগাইবে, বাড়ির কর্তা পূজা করিবেন, গৃহিণী ভোগ সাজাইবেন, আত্মীয়স্বজন আনন্দ করিবেন, মেয়েরা ভোজ রাঁধিবে,—বঙ্কিমচন্দ্র তো এমনই প্রতিমাপূজার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তো কাহারও বাহিরে পড়িয়া থাকার কথা ছিল না। সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে ছাড়া মায়ের অভিষেক হইবে না, মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তো সেই

গানই গাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আজ যখন সেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তখন জাতির নেতারা কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়া বলুন, যে যেখানে আছ, কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দাও। সহায়হীন, সম্বলহীন অবস্থায় অসীম দুঃখদুর্দশার বোঝা মাথায় লইয়া নিদারুণ দুঃসময়ে স্বাধীন হইয়াছি। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের লোকের দুর্জয় সংকল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়া তো সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবার নহে। এইজন্য আঠারো দফা কেন, ছত্রিশ দফা বা ছাপ্পান্ন দফা কর্মসূচী তোমাদের সামনে রহিল। যে শিক্ষাব্রতী সে নূতন মানুষ গড়িবার কাজে লাগিয়া যাক, যে যন্ত্রবিদ্ সে সেই দিকে কাজ করিতে থাকুক, যে শিল্পী সে নূতন শিল্পরচনায় দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলুক, গ্রামের নেতা গ্রামের লোককে একত্রিত করিয়া দেশের কাজে লাগাইয়া দিন, প্রদেশের নেতা প্রদেশকে গড়িয়া তুলুন। কিন্তু সকলেই ফাঁকি না দিয়া কাজ করুন, নিজের মধ্যে যে জিনিস আছে তাহাকে বাহিরে আনিয়া মাজিয়া ঘষিয়া সমৃদ্ধ করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ উপকারে লাগাইয়া দিন। ইহার মধ্যে যেন প্রবঞ্চনা না থাকে, কারণ তাহা হইলে বছরে একদিন ধুমধামের সহিত গান্ধী-জন্মতিথি বা হরিজন-দিবস পালন হইতে পারে, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হইবে না।

সুতরাং দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, গান্ধীজীর কর্মসূচীকে আজ আনুষ্ঠানিক বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি দিয়া এইভাবে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে, জীবনের প্রত্যেক দিকে তাহাকে বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আগে হইতে এইরূপ চেষ্টা হইলে আমরা এখন এইরকম অবস্থায় পড়িতাম না।

কিন্তু এই সঙ্গে আরও দুইটি কথা আছে, সে দুইটিই হইল তৃতীয় ও চতুর্থ কথা। গান্ধীজীর কর্মসূচীকে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া দেশজোড়া action-therapy-র কথা ঠিক এইভাবে না বলিলেও নেতারা তো নানা বিষয়ে আহ্বান প্রায়ই দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দেশ তেমনভাবে সাড়া দিয়া উঠিতেছে না কেন? তেমন বিপুল উৎসাহ ও কর্মচঞ্চলতার বন্যায় দেশ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে না কেন? ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইল, আমরা যতই আহ্বান জানাই না কেন, আমাদের কাজের

পদ্ধতিটার এমন সংস্কার করি নাই যাহাতে প্রত্যেকে কাজের সুযোগ পাইতে পারে। খাল কাটিবার জন্য যে গাঁইতি শাবল কোদাল দরকার তাহার লোহাটুকুর জন্যও তো সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে লেখালেখি করিতে হইবে, তাহাতে দেরি হইয়া গেলেই কাজের দফা রফা। একটা ছোট গ্রামের রাস্তা করিতে হইবে, তাহার জন্য সার্কেল-অফিসার মহকুমা-শাসক জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার সাহেবের দপ্তর হইয়া লালদীঘি পর্যন্ত আবেদন জানাইতে হইলেই বছরখানেক ধরিয়া তো চিঠিপত্র চলুক, তাহার পর রাস্তার কথা ভাবিতে হইবে। এই অবস্থায় কাজের আহ্বান দিলে লোকে দুই-একবার সাড়া দিয়া আর উৎসাহ বোধ করিবে না। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-যন্ত্রকে এমনভাবে সংস্কার করিতে হইবে, এমন পরিমাণে বিকেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, এমন এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে বড় বড় পরিকল্পনায় সকলে অংশ গ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্য সমস্ত পরিকল্পনায় প্রত্যেকেরই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কাজ করিবার ক্ষেত্র মিলিবে।

সেই সঙ্গে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বদলাইতে হইবে। রাষ্ট্রকে বদলাইয়া তাহার কাঠামো কাজের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া জনসাধারণ একটা আলাদা সংস্থা চালাইবার চেষ্টা করিবে,—এ মতবাদ আমাদের ছাড়িতে হইবে। এখন রাষ্ট্রকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে ইতস্তত করিলে চলিবে না। সুতরাং শুধু উদাত্ত আহ্বান জানাইলেই চলিবে না, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের কাঠামো ও কর্মের প্রণালী এমনভাবে গড়িয়া দিতে হইবে, যাহাতে সকলেই কাজ করিবার ক্ষেত্র পায়, সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারে যে, তাহার কাজের উপরও রাষ্ট্রের অগ্রগতি নির্ভর করে। ইহাই হইল তৃতীয় কথা।

সবশেষে চতুর্থ কথাটি বলিতেছি। গান্ধীজীর কর্মসূচীকে ব্যাপক রূপ দিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইলাম, সেইমত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কার করিয়া কাজের ক্ষেত্রও রচনা করিয়া দিলাম। কিন্তু এগুলি সত্ত্বেও দেশের চিত্ত স্পন্দিত হইয়া

উঠিবে না, যদি না যে কাজের জন্য আহ্বান জানাইলাম ও ক্ষেত্র রচনা করিলাম, সেই কাজে দেশের লোক উৎসাহ বোধ করে। কাজে অগ্রসর হইবার আগে লোকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, কাজটা কেমন, যাহার জন্য অগ্রসর হইব? সুতরাং এই সঙ্গে কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রয়োজন হইয়াছে।

দুইটি কারণে এইরূপ ঘোষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি, ততদিন আমরা বার বার দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি, আমাদের আদর্শ কৃষাণ-প্রজা-মজুর-রাজ। এই ঘোষণার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। তথাকথিত বামপন্থীরা কংগ্রেসকে যতই গালাগালি দিন না কেন, এই রকম নানা অসুবিধার মধ্যেও কংগ্রেস ধীরে ধীরে সেই লক্ষ্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার লোপ পাইতে চলিয়াছে, শিল্পের জাতীয়করণ ধীরে ধীরে হইতেছে। অবস্থা-গতিকে তাহার গতি মন্থর হইতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়াই বামপন্থীরা বাম হইবার সুযোগলাভ করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা যাক। ধরিয়া লইলাম, কংগ্রেস ধীরে ধীরে সে পথে চলিতেছে। কিন্তু আজ যাহাই হউক না কেন, ভবিষ্যতে তাহার পথভ্রান্তি অনিবার্য যদি না তাহার নিজের policy ঠিক থাকে। এতদিন পর্যন্ত আমরা কৃষক-প্রজা-মজুর-রাজের কথা বলিয়াছি, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থত্যাগের ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত না বাধিয়া মিল থাকিয়া যাইবে এই কথাই আমরা বলিয়া আসিয়াছি। Class-struggle-এর বদলে class-adjustment-এর কথাই বলিয়া আসিয়াছি।

এ তো পুরানো তর্ক, ইহার দোষ-গুণ সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা লইয়া বহু বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এই সমস্যা নূতন আকারে তীব্রতররূপে দেখা দিয়াছে। প্রথমত, পূর্বে সংগ্রামের সময় যাঁহারা এক পক্ষে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংগ্রামের অজুহাতে একটা জোড়াতালি মিলন করানো অসম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস তখন ক্ষমতা পায় নাই। সুতরাং ফেরারী আসামীদের জন্য কিছু অর্থ তখন না হয় বড়-লোকেরা দিতেন, কিন্তু তাহার বদলে এখনকার মত বাস-ট্যাক্সি-

র‍্যাশনশপ-ক্লথডীলারের-লাইসেন্স-পারমিট তো চাহিয়া বসিবার সুযোগ ছিল না। আজ কিন্তু অবস্থা-বদল হইয়াছে। সেইজন্য সেকালে যাঁহাদের কাছে বাধ্যবাধকতা করিতে বিশেষ ভয় ছিল না, আজ সে ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষেও দেখা গেল, স্বার্থবুদ্ধিকে ছাপাইয়া শুভবুদ্ধি কোনও দিনই প্রবল হইতে পারে না, ইহা মানবধর্ম নয়। তাহা না হইলে বার বার অনুনয়বিনয়, ধমক, তর্জনগর্জন ইত্যাদি নানারকম হওয়া সত্ত্বেও দেশে নির্লজ্জ লোভ, চোরাকারবার ও অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা কমিতেছে না কেন? শিল্পপতিদের তো পণ্ডিত নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না, জিনিসপত্রের দামও কমিতেছে না, দাম কমাইতে গেলেই জিনিসপত্র সাদাবাজার হইতে উধাও হইয়া কালোবাজারে ঢুকিতেছে এবং তখন কি কেন্দ্রীয় সরকার কি প্রাদেশিক সরকার সকলেই নিরুপায়ভাবে দেখিতেছেন, কেবল মরিতেছে সাধারণ লোক। জাতীয় নেতাদের আবেদন সত্ত্বেও স্বার্থবুদ্ধির বদলে শুভবুদ্ধির পরিচয় তো পাওয়া যাইতেছে না। চতুর্থত, পূর্বের ভারতবর্ষ, অর্থাৎ এমন কি দশ বছর আগের ভারতবর্ষ—আর বর্তমান ভারতবর্ষ এক নহে। এখন ভারতবর্ষ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। Capitalism-এর এতখানি চেহারা ভারতবর্ষে আগে ছিল না। সেইজন্য এখনই তাহাকে তাহার যাত্রাপথ ঠিক করিতে হইবে। দৃঢ় চিত্তে কঠিন হস্তে অগ্রসর হইতে পারিলে তাহাকে পুরা ধনতন্ত্রের চক্র ঘুরিয়া সমাজবাদে পৌঁছিতে হইবে না—ধনতন্ত্রের যে technical benefits তাহা গ্রহণ করিয়াও সে ধনতন্ত্রের আনুষঙ্গিক কষ্টকাহিনী বাদ দিয়া সরাসরি সমাজবাদে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং পূর্বে যেখানে class-adjustment-এর কথা বলা চলিত, হয়তো খানিকটা সম্ভবও ছিল, এখন আর তাহা সম্ভব নহে।

এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইলে দৃঢ় চিত্তে ও কঠিন হস্তে অগ্রসর হইতে বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একে তো ধনতন্ত্রের জাল ছেঁড়া স্বভাবতই কঠিন, বিশেষত এ দেশের শ্রমিক-কৃষকেরা এখনও আশানুরূপ সচেতন ও সংঘবদ্ধ নহে। তাহার উপর ভারতবর্ষ যে অবস্থায়

পড়িয়াছে, তাহাতে ধনতন্ত্রের হাত হইতে তাহার উদ্ধার পাওয়া সহজ নয়। ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি? বহু ব্যাপারেই আমরা পরমুখাপেক্ষী। আমাদের মোটর-কারখানা নাই, এরোপ্লেন-কারখানা নাই, জাহাজ-নির্মাণের ব্যবস্থা নাই, যথেষ্ট পরিমাণ ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা নাই। অথচ দেশরক্ষার জন্য, দেশের উন্নতির জন্য এবং মুদ্রা-বিনিময়ের সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাদের এ সব গড়িয়া তুলিতেই হইবে। দেশকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে আরও অনেক জিনিস—যেমন কাপড়কল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কলও গড়িতে হইবে। এত কাজ একসঙ্গে গড়িবার মত উপকরণ এবং অর্থ ও লোকবল সরকারের নাই। অথচ যত দিন যাইতেছে, আন্তর্জাতিক আকাশ যতই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যতই ক্ষীণ হইতেছে, ততই আমরা সংকটের দিকে আগাইতেছি। সেইজন্য এইসব শিল্প যত তাড়াতাড়ি গড়িয়া উঠে ততই ভাল, দেরি করিবার সময় নাই। কিন্তু যদি সরকারের এইরকম গরজ পড়ে, তাহা হইলেই তো শিল্পপতিদের পোয়া বারো—তাঁহাদের কথা না শুনিয়া সরকারের উপায় নাই। আর, সরকার যদি তাঁহাদের কথা না শোনেন, শিল্প হইবে না,—ফলে সাধারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের জন্যও পরদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। অর্থাৎ দেশী ধনিক-সমাজের বদলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও বিদেশী ধনতন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর।

এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ইংরেজীতে যাহাকে বলে—half-hearted measure, তাহাতে হইবে না। আমাদের ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের মনোবল, শাসনযন্ত্রের শক্তি ও জনসাধারণের চিত্তদৃঢ়তা এতটা আছে কি না, যাহাতে এই অবস্থা ভাঙিয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিতে যে বিপুল কষ্ট দুঃখদুর্দশা এবং গোলমাল হইবে, তাহা অতিক্রমণ করা সম্ভব হইবে। যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে এখন হইতে ধাপে ধাপে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী স্থির করিয়া অবিচলিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা যতই সম-সমাজ চাই না

কেন, কৃষক-মজুর-রাজ চাই না কেন, সেদিকে কাজ বিশেষ অগ্রসর হইবে না।

আর হইতেছেও তাহাই। আমরা কখনও নরম কখনও ব গরম গাহিতেছি, ফলে আমাদের গতি চংক্রমিত, সরল রেখা উর্ধ্বগতি নয়। একই জিনিস কতবার নিয়ন্ত্রণ, কতবার বিনিয়ন্ত্রণ হইল, বাণিজ্য-নীতিতে কতবার খোলা আমদানির অধিকার দেওয়া হইল, আবার বন্ধ করা হইল, শিল্পনীতিতে একবার বৃহৎ শিল্পস্থাপনের নীতি গৃহীত হইল, অথচ এখন বলা হইতেছে, খাদ্যসমস্যা এতই বড় যে এখন বৃহৎ শিল্পের কথা আপাতত না বেশি করিয়া তুলিয়া অল্পে-স্বল্পে যে সব শিল্প হয়—যেমন কুটীর-শিল্প—তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। শিল্পে শ্রমিক-মালিকদের মুনাফা-বণ্টন (profit sharing) সম্বন্ধে কত কমিটী বসিল, কত মাথা-ঘামানো হইল—তাহার পর প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক মন্ত্রী ও সেক্রেটারি এবং শ্রমিক ও মালিকদের ডাকাইয়া দিল্লীতে সভা বসিল। কিন্তু তাহাতে যেই দুই-একজন শিল্পপতি আপত্তি করিলেন, অমনই সম্মেলন স্থগিত হইয়া গেল। আবার কত দিনে এই ব্যাপারটি উঠিবে কে জানে! এই ধরনের ব্যাপার ঘটিলে লোকের মন উৎসাহ পায় না। যাহা পারিব না তাহা বলিবও না, তাহাতে হাতও দিব না, কিন্তু যাহা ধরিব তাহা দৃঢ়চিত্তে শেষ পর্যন্ত করিয়া ছাড়িব—ইহা না হইলে লোককে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না। সেইজন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের খুব পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার এবং আমাদের আদর্শ কি সে সম্বন্ধেও খুব পরিষ্কার ধারণা ও নীতি থাকা দরকার। আজ এই সকল কথা খুব স্পষ্টভাবে বিচার করা ও ঘোষণা করার দিন আসিয়াছে। এখন বলিতে হইবে, আমরা আর class-adjustment-এ বিশ্বাস করি না, স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ে স্বেচ্ছায় class-adjustment-এর যে আশা গান্ধীজী বলিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই, সুতরাং আমরা শ্রেণী-সংগ্রাম মানিয়া লইতেছি এবং তাহার মধ্যে সরাসরি সমাজবাদে পৌঁছিবার জন্য যাহা-কিছু দরকার সমস্তই দৃঢ়হস্তে করিব। এই ক্ষেত্রেও অহিংস অসহযোগের দ্বারা ধনতন্ত্রের

অবসান ঘটানো যাইতে পারে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে ; কারণ গান্ধীজী যে শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের অবসানের পরিবর্তে "Eastern Socialism"-এর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

কংগ্রেসে যে নূতন নূতন কর্মী গড়িয়া উঠিতেছে না এবং ফলে যাঁহারা এককালে কর্তা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চিরকাল কর্তা হইয়া রহিয়া গেলেন, কংগ্রেসের মধ্যে তরুণ চিত্ত ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য হইল না, ইহারও কারণ তাহাই। এই ধরনের সর্বজনসমন্বয় ও class-adjustment-এর কথায় তরুণ চিত্ত সাড়া দেয় নাই। আগস্ট-আন্দোলনের বৈপ্লবিক মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া বহু তরুণ আগাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে নিতান্ত সাময়িক। ক্ষণিক উত্তেজনার পর তাহারা ছিটকাইয়া পড়িয়াছে অথবা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, সত্যকারের নৈষ্ঠিক কর্মীতেও পরিণত হয় নাই। আজ যদি এই তরুণ চিত্ত জয় করিয়া ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা ক রতে হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে পথ বাছিয়া লই ইবে এবং সেই পথে অবিচলভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। ইতস্তত চলিবে না, তাহাতে হউক না দুঃখকষ্ট, ক্ষতি কি? ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পণ্ডিত নেহরু ৬।১০।৪৯ তারিখে বোম্বাই আইন-সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—My reading of history has convinced me that Government could make people put up with any amount of hardship even willingly provided the people knew why they were suffering inconveniences and also the burden was shared by all. ইহা অত্যন্ত খাঁটি কথা। পণ্ডিত নেহরু আরও বলিয়াছেন—Government must define clearly their objectives. Saying merely that they wished to raise the standards of the common man was a very vague statement and was

* বস্তুত এ বিষয়েও গান্ধীজী ক্রমেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতেছিলেন। এ বিষয়ে বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

merely an expression of goodwill on their part. বর্তমান পটভূমিকায় ইহার চেয়ে দরকারী কথাও আর নাই।

এইভাবে নূতন হাওয়া বহাইতে না পারিলে কংগ্রেসের চেহারা বদলাইবে না, তাহার মধ্যে সজীব প্রাণের দুর্নিবার গতি ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিবে। যাঁহারা পঁচিশ বছর, ত্রিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর আগে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও এত পরিবেশ বদল সত্ত্বেও সমাজবিবর্তনের পুরোভাগে থাকিয়া নূতন নূতন প্রেরণা যোগাইতে থাকিবেন, ইহা আশা করাই তো জৈব ধর্মের ব্যতিক্রম। তাহার উপর যখন দেখা যায়, কংগ্রেস-কমিটীতে তাঁহাদের নির্বিরোধ আধিপত্য, নূতন কালের নূতন হাওয়ার নূতন মতবাদ অবলম্বন করিয়া দৃঢ়সংকল্প নবীন কর্মীদলের কোনও চিহ্নই সেখানে নাই, তখন যদি দাদাদের মধ্যে কেহ সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন, তবেই সেখানে কংগ্রেস-কমিটীর চেহারা নূতন কালের উপযোগী হইল! আর যদি দাদারা সেরূপ অগ্রসর হইতে না পারিলেন, সেখানে একদম নিশ্চিন্ত—নূতন নূতন ভাবের ধারা, নূতন সমস্যার উপলব্ধি, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর চাপ, নূতন উৎসাহের স্পর্শ হইতে সে-সব কমিটী সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া রহিল;—ফলে সেখানে দেখা দিল হয় পণ্ডিচেরীর প্রভাব, না হয় তো গান্ধীবাদ=কম্যুনিজ্‌ম এই দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত স্থাপনের উৎকট প্রয়াস। এই সমস্ত স্রোতের জলের লক্ষণ নহে, বদ্ধ জলের ঘূর্ণি মাত্র। গান্ধীজীর দৃষ্টি তো কখনও নিজের থিওরির জালেও আটকাইয়া যায় নাই, তিনি সর্বদাই নূতন নূতন পথ কাটিয়া চলিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার সেই শিক্ষা গ্রহণ করিব না কেন?

৪

আজ দোসরা অক্টোবর, গান্ধীজীর জন্মদিন। এই দিনে তাঁহার জীবনের কাহিনী যতই ভাবি, ততই তাহার দীপ্তিতে বিস্মিত হইতে হয়, মাধুর্যে ও প্রসন্নতায় হৃদয় ভরিয়া যায়। সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশ তো তাঁহার মধ্যে একনীড় হইয়া ছিল, প্রত্যেকটি লোকের মনে অহরহ

এই আশ্বাস তো ছিল যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নরনারীর সুখদুঃখ-বেদনার শিয়রে একটি মানুষ অতন্দ্র জাগিয়া বসিয়া আছেন, যিনি নিজে সকল লোকের ব্যথা আহরণ করিয়া সেই বিষ ধারণ করিয়া সকলকে অমৃত বিলাইতেছেন। শাস্ত্রে বলে, আমাদের গ্রহসূর্যতারা সবাই ভয় হইতে কাজ করিতেছে, কথিত আছে—ভয়াদ্ অস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি চ সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কিন্তু মহাত্মার মধ্যে তো রুদ্রের এ রূপ দেখা দেয় নাই। বরং রুদ্রের অন্য যে রূপটি আছে, তাঁহার যে দক্ষিণ মুখ হইতে তিনি জগৎকে করুণার প্লাবন-ধারায় ত্রাণ করেন, মহাত্মার মধ্যে সেই রূপ, সেই প্লাবন-ধারার গোমুখীমুখই তো আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আজ তো আর গোটা ভারতবর্ষের শিয়রে সেই রকম অবিচল অতন্দ্র একজন কেহ বসিয়া নাই! আমরা তো সেই মহৎ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আর শুধু কি তাহাই? আমরা কি শুধু সেই আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, আমাদের মধ্য হইতে মহামানবের উপস্থিতি হারাইয়াছি? মহাত্মার মত এমন জীবনশিল্পীও তো সহজে দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে সন্ন্যাসীর উদয় এখানে হইল, সেই সন্ন্যাসী শুধু যে ক্রমেই নিজের সাধনার অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সৌরমণ্ডল তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সৌরমণ্ডলই তো আজ ভারতবর্ষকে পরিচালনা করিতেছেন। কই, তিনি যাঁহাদের গড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তো আবার নূতন সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না! শুধু তাহাই নহে। যে সংকল্প লইয়া তিনি সাধনা শুরু করিয়াছিলেন সেই সংকল্পের যখন সিদ্ধি হইল, যে যুগ তিনি সৃষ্টি করিলেন সেই যুগ যখন অবসান হইয়া ক্রমে যুগবদলের পালা দেখা দিল, তখনই তিনি দেশকে নূতন পথ খুঁজিবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়া চলিয়া গেলেন। আর কেবল ইহাই তো নয়। দ্বিখণ্ডিত ভারতের বেদনায় তিনি তো শান্তি পান নাই। শোনা যায়, যখন ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস এই দ্বিখণ্ডিত ভারত গ্রহণ করিতেছে, করিতে দাও, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি করিব। আর করিয়াছিলেন তো তাহাই। ওদিকে দিল্লীতে জয়ধ্বনি উঠিল,

এদিকে তিনি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে, বেলেঘাটার বাড়ির ক্রুদ্ধ জনতার সামনে তাঁহার অসীম বেদনার ভার বহন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত শুরু করিলেন। দেশকে রাজা করিলেন, নিজে সন্ন্যাসী রহিয়া গেলেন। ওদিকে রাজ্যাভিষেকের নহবৎ মিলাইতে না মিলাইতে দেশে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বহিয়া গেল। জীবনকে এমন করিয়া সাজানো এবং এমন করিয়া ত্যাগ করা, ইহার মহিমাও তো গান্ধীজীবনের অন্য মহিমার চেয়ে কম নহে।

আমরা তাঁহার সম-সাময়িক কালে জন্মিয়াছি, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কণ্ঠ শুনিয়াছি, আমাদের এ সৌভাগ্যে আমাদের উত্তরাধিকারীরা ঈর্ষা করিবে। তেমনই তাঁহার মহৎ উত্তরাধিকারের দায়ও আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। কেবল জয় উদীরণ করিয়া সেই দায় পূরণ করা যাইবে না। গান্ধীজীর জীবনকে আমরা অবমাননা না করি, তাঁহাকে শুধু ঠাকুরপূজা করিয়া আমরা নিঃশেষ করিয়া না দিই, তাঁহার জীবন-বেদকে সূত্রসংহিতার ভাষ্যে জড়াইয়া ফসিল বানাইয়া কাজের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া না দিই। তাঁহার জীবন-বেদ ও কর্মের সাধনাকে আমরা অনুধাবন করি, তাঁহার সৃষ্টি যেন আমরা ভবিষ্যতের ভিত্তিস্বরূপে ব্যবহার করিতে পারি, ইতিহাসের বিবর্তনে আমাদের সামনে যে নূতন যুগ উপস্থিত হইতেছে, সেই যুগের দাবি মিটাইবার জন্য নূতন উদ্দীপনা, নূতন কর্মপ্রবাহ, নূতন কাজের নিরলস সাধনা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সবল বলিষ্ঠ আহ্বানে সমস্ত দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমস্ত বাধাবিপত্তি দুর্নিবার সাহসে অতিক্রমণ করিবার শক্তি আমরা সঞ্চয় করি। তাহা না হইলে —গান্ধীজীকো জয় পুকারকে আপ্ লোগ উন্‌কা ক্যা শান বঢ়ায়েঙ্গে?

"দায়ভাগী"

বাংলা দেশের এত দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগ কোন্দল-কোলাহল জরা-মৃত্যুর মাঝখানে দিল্লীর নন্দন-কানন লিমিটেড যে শাখা খুলিয়া বসিয়া আছেন তাহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। কলিকাতায় গার্স্টিন প্লেসের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটিই যেন ভূমিকম্প-জলপ্লাবন-লাঞ্ছিত ধরিত্রীর মধ্যস্থলে নিবাতনিষ্কম্প ব্যাসকাশী; কদর্য বস্ত্রীতার

পূর্ণ এক গোলাপ-অরণ্য রক্তচিত্ত
চ'লে গেল সাথে। নক্ষত্রের পানশালা
বিন্দু দিয়ে ভ'রে দিল রসের পেয়ালা।
সাকীর অধর-প্রান্তে হাস্য-দীপ জ্বালা॥

৩

বর্ষহীন অন্ধকারে দীপাবলি জ্বালি
ব'সে আছি কামনার উন্মাদ বেদীতে।
বলেছিল, আসিবে সে।
নয়ন-অঞ্জন
চক্ষে দেবে মাখাইয়া; প্রান্তে অধরের
দেবে আনি গোলাপের বাণী, রাত্রিখানি
করিবে চকিত মদিরার মধুগীত;
কাব্য ব'লে মনে হবে প্রেমের বেদনা—
রাত্রির প্রমাদে-হাসা প্রভাতের চাঁদ।

সাকী আসে নাই। জানি আমি আসিবে না।
হে হাফিজ, তোমার মরণরথে বসি
সে বুঝি শুনিছে—"পৃথিবী মসজিদ নয়,
মৃত্যুমুগ্ধ কাঁপিছে সম্রাট্; আছে জয়—
শুধু এক বাঁকা-রেখা প্রেমের পাতায়,
পাখি-ডাকা ফুলবনে, রক্তমদিরায়॥"

৪

মানবের সংসারেতে ওঠে কলরব
"শুধু ভুল, শুধু ভুল, শুধু ভুল সব
ক্ষেত্রমাঝে কাঁপে শুধু মুহূর্তের প্রাণ
কর্মের প্রহার ছাড়া ধর্ম হেথা ম্লান।"

বোঝে না মানব—সংসার তাহার নয়
সাম্রাজ্য একক। গোলাপের বীথিবনে,
চামেলির নিমন্ত্রণে, দোয়েলের শিসে
সামান্য সংসার আরো রয়েছে যে পাতা।

লক্ষ লক্ষ সংসারের মাধুর্য কুড়ায়ে
গড়েছি মানবে আমি। সৃষ্টিধ্বংসী প্রাণ
চলেছে পথিকরূপে ;—বনে বনান্তরে
যুগ-যজ্ঞ-গৃহে ;—খুলিয়া একটি দ্বার
আরেক দুয়ারে।
হে হাফিজ, সুরাশ্রয়ী
তোমার মদিরাধ্যক্ষ আমি শিষ্য রহি ॥

৫

হাফিজের সাকী, লগ্নদৃষ্টি আছি আমি
তোমার আঁখিতে। পানপাত্র হৈফাজিক
রয়েছে অধর চুমি। দীন হাফিজের
প্রফুল্ল গোলাপবন দিয়েছে হৃদয়ে
নবরক্তসঞ্চারিণী ব্যথা।
হে হাফিজ,
কী হবে আমার!
পরিমিত ছন্দ লয়ে
সাধারণী আর্তা সেই ক্ষুধাটারে ল'য়ে
জাগরণহীন এক সভ্য মনুষ্যের
সাম্রাজ্জীয় আলস্যের অবহেলা ল'য়ে,
কী হবে আমার!
আমি তো আমাতে নেই।
তার চেয়ে তুমি এস, এস, সৃষ্টি কর,
বর্ণাঞ্চলা পূর্ণনবা সাকীরে তোমার
মদিরার রক্তপ্রাণ আনন্দবন্যাতে।
অপূর্ব সে অভিসারে আমি আছি সাথে ॥

৬

কাব্যবীথি ফুলবনে পুষ্পচয়ী আমি।
তোমার সুঘ্রাণ এসেছে আমার কাছে
শতাব্দীর পরঃসীমা হতে। হে হাফিজ,

মনে লয় তুমি এক অতীত নিশীথে
সখা ছিলে মোর। পানপাত্র ল'য়ে হাতে,
কক্ষে তব সুবর্ণা সে সাকী, বক্ষে তব
রক্ত-গোলাপের তোড়া—এলে মোর কাছে,
নক্ষত্রের লক্ষ্য তব চক্ষের দ্যুতিতে।

চিনিল না তোমারে মূঢ়তা, অহঙ্কৃত
ঘোর নির্বিচারে। মূর্খ কবরের পাশে
উন্নত সাহসে শেষে কহিলে মানুষে,
"চেনো ফুল, শোনো গান, চেনো আলোছায়া,
মধুপাত্রে পূর্ণ রাখো, সাকী নয় মায়া॥"

৭

হে পৃথিবি, মরণের অপূর্ব মাতৃকা,
দাক্ষিণ্য তোমার হেরি দিয়াছে আমারে
মৃত্যুমুগ্ধ জন্ম এক। মৃত্যুস্নান সারি
মেলেছি নয়ন আমি। জ্ঞানের দেউলে
হেরিতেছি লক্ষ লক্ষ মৃত্যুদীপ জ্বলে।
কী বিচিত্রা দীপান্বিতা সম্মোহিনী পূজা
মানবসন্তান তোরে পাঠায়, পৃথিবি,
প্রবল বিপুল পূজা ভৃপ্ত-যোনিত্বের!

মদিরার স্বর্ণপাত্র হাতে, তারপরে
হে হাফিজ, এলে তুমি আমার অঙ্গনে।
মুক্ত করি শির হতে সম্রাট্-শাসন
শিরতাজ তব, কহিলে আমারে—"সখা,
ছাড়ো পৃথ্বী, পান করো, চিনো এ পৃথ্বীরে
এ প্রবৃদ্ধা—লক্ষ লক্ষ প্রেমিকের সাকী॥"

৮

নাস্তিত্বের বেদনার সিংহদ্বার ভেদি
এসেছে অস্তিত্ব আজি—ফুটন্ত গোলাপ!

কর্মফুলবনে—আহা, জেগেছে মাধবী।
পাত্র ভরো, পান করো, বাঁশরী-প্রলাপে
সুর শোনো জীবনের। সাকীর চিবুকে
চুম্বনের সুধা দাও, মদিরার গীতে
ধ'রে রাখ জগতের কাব্যলীলাখানি
পূর্ণতার বন্ধু তুমি নবতার বাণী।

এস তুমি মালঞ্চে আমার, এস তুমি ;
গোলাপ-ফোটার আজি বেলা। হেলাভরে
চেয়ে দেখো। ক্লান্ত পাত্র পূর্ণ ক'রে নাও
সুন্দরী পুষ্টিতে। আরো কিছু রেখে যাও
সন্ধ্যার সুন্দর চাঁদে।
জীবনের বীজ
সিক্তমদ বৃক্ষ হোক হে বন্ধু হাফিজ ॥

৯

দিক্‌ভ্রান্তেরে দিগন্ত দেখালে ; তবু তার
খসিল না অবিশ্বাস রহস্যের প্রতি।
প্রাভাতিক পাত্র ভরো, করো পূর্ণ পান
উষার মদিরা, ভেসে যাবে অসত্যের
মেঘ-উত্তরীয়। গোলাপের রক্তমুখ
শিশির-চুম্বিত। মরকত-সিংহাসনে
নিদারুণ সত্য হের একা ব'সে আছে।
আনো সুরা, চুণীর সবর্ণা।
হে হাফিজ,
করো পান, আমারে শোনাও তব গান।
যে বনে গোলাপ ফোটে, মালাকর তার
রয়েছে কি হেথা ? গৃহে গৃহে এত দ্বার
কোন্ দ্বারী খুলে দেয় ?
দিগন্তের স্বামী।

১০

অরণ্যের মাঝে বাঁশী বাজে রাখালিয়া।
সেথা শান্ত রয়েছে দাঁড়ায়ে—নীলকান্তি
সমগ্র-গুঞ্জন-শান্ত একটি ভ্রমর।
জানে না সে কী শুনেছে! মধুরের সুরা
কী প্রবাহ এনে দেয় ধ্বনির প্রাণেতে!
কে ফোটায় দিকে দিকে আনন্দ-গোলাপ?
ঝ'রে পড়ে নৃত্যরস সাকীর নূপুরে?

বাঁশী শুধু লয় তারে—দূর হতে দূরে।

সুধামত্ত হে হাফিজ, তব আশীর্বাদ,
দুর্ধর্ষ ঝরিছে লোক সুপ্রাণ-সঙ্গীতে।
উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমর স্তব্ধ; শোনে বংশীধ্বনি।—
নিজ গান ভোলে বারম্বার।
তারপরে
নীলপর্ণ উর্ধ্বে ওড়ে অন্তরীক্ষ স্মরি,
সাকীর অধরে যেথা মধু পড়ে ঝরি।

১১

মদিরার উন্মাদনা টেনেছে আমারে
করেছে বিস্তীর্ণ তার রাগরক্তবিভা—
আমার উপরে। আমার কপোল হতে
রক্তের সংগ্রহ ল'য়ে, পীত বিশ্বখানি
দিয়েছে রাঙায়ে। চূর্ণ কর, পিষ্ট কর
দ্রাক্ষার আরাম। সম্পূর্ণ বিনষ্টি এস,
লহ মোরে অবিনাশী পাশে। ভাবি শুধু
হে মৃত্যুপথিক, কী হবে তোমার মূঢ়!

বুলবুলের সুরাগীত শুনিবে না তুমি
আলো-ফাটা কোনো সূর্য হেরিবে না চোখে,
জিহ্বা তোর মদিরার পাবে না আস্বাদ,

তার চেয়ে হে হাফিজ, চল যাই ত্বরা
সাকীর মন্দিরে যেথা সুধা আছে ভরা।

১২

হে হাফিজ, সুধাপথে রথযাত্রী তুমি
সেথা আমি আছি সাথী। জনতার নীড়ে
জমে বহু নির্বীর্যের ভিড়। সংসারের
তৈজসসম্ভার ভারাক্রান্ত করে আরো
জীবনের বোঝা। অন্ধতার তমিস্রায়
আলো ফেলো তব রথ হতে। নিশাটিরে
মুক্তি দাও, এসো তুমি আলোকপ্রহরী;
চেতনার অন্তঃপুরে তোলো মত্ত সুর।
বলো সবে "আছে প্রাণ—
গোলাপবাগান—
সুন্দরের মহাদান। পাত্রে মদিরার
উচ্ছলিত শুভ্রফেন। জেনো পৃথী-মাঝে
বন্য মানুষেরা খেলে রূপান্ধতা ল'য়ে।
নারী পণ্য, নর পণ্য—হিংস্র অপলাপ।
বিশ্বে শুধু সুধা ঢালে সাকীর আলাপ॥"

১৩

এস সাকী, সেতারটি তুলে লও হাতে
মদিরার পাত্রখানি গোলাপী আলাপে
মৃদু হাসি কথা কয়, মোর কানে কানে
পুরাতনী পৃথীরাণী নব্য কাব্য শোনে।

মাটিতে একটু পান্না, আকাশে নীলাম
এইটুকু দেখে নিতে আমি কি এলাম?
চুলের চামরে আর চোখের কাজলে
লিখে যাব দুটো গান হাফিজী গজলে?

লোকে মোরে মন্দ কয়, না করি বিবাদ;

আশা করি স্বর্ণমুদ্রা রচিবে চকিত
তাহাদের মেঘ-রৌদ্রে অসম্ভব গীত।
হে হাফিজ, সুরা আর সুধাহাস্য ল'য়ে
শূন্য বিশ্বে রব মোরা পূর্ণিমা-আলয়ে॥

১৪

মদ্যে ভরা সূর্যের পেয়ালা। শুভ্রফেন
জ্যোতিঃকণা ঝর্ঝরিয়া ঝরে বারম্বার
তমসার দ্বার খুলি—সাকীর অধরে।
তার রক্তমণি ঠোঁটে, আঁখির খঞ্জনে
দৃষ্টি বিঁধে গেছে মোর রূপের অঞ্জনে;
—নাচে যেথা বর্ণের বসুধা, দোলে যেথা
দোয়েলের শিসে ধ্বনির প্রলাপ
পূর্ণপুর বাজে সুর—উষার নূপুর।

দাও দাও, বারম্বার পাত্র নিয়ে এসো
আমার আলোতে মেশো, ওরে নীল ছায়া,
ক'রো নাকো দেরি। গোলাপ-বনের পাখি
দ্বার ভাঙি মালঞ্চের আসে মোর কাছে!

হে হাফিজ, তুমি জান আর তারে জানে
যে জন সূর্যেরে পায় মদিরার গানে।

১৫

জানি আমি একদিন দগ্ধ হবে মোর
সুলতানের দান ঐ ফকিরের কাবা;
ক্রন্দনসমুদ্র হতে একখানি ঢেউ
মুছে দেবে খেলা এই জীবনের দাবা।
সত্য কথা তবু বলি;—
আনো, মদ্য আনো;—
সাকীর আঁখির রেখা বিশ্বে শুধু ছবি।
বণিকের পণ্য নয় রসিকের প্রাণ,
অন্ধকার আলো করে মধুরের কবি।

মন্থ আনো, আনো সুরা। আনন্দের ঘরে
কপাট খুলেছে আজ। প্রসন্ন অন্তরে
থাকো সবে, জ্বালো আলো। হে হাফিজ, মোরে
গান দাও, লয় যাহা দুর হতে দূরে
প্রাণ দাও, ভালবাসি চরম সুন্দরে
পাত্র দাও, মৃত্যুরে অমৃত যাহা করে।

১৬

মেহগ্নির মঞ্চজোড়া গ্রন্থশালা মাঝে
কাব্যসখা হে হাফিজ, পড়েছি তোমায় ;—
অব্দের তরঙ্গশিরে চলেছ ভাসিয়া
ক্লান্ত যেন চন্দ্রচ্ছায়া শ্রান্তির সায়রে।
যাদুকর হয়ে আছ গ্রন্থ-যাদুঘরে,
ধর্মের মসজিদে কেহ চেনে না তোমারে,
বর্ষজন্ম জনতার পৃথ্বীশোষী ক্ষুধা
বোঝে না কাব্যের দান—ঈশ্বর-আহ্বান।

জন্ম দেয় শিশির ধান্যেরে,—ধান্য অজ্ঞ ;
গোলাপ ফোটায় কাব্য—কাব্য নাহি জানে ;
বুল্‌বুলের গানখানি—ভোরের আজান
মদিরার রক্তপাত্র—রক্তবিশ্বপ্রাণ।
হে হাফিজ, ক্ষমা কর সবে।
এ নিশীথে
ঘোমটা খুলেছে সাকী প্রাণ ভ'রে দিতে।

১৭

একদা তোমার সাথে হয়েছিল দেখা,
তুমি আজ চ'লে গেছ—আমি আছি একা।
গোলাপের গন্ধ নেই,—এ কেমন বেলা !
পুষ্পহারা কাব্যবন ! ভাঙনের খেলা ?

হে হাফিজ, দেখি শুধু প্রহরে প্রহরে
মিথ্যা ভাষা হাঁটে পথ কাব্যের শহরে

অশ্লীল প্রশংসালোভী দুষ্ট সমাচার
রসোত্তীর্ণ ব'লে করে নিজেরে প্রচার।

ধ্বনির মালঞ্চে তবু তুমি ছিলে ফুটে
বর্ণিত গোলাপ সম। নেব,—গন্ধ লুটে।
ভাষার মসজিদ গড়ি, সুরার রূপেতে
বিশ্ব-প্রাণ ভ'রে গেছ গুগ্‌গুলে ধূপেতে।

ফিরে এস, এস কবি, ফিরে এস তুমি
দীর্ণক্ষীর মাতৃবক্ষ এস দোঁহে চুমি॥

১৮

এস ভালবাসি।
দুটি তারা শুধু রাখো
দুটি কালো চোখে। চোখের সুর্মায়
ম'রে যাক নিদ্রা মোর। ঠোঁটের মানিকে
লগ্ন হয়ে থাক্ প্রেম। যাহা রহে বাকি
সব পূর্ণ হয়ে যাক সীমায় সীমায়।
সীমানার শেষ হোক। টানো পূর্ণচ্ছেদ।

এস ভালবাসি। লজ্জার আঙুর খাও।
মদিরার পাত্র তোলো হাতে। রসের বিচ্ছেদ
সহে না সহে না বন্ধু। এস কাছে এস,
ভালবাসা—নীড় মোর!—আর সব খেদ।

গোলাপ-বনের পাখি অপূর্ব বুলবুল,—
আকাশ-অরণ্যে যেন বাতাসের ফুল—
আমারে শোনায়ে গেছে মানহারা গান
ব'লে গেছে হে হাফিজ—
"প্রেম শুধু প্রাণ।"

১৯

কী যেন পাই নি আমি, কি যেন দাও নি!
যে সুর শোনাতে এলে সে সুর গাও নি!

তবু মোর দেখা হ'ল।   জানি হবে, হবে ;
একটি প্রেমের গান বিশ্ব জিতে লবে।

দোয়েলেরে ডাক দাও, ডাকো দূর চাঁদে
বর্ণে স্থরে বদ্ধ আমি প'ড়েছি যে ফাঁদে।
আমি যে নূপুর শুনি, যেন রূপ দেখি।
মসজিদ মিনার আর মন্দিরের মেকি
স্বর্ণচূড়া ভেঙে ফেলো পথের ধুলায়
স্থধাহারা যারা সব—বিশ্বেরে ঘুলায়।

হে হাফিজ, এস ডুবি সাকীর আঁখিতে।—
সেথা দীর্ঘদৃষ্টি প্রেম অতিশান্ত জ্বলে
বিশ্ব সেথা লভে রূপ, মৃত সূর্য জাগে
ভোরের গোলাপ ফোটে সম্পূর্ণ সোহাগে॥

২০

পান করো, আর ভাঙো সুরার পেয়ালা।
বক্ষে টানো, মর্ম ছিঁড়ে ফেলে দাও জ্বালা।
রক্ত থেকে সৃষ্টি হয় রক্তের বিদ্রোহ,
ছিন্নপুষ্পে গড়া জেনো সভ্যতার মালা।

পান করো, আর দেখো, গোলাপবাগান—
—বুলবুলি যেখানে নাচে দোয়েলের সাথে,
ওঠে যেথা রক্তপাত্রে শুভ্রফেন গান,
করকে মন্দিরা বাজে, নূপুরে আরাম।

পান করো হে হাফিজ, পাত্র পূর্ণ কর।
আনন্দস্থন্দর আজি হয়েছে অতিথি,
পেয়ালার মূল্য নেই, পান করো স্থধা
চন্দ্রের চুম্বনে হের প্রসন্না বস্থধা।

পান কর আর জ্বালো আরেকটি দীপ
বিশ্বের ললাটে দাও মত্ত রক্ত-টিপ॥

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

আক্ষরিক স্বাধীনতা

প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে বহুদিন যাবৎ নানা ষড়যন্ত্র চলছে, কিন্তু নখদন্তের ভয়ে কেউ গায়ে হাত দিতে সাহস করছেন না। এই ধরনের অহিংস আন্দোলনের সাহায্যে ফললাভে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। মনে হয়, এতদিনে নির্ঘাত আঘাতের (ডাইরেক্ট অ্যাকশনের) সময় এসেছে।

অক্ষর-পরিচয়ের পথ সুগম না হ'লে শিক্ষার ইঞ্জিন চলতে পারে না, এবং ইঞ্জিন না চললে রাষ্ট্রের ট্রেন অচল। এর প্রধান অন্তরায়, বাংলা অক্ষরের বাহুল্য ও জটিলতা; এবং তা দূর করতে হ'লে বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃতের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক, অন্ততপক্ষে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' অর্জন করতে হবে।

বাংলা ভাষা তথা তার বর্ণমালা সংস্কৃতের কাছে ঋণী, যেমন প্রত্যেকে তার পূর্বপুরুষের ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য। যুগধর্মের চাপে ও প্রয়োজনের স্বার্থে পূর্বপুরুষের আচার-ব্যবহার লুপ্ত হয়, ঋণও হয় ক্ষয়প্রাপ্ত। এই ঋণ চিরকালের জন্য আমাদের স্বাধীন স্ফূর্তির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, এই ধারণা সত্য নয়। বীজ ও গাছের পরস্পরের সম্পর্ক তুলনা করা যেতে পারে।

বাংলা বর্ণমালা মোটামুটি সংস্কৃতের অনুগামী, যদিও প্রয়োগবিধি বিভিন্ন; এবং এই প্রয়োগবিধির অভিন্নতা রক্ষার অন্ধ-প্রচেষ্টা থেকেই যত কিছু গোলমালের সৃষ্টি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বাংলা ভাষাকে বাঁধতে গেলে এ দুর্দশা তার ভাগ্যে ঘটে।

'অ' থেকে 'ঔ' এবং 'ক' থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ১২টি স্বরবর্ণ ও ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ—এই কটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বঙ্গভারতীর বিশাল সংসার।

দীর্ঘ-ঋ ও দীর্ঘ-ঌ বাংলা বর্ণমালা থেকে অনাবশ্যক-বোধে বাদ পড়েছে। অথচ ঌ কেন আজও সেখানে জায়গা জুড়ে আছে, বলা যায় না। সম্ভবত বর্ণমালার ছন্দ বজায় রাখতে।

ছন্দের খাতির, সংস্কৃত ভাষার প্রতি চক্ষুলজ্জা এই সব নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত। বালক-বালিকা ও নিরক্ষরদের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের যেন কোনও দায়িত্বই নেই।

যাই হোক, একটা মাত্র স্বরবর্ণ নিয়ে বাজে তর্ক তুলতে চাই না. বিশেষত, স্বরবর্ণগুলির উপর আমার কিছু রাগ নেই—নারী অবধ্যা এরা—অর্থাৎ স্বরবর্ণরা স্বাধীনভাবে কিংবা ছেলেদের—অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সারস্বত-সংসারের কাজকর্ম সহজ ক'রে তুলেছে। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় তারা একাকারা (অ+আ=আ ; ই+ঈ=ঈ ; এবং উ+উ=উ), যদিও কোন-কোন স্থলে য-ফলা, অন্তঃস্থ-ব ও রেফ্ এই তিনটি আধা-ব্যঞ্জনের সাহায্য গ্রহণ করে। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর এদের রূপ পালটে যায়, ঘোমটা তুলে, শাঁখা, সিঁদুর ও আলতা প'রে দক্ষিণ বাম, ঊর্ধ্ব, অধঃ চতুর্দিক হ'তে বেচারা ব্যঞ্জনবর্ণদের অষ্টে-পৃষ্ঠে ললাটে ঘিরে রাখে। এই মধুর বন্ধন তাদের সইতেই হবে, এই ভার তাদের বইতেই হবে—স্বরচিহ্নগুলি সংস্কৃত লিপিপদ্ধতির বিশিষ্ট অবদান।

কিন্তু যুক্তাক্ষরগুলোর কথা ভেবে দেখুন, কি কষ্টই না ওরা আমাদের অসহায় শৈশবে দিয়েছিল! ওদের উপর যাদের রাগ নেই, যারা দুঃখের কথা ভুলে যায়, তাদের স্মৃতিশক্তি নিশ্চয় অত্যন্ত দুর্বল।

•

জরাসন্ধ মাতৃগর্ভ হ'তে দু-আধখানা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তার প্রাণহীন দেহ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। জরা রাক্ষসী সেই দুটোকে জোড়া দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে।

শিশুমস্তকচর্বণকারিণী কোন্ রাক্ষসী দু-আধখানা বাংলা অক্ষর জোড়া দিয়ে যুক্তাক্ষরের জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছিল? বাংলা ভাষায় এর সার্থকতা কি? সংস্কৃতে সন্ধির আবশ্যিক নিয়মে পদ ও বাক্যের অন্তর্গত হসন্ত অক্ষর পরবর্তী অক্ষরে যুক্ত হয়ে (যথা, সম্‌গত—সঙ্গত ; অপ্‌জ—অব্জ : তৎহিত—তদ্ধিত ইত্যাদি) বারংবার হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহারের দুর্গতি থেকে লেখার কাজকে মুক্তি দিয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, হসন্ত-শব্দ তার নির্দিষ্ট-সংখ্যক। শুধু বাক্য-শেষে সন্ধি অসম্ভব ব'লেই হসন্ত-চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়, প্রয়োগেও অসুবিধা কম, কারণ লিপিকরকে পূর্ণচ্ছেদের জন্য কলম একবার তুলতেই হ'ত—

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেত্॥*

এখানে মাত্র দুটি হসন্তের দরকার হয়েছে। বহুক্ষেত্রে একেবারেই হয় না—

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

গদ্যেও হসন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন অনুরূপ—শুধু বাক্যশেষে। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন, কারণ সংস্কৃত গদ্যও কবিতার মতই অন্বয়ের অপেক্ষা রাখে।

যে বর্ণমালা সুনির্দিষ্ট উচ্চারণের সাহায্যে বানান-পদ্ধতিকে নিয়মিত করতে পারে না, তা অসম্পূর্ণ। এই হিসাবে সংস্কৃত বর্ণমালা নিখুঁত স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বাংলায় কিন্তু তেমন নয়; ই এবং ঈ, উ এবং ঊ, জ এবং য, অ এবং য়, ন এবং ণ, দুটি ব, খ এবং পদাগ্রবর্তী ক্ষ—এই সব অক্ষর-যুগলের এবং শ, ষ, স এই অক্ষরত্রয়ের পরস্পরের উচ্চারণে কোনও পার্থক্য না থাকলেও, জোড়ায় জোড়ায় ও ত্রিমূর্তিতে বাংলা ভাষার প্রাঙ্গণময় হাডুডু খেলে বেড়াচ্ছে এবং কোন্ সুদূরভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করবে ব'লে শিশুর মন ও মস্তিষ্ককে অনর্থক ভারাক্রান্ত ও জর্জরিত ক'রে রেখেছে।

বয়স হ'লে যখন তারা সংস্কৃত পড়বে এবং মোটেই যদি পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণে পড়বে ণত্ব-ষত্বের নিয়ম, ব্যাকরণের সূত্র থেকেই বহু স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘের কারণ খুঁজে পাবে। তখন উল্লাস অবজ্ঞায় বলতে পারবে—

ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ।

এবং তা মানানসই হবে। কিন্তু এক ৮ বছরের শিশুকে বানানের গোলকধাঁধায় ফেলে 'বর্বর' বলা ভদ্রোচিত নয়।

পরিণত বয়সে সংস্কৃত ভাষার নির্দিষ্ট-সংখ্যক যুক্তাক্ষর তাদের মনে ভীতির সঞ্চার না ক'রে বরং কৌতূহলের সৃষ্টি করবে, বরং এইটুকু চাপে মস্তিষ্কের সুগঠন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হবে। তার আগে মাতৃভাষার

---

* যে সন্তান জন্মায় নি, সে কেমন ক'রে দুঃখের কারণ হবে?—এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বাংলা ৯।

সাহায্যে যত শীঘ্র সম্ভব নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে জগৎসভায় দশের একজন হয়, আমি জানি, সকলেই তা চাইবেন।*

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥

উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব শক্তির-অধিকারী হয়েও কবি তখন ভেবে দেখেন নি যে, কেড়ে না নিয়েও, ভাষারত্নভাণ্ডারের দ্বারপ্রান্তে যুক্তাক্ষর ও অনাবশ্যক অক্ষরের দারোয়ান বসিয়ে রেখে তাদের আমরা বঞ্চিত করেছি—বিদ্যাধনেও ক্যাপিট্যালিজ্‌ম চালিয়েছি।

বাংলা বানানে এতবড় একটা বিপর্যয় অনেকেই হয়তো দুঃসাহসের কাজ ব'লে মনে করবেন, বলবেন, সংস্কৃতের সঙ্গে নাড়ীর যোগ নষ্ট হয়ে যাবে। ধাত্রীমাতা বিদ্যাসাগরের কথা ছেড়েই দিলাম, প্রসূতির পক্ষে না হোক—যুগ যুগ তপস্যায় তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন—নাড়ী-কাটায় বিলম্ব ঘটলে শিশুর পক্ষে বিপজ্জনক জেনেও, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী যোগেশ বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও ইতস্তত করেছিলেন, এ ভারি আশ্চর্য কথা।

অনাবশ্যক ডুপ্লিকেট অক্ষরগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে বাংলা বানানে বিপ্লব ডেকে আনা আপাতত না-হয় স্থগিত থাক্। কিন্তু প্রচলিত বানান-পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও যুক্তাক্ষর-বর্জন অসম্ভব নয়।

সংস্কৃতের নির্দিষ্ট-সংখ্যক হসন্ত অক্ষরকে পরবর্তী নির্দিষ্ট-সংখ্যক অক্ষরে জোড়া দিয়ে নির্দিষ্ট-সংখ্যক যুক্তাক্ষরে পরিণত করা হয়েছে, তাও আবার বহুব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেখানে ব্যবহার কম, সেই সব স্থলে হসন্ত-চিহ্নেই কাজ চালানো হয়, যথা—বাক্‌পটু, অপ্‌শয়িত, ষট্‌চক্র। শুধু নিয়মের খাতিরে অনাবশ্যকভাবে যুক্তাক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন নি, লিপি-সৌকর্যই উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা ভাষায় বাক্যান্তর্গত অধিকাংশ শব্দই হসন্ত, নিয়মের ঐক্য রক্ষা করতে হ'লে অজস্র যুক্ত অক্ষরের সৃষ্টি করা উচিত ছিল। যেখানে বিনা যুক্তাক্ষরে বহুসংখ্যক

* ণত্ব ষত্ব বিধান ও লিঙ্গনির্ণয়ের মত সংস্কৃত ব্যাকরণে হ্রস্বদীর্ঘভেদ ও অন্যান্য বানান বিষয়ে একটি নূতন পরিচ্ছেদ জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক।

হসন্তের চলতি, সেখানে সংস্কৃত থেকে ধার-করা কয়েকটি যুক্তাক্ষর কোন্ কাজে লাগে বোঝা যায় না।

আম্ জাম্ নারিকেল্ গুবাক্ তেঁতুল্।

এখানে হসন্তকে যুক্তাক্ষরের রূপ দিলে বিকটমূর্তি ধারণ করবে—

আ(ম্জা)ম্নারিকেল্গুবাক্তেঁতুল !

ব্র্যাকেটের অন্তর্গত অক্ষর দুটির সংস্কৃতে কোনও যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন হয় নি। সন্ধির আবশ্যিক নিয়মে সংস্কৃতে হয়ে যেত—

আঞ্জাম্নারিকেল্গুবাক্তেঁতুল,

কিন্তু বাংলা ভাষার মাথায় এইভাবে তেঁতুল গুলে দেওয়া একেবারে অসম্ভব।

এর প্রকৃত উচ্চারণ দেখাতে হ'লে প্রথম দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত পাঁচটি হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার অনিবার্য। কিন্তু এত বেশি হসন্তের ব্যবহার লিপিকর ও মুদ্রাকরের কার্যে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

এইভাবে, ব্যঞ্জনে-যুক্ত 'অ'-স্বরবর্ণের কোনও বিশিষ্ট চিহ্ন না থাকায় এবং পদে পদে হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার অসম্ভব হওয়ায়, বাংলা লিপিতে প্রকৃত অকারান্ত ব্যঞ্জন ও অকারান্ত-রূপী হসন্ত ব্যঞ্জন শিশু, নিরক্ষর ও বৈদেশিকের পক্ষে অবর্ণনীয় অসুবিধা ও অমার্জনীয় অনিয়মের সৃষ্টি করেছে। 'আম খাব' এই দৃষ্টান্তে হসন্ত 'ম' ও স্বরান্ত 'ব'-এর একই রূপ, উচ্চারণ-ক্ষেত্রে তাদের স্মৃতিশক্তির উপর মস্তিষ্কহীন উৎপীড়ন চালিয়ে আসছে।

বার বার হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহারের আর এক অসুবিধা এই যে, ছাপার হরফে তা মোটেই স্থানস্থিতিশীল ও টিকসই নয় (বোধ হয়)।

এর সমাধান, অন্য সকল স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জনাশ্রিত 'অ'-স্বরবর্ণেরও বিশিষ্ট একটি চিহ্ন আবিষ্কার। আমার মত অক্রিয়তাত্ত্বিকের (থিওরিস্টের) পক্ষে এই কাজ একরূপ অসম্ভব। তবু দৃষ্টান্তস্বরূপ—

(১) সংস্কৃত অনুস্বারের অনুকরণে অক্ষরমস্তকে বিন্দুপ্রয়োগ (বাংলা অনুস্বারের রূপ পৃথক), যথা—

যুকত কর হে সবার সংগে

মুকত কর হে বনধ

অসুবিধা এই, ইংরেজী i j t যত বার, প্রায় তত বারই, বরং বেশি লিপিকরকে হাত তুলতে বাধ্য করবে।

(২) কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের মাত্রাপার্শ্বে বিন্দু স্থাপনে, যথা—

যুকত˙ ক র˙ হে স˙বার স˙ংগে

মুকত˙ ক˙র˙ হে ব˙নধ˙

একই অসুবিধা, মাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে লিখ্‌লেও বার বার কলম টিপতে হবে।

(৩) কিংবা ব্যঞ্জনান্তিক আ-চিহ্নের খর্বরূপ সংযোগে, যথা—

যুকত' ক'র' হে স'বার স'ংগে

মুকত' ক'র' হে ব'নধ'

এতেও দীর্ঘ-খর্বের পার্থক্য ঠিক রাখতে উদ্বিগ্ন সতর্কতায় চলতে হবে।*

(৪) কিংবা দীর্ঘ যুগের অভ্যাস যদি ভুলতে পারেন, আ-চিহ্নের দ্বিত্ব-সাধনের দ্বারা প্রচলিত আ-চিহ্নকে অ-চিহ্নে পরিণত ক'রে, যথা—

যুকতা কারা হে সাবাাব সাংগে

মুকতা কারা হে বানধা

কিন্তু এতে নিরক্ষরদের কথা ভাবতে গিয়ে 'সাক্ষর'দের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিংবা— কিন্তু আমাব অবৈজ্ঞানিক দুর্বল মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পডছে। যে-কোন প্রক্রিয়ায় স্বরচিহ্ন একটি বাডবে সত্য, কিন্তু 'অ' তার প্রাপ্য আদায় করতে ছাড়বে কেন? বলা বাহুল্য, উপরের স্বরচিহ্নহীন সকল ব্যঞ্জনেরই উচ্চারণ হসন্ত। ব্যঞ্জনান্তিক 'অ'কারের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন আবিষ্কারের জন্য আমি আমার পিতৃহৃদয়ের অসংখ্য ধন্যবাদ পুরস্কার ঘোষণা করছি।

আপাতত আমার এই নিরীহ প্রস্তাবটিকে আপনারা 'বঙ্গ-রোমান' লিপিপদ্ধতি বলতে পারেন, কারণ এতে বাংলা অক্ষরের সাহায্যে রোম্যান বর্ণমালার মূলনীতি উন্নততর পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়েছে।

---

* এই প্রবন্ধ লেখার পর কিছুদিন অভ্যাসের ফলে উপরের চারিটি অক্ষম প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয়টিই আমার কাছে সবচেয়ে সুবিধার ব'লে মনে হয়েছে। আশা করা যায়, আশৈশব অভ্যাসের সাহায্যে 'উদ্বিগ্ন সতর্কতা' নিরুদ্বেগ সহজসাধ্যে পরিণত হবে। যারা উ এবং ঊ (ু ূ)-চিহ্নের পার্থক্য ঠিক রেখেছে, তাদের পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

(অনুগ্রহ ক'রে 'ব্যঙ্গ-রোমান' বলবেন না।) এই রীতিতে, অসংযুক্ত-ভাবে এক-একটি অক্ষর ও স্বরচিহ্ন এক-একটি ধ্বনির দ্যোতক হয়ে উচ্চারণের দৌত্যকার্যে প্রচুর সাফল্য নিয়ে আসবে। অথচ একই অক্ষর ও অক্ষরসমষ্টির উচ্চারণের এলোমেলো রীতি যা ইংরেজী ভাষার বানান-পদ্ধতিকে (বস্তুত, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তাতে নেই বললেই হয়) অত্যন্ত জটিল ক'রে তুলেছে, বাংলা ভাষা তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। যুক্তাক্ষর-বর্জিত ছাপার টাইপ অপেক্ষাকৃত ছোট হবে, কাগজ খরচ সংক্ষেপ হয়ে গ্রন্থকলেবর হালকা হবে ও লাইব্রেরির আলমারিতে সংখ্যা ক'মে যাবে। এই ইকনমির যুগে—

'অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ সব ইস্ক্রুপ দিয়ে আঁট,
যখন যেটা নিষ্প্রয়োজন তখন সেটা ছাঁট;
চলবার সময় হাত দুটোকে আলগা রাখ খুলে,
বসতে রাখ পা-জোড়াকে আলমারিতে তুলে;
শয়নকালে হাত-পা-মাথা তিনটেই খুলে দাও,
লেপ-তোষকের কমবে খরচ, আর কি অধিক চাও?'

তা ছাড়া, এর দ্বারা সমমাত্রিক কবিতার লাইনগুলির অসম-দীর্ঘতা, যথা—

'যখন সঘন গগন গরজে,
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো'

নষ্ট হয়ে কবিতাগুলি দেখতে সুন্দর হবে।*

প্রথম প্রথম যুক্তাক্ষর-বর্জিত লিপি একটু দৃষ্টিকটু হবে—

শরীক্রষণায়' ন'ম'ঃ (শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ)

তবে—

'অভ্যাস-দোষে প্রথম-প্রথম পেলেও কিছু ভয়,
স'য়ে গেলে বুঝবেন এটা বেমানানসই নয়!'

---

* এবং গান ও কবিতার হসন্ত ও স্বরান্ত উচ্চারণ পৃথকভাবে প্রদর্শিত হয়ে কবি-ব্যবহৃত ছন্দের পূর্ণ নির্দেশ পাওয়া যাবে—

'অনতা'য়' মা'ম' বিকা'সিতা কা'য়'
'সুনদা'য়' কা'য়' হে।

এও সম্ভব, 'শরীকৃষণে' অভ্যস্তচক্ষু পঞ্চাশ বৎসর পর 'শ্রীকৃষ্ণ' দর্শনে ভয় পাবে।

কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক, বহু দিনের অভ্যাসকে হঠাৎ একদিন ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যায় না। বাস্তবিক 'শরীকৃষণ' অনেকের ভক্ত মনকে ব্যথিত ক'রে তুলবে। সেইজন্য, বর্তমানে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বাংলা বর্ণমালাকে 'স্যানসৃক্রিট কমনওয়েলথে'র অন্তর্ভুক্ত রাখার পক্ষপাতী—

(১) য-ফলা, র-ফলা, রেফ—বাক্য, বজ্র, তর্ক—এরা বাংলা বর্ণমালার লিপি-সৌষ্ঠবের কাজে লাগবে;

(২) এবং যে সব স্থলে যুক্ত বর্ণের দ্বিতীয়ার্ধ তার মূল উচ্চারণ হারিয়ে ফেলে, যথা—অন্বয়, দ্বয়, ক্ষয়, পক্ষ, জ্ঞান। (এই সুযোগে 'বঞ্ চনা' ও 'বাঙ্ময়' যেন দলে ভিড়ে না যায়।) রুক্মিণী, বাগ্মী, আত্মা প্রভৃতির বাংলা উচ্চারণ (রুক্‌কিঁণী, আত্‌তাঁ ইত্যাদি) বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

এই ক'টিকে ধ'রে রাখলেও দেখবেন, অনেক যুক্তাক্ষর 'কুইট বেঙ্গলি' করতে বাধ্য হয়েছে। বৈপ্লবিক মন নিয়ে ও পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে এক যোগে আমরা অগ্রসর হতে পারি—

'ধীরে, রজনী, ধীরে'।

তবে, কবিগুরুর এই অমূল্য উপদেশ বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে'!

বরং—'নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অজানিতের পথে'—অবশ্য সকলে মিলে।

এইবার দেখা যাক, কিছুদিন সংস্কৃত কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত রেখে প্রগতিশীল অথচ ধীর সংযত বিপ্লবের সাহায্যে কত প্রকারে অক্ষর-সংহার করা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের হাতে আছে ৪৭টি স্বাধীন অক্ষর ও ১১টি স্বরচিহ্ন। মোট ৫৮।

১। ওয়ার্ধা রাষ্ট্রভাষা সমিতি 'অ'কে সাধারণ স্বর গণ্য ক'রে

অন্যান্য স্বরচিহ্ন সংযোগে ৯টি স্বাধীন স্বরবর্ণকে সংহার করেছেন। অি অী অ, অো ইত্যাদি। বাকি থাকে ৪৯। এখানে ‘অ’ মহাস্বর, অন্যেরা স্বরচিহ্ন মাত্র।

২। উচ্চারণের পার্থক্য না থাকায় দুটি দীর্ঘ স্বরচিহ্ন বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৪৭। ‘ঋ’ও সমান অপরাধে অপরাধী (রি)। অতএব —৪৬। ঋ-চিহ্নও বাদ = ৪৫।*

৩। যুগ্মস্বরের সাহায্যে ‘ঐ’ এবং ‘ঔ’-এর উচ্চারণ চলিয়ে নিলে (‘অই’, ‘অউ’ কিংবা ‘ওই’ ‘ওউ’) বাকি থাকে ৪৩।

৪। ও-স্বরচিহ্ন (ে া) ‘এ’ এবং ‘আ’-চিহ্নের যুগ্মরূপে মাত্র = ৪২।

৫। পৃথক উচ্চারণের সার্থকতার অভাবে ‘ঙ’ ‘ঞ’ ‘ন’ ‘য’ ‘শ’ ‘ষ’ ‘ব’—এই ৭টি ব্যঞ্জন বাদ পড়লে দাঁড়ায় ৩৫। ‘বাঙ্গালী’ ‘বাঙালী’ হয়েছে, হবে ‘বাংলী’। ‘অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি’।

৬। ‘হ’কে স্বর ও ব্যঞ্জনের ডবল ডিউটিতে নিযুক্ত ক’রে তার অবয়বের ঊর্ধ্বাংশকে বর্ণনিম্নে স্বরচিহ্ন-রূপে ব্যবহার করলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আরও অনেক ক’মে যায়—ক্ + হ্ = খ = ক ; গ্ + হ্ = ঘ = গ ; জ্ + হ = ঝ = জ ইত্যাদি। এই নব-পরিকল্পিত স্বরচিহ্নটি আকৃতিতে সংস্কৃত ও হিন্দী উ-চিহ্নের মত হ’লেও, বাংলায় উ-চিহ্নের পৃথক রূপ থাকায়, গোলযোগের সৃষ্টি হবে না। এই নিয়মে ১০টি ব্যঞ্জন কমবে, বাড়বে মাত্র ১টি স্বরচিহ্ন। যোগ-বিয়োগে—২৬।

বিপ্লবের হট্টগোলে ‘র’-ফলা ও রেফ নিশ্চয় স’রে পড়বে। মহাস্বর ‘অ’-এর সাহায্যে শব্দশেষে হসন্ত উচ্চারণ উচিত নয় ব’লে ‘য়’ (যথা— ‘ভয়’ ‘জয়’ ‘সময়’ প্রভৃতি) এবং বাংলার বিশিষ্ট একটি বক্র-উচ্চারণের প্রতীক স্বরূপ য-ফলা আমাদের কাজে লাগবে—অ্যাক, ন্যায়, বা’ক্য ইত্যাদি স্থলে। ক্রিয়া-পার্থক্যে ‘ড়’-এর সার্থকতা আছে। ফলে—

---

* সংস্কৃত বর্ণমালার একমাত্র অবৈজ্ঞানিকতা যা নজরে পড়ে—‘ই’ ‘এ’ এবং ‘ঐ’ স্বরচিহ্নের ব্যঞ্জনাগ্রে অবস্থিতি। ‘শকটাগ্র-ঘোটক-ন্যায়ের’ বিপরীত—কার্ট বিফোর হর্স্। স্বরচিহ্নের পদ-নিম্নে স্থান বরং মার্জনীয় (যেমন ‘উ’ ‘ঊ’ ‘ঋ’ স্বরচিহ্ন)। এই হিসাবে ‘ও’ ‘ঈ’ স্বরচিহ্ন দো-আঁসলা। এই কারণে হ্রস্বদীর্ঘ-বর্জনে ঈ-চিহ্নটিই গ্রহণযোগ্য। ‘এ’ এবং ‘ঐ’ চিহ্নের কোনও ডুপ্লিকেট না থাকায় ‘নিরুপায়-ন্যায়ে’ তাদের রাখতে হবে।

অ, ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, ন, প, ব,
ম, য়, ড়, র, ল, হ, স, ং ঃ ঁ ' া ী ু ে ৈ ্

এই ২৯টি সহজ উচ্চারণ-চিহ্ন অর্থাৎ অক্ষর ও অক্ষর-চিহ্নের সাহায্যে আমরা বাংলা লিপিকার্য চালিয়ে যেতে পারব; যেমন উচ্চারণ তেমনই বানান, যেমন বানান তেমনই উচ্চারণ। অবশ্য আমার হিসাব মোটামুটি, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম হিসাবে আরও দু-একটা বেড়ে যাবে হয়তো, খুঁটিনাটি সমস্যা কিছু দেখা দেবে। এইভাবে একশত বৎসরের বিপ্লবের পর আমাদের বংশধরেরা সংবাদপত্রে পড়বে—

আমরা সুনে সুকী হায়েচী জে, জাগাদগুরু দারমানানদা সাত্যাসরায়ী বীসসারাসটরা পারীসদের সাবাপাতী নীরবাচীতা হায়েচেন। আপরীকা, ঈওরোপ, এসীয়া ও আমেরীকার উপারাসটরাপাতীরা অ্যাকবাক্যে তাঁকে বীসসানেতা বালে সীকার কারেচেন। তীনী এসীয়ার লোক, এ গাউরাব কারা আমাদের পাকখে সামীচীন নায়, কারান তার দারা অকানডা পরীথীবীর পারীকালপানা খুননা হাবে। তাঁর কাচে আমাদের এঈ পরারথানা —"বারীসা দারামাজে সানতীরা দারা!"

তখনকার রিসার্চ-স্কলাররা প্রাচীন অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে—

আমরা শুনে সুখী হয়েছি যে, জগদ্‌গুরু ধর্মানন্দ সত্যাশ্রয়ী বিশ্বরাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আফ্রিকা, ইয়োরোপ এশিয়া ও আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতিরা একবাক্যে তাঁকে বিশ্বনেতা ব'লে স্বীকার করেছেন। তিনি এশিয়ার লোক, এ গৌরব করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়, কারণ তার দ্বারা অখণ্ড পৃথিবীর পরিকল্পনা ক্ষুণ্ণ হবে। তাঁর কাছে আমাদের এই প্রার্থনা—"বরিষ ধরামাঝে শান্তির ধারা!"

খণ্ডিত ভারত অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্রের বিশাল গর্ভে তলিয়ে যাবে শুধু, সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রভাষা কোন্‌টা হবে—এই বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলবে। তবে তাই নিয়ে দশম মহাযুদ্ধ ঘটবে কি না, আমার পক্ষে এখন থেকে তা বলা সম্ভব নয়।

রসিকতার কথা নয়—ভারতীয় ভাষায় রোমান অক্ষর প্রভৃতি চালিয়ে যাঁরা অক্ষর-পরিচয়ের পথ সুগম করতে চান, তাঁরা প্রকৃত শিক্ষাগুরুর অন্তরের অধিকারী। 'অন্ধজনে দয়া কর'—অজ্ঞানান্ধের অন্তরের ব্যাকুলতা তাঁদের বুকে বেজেছে। যা হয় একটা কিছু ক'রে ফেলুন, আপনাদের পাকা মাথা টাইপরাইটারের মেশিনে, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের কলে যত জোরে ইচ্ছা ঠুকতে থাকুন, চেয়েও দেখব না, শুধু দয়া ক'রে শিশুদের কাঁচা মাথাগুলিকে যুক্তাক্ষরের গিলোটিনে ফেলে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা অটুট রাখবেন না।

পরিণতবয়স্কদের সুবিধার জন্য শিশুদের পিছনে ঠেলে ফেলা হয়, এই দেশের যাত্রার আসরেই তা সম্ভব। যন্ত্রের খাতিরে বর্ণমালা চলিবে না, বর্ণমালার অধীন হয়ে যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে।

আমার এই অনধিকার-চর্চা যাবৎ-পিতৃহৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ মাত্র। কোথায় আগামী যুগের বিদ্যাসাগর, যিনি নব-বর্ণপরিচয় রচনা করবেন, আমি আজীবন তাঁর দণ্ডকমণ্ডলু বহন করতে প্রস্তুত! শিশু নিরক্ষরদের জ্ঞানমুক্তির মহাপুণ্যকর্মে তিনি মরবঙ্গে, (তুঃ 'মরজগতে') অমরত্ব লাভ করবেন। স্বচ্ছন্দে ও নিঃসংকোচে নির্দেশ দিতে পারি তাঁর উদ্দেশে জাতির শিশু ও নিরক্ষরেরা প্রতি প্রভাতে ও প্রতি সন্ধ্যায় আবৃত্তি করবে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভোলা সেন

টলষ্টয়ের প্রতি

পূর্বে নামে অন্ধকার, পশ্চিমেতে ম্রিয়মাণ আলো
নিম্নে চিরশূন্যতার মৃত্যুনীল অনন্ত অতল—
আত্মার উত্তুঙ্গ লোকে একা ব'সে ঝাপটিছ ডানা,
—শঙ্কাহীন নিঃসঙ্গ ঈগল।

অসিতকুমার

অন্যপূর্বা

এগারো

সরোজ শুধু কাঁদতে জানে। রাস্তায় মালতী যে ওকে দেখে পায় নি, সেজন্যে ওর রাগ হয় নি মালতীর উপর। দোষ দিয়ে শুধু নিজেকে। কেন সে এতক্ষণ ব'সে ছিল মালতীর অপেক্ষায় মালতী তো বলে নি তাকে আসতে। চাকর এসে দু-তিন বার ব'লে গেছে যে, মালতীর আসবার সময়ের ঠিক নেই। তবু সরোজ ব'সে ছিল। হয়তো এখনই আসবে। হয়তো—হয়তো এখন পথে আছে। এতক্ষণ ব'সে থেকে আর পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা না ক'রে চ'লে যাবে? সে হয় না। আর পাঁচ মিনিট, আরও পাঁচটা মিনিট দেখাই যাক না।

এমনই ক'রে পূরো দু-ঘণ্টা কেটেছে। তবু মালতীর দেখা পায় নি। শেষ পর্যন্ত দেখা হ'ল রাস্তায়। না, দেখা হ'ল কই? সরোজ শুধু মালতীকে দেখেছে। মালতী তাকে দেখে নি। মালতীর দৃষ্টি ছিল বিমনা। কি যেন ভাবছিল সে। সরোজের কথা ভাবছিল এমন কথা ভাববার মত উদ্ধত দুঃসাহস সরোজের হবে না কোনদিন। তার কথা ভাববার মত অবকাশ কোন মানুষের হবে এমন আশাই ঠাঁই পায় না ওর মনে।

পায় না নয়। পেত না। অ.. কিছুদিন আগেও না।

কিন্তু তারপরে সব কিছু যেন বদলে গেল। যে সরোজ আপন নগণ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে, তারও একদিন নিজেকে যেন ঠিক ততটা অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল না। ছোট চাকরি, আপিসে তার মান নেই। সরকারী অস্থায়ী আপিসে কেরানী সে। ধুতি প'রে আপিসে যায়, নামের আদ্যক্ষর শুধু লিখতে পায় ফাইলের বাফ্ শীটে, তাও সব সময় বাঁ দিকে। সাহেবরা তাকে সেলাম পাঠায় না,—বোলায়। বড়বাবু ধমক দিতে দ্বিধা করে না। সরোজ নির্বিবাদে সব মেনে নেয়। এর বেশির যোগ্যতা নেই তার। কি হবে অভিযোগ ক'রে? এর বেশির অভিলাষও নেই।

নেই নয়, ছিল না। অল্প কিছুদিন আগেও না। ওর ওই অনাশা ভালমানুষি ব'লে কখনও কখনও অনুকম্পা পেয়েছে, তার বেশি নয়।

ওর উচ্চাশা নেই, ওর দ্বারা কিছু হবে না—গুরুজনেরা এই সুচি অভিমত পোষণ ক'রে তদনুযায়ী ওকে অবহেলা করেছেন। সরো ক্রমে সেটা বিশ্বাস ক'রে দুরাশা পরিহার ক'রে সন্তুষ্টির আশীর্বাদ শিরোধার্য ক'রে নিয়েছিল।

তারপরে হঠাৎ সব যেন বদলে গেল। কিছুদিন আগে সরো বি. কম. পড়তে শুরু করেছে। তারপরে আর. এ. দিয়ে অন্য কে চাকরির জন্যে চেষ্টা করবে। তা ছাড়া ওদেরই ডিপার্টমেণ্টে কি এক টেম্পোরারি ভেকেন্সির জন্যেও দরখাস্ত করেছে যেন। আ এগুলিতে সরোজের উৎসাহ ছিল না কোনদিন।

তারপরে ভ্রাতৃবধূরূপে মালতীর আবির্ভাব। কিছুদিনের মধ্যে দাদা বিলাত যাত্রা করলেন উচ্চশিক্ষার মানসে। স্বামীমুক্ত জীবনে অফুরন্ত অবকাশে দেবরের সঙ্গে পরিচয় অন্যথা যা হ'ত তার চাইতে ঘনিষ্ঠতর হ'ল। পরবর্তী কালে স্বভাবতই সন্দিগ্ধচিত্তা শ্বশ্রূমাত এ নিয়ে বহু কুটিল কাহিনী রচনা ও রটনা করেছেন ব'লে শুনেছি কিন্তু দুজনের একজনেরও কোন দুরভিসন্ধি ছিল ব'লে আমি অন্তত বিশ্বাস করি নে। নিঃসঙ্গিনী মালতী সরোজকে পেয়েছিল সাথীরূপে তার চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন ছিল না, চায়ও নি। চাইলেও ত দেবার যোগ্যতা সরোজের ছিল সামান্যই, এ কথাটা মালতী সরোজকে কখনও স্মরণ করিয়ে না দিলেও নিজে বিস্মৃত হয় নি। আর সেই সাথীত্বের অন্তরালে সরোজ যদি তার অপরিণত মনের ভাবাতিশয্যসিক্ত বেদীতে অপরা মূর্তি স্থাপন ক'রে আর কোন উপচার নিবেদন ক'রে থাকে, মালতী তাকে বয়ঃকনিষ্ঠের স্বপ্নবিলাসিতা ব'লে করুণার চোখে দেখেছে, গুরুত্ব আরোপ করে নি, প্রশ্রয় দিয়েছে সরোজের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায়।

এই বয়ঃপ্রাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। কারও কারও বেলায় সময়ও নিরর্থক। তিন কুড়ি দশ বৎসরের পরিপক্ক বয়সেও নাবালক থেকে কত লোক যে এই ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তার সংখ্যা নেই। সরোজের সম্বন্ধে এমন চরম রায় দিলে হয়তো অবিচার হবে; কিন্তু ওকে আমি যে দু-একবার দেখেছি, তাতে

একবারও বয়সের পরিচয় পাই নি। এটা তিরস্কার নয়, নিন্দা নয়, বরং ঈর্ষা করতে হয় এমন সুখী লোকদের। কিন্তু ওদেরও সুখই সব নয়। ওদের কাঁচা মনের নরম জমিতে পুলকের চারা যেমন সহজেই পল্লবিত হয়ে মৃদুতম বায়ুহিল্লোলে দুলতে থাকে, তেমনই অনাবশ্যক ও পরিহার্য নৈরাশ্যের আগাছার জঞ্জালও সেখানে কম সহজে জন্মায় না। ওরা বেশি আশা করে ব'লেই আঘাতও পায় বেশি। বয়ঃপ্রাপ্ত সীনিকের কঠোর দুঃখের বিরুদ্ধে যে ইমিউনিটি আছে তা ওদের নেই ব'লেই ওরা সদ্য নেপাল থেকে নেমে আসা পাহাড়ীর মত বহু রোগের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ বহন ক'রে বেড়ায়। নিতান্ত ভাগ্যবান না হ'লে সে আমন্ত্রণ বড় একটা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সরোজকে ভাগ্যবান বললে বেচারীর প্রতি নিষ্ঠুর অন্যায় করা হবে।

গৃহপ্রত্যাবর্তনরতা মালতীর দৃষ্টিপথে সরোজ যে উপেক্ষিত হয়েছে, তার কারণ খুঁজে না পাওয়ায় একটা বোবা ব্যথা তার মনকে আচ্ছন্ন করল। ব্যথাই শুধু নয়, লজ্জা, অবহেলার অপমান। পথের দু ধারের দোকানের প্রখর আলোগুলির প্রচণ্ড অট্টহাস্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে দ্রুত পদচালনা ক'রে সরোজ যখন ট্রাম-লাইনের কাছাকাছি এসে মালতীর অদর্শনের কারণটা আবিষ্কার করল, তখন তার উৎসুক হৃদয় কৌতূহলনিবৃত্তির আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল না। অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হ'ল।

চোখে মোটা চশমা। হাতে মোটা মোটা গোটা দুই বই। দেহে রোগা, হ্রস্ব। অখণ্ডমণ্ডলাকার বৃহৎ দুটো চোখ। 'বেতার-জগতে' প্রকাশিত চিত্রের সঙ্গে নির্ভুল সাদৃশ্য। নিঃসন্দেহে দেবেশ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি মালতীর মুখে এত অসংখ্যবার এই নামটির অসংলগ্ন কিন্তু সদাসপ্রশংস উল্লেখ শোনা গেছে যে, এই নবলব্ধ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না ক'রে উপায় ছিল না সরোজের। মালতীর সকাশে সভয় প্রশ্ন নিবেদন ক'রে স্পষ্ট উত্তর পায় নি। অস্পষ্ট সন্দেহ তাতে বেড়েছে বই কমে নি। এখন মালতীর বাড়ির সামনের স্বল্পালোকিত রাস্তায় ট্রামের জন্যে অপেক্ষমান স্বল্পদৃষ্টিগোচর ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি সরোজের সন্দেহের অন্ধকারের উপর যে আলোকসম্পাত করল, তাকে

তার মনে হ'ল নিষ্ঠুর অভিসম্পাত ব'লে। সংশয়ের ব্যথাটা পরিব্যাপ্ত হয়ে কিয়দংশে সহনীয় ব'লে মনে হয়েছিল, এখন তার পরিপূর্ণ নিরসনে সে ব্যথা বুঝি কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হয়ে অসহ্য আঘাতের আকার নিল। সরোজ আর একবার দেবেশের দিকে ঈর্ষাবিষাক্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে কাছের পার্কটায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল, অপরাধী পলাতকের মত।

কিন্তু অপরাধটা কি? কার?

নির্জন পার্কে অর্ধঘণ্টাব্যাপী অশ্রুবিসর্জনে সে প্রশ্নের উত্তর মিলল না। উত্তর যে সরোজের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তা নয়। কিন্তু দুর্মর আশা কেবলই দুর্ভেদ্য রহস্যের ছদ্মবেশে ছলনা করতে থাকে। সত্যটা এতই নির্দয় যে, সেটাকে বিশ্বাস করতে বিদ্রোহ করে সমস্ত অন্তর। সীয়িংও সেখানে বিলীভিং নয়।

যে দাঁত আলগা হয়ে গেছে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যে ব্যথা হবে—এ তথ্য শিশুও জানে। তবু পারে না সে দাঁতে হাত না দিয়ে থাকতে। হাত দিয়ে ব্যথা পায়, তবু হাত দেয়। শিশু যা দাঁত নিয়ে করে, আমরা বয়স্করা ঠিক অনুরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই আমাদের ব্যথাগুলি নিয়ে। ইচ্ছা ক'রে নয়, না ক'রে পারি নে ব'লে।

আসলে অনেকগুলি ব্যাপারে আমরা বোধ হয় কথনই বড় হই নে!

অস্থির সরোজকে পার্কের বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে হ'ল অপরিচিত এক বিশ্রামাকাঙ্ক্ষীর অনভিপ্রেত আবির্ভাবে। কিন্তু যাবে কোথায়? বাড়ি যেতে মন চাইল না। বাড়ি ওর বাড়ি নয়। সেখানকার অবহেলা আজ আর তার সয় না। যে অবহেলাকে সাধারণত নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য ব'লে অগ্রাহ্য করা সম্ভব, অপমানের ক্রূর মুহূর্তে তাকেই মনে হয় আগ্রাসী বৈরিতা। মানুষ তো দূরের কথা, চতুর্দিকের জড় পারিপার্শ্বিককে পর্যন্ত তখন মনে হয় উদ্যতশস্ত্র শত্রু ব'লে।

সরোজ মালতীর সঙ্গে আজই—এখনই দেখা করবে। দেখা ক'রে তারপর? তার পরের কথা ভাববার সময় নেই সরোজের। আগে দেখা তো হোক। পরের কথা পরে। অনিশ্চিত (এখনও অনিশ্চিত!)

সন্দেহের চেয়ে হিংস্র মীমাংসা ভাল, সরোজ বলল মনে মনে। বল
বলতে মনে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করল।

মালতী তখনও বাইরের পোশাক বদলায় নি। জুতো খোলে নি
ব্যাগটাকে শুধু ছুঁড়ে ফেলেছে বিছানার উপর। এ ব্যাগে মা
রাখে নি দেবেশ। দোষ যেন ব্যাগটারই। ঘরে আলো জ্বলছি
কিন্তু মালতী শুয়ে ছিল আরাম-কেদারার উপর শরীর এলিয়ে, চো
বন্ধ ক'রে। সরোজ আসতেই পা দুটো গুছিয়ে সোজা হয়ে ব'
মালতী বললে, আরে, সরোজ যে! এত রাত্তিরে?

মালতীর স্বরে অভ্যর্থনার সুর ছিল না।

রাত কিন্তু সত্যিই বেশি হয় নি। সরোজ এর আগে অসংখ্যবা
এর চাইতে অনেক পরে এসেছে। কখনও দেরি নিয়ে জবাবদি
করতে হয় নি। কিন্তু আজ? সরোজ তবু পারল না স্পষ্ট কি
জিজ্ঞাসা করতে, দেবেশের নামও উল্লেখ করতে ভয় পেল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে বলল, দিদি, এর আগে এসেছিলুম
অনেকক্ষণ ব'সে ছিলুম।

মালতী বলল, তাই নাকি? (প্রশ্নচিহ্নটা একান্তই ভাষ্যকারের
মালতীর উক্তিতে জিজ্ঞাসা কেন, কৌতূহলের আভাসমাত্র ছি
না।)

সরোজের বুঝতে বাকি রইল না যে, তার আগমন আকাঙ্ক্ষিত ছি
না, বরং গমনই ছিল অপেক্ষিত। দেবেশের উল্লেখ ক'রে তার বক্তব্যকে
একাধারে সুস্পষ্ট ও সুমধুর করবার মত পরিসর ছিল অল্পই। সরাসরি
জিজ্ঞাসা করল, দিদি, আমার দিল্লী অফিসে একটা ভেকেন্সি হয়েছে
মাইনের দিক থেকে খুব যে লাভ তা নয়, তবে দিল্লী গেলে উন্নতি
আশা আছে যা কলকাতায় নেই। দরখাস্ত করলেই যে আমার হবে
তা নয়, মাদ্রাজ আর বম্বে থেকে কত দরখাস্ত যাবে তার ঠিক নেই
তবু আজ দরখাস্ত করেছি—যদি হয়।

মালতী জুতোর বক্‌লস খুলতে খুলতে অন্যমনস্কভাবে বলল, তা
নাকি? কই, আমাকে বল নি তো! হয়ে গেলে তো খুবই আনন্দে
কথা।

দিল্লী যাওয়ার সম্ভাবনার সংবাদে মালতীর হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হবে, এই রকম আশা নিয়েই সরোজ কথাটা তুলেছিল। খবরটা শুনে মালতী যখন ক্ষীণতম কৌতূহল প্রকাশ করল না, বরং স্পষ্ট বলল যে, সরোজের দিল্লীগমন আনন্দেরই কথা হবে, তখন মালতীর বদলে সরোজের হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হ'ল। কিছুক্ষণের জন্যে বাক্‌স্ফূর্তি হ'ল না সরোজের, বিশেষ ক'রে এই কথা ভেবে যে, মাত্র মাস তিনেক আগে ঠিক এমনই একটা সুযোগ হয়েছিল নাগপুর আপিসে, যখন মালতী অভিমান ক'রে বলেছিল, যাবে না কেন? পুরুষের জীবনে কেরীয়ারই তো সবচেয়ে বড় কথা। নিশ্চয়ই যাবে।

সরোজ সেদিন উন্নতির সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছিল, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব হ'লেও তার শতাংশ আনন্দ পেত না। আজ সে কথা স্মরণ করলে ব্যথা পেতে হয়, স্মরণ করিয়ে দিয়ে লাভ হয় না। বলল, তোমাকে বলব ব'লেই তো গত তিন দিন তোমার এখানে এসেছি। তোমার দেখা পাই নি। আজও এসেছিলুম, অনেকক্ষণ ব'সে ছিলুম। তারপর ফিরে যাবার পথে তোমায় আসতে দেখলুম। তাই তো আবার এসেছি।

হ্যাঁ, আমি একটু বেরিয়েছিলেম। অবিশ্যি আমাকে যে বলতেই হবে, এমন তো কোনও কথা নেই।—মালতীর স্বরে অনুযোগের বাষ্পমাত্র ছিল না।

কথাটা সরোজের বুকে বেদনা হয়ে বাজল। মুখে তা প্রকাশ পেল না। মনে মনে ভাবল, হায় রে, কথা নেই ব'লেই তো না-ব'লে পারি নে। কথা থাকলে সে কথা ভাঙলে তো শুধু কথাই ভাঙা হয়, হৃদয় নয়। সরোজ চুপ ক'রে রইল।

মালতী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের একটা চেয়ারের উপর পা রেখে জুতো খুলছিল। সরোজের দিকে ছিল পিঠ। কি যেন একটা গানের সুর গুন গুন করছিল মালতী। সব কিছু মিলিয়ে মালতীর অন্যমনস্ক ঔদাসীন্যের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। সরোজের বুঝতে বাকি ছিল না যে, তার এখন ওঠাই উচিত। কিন্তু উঠতে পারে

কই ? আবার একটা দীর্ঘ অস্বস্তিকর নিঃশব্দতার পরে সরোজ অন্য কথা তুলল। বলল, দিদি, রেডিওটা খুলব ?

সরোজ লক্ষ্য করল যে, রেডিওর উল্লেখ করা মাত্র মালতীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। কি জন্যে কে জানে ! কিন্তু তারই সঙ্গে মালতীর মুখ যে দীপ্ত হয়ে উঠল, তার কারণ জানতে বাকি রইল না। রেডিওটা তো এখন আর শব্দসৃষ্টিকারী একটা যন্ত্র মাত্র নয়। এখন এর প্রাণ আছে। তার যোগাযোগ এখন শুধু কানের সঙ্গে নয়, প্রাণের সঙ্গে। মালতী খুশি হয়ে বলল, দাঁড়াও, আমি খুলে দিচ্ছি।

আস্তে সযত্নে আপন হাতের কোমল স্পর্শে মালতী রেডিওটা খুলল। গরম হতে যে সময়টা লাগল তার মধ্যে সরোজ বলল, দিদি, তা হ'লে তোমার কি মনে হয়, আমার এখন দিল্লী যাওয়াই ভাল ?

মালতী রেডিওটার উপর হাত রেখে দেবেশের কথা ভাবছিল, ঘণ্টাখানেক আগে ফুরিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনবার মধুর চেষ্টায়। সরোজের করুণ জিজ্ঞাসায় বাধা পড়ল স্মৃতিমন্থনে। ফিরতে হ'ল নীরস বর্তমানে। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। এখন তার নিজেরও মনে পড়ল যে, নিকট অতীতেই অনুরূপ অবস্থায় সে বিপরীত রায় দিয়েছিল। কি বলবে সে ? ঠিক এমনই সময় রেডিওটা বেজে উঠে মালতীকে বাঁচাল। মালতী আবার সরোজের দৃষ্টি এড়িয়ে পাদুকাপরিহারে মনোনিবেশ করল।

সরোজ জানে মালতীর উত্তর, তবু সেটা মালতীর মুখ থেকে না শুনে যেন ওর শান্তি নেই। সে তাকিয়ে রইল মালতীর ফেরানো মুখের দিকে অধীর প্রতীক্ষায়। অসহ্য নৈঃশব্দ্যের পরে নিজেই আবার সকল সম্মানবোধ, সকল লজ্জা পরিহার ক'রে আপন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, দিদি, তা হ'লে—

মালতীর ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। সরোজকে ব্যথা দিতে তার ইচ্ছা নেই, কিন্তু, কিন্তু— কি জানি, সরোজকে আজ ভাল লাগছে না। এর আগে তার একাকিত্বের নিরসনের জন্যে সরোজের প্রয়োজন ছিল। আজ তার একজনের সঙ্গ ভাল লাগে। সেই বিশেষ একজন কাছে না থাকলে অবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতাও অন্য সঙ্গের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেয়।

আজ সরোজ সাথীও নয়, নিঃসঙ্গতারও অন্তরায়। ও যায় না কেন ?

মালতী সরোজের দিকে না তাকিয়ে একান্ত নিরাবেগ কণ্ঠে বলল, দেখ সরোজ, প্রত্যেকেরই জীবনে এমন কতগুলি সমস্যা আছে, যার সিদ্ধান্ত নিজেকেই করতে হয়। সেখানে অপরের পরামর্শ চাওয়া যেমন নির্বুদ্ধিতা, অপরের সেখানে পরামর্শ দিতে যাওয়াও ঠিক তেমনই অনধিকারচর্চা।

অপর ? সে কে ? মালতী ? সরোজের মনে অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ কতগুলি প্রশ্ন কেবলই তীক্ষ্ণ শরের মত বিদ্ধ হতে থাকল। যারা সরোজের আপন ছিল—বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী সবাইকে তো সে পর করেছে এই মালতীরই জন্যে। একবারও তো মনে হয় নি সে কিছু হারিয়েছে, সকল ক্ষতির সকল পূরণ উচ্ছল হয়েছে দিনের শেষে মালতীর কাছে এসে। এখানে এসে পর যখন আপন হ'ল, সে হ'ল সকল আপনের বাড়া। আবার যখন সেই আপন পর হয়, তখন সে শুধু পর হয় না। হয় পরের চেয়ে কিছু বেশি, কিছু কম।

রেডিওর উচ্চ রবকে ছাপিয়ে মালতীর নীরবতা যেন চীৎকারের মত বাজছিল সরোজের কানে। আর কি করবে ভেবে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে সে রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিল। চীৎকার তবু যেন থামে না। ঘরের সমস্ত জড় পদার্থগুলি যেন এক মত্ত অট্টহাস্যে মেতে উঠেছে। মালতী রেডিওটা থেমে যাওয়ায় একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল রেডিওটার দিকে, তারপর সরোজের দিকে। তার মনে শুধু এক চিন্তা, একটু কি একা থাকবারও উপায় নেই !

সরোজ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যদি শুনতে চাও, তা হ'লে আবার খুলে দিচ্ছি। বক্তৃতাটা আমার ভাল লাগছিল না, তাই—

মালতী বলল, থাক্। শোনা যায় না, এত সব বাজে বক্তৃতা।

সরোজ এতক্ষণ দেবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না, সুযোগ খুঁজছিল। এবার বলল, হ্যাঁ। তবে দু-একজন বেশ বলে।

মালতী প্রসঙ্গ পরিবর্তনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। রেডিওর কথায় খুশি হ'ল। বলল, ও হ্যাঁ, তুমি না বলেছিলে দেবেশ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা হ'লে তোমায় জানাতে। কাল আটটায় আছে। এখানে এসে শুনো। ইংরেজী ছবি নিয়ে বলবে।

সরোজ একটু অর্থপূর্ণ শ্লেষের সুরে বলল, তোমার ওর বক্তৃতা খুব ভাল লাগে, না?

মালতীর বুঝতে বাকি রইল না সরোজের ইঙ্গিত। তার উল্লেখ-মাত্র না ক'রে সে সংক্ষেপে ও সতেজে তিরস্কার করল, সরোজ!

সরোজ অশ্রু গোপন করতে আর বাক্যব্যয় না ক'রে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালতী তাকে একবার ডাকল না, একবার আর একটু বসতে বলল না, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল না, খোলা রেখে যাওয়া গেটটা পর্যন্ত বন্ধ করতে গেল না। বিরক্তিজাত উত্তেজনা প্রশমিত হ'লে মালতী দেবেশকে টেলিফোনে ডেকে পরের দিনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল, আটটার বক্তৃতার পরে যত শীঘ্র সম্ভব। হ্যাঁ, সে সন্ধ্যা থেকেই বাড়ি থাকবে। বা রে, বক্তৃতাটা শুনতে হবে না! আচ্ছা। গুড নাইট।

মালতী চাকরকে ডেকে শ্বশুরের খাবার ব্যবস্থার কথা ব'লে দিল। নিজে কিছু খাবে না সে, শরীরটা তেমন ভাল নেই। আলো নিবিয়ে শুয়ে প'ড়ে বালিশকে বললে, এর চাইতে ভাল কখনও বোধ করি নি।

মালতীর মন অদূর অতীতের মিলনের স্মৃতিতে উত্তপ্ত, অদূর ভবিষ্যতের নিশ্চিত মিলনের প্রতীক্ষায় উদ্দীপ্ত। এ দুয়ের মাঝে নব মালতীর সদ্যজাগরিত সত্তা। আর কোন কিছুর স্থান নেই সেখানে। রুণু কেবলমাত্র ভূগোলের বিচারেই মধ্যপ্রাচ্যে বা নিকটপ্রাচ্যে, আসলে সে সুদূর পশ্চিমে অস্তগমনোন্মুখ। শ্বশুর-শাশুড়ী দোতলায় নন, পাতালে। নৈনিতালে কেউ নেই এই মালতীর। সরোজ আর তার দিল্লী দূর—বহু দূর অস্ত্।

বিপুলা পৃথিবীতে এখন শুধু দুটি মাত্র প্রাণী—মালতী আর দেবেশ,

দেবেশ আর মালতী। এই মুহূর্তে মালতীর মনে মা-বাবার জন্যে স্নেহ নেই, শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্যে দায়িত্ব নেই, রুমুর প্রতি নেই কোনও দায়, সরোজের জন্যে নেই কোনও করুণা। জীবনে প্রেম যখন আসে তখন সে আসে বন্যার মত, সব কিছুকে ভেঙে ভাসিয়ে দিয়ে। সমস্ত সত্তাকে সে আচ্ছন্ন করে, অধিকৃত হৃদয়ে সে সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানও দেয় না অন্য কোনও অনুভূতিকে। প্রীতির সেখানে ইতি, দয়া সেখান থেকে নির্বাসিতা, করুণা বহিষ্কৃতা।

ক্রমশ

প্রসঙ্গ কথা

সত্যমেব জয়তে

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতির বীজমন্ত্র বলিয়া উপনিষদের এই বাক্যটি গৃহীত হইয়াছে। সিংহমূর্তিশোভিত স্তম্ভের নিম্নে খোদিত এই মন্ত্রটি দেখিতে শুনিতে ভালই লাগে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই মন্ত্র দ্বারা কর্তৃপক্ষ চালিত হইবেন কি না? মহাত্মাজী এতবড় একটা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেশসেবা করিবার জন্য আস্ফালন করেন নাই। তিনি বিনয়ের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রচেষ্টা পরীক্ষামূলক—Experiment with truth। তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি নিজে সত্যকেই আশ্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অসত্যের সঙ্গে খুবই সংগ্রাম তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সত্যভাষণ, সত্য-আচরণ করিতে দ্বিধা ভয় করেন নাই।

বর্তমান কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এই মন্ত্রেই দীক্ষিত বলিয়া আমরা শুনিতেছি। শুনিয়া শুনিয়া আমরা জনসাধারণ যে খুব একটা উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। তাহার অনেক কারণ আছে। প্রধান একটি কারণ এই যে, সত্যভাষণ, সত্য-আচরণের পরিবর্তে সত্যের অপলাপ বা সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার দৃষ্টান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে

সত্যভাষণের হাস্যকর আস্ফালনই জনসাধারণ চারিদিকে দেখিতে পাইতেছে। দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার দৃষ্টান্তগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে আরও একটি বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

অনেকেই জানেন যে, যীশুর বিচারের সময় যীশু বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্য প্রচার করিয়া থাকেন। বিচারক পিলাত বলিলেন, সত্য আবার কি বস্তু?—বলিয়া তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। পিলাত ছিলেন রোমের সাম্রাজ্যবাদ-নীতিতে বিশ্বাসী। যাহা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং পোষক, তাহা ব্যতীত আর সকলই অসত্য—এই বোধ হয় ছিল তাঁহার নীতি।

এই নীতি ইউরোপ ও আমেরিকায় এখনও চলিতেছে। সেখানে রাষ্ট্রনীতিতে একটা পাপ ক্রিয়া করে, সেটি হইতেছে—ডিপ্লোম্যাসি বা কূটনীতি। এই কূটনীতি বিশুদ্ধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারে না। মিথ্যাকে সত্যের আবরণে সাজাইয়া অর্ধসত্যকে পূর্ণসত্য বলিয়া প্রচার করাই কূটনীতি। পাশ্চাত্য কূটনীতিজ্ঞগণ প্রয়োজনমত সত্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক গভর্মেণ্টেরই এইজন্য একটি বিভাগ থাকে, তাহাতে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বিভাগের কার্য হইয়াছে অপ্রিয় সত্যঘটনা সাধারণের কর্ণগোচর না করা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ধসত্যকে একত্র করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য বিরাট সত্যের সৃষ্টি করা। এইজন্যই রেডিও ওয়্যারলেস সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হইয়া থাকে। ঠিক এই নীতি অনুসরণ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়া থাকে। এক কথায় শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র সত্যকে ভয় করিয়া চলেন বলিয়া সত্যের প্রচার নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ এখন নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। সেই শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হইতেছে তাহাতেই বুঝা যায় যে, প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিগণ বুকের সত্য মুখে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা খানিকটা ইংলণ্ডের, খানিকটা আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণ করিয়া পাশ্চাত্য ছাঁদে আমাদের রাষ্ট্রবিধান প্রস্তুত

করিতেছেন। এবং জনগণের আশু প্রয়োজন মিটাইবার পূর্বে কূট-নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

বিহারের কোন কোন অঞ্চলের লোক বাঙালী। বাংলাই সেই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা হইবে—কংগ্রেসের এই নীতি কার্যকরী হইতেছে না। বরং সত্যাশ্রয়ী অনেক কংগ্রেস-নেতা অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন, মানভূমের অধিবাসীগণ বাঙালীও নহে, তাহাদের ভাষাও বাংলা নহে। ভারত-সরকার স্তোকবাক্য প্রয়োগে বলিয়া থাকেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন-কার্য এখন আরম্ভ করা যায় না। করিতে গেলে বিষম বিপদের সৃষ্টি হইবে। এ দিকে বিহার কর্তৃপক্ষ সময় ও সুযোগ পাইয়া সেখানে গায়ের জোরে হিন্দী প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছেন। যদি কয়েক বৎসর পরে এই প্রশ্ন আবার উঠে, তখন গণভোটের দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, ও-অঞ্চলের অধিবাসীগণ হিন্দীভাষী। এই করিয়া সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। অথচ সরকারী মটো হইল—সত্যমেব জয়তে। ইহাকে ভণ্ডামি বলিলে কর্তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে। যদি সোজাসুজি বলিয়া দিতেন যে, রাজেন্দ্রবাবুর রাজ্য হইতে এক ইঞ্চি ভূমিও বাংলাকে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে আর কিছু না হোক, সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইত।

কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রীদের দুর্নীতি লইয়া অভিযোগ হইয়াছে। পাছে কংগ্রেসের দলগত প্রাধান্য খর্ব হয়, জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, এইজন্য এই কলঙ্ক চাপা দেওয়া হইতেছে। সত্যের অপলাপ করিতে দ্বিধা হইল না। ন্যায়ের মর্যাদাও নির্লজ্জভাবে পদদলিত করা হইল।

শরৎচন্দ্র বসুর নির্বাচনের পর অকস্মাৎ বাংলার আইন-সভা ভাঙিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। আবার সাধারণ নির্বাচন হইবে, এইজন্য বড়লাটকে যদৃচ্ছা ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কু-লোকে বলে যে, শরৎবাবুকে আইন-সভায় বসিতে দেওয়া যত দিন সম্ভব বিলম্বিত করাই কর্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ একটি ধারণা সাধারণের মনে যদি জন্মিতে থাকে, তাহাতে কংগ্রেসের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

পণ্ডিত নেহেরু আমেরিকা কেন গেলেন, তাহা এখনও দেশবাসী বুঝিতে পারে নাই। মনের আসল কথা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। যদি কেবল মাত্র দেশভ্রমণই উদ্দেশ্য হয়, তাহা খুলিয়া বলিলেন না কেন, বুঝা যাইতেছে না। সেখানে যাইয়া আমেরিকার আইন-সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার অর্থ লইয়া ইতিমধ্যেই নানা মতভেদ দেখা যাইতেছে। আর একটা যুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষ রুশিয়ার বিরোধিতা করিবে—এমন একটি ইঙ্গিত পণ্ডিতজীর ভাষণে ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। পণ্ডিতজী যদি যথার্থ সত্যাশ্রয়ী হইতেন, তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলিলেই পারিতেন। তিনি যে কূটনীতির আশ্রয় লইয়া গোলমেলে কথা বলিতেছেন, ইহাতে মহাত্মাজীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। তারপর আমেরিকায় তিনি যে জামাই-আদর লাভ করিয়াছেন, তাহার বিবরণী 'রেডিও' ও সংবাদপত্র মারফৎ পাইয়াছি। এত আদর সম্মান আমেরিকাবাসী একটি অশ্বেতাঙ্গকে যে দেখাইলেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটি গুপ্ত উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষকে দলে ভিড়াইবার এই একটি অন্যতম উপায়। শুনিয়াছি পণ্ডিতজী নির্ভীক ব্যক্তি। তিনি অকপটে সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করিতেছেন দেখিয়া অনেকের ভাল লাগে না। আমরা ভারতবাসী না জানি কি একটা কূটনৈতিকজালে জড়াইয়া পড়িব—এই আশঙ্কা মানুষের মনে আসিয়াছে।

ভারত-সরকার ঘোষণা করিলেন, দেশে চিনির অভাব হইয়াছে। সুতরাং চিনির ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করা হইল। অথচ প্রকাশ যে, চিনির কলের গুদামে চিনি ভরতি। এ ব্যাপারেও সত্যের অপলাপ হইয়াছে।

এই প্রকারের আরও অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রীতিকর হইবে না। মহাত্মাজীর আদর্শ মানিয়া চলিবেন বলিয়া কংগ্রেসের নেতাগণ যে বড় গলায় বলিয়া বেড়াইতেছেন, ইহার মধ্যে কপটতার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা দেশবাসীর পক্ষে সুখকর নহে। গান্ধীজীর আদেশ নির্দেশ ইঁহারা অনুসরণ করেন নাই এবং করিতেছেনও না। মহাত্মাজীর ইচ্ছার

বিরুদ্ধে ভারত-বিভাগ করাইয়া কংগ্রেস-নেতাগণ শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মাজী সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ফলে যেখানেই যে বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে, সেইখানেই চোরাকারবার বাড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্র দেশে সরকারী কর্মচারীদের বেতন পাঁচশ টাকার বেশি হইবে না—এই ছিল মহাত্মাজীর নির্দেশ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বহুবেতন বহুবিলাসিতার উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া সরকারী কর্মচারীদের একটি পৃথক শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কেবল একটি বিষয়ে গান্ধীজীর আদর্শ কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন। সেটি হইতেছে চোরাকারবারী এবং অতিরিক্ত লভ্যকামী ব্যবসায়ীদের প্রতি অহিংসা।

উপসংহারে বলিতে চাহি—কথা ও কাজে সঙ্গতি রাখিতেছেন না বলিয়া কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে। সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ আনুরক্তি যদি মহাত্মাজীর আদর্শ হয়, তাহা হইলে বলিব, বর্তমানে নেতাগণ সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

বাংলার জনসম্পদ

আজকাল সাময়িকপত্রে নেতাদের বক্তৃতায় খুব বড় বড় বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলার সকলের অপেক্ষা বৃহত্তম সমস্যার দিকে কর্তাদের এবং সাধারণের তেমন দৃষ্টি দেখা যায় না। সেই সমস্যাটি হইতেছে—পরিশ্রমী উদ্যমশীল বাঙালী শ্রমিকের অভাব। কিছুদিন পূর্বে বাংলার সেচ-বিভাগের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মহাশয়ও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, গ্রামের শ্রমিকগণ মাটি-কাটার কার্য করিতে অসম্মত। মাটি-কাটার কাজ তাহাদের নহে—এই নাকি শ্রমিকগণের উক্তি। ভারতের অন্যত্র একটিও বাঙালী শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলা দেশে অবাঙালী শ্রমিকের অভাব নাই। অবাঙালী শ্রমিকগণ চলিয়া গেলে কলিকাতা শহর একদিনে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। রেল-স্টেশনে একটি বাঙালী কুলি নাই। কর্পোরেশনের

শ্রমসাধ্য কার্য সকলই অবাঙালী কুলিরা করিয়া দিতেছে। যানবাহন-চালক প্রায় সকলই অবাঙালী। কলকারখানা চালায় প্রধানত অবাঙালী শ্রমিকেরা। পুলিস-বিভাগেও অবাঙালীর সংখ্যাই বেশি। ধোপা, নাপিত, মুটে-মজুর, মুদী, মেঠাই-বিক্রেতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও বাঙালীর সংখ্যা সামান্য।

ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু মনে হয়, প্রধান কারণ হইতেছে—বাঙালী শ্রমিকগণের দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই। শ্রমসাধ্য কর্ম করিতে তাহারা যেমন বিমুখ, তেমনই অপটু। অথচ একই আবহাওয়ায় বর্ধিত মুসলমান শ্রমিকগণ হিন্দু শ্রমিক অপেক্ষা বেশি মজবুত, বেশি পরিশ্রমী।

হিন্দু শ্রমিকদের কর্মবিমুখতা দৈহিক শক্তির স্বল্পতাবশত হইয়াছে, না, ইহার মধ্যে সামাজিক কোনও কারণ রহিয়াছে—ইহা সর্বাগ্রে আবিষ্কার করিতে হইবে।

যাঁহারা সমাজতত্ত্ব, প্রজনন প্রভৃতি বিজ্ঞান লইয়া চর্চা করেন, তাঁহারা গবেষণা করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন। মনে হয়, মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে আমাদের শ্রমিকদের অপটুতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে।

প্রথমে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় কঠোর জাতিভেদ প্রথা থাকায় অনিষ্ট হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের অন্যত্রও রহিয়াছে, কিন্তু বাংলায় ইহার বিষময় ফল বেশি করিয়া লক্ষিত হয়। জাতিভেদের কঠোরতা সমাজের নিম্নস্তরে আরও বেশি। ফলে সেই স্তরের লোকেদের মনে এইজন্য একটা হীনতাবোধ ক্রিয়া করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উপরের স্তরে উঠিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। নাপিত বুঝিতেছে ক্ষৌরকর্ম করিতে থাকিলে সে চিরকাল সমাজে হেয় হইয়া থাকিবে, তাই তাহারা তাহাদের পদবী বদল করিয়া শীল প্রামাণিকের পরিবর্তে দাস লিখিতেছে। ধোপাদেরও ঐ মনোভাব। নমঃশূদ্রদের বহুসংখ্যক লোক পদবী বদলাইয়া লইতেছেন এবং উপবীত ধারণ করিয়া উপরের স্তরে উঠিবার জন্য ব্যস্ত। ফলে ঐ ঐ শ্রেণীর হিন্দুগণ নিজেদের কৌলিক বা জাতব্যবসা ত্যাগ করিতেছে।

এমন কি কেহ কেহ স্বজাতির প্রচলিত নামটা পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। এই সেদিন ইহার একটি মর্মপীড়াদায়ক দৃষ্টান্ত কলিকাতার বুকে দেখা গেল। এক কথায়, দৈহিক পরিশ্রমের কার্য, যাহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অন্যায়ভাবে 'ছোটলোকের কাজ' বলিয়া আসিতেছিলাম, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণও সেই কর্মকে ছোটলোকের কাজ বলিয়া তাহারা আর সে কার্য করিতে চাহে না। সে সব কাজ এখন হয় মুসলমান শ্রমিক, না হয় অবাঙালী শ্রমিকগণ করিতেছে। হিন্দু বাঙালী শ্রমিকদের মনোভাব এই যে, বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব তথাপি ছোট কাজ করিব না। এই মানসিক ব্যাধিই সকল দৈন্যের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কোনও কাজই যে হীন হেয় নহে, সে শিক্ষা আমরা তাহাদের দিই নাই। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির যে কৌলিক ব্যবসায় ছিল, তাহা আরও উন্নত, আরও অর্থাগমযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদিগকে আমরা শিক্ষা উৎসাহ ও সাহায্য দিই নাই। সুতরাং গভর্মেণ্ট এবং নেতাদের অবহেলায় এই শোচনীয় দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ, দেশময় দারিদ্র্য এবং নানাপ্রকার ব্যাধির প্রকোপ একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত, এবং উভয়ই কৌলিক ব্যবসায় বর্জন প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। নিম্নস্তরের হিন্দু শ্রমিক জাতব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে পারে না, সুতরাং পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয় দেশের কৃষক-শ্রমিক হীনবল হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে ম্যালেরিয় প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হয় মরিয়া যাইতেছে, না হ অর্ধমৃত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। পরিশ্রমবিমুখ মানুষ উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারে না বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয় খাইতে পারে না। এই প্রকারে একটি পাপচক্র সমাজের স্তরে স্তরে ঘুরিতেছে। অর্থাৎ শ্রমবিমুখতার দরুন দারিদ্র্য, আবার দারিদ্র্যহে নানা ব্যাধির প্রকোপ এবং তাহার জন্যও শ্রমবিমুখতার সৃষ্টি।

তৃতীয়, সমাজের উচ্চস্তরের হিন্দুগণের মনে 'ছোটলো বলিয়া ঘৃণা বা অবজ্ঞা রহিয়াছে, তাহার জন্যও নিম্নস্তরের হিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া উপরে উঠিয়া 'ভদ্রলোক' সাজিবার জন্য ব্যগ্র। তাহা

এ ইচ্ছা খুব নিন্দার কথা নহে। কিন্তু অনেকে হাতের কাজ ভ করিয়া করিলে যে অর্থাগম হইতে পারিত, তাহা ত্যাগ করিয়া নূ এক-একটা ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া অপটুতার দরুন অকৃতকার্য হই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। সহানুভূতির সঙ্গে ইহাদের শিক্ষা দি চালনা করিয়া কর্মনিপুণ করিবার জন্য কোনও ব্যবস্থাই আম করিতেছি না। ফলে বাংলার শ্রমিকসমাজ ক্রমশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে এবং অবাঙালীর হাতে সমস্ত বৃত্তি চলিয়া যাইতেছে। তাহারা ও উপার্জন করিয়া বাংলার বাহিরে পাঠাইতেছে, আর বাংলা দে দ্রুতগতিতে দারিদ্র্যে ডুবিতেছে।

কলিকাতার ভূগর্ভস্থ রেল-লাইন এবং আরও বহু অর্থব্যয়সাপে শ্রুতিসুখকর পরিকল্পনার কথা নেতাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে এই সব পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা প্রায় সমস্তই অবাঙালীরা লইয়া যাইবে; বাঙালী শ্রমিকের অদৃ সনাতন দারিদ্র্যই রহিয়া যাইবে।

নেতাদের মুখে শুনা যায়, কৃষক ও শ্রমিক প্রত্যেক সমাজে মেরুদণ্ড। কিন্তু বাঙালীর সমাজে সে মেরুদণ্ড যে ব্যাধিগ্রস্ত হই হইয়া পড়িতেছে, আর যে সে মেরুদণ্ড সমাজদেহকে ধারণ করি রাখিতে পারিবে না এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

কি প্রকারে এই মুমূর্ষু সমাজে প্রাণ সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহারও একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই আইন করি জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহে বিঘ্ন থাকিবে না। গ্রামে গ্রামে গিয়া ইহাই লোকদের বুঝাইতে হইবে যে, জাতিভেদ আর রহিল না। সকলেই সকলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এক বর্ণের পাত্র-পাত্রী অপর বর্ণের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কোন বাধা থাকিবে না। সর্বাগ্রে এই ঘোষণা করার প্রয়োজন—ইহাতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণের লোকদের মনেও উৎসাহ আসিবে এবং তাহারা, যাহাকে বলে মানুষের মর্যাদা তাহার আস্বাদ পাইবে, এবং ছোটলোক বলিয়া অভিহিত হইবার গ্লানিও দূর হইয়া যাইবে।

তারপর বড় বড় পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখিয়া পল্লীতে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসংস্কারকার্যে কৃষক-শ্রমিকগণের উপার্জনে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। তাহারা যখন শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, তখন যেমন সৈন্যদের জন্য ব্যবস্থা হয়, তেমনই তাহাদের জন্যও পারিশ্রমিকের সঙ্গে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে তাহারা উৎসাহিত হইয়া বেশি পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হইবে। আমাদের সরকার কলিকাতা শহরকেই সুসজ্জিত করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যাইতেছেন। পল্লীবাসী দুই কোটি লোকদের জন্য তাঁহারা তেমন কিছু করিতেছেন না। ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ, পানীয় জলের সরবরাহ, পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা, তাহাদের জীবিকা-সংস্থানের উন্নততর ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। গ্রামে গ্রামে মানুষ যাহাতে সুস্থ শরীরে কৃষিকার্য্য এবং কুটীরশিল্পে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহার জন্য সরকার-পক্ষের কোন পরিকল্পনা নাই। ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

বাংলার জনগণকে উৎসাহী উদ্যমী শ্রমশীল করিয়া না তুলিতে পারিলে বাংলার কল্যাণ নাই। বাংলার সরকার অনতিবিলম্বে এই বিষয়ে অবহিত না হইলে আরও অবাঙালীরা আসিয়া বাংলা দেশের সকল উপার্জনের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিবে এবং বাঙালী দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া চিরকাল পরপদানত হইয়াই থাকিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

বনিয়াদী শিক্ষার কয়েকটি দিক

১৩৫৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার" শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন কার্তিক-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে। এ আলোচনার জের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা এবং বর্তমান বর্ষের বৈশাখ-সংখ্যায় আসিয়াছে। আষাঢ়-সংখ্যায় দেখিতেছি, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী উদার মনোভাব লইয়া এ

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের যতখানি সচেতন হইয়া উঠা উচিত ছিল, ততখানি তাঁহারা হন নাই। তাই শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনাকে অনেকে কেবল শিক্ষকদেরই ব্যাপার মনে করিয়া এড়াইয়া যান, চিন্তা করেন না যে, শিক্ষার ব্যবস্থার উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। স্বীকার করি, অন্ন বস্ত্র এবং অন্যান্য অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে মানুষের জীবন এমন বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, টিকিয়া থাকিবার প্রশ্নই এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাকে অবহেলা করিলে শক্তিমান জাতি গঠনের একটি প্রধান উপাদানকেই উপেক্ষা করা হইবে।

অজ্ঞতার গুরুভার বহন করিয়া কোন জাতিই উন্নতির পথে আগাইয়া চলিতে পারে না—মহাত্মাজী এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি এমন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার কল্যাণে শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নয়, শিক্ষা মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া প্রতি নাগরিকের ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়তা করিবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী সকল শিক্ষাবিদ্‌ই সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিবেন। বনিয়াদী শিক্ষার এ আদর্শ সর্বজনগ্রাহ্য; কিন্তু ইহার কতকগুলি নীতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কেন না, আমরা চাই, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার আবশ্যক হইলে তাহা করিয়া এ প্রণালী আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা হউক। দ্বিধা, সংকোচ ও নিরুদ্যমের সঙ্গে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাহা হইতে সুফল আশা করা বৃথা।

শ্রীযুক্ত গুপ্তের সঙ্গে আমাদের যে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য হইয়াছে, তাহার আলোচনা ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে নামাইয়া না আনিয়া নৈর্ব্যক্তিক স্তরে রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। অল্প কিছুদিন আগে বাইগাছি (২৪ পরগনা) বনিয়াদী ট্রেনিং কলেজে থাকাকালীন কয়েকটি বনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের এবং কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে এ শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল। বনিয়াদী

শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইলে এগুলির বিশদ আলোচনা দরকার।

১। গান্ধীজী বনিয়াদি শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে ইহার আর্থিক স্বাবলম্বন। বিদ্যার্থিগণের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে—ইহা ছিল তাঁহার আদর্শ। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যালয়ের যোগ্যতার অগ্নিপরীক্ষা—acid test of efficiency।

বর্তমানে জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেরূপ চড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ছাত্রদের অর্জিত অর্থে শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন সঙ্কুলান সম্ভব কি? হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘের তত্ত্বাবধানে যে বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, সেখানেও গান্ধীজীর এই আদর্শানুগ যোগ্যতা সম্পূর্ণ অর্জিত হইয়াছে বলিয়া বিবরণ দেখি নাই।

২। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কঠোরতা শ্লথ করার পরিণাম সম্বন্ধে গান্ধীজী ইঙ্গিতে এবং আচার্য কৃপালনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে উৎপাদিত জিনিসের আর্থিক মূল্যের গুরুত্ব হ্রাস করিলে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার একটা উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। বাজারে প্রতিযোগিতার ভাব কমিয়া গেলে উৎপাদিত জিনিসের উৎকর্ষের প্রতি মানসিক শিথিলতা আসা অস্বাভাবিক নয়। সকল বিদ্যালয়েই যে এরূপ হইবে তাহা নয়, তবে বাজারে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে বেতন সঙ্কুলান করিতে হইবে—এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে যেমন গরজ থাকিত, তাহা অনেকেরই থাকিবে না। ফলে ক্রমে শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষের অবনতিও অসম্ভব নয়।

৩। প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের ভূমিপ্রকৃতি, জনসাধারণের জীবিকার্জনের উপায়, পরিবেশ ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প নির্ধারিত হওয়া উচিত। রুরাল অ্যাণ্ড আর্বান শব্দের যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, যে সব অঞ্চল কৃষিপ্রধান এবং শিল্পপ্রধান এবং যেখানে লোকের জীবিকা-সংস্থানের

পন্থা বিভিন্ন রকম হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়া প্রকৃতি এবং জীব‹
সঙ্গে সংযোগ সাধন করিতে হইলে বিদ্যাভবনে প্রবর্তিত শিল্পের মে
বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। সর্বত্রই কেবল সূতা-কাটা এবং বয়ন
বনিয়াদী শিল্প হিসাবে গ্রহণ না করিয়া কৃষি এবং অন্যান্য শিল্পে
গ্রহণ করা উচিত। যদিও সূতা-কাটা এবং বয়নশিল্পের মধ্যে শি
সম্ভাবনা (Educative possibilities) খুব বেশি, এবং বিভিন্ন শ্রে
ক্রম অনুযায়ী ইহাকে সহজে ভাগ করিয়া লওয়া যায়, তবু কৃষিপ্রঃ
অঞ্চলে চাষের, অন্তত বিদ্যাভবন-সংলগ্ন জমিতে সব্জী এবং ফল ইত্যা
চাষের উপর জোর দেওয়া উচিত। ইহার আর্থিক দিকের স
অন্য কোন প্রচলিত ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই।

৪। পক্ষান্তরে বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই যদি বয়নশিল্প গ্রহণ ক
হয়, তবে ছাত্রদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের সমস্যা একদিন গুরুতর হই
দেখা দিতে পারে। হাজার হাজার বিদ্যালয়ে হাতে প্রস্তুত মোটা কা
মিলের তৈরি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে কি
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশী জিনিস বর্জনের উন্মাদনায় লো
বেশি দাম দিয়াও খদ্দর এবং দেশী তাঁতের বা মিলের কাপড় কিনিয়াছে
বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে মিলের কাপড় যদি ভাল এ
অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়, তবে ছাত্রদের তৈয়ারি কাপড় শুধু শিশুদের প্র
অনুরাগের বশেই কি লোকে কিনিবে? যদি প্রতিযোগিতায় না চ
এবং সরকারকে উৎপাদিত জিনিস গ্রহণ করিয়া শিক্ষকদের বেতনভা
বহন করিতে হয়, তবে শেষ পর্যন্ত অবিক্রিত বস্ত্রের বোঝা গুরুভা
হইয়া দাঁড়াইবে না তো?

৫। বলা হইয়াছে, বনিয়াদী শিক্ষা সত্য ও অহিংসার উপ
প্রতিষ্ঠিত। এদিকে স্বাধীন ভারতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে কিশো
ও তরুণকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে গভর্মেণ্ট আহ্বা
জানাইতেছেন। বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ভারতে
শক্তিশালী যোদ্ধদল গড়িয়া তোলা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। বনিয়াদী
শিক্ষার এই অহিংস ভিত্তির সঙ্গে বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের যে
বৈষম্য দেখা দিয়াছে, ইহার সামঞ্জস্য-বিধান আবশ্যক। জীবনের জ

প্রস্তুতির এক নাম শিক্ষা। ভারতের নাগরিককে স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করিতে হইতে পারে। কাজেই বাল্য কাল হইতে তাহার জন্য প্রস্তুতিও প্রয়োজন।

আমরা মনে করি, কোন বিরাট কাজে, বিশেষ করিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজে, অগ্রসর হইবার কালে পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো এবং কাম্য লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকিলে পরিণামে পণ্ডশ্রম হইবার আশঙ্কা থাকে। শিক্ষাপ্রণালীর বিভিন্ন শ্রেণীর খুঁটিনাটি পাঠ্যক্রম নির্ণয়কে গুপ্ত মহাশয় 'অপচেষ্টা' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। শিক্ষায় অগ্রসর সকল দেশই এইরূপ 'অপচেষ্টা'র ভিতর দিয়া উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। মহাত্মাজী বনিয়াদী শিক্ষার মূলগত ভাবটি স্থত্রাকারে এক শিক্ষাবিদ্‌গোষ্ঠীর নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য নির্ধারণের 'অপচেষ্টা' করেন নাই, করিয়াছেন জাকির হোসেন কমিটী। আমাদের মতে যথার্থ কাজই করিয়াছেন। শুধু এইটুকু নমনীয় মনোভাব পরিকল্পনা-রচয়িতাদের রাখিতে হইবে যে, কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার কালে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে তাহা সাধন করাই বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বনিয়াদী শিক্ষাকে "গাঁয়ের শিক্ষা ব'লে ছাপ এঁটে দেবার মূলে একটা ভেদবুদ্ধি ক্রিয়া করছে" বলিয়া অনিলবাবু যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বনিয়াদী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলে শহরের জনসাধারণ নিজেদের সন্তানসন্ততিকে ইহার প্রয়োগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে রাজী হইবে কেন? রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে :

"যে তপস্যা সত্য, তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

আরক্ষা-সমস্যা

রাম যদি চুরি করে শ্যাম ধরে তারে,
দুজনে করিলে চুরি কে ধরিবে কারে?

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

১৫

গত কয়েকদিন থেকে রূপচাঁদ মনে মনে একটি ব'ড়ে হাতে ক'রে কোথায় সেটি বসাবেন ভাবছিলেন। সনাতন মল্লিকের আগমনে তাঁর সে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। রূপচাঁদ যুক্তিপন্থী জড়বাদী লোক, দৈব-টৈবের ধার বিশেষ ধারেন না, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য তিনি বিচলিত হলেন একটু। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হ'ল, এর মধ্যে দৈবের কোনও ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি! মনে হওয়াতে কিন্তু আনন্দিতই হলেন। সমস্ত যুক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে তাঁর মন কোন এক অজানা দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় লোলুপ হয়ে উঠল। এ ভাবে লোলুপ হয়ে ওঠাটা যে অযৌক্তিক, তা তাঁর মনেই হ'ল না।

শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক অবশ্য রূপচাঁদকে সাহায্য করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাজে। তিনি যদিও অমরবাবুর একটা কাছারির ম্যানেজার ব'লেই বিখ্যাত, তবু তাঁর নিজেরও বিষয়-সম্পত্তি আছে কিছু। যদিও যৎসামান্য, তবু সেটাকে কেন্দ্র ক'রেই একটা ফৌজদারী মামলায় প'ড়ে গেলেন তিনি। সিংহেশ্বর দারোগা যদি ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়, তা হ'লে খুনের দায়ে পড়তে হবে তাঁকে। বিপদে পড়লে সনাতন মল্লিকের বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে ওঠে। সিংহেশ্বর দারোগার কাছে না গিয়ে তিনি সোজা চ'লে গেলেন রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তাঁর মনে হ'ল, রূপচাঁদ যখন পুলিস-অফিসের বড়বাবু, তখন তিনি দারোগারও দারোগা।

রূপচাঁদ হাসিমুখে মল্লিক মশায়ের কথা শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। নিশ্চয় করবেন। মল্লিকের মুখের দিকে হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর বললেন, আপনি অমরকে দিয়েও যদি একটু চেষ্টা করেন, তা হ'লেও তো হয়ে যায়। অমরকে খুবই খাতির করে সিংহেশ্বর দারোগা।

তা জানি।—মৃদু হেসে বললেন মল্লিক মশাই।—কিন্তু পাখি নিয়ে উনি এমন উন্মত্ত যে, এ সব কথা ওঁর কাছে পাড়াই মুশকিল।

এইবার ব'ড়েটি চাললেন রূপচাঁদ।

মুচকি হেসে বললেন, বিশেষ ক'রে পাখির ডানা নিয়ে বলুন। সেদিন স্বচক্ষেই তো দেখলেন।

এর উত্তরে মল্লিক কোন কথা বললেন না, তাঁর মুচকি হাসিটি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে গেল শুধু।

না না, হাসির কথা নয়।—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেল এবার।—বন্ধু হিসেবে এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত আমাদের।

কি প্রতিকার করবেন? আপনি আমি কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? যার হাতে অত টাকা—

কথাটা শুনে রূপচাঁদ দ'মে গেলেন একটু মনে মনে। বস্তুতান্ত্রিক লোক তিনি, টাকার ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে অনেক টাকা আছে—এ সংবাদটা মোটেই আনন্দজনক নয় তাঁর কাছে। তাঁর ধারণা, টাকা দিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। কাকে কিনতে কত সময় এবং কি পরিমাণ অর্থ লাগে, সেইটে কেবল নির্ভর করে প্রতি স্ত্রীলোকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের উপর। আর কোন তফাত নেই। অমরেশ যে বড়লোক তা রূপচাঁদ জানতেন, কিন্তু তার ঠিক কত টাকা আছে এ খবরটা ঠিক তিনি জানতেন না। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল।

অনেক টাকা আছে নাকি ওঁর?

নেই? বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু জমিদারি আছে যে। নগদ টাকাও আছে বেশ। বাপের, শ্বশুরের, মামার—তিন জায়গারই বিষয় পেয়েছেন কিনা। ত্রিবেণী-সঙ্গম। অগাধ জলের মাছ উনি।

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক অবশ্য রাশ টেনে ধরতে পারেন—ওঁর পরিবার।

মল্লিক মশাইও কথাটা স্বীকার করলেন।

তা পারেন বইকি, একশো বার পারেন। কিন্তু করছেন না তো কিছু। বরং ওঁর গোড়েই গোড় মিলিয়ে—

আমরা সেদিন যেটা দেখলাম, সে খবরটা উনি জানেন না বোধ হয়। আমাদের উচিত খবরটা ওঁর কানে তুলে দেওয়া। আমার দ্বারা অবশ্য অসম্ভব সেটা, কোন কৌশলে আপনি যদি পারেন।

আমি? ও বাবা! কে পড়তে যাবে ওই বাঘিনীর পাল্লায়।

বাঘিনী নাকি? মনে তো হয় না দেখে।

আপনার মনে হবে কেন, হবার কথাও নয়, যার ঘাড়টি মটকায় সে-ই জানতে পারে।

ঘাড় মটকায় নাকি?

খুব মটকায়। এখানকার জমিদারি তো ওঁরই বাপের. উনিই সব দেখাশোনা করেন, পান থেকে চুনটি খসবার জো নেই কারও। লেখাপড়া তেমন জানেন না বটে, কিন্তু সমস্ত জমিদারির হিসাবপত্র একবারে নখাগ্রে।

সেইজন্যেই তো আমার আরও আশা হচ্ছে যে, নিজের স্বামীর পান থেকে চুন খসার খবরটা পেলে উনি ছেড়ে কথা কইবেন না। খবরটা আপনি পৌঁছে দিন কোন রকমে, বুঝলেন? আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন।

কথাটা ব'লে রূপচাঁদ এমনভাবে চাইলেন মল্লিক মশাইয়ের দিকে যে, মল্লিক পুলকিত না হয়ে পারলেন না।

নবুর মাকে দিয়ে খবরটা বলাতে পারি অবশ্য। এমনভাবে বলবে, যেন গুজব শুনেছে একটা। সেটা কিছু অসম্ভব নয়।

নবুর মা-টি কে?

ওঁর ঝি।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূপচাঁদ বললেন, উপকারটি করুন তা হ'লে। অমরেশ আমাদের বন্ধুলোক, কিন্তু এসব ব্যাপার সামনাসামনি তো বলা যায় না কিছু। অথচ—

রূপচাঁদ এমন একটা ভাব করলেন যে, মল্লিক মশাই যদি নবুর মাকে দিয়ে রত্নপ্রভার কানে খবরটা তোলেন, তা হ'লে তিনি, মানে রূপচাঁদই, যেন ব্যক্তিগতভাবে বাধিত হবেন। মল্লিক মশাই রূপচাঁদের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, রত্নপ্রভার উপর তাঁর নিজেরও একটা আক্রোশ আছে, তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

বেশ, নবুর মাকে বলব আমি। দু-চার দিনের মধ্যে চ'লেও যাচ্ছেন ওঁরা।

কারা?

অমরবাবুরা।

কোথায়?

ওঁদের জমিদারি দেখতে। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে তো। একটা জরুরি তারও এসেছে নাকি কোথা থেকে।

ডানাও সঙ্গে যাচ্ছে নাকি?

প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন, যাওয়া তো উচিত।

রূপচাঁদের মনটা ঝম্পনোন্মুখ বিড়ালের মত একাগ্র হয়ে উঠল সহসা।

সিংহেশ্বর দারোগাকে আজই খবর পাঠাব আমি। আপনিও নবুর মাকে লাগান আজই, দেরি করবেন না। দেরি করবেন না, বুঝলেন?

মল্লিক মশাইয়ের কেমন যেন অস্পষ্টভাবে মনে হ'ল যে, সিংহেশ্বর দারোগাকে সপক্ষে আনার মূল্য হিসাবেই যেন তাঁকে এ কাজটি করতে হবে।

উঠি তবে।

নবুর মায়ের কথাটা ভুলবেন না।

না।

মল্লিক মশাই চ'লে গেলেন। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন রূপচাঁদ। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হতে লাগল তাঁর। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিলেন। তারই একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। একটা সর্পসঙ্কুল গুহার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সিন্দবাদের মানসিক অবস্থা যে রকম হয়েছিল, তাঁরও যেন সেই রকম হ'ল। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। প্রত্যেকটা মনোহর, প্রত্যেকটা বিষধর। প্রত্যেকের ফণার দু পাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ, না, মণি? রূপচাঁদের শরীরের শিরায় উপশিরায় অগ্নিস্রোত বইতে

উলটে দেখতে হবে একটু। এই প্রসঙ্গে মনে হ'ল, একটা পাখির ব্যাপারেই যখন এত হেঁয়ালি, মানুষের ব্যাপারে সে হেঁয়ালি না জানি আরও কত জটিল! অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ডানার বাসার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে অপ্রত্যাশিত রূপ তিনি এই সামান্য পাখিটার মধ্যে দেখলেন, ডানার মধ্যেও তেমনই একটা কিছু পাওয়া যাবে কি না এই ধরনের একটা ঔৎসুক্য তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, একটা শব্দ শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোর বালক ডানার বাড়ির পিছন দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোপ-জঙ্গল ভেদ ক'রে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছে। কবি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ভদ্রঘরের বয়স্ক মেয়েকে এমনভাবে ছুটতে কখনও দেখেন নি তিনি। মাথার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে পিঠে, পরনের শাড়ি গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। বকুলবালা আনন্দমোহনকে দেখেই ছুট দিয়েছিলেন, দূর থেকে আনন্দমোহন তাঁকে চিনতে পারলেন না। চণ্ডীর সঙ্গে বকুলবালা চুপিচুপি দুপুরবেলা বেরিয়েছিলেন, অমরবাবু পাখিদের জন্যে কাঠের যে সব বাসা বানিয়ে নানা গাছে টাঙিয়ে দিয়েছেন তাই দেখবার জন্যে। ডানার বাসার সামনের গাছেই টাঙানো ছিল কাঠের বাক্স একটা, চণ্ডী দূর থেকে সেইটে দেখাচ্ছিল বকুলবালাকে।

কবি গিয়ে দেখলেন, দূর থেকেই দেখতে পেলেন, ডানা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তার বাঁ কাঁধের উপর। শাড়ির জরি-পাড়টা জ্বলছে রোদ লেগে, কমলা-রঙের শাড়িটা যেন আগুনের শিখা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দেখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে গেলেন।

পড়া হচ্ছে নাকি?

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললে, আসুন। অনেক দিন আসেন নি।

কি পড়ছ?

পাখির বই একটা।

অমরবাবু দিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কবির সঙ্কোচ কেটে গেল। সহজ সুরেই আলাপ করতে লাগলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

অঙ্কফল

আগুন এখনও জ্বলিতেছে। যে বাড়ি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে সেখানে আগুন নাই, কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপ আছে। বড় বাড়িগুলি পুড়িয়া শেষ হইতে পারে নাই, এখনও জ্বলিতেছে।

সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা মৃত এবং মুমূর্ষুদের উদ্ধারকার্যে ব্যস্ত আছে। পুরুষদের অধিকাংশই মৃত, নারীদের অধিকাংশই মুমূর্ষু। গ্রামগুলির মাঝামাঝি মাঠে তাঁবু টাঙাইয়া সেখানে সব জমা করা হইতেছে। মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক পাওয়া যায় নাই, অনেক ফেলিয়া আসা হইতেছে।

অর্ধজীবিত অবশিষ্ট নরনারী ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নারীরা কাঁদিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ডাক্তার আসিয়াছে, নার্স আসিয়াছে, ঔষধ পথ্য খাদ্য সমস্ত ব্যবস্থাই হইতেছে। সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক, ডাক্তার, নার্স এবং কর্তৃপক্ষ সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। যথাসম্ভব কম বাক্যব্যয়ে আদেশ হইতেছে, বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালিত হইতেছে। কোনখানে বিরোধ নাই, প্রতিবাদ নাই। শব্দ যেন এখানে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে।

মৃতদেহ সারিবন্দী করিয়া সাজানো হইয়াছে। হাসপাতালে এখনও যাহারা মরে নাই, তাহাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা চলিতেছে। যাহারা একটু সুস্থ হইয়াছে, তাহাদের নিকট ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ লওয়া হইতেছে।

বলুন। ধীরে ধীরে বলুন। কোন ভয় নেই।—কর্তৃপক্ষ অভয় দিলেন।

কিন্তু বলিতে যাইয়া এতক্ষণে রমণীর অবরুদ্ধ কান্নার বেগ বাঁধ

ভাঙিয়া আসিল। রুদ্ধ কণ্ঠ ভাঙিয়া ভাঙিয়া শুধু বলিলেন, বলতে পারব না, পারব না, আমি পারব না।

কাঁদিতে সময় দিয়া কর্তৃপক্ষ সরিয়া গেলেন।

বুকফাটা ক্রন্দন আর দীর্ঘশ্বাস চারিদিকে সংক্রামিত হইয়া মাঠের আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া তুলিল।

কাজ চলিতেছে।

একজন পুরুষ বিবরণ দিলেন। অমানুষিক অত্যাচারের, নরহত্যার, নারীধর্ষণের চিরন্তন বিভীষিকাময় বিবরণ। নাদিরশাহী ধ্বংসের আর লুণ্ঠনের বিবরণ। সমস্ত গ্রাম একসঙ্গে অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ায় গ্রামবাসীরা একযোগে বাধা দিতে পারে নাই। শত্রুরা তাহার রক্তাক্ত দেহ বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে শিশুদের হত্যা করিয়াছে, সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, চক্ষের সম্মুখে স্ত্রীকে ভগ্নীকে—

আর বলা হইল না। অসহ্য বেদনায় মুখ বিকৃত করিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই কাহিনী সকলেরই।

রমণীও বিবরণ দিলেন। সংক্ষেপে। পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারিলেন না।

কাজেই প্রশ্ন হইল, ওরা কতজন ছিল?

অস্ফুট কণ্ঠের শব্দ আসিল, দশজন।

রমণী অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুখ ঢাকিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্। আর বলতে হবে না।—কর্তৃপক্ষ রেহাই দিলেন।

আরও প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ হইল। অত্যাচারের ধারা সর্বত্র এক। শুধু সংখ্যার তারতম্য।

ক্ষতির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইয়া গেল।

চল্লিশখানা গ্রাম নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়াছে।

অন্যূন এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে। নগদ টাকা এবং অলঙ্কারে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। নারী-

ধর্ষণ হইয়াছে দুই হাজার এবং অপহৃতা নারীর সংখ্যা তিন হাজারেরও কিছু বেশি।

মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে মোট প্রায় পাঁচ হাজার।

ক্ষতির তালিকা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই অস্থির হইয়া কিসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মৃতদেহ সনাক্তকরণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। মর্মান্তিক বীভৎসতা যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া শিহরিতে লাগিলেন। স্নায়ুর উপর কঠিন আঘাত যাঁহাদের আকর্ষণ, তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন।

প্রত্যাশিত সংবাদ আসিল। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে সংবাদটা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

আমাদের সৈন্যরা শত্রুপক্ষের ত্রিশখানা গ্রাম একেবারে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছে।

লুণ্ঠন করিয়াছে প্রায় এক কোটি টাকা।

হত্যা চারি হাজারের কিছু বেশি।

আর নারীহরণ—ছয় হাজার। ধর্ষণের সংখ্যা জানা যায় নাই।

কিন্তু হত্যা এত কম হ'ল কেন? আমাদের পাঁচ হাজার আর ওদের চার হাজার?—একজন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।

নারী-হরণে আমরা তিন হাজার বেশি আছি যে!—আর একজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন।

আনন্দ-সংবাদ তড়িৎগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

দুটি রাত

গভীর রাত। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক আর অখণ্ড নিস্তব্ধতা। ছোট্ট গ্রামখানির ওপর ঘুমের রাজত্ব চেপে বসেছে।

স্বামী-স্ত্রী তখনও জেগে আছে। মধুচন্দ্রিকার নেশায় ঠিক বলা যায় না, পাঁচ বছরের ওপর তাদের বিয়ে হয়েছে। তবে কি? আসন্ন বিরহ? ঈর্ষা? ঘর ভাঙবার ষড়যন্ত্র? প্রাক্‌বিবাহকালীন কোন প্রেমের গল্প? ঘরে আলো নেই, বিশেষ কোন কথাবার্তার

শব্দও পাওয়া যায় না। তবে কি কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত পলাতক ঘুমকে পাকড়াও করতে ভেড়ার পাল নিয়ে রাখালগিরি করছে দুজনেই ?

হঠাৎ স্ত্রীর গলার শব্দ শোনা গেল।

স্ত্রী। আচ্ছা, এখন তুমি ময়নাডাঙার জঙ্গলে যেতে পার ?

স্বামী। তুমি পার ?

স্ত্রী। পারি, যদি তুমি সঙ্গে যাও।

স্বামী। যদি না যাই ?

স্ত্রী। ও বাবা! তুমি না থাকলে একলা আমি এ ঘরেই শুতে পারি নে।

ভয়ের রক্ষাকবচের শক্তিপরীক্ষা চলছে তা হ'লে। কানের কাছে একটা কুকুর ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছে। স্বামীর বুক থেকে ফাঁপা আওয়াজ বেরুল। মানুষ দেখে ভয়-পাওয়া কুকুরের ডাক তার জানা আছে। নিজের চিন্তা ছাড়া আর একজনের নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব তার মাথায়। আবার সেই ডাক।

টর্চটা ঠিক আছে তো ? স্ত্রীর হাতের মধ্যে স্বামীর হাতখানা যেন একটু কেঁপে উঠল। খিলখিল ক'রে হেসে উঠল স্ত্রী।

খুব বীরপুরুষ তো! এই বুঝি তোমার সাহস ?

পাঁচ বছরের দাম্পত্য, সমস্ত খোঁচখাঁচ মিলিয়ে এখনও নিটোল হয়ে ওঠে নি।

দেখবে ?—এক লাফে নেমে পড়ল স্বামী খাট থেকে।

কি ? কোথায় যাচ্ছ ? অন্ধকারে দুখানা সাঁড়াশী যেন চেপে বসল স্বামীর দেহের ওপর।

নিশ্চয়ই চোর, নয় বদমাইস। এইখানেই কোথাও ঘোরাফেরা করছে।—জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে স্বামী।

তা ব'লে কি তুমি এখন বাইরে যাবে নাকি এই অন্ধকারে ?

ঘুটঘুটে অন্ধকারে স্বামীর মুখের চেহারা ঠিক দেখা গেল না। হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত বিদ্যুৎবাতি জ্ব'লে উঠে আবার নিবে গেল।

দোরটা বন্ধ ক'রে দাও তো।—সড়াৎ ক'রে একগাছা লাঠি টেনে নিলে স্বামী আলমারির মাথা থেকে।

পাগল হ'লে নাকি? খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছ, না?—ঝাঁঝিয়ে উঠল স্ত্রী।

এত ভয় তোমার? আত্মসমর্পণ করেছে স্ত্রী, আঘাত-খাওয়া পৌরুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেল। সামান্য একটুখানি অভিনয়। তার জোরেই জিতে গেল স্বামী। ছলনার আশীর্বাদে বুকখানি দশ হাত হয়ে গেল স্ত্রীর। চোর, ডাকাত, ভূত, প্রেত সে আর ভয় করে না। গভীর রাতের গভীরতর ছায়ায় তাদের নিয়ে সে বেশ আমোদ পায় চিঁড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে বাঘ-সিংহ দেখার মত। ভয়বিলাস-ভরা জমাট রাতে স্বপ্নের জাল বুনে চলে সে। দুর্ভেদ্য কবচের মত সমস্ত দেহ, মনকে ঢেকে রয়েছে মস্ত একটা বলিষ্ঠ আশ্রয়—তার স্বামী। সমস্ত চেতনা দিয়ে সে অনুভব করে তার সর্বব্যাপী সত্তা।

আর একটি রাত। ঠিক সেই রকম অন্ধকার। মাঝে মাঝে খাপছাড়া কুকুরের চীৎকার। স্ত্রীর কিন্তু বিধবার বেশ। বৈধব্যেরও অনেকটা গা-সওয়া। জলের দাগের মত দাম্পত্যস্মৃতি। ঘরের কোণে পিলসুজের ওপর মাটির প্রদীপ জ্বলছে, মৃত্যুপথযাত্রীর ঘোলাটে চোখের মত। খাটের বদলে মেঝেয় ঢালা বিছানা পাতা, স্বামীর জায়গা দখল ক'রে শুয়ে আছে সাত বছরের একটি বালক।

ঘুমোও বাবা। অনেক রাত হয়ে গেছে। মায়ের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

আচ্ছা মা, ময়নাডাঙার জঙ্গলে তুমি এখন যেতে পার?

জিজ্ঞাসা, না, চাবুক? মায়ের চোখের ঘুম কোথায় মিলিয়ে গেল। পুরানো স্মৃতির জীর্ণ খাতার ভেতর থেকে একখানা পরিচিত পাতা যেন ছিটকে এসে পড়ল। ভয়ে-ভরা এক মধুর রাত—আর তাকে ঘিরে রয়েছে অফুরন্ত কৌতূহলের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ছায়ায় জীবনের রসসঞ্চয় করছিল এই শিশু। এই কৌতূহল কি তার প্রতিধ্বনি?

চুপ কর বাবা। রাত্তিরে ওসব জায়গার নাম করতে নেই।

প্রদীপের শিখায় যেন কিসের ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। চোখ বুজলেন মা। ভেতরে বাইরে তাঁকে ঘিরে রয়েছে সীমাহীন অন্ধকার—অবলম্বনশূন্য। নাঃ, অসহ্য। আবার চোখ চাইতে হ'ল।

মা, আমার বড্ড ভয় করছে।

ভয়! পায়ের নখ থেকে যেন অসাড় হতে আরম্ভ করেছে মায়ের।

ভয় কি বাবা? চোখ বুজে থাক, এখুনি ঘুম আসবে।

প্রদীপের আলো প'ড়ে বড্ড জ্বলজ্বল করছে স্বামীর ছবিখানা। টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে ছবিখানি ঘিরে। মরা-মানুষের ছবি। দমকা হাওয়ার মতন খানিকটা ভয়ের বাষ্প যেন সমস্ত ঘরটা ভরিয়ে ফেলল। ছবিখানা পিছনে রেখে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। কেমন একটা অস্বস্তিকর কল্পনা সমস্ত মনটাকে তাঁর চেপে ধরেছে। এ কি? এত ভালবাসতেন যে স্বামীকে, তাঁর চিন্তায় এত ভয় আসছে কোথা থেকে? কোথায় গেল সে রক্ত-মাংসে গড়া দুর্ভেদ্য আশ্রয়? কনকনে বরফের মত অনুভূতির মধ্যে সে জোর কোথায় হারিয়ে গেল? সব-চেয়ে বেশি ভয় করছে আজ তাঁর স্বামীকে? অবাক হয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিসের এ অনুভূতি? কোথায় ওর উৎসমুখ? দুর্বলতা? আত্মকেন্দ্রিকতা? এতদিনের স্মৃতিপূজা, স্মরণ-চেষ্টা কি তা হ'লে সমস্ত মিথ্যা? মৃত্যু কি তাঁকে সব দিক দিয়ে নিঃস্ব ক'রে রেখে গেছে? না, তা তো নয়। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তিনি লালন ক'রে আসছেন কার স্মৃতি? তাঁর স্বামীর। তবে? ভোরের হাওয়া যে আশ্বাস যোগায়, রাতের অন্ধকারে তার স্পর্শ কোথায় লুকিয়ে থাকে? এ কি মনের খেয়াল, না, আলো-আঁধারের কারসাজি? একই রকমের দুটি রাত, কোন্‌টা তার সত্যি?

ঠাণ্ডা হাওয়া আর খানিকটা তাজা রোদ মুখে এসে লাগতেই স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল, ঘামে তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, আর স্বামী তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন।

দিনরাত যত বাজে বই পড়বে, আর ঘুমুতে ঘুমুতে আঁতকে উঠবে! একখানা রামকবচ না করালে আর চলছে না দেখছি।

আর সেই সঙ্গে তোমার জন্যে একখানা মৃত্যুঞ্জয় কবচও করতে ব'লে দিও।

জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা করলে স্ত্রী, কিন্তু তার চেয়ে কান্না বোধ হয় ভাল ছিল।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

শেষ অধ্যায়

শৈলেশ্বর চৌধুরী জীবনে বোধ হয় এমন বিপদে পড়েন নি। চিন্তায় চিন্তায় পাগল হবার উপক্রম। কাগজের আপিস থেকে আজ জোর তাগাদা দিয়ে গেছে, আর মাসখানেকের মধ্যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিতে না পারলে পূজোর আগে কিছুতেই কাগজ বেরুবে না। অথচ আজ দু-তিন বছর হ'ল, লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন শৈলেশ্বর। আবার হঠাৎ কেন যে লিখতে রাজি হলেন, তা তাঁর নিজের কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকছে।

শৈলেশ্বরের শেষ উপন্যাসটি এখনও অসমাপ্ত। বছর তিনেক আগে কোন একটি পত্রিকায় সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। শেষ হবার আগেই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী হঠাৎ লেখা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল।

লেখা বন্ধ ক'রে এক দিক দিয়ে ভালই করেছিলেন তিনি। কারণ মানসিক যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তাঁর। তার পর থেকে এই ক বছর আর কলম ধরেন নি শৈলেশ্বর। শুধু পড়েছেন। বই কিনে বা বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে দৈনিক বারো থেকে ষোল ঘণ্টা ক'রে প'ড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় বঙ্কুবিহারী এসে ধ'রে পড়ল, এবার আপনার একখানা উপন্যাস চাই কিন্তু।

উপন্যাসটা আরম্ভ ক'রে একসঙ্গে অনেকখানি লিখেও ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু তার পর আর কিছুতেই লিখতে পারছেন না। নায়কের অন্যায় সন্দেহের প্রতিবাদে এক মহাদুর্যোগময়ী রাত্রিতে নায়িকা গৃহত্যাগ করলে; তারপর অনুতপ্ত নায়ক তাকে অনুসন্ধান ক'রে ফিরতে লাগল দিনের পর দিন। ঘটনার এই চূড়ান্ত মুহূর্তে এসে

তাঁর উপন্যাসের কাহিনী একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেটুকু লিখেছেন এবং তারপর যা কল্পনা করেছেন, তার মাঝখানকার যোগসূত্রটুকু কিছুতেই যেন খুঁজে পাচ্ছেন না শৈলেশ্বর।

অন্ধকার রাতে খোলা ছাদের ওপর একটা ঈজিচেয়ারে ব'সে তারা-জ্বলা আকাশের দিকে চেয়ে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করেছেন তিনি। কিন্তু তার পর যা লিখতে গেছেন, তা তাঁর নিজের কাছেই হাস্যকর ঠেকেছে।

এক-একবার ভেবেছেন, এখানেই শেষ ক'রে দেবেন। তাঁর শিল্পীমন জানে, উপন্যাসটা এখানে শেষ করতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে, এখানে কিছুতেই শেষ করতে পারবেন না। এখানে যদি শেষ করতে হয়, তা হ'লে পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের চিন্তাটা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, ডাক্তার এসে আবার সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন। যদিও তার কোনও দরকার ছিল না, কারণ শৈলেশ্বর নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়ছে। আবার লেখা বন্ধ ক'রে দিলেন কিছুদিন। কিন্তু তাতে ফল হ'ল না কিছু। বরং চিন্তায় চিন্তায় আরও অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

এমন সময় আসাম থেকে বন্ধু মণিভূষণ একখানা চিঠি লিখল। রাঙাপাড়া নর্থের ওধারে কোন এক চা-বাগানে ম্যানেজারি করে মণিভূষণ। তাঁকে ওর ওখানে যেতে লিখেছে। চিঠিটা প'ড়েই শৈলেশ্বর স্থির ক'রে ফেললেন, তিনি যাবেন। একটা স্যুটকেসে তাড়াতাড়ি কয়েকটা দরকারী জিনিস নিয়ে সেই দিনই আসাম মেলে রওনা হলেন তিনি।

কিন্তু ট্রেনে উঠেও স্বস্তি পেলেন না শৈলেশ্বর। উপন্যাসের চিন্তাটা কিছুতেই যাচ্ছে না মন থেকে। কামরার আর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন তিনি জানলার বাইরে ওই জ্যোৎস্না-বিভাসিত প্রান্তরটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। বকের মত একটা সাদা পাখি তার রূপালী ডানা মেলে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরছিল। শৈলেশ্বর দেখলেন, তার প্রসারিত ডানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তাঁর মনে হ'ল, পাখিটা এই পাগল-করা জ্যোৎস্নার বন্যায় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছে না, সারা দেহে মেখে নিচ্ছে উন্মাদের মত।

পাখিটা দৃষ্টিপথ থেকে স'রে গেল। নির্জন প্রান্তরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভ'রে উঠল তাঁর সমস্ত মন। ওই প্রান্তরটাকে তাঁর নিরাভরণা বিধবার মত লাগল। পাখিটার কথা মনে পড়ল আবার। এবার মনে হ'ল, সে যেন ওই নির্জন প্রান্তরে তার সঙ্গিনীকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে, অথচ পথের সন্ধান জানা নেই।

সমস্তটা পথ এত তন্ময় ছিলেন যে, পরদিন সকালে ট্রেন যখন রণ্ডিয়া স্টেশনে পৌঁছল, তখনও তাঁর খেয়াল হ'ল না যে, এখানে নেমে আবার গাড়ি বদলাতে হবে। যাত্রীদের ব্যস্ততা দেখে হঠাৎ চমক ভাঙল তাঁর, দেখলেন, রাঙাপাড়া নর্থের গাড়িটা পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন তিনি।

তাঁর আগে আগে একটি মহিলা রাঙাপাড়ার গাড়িটার দিকে যাচ্ছিলেন। সেদিকে চোখ পড়তেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন শৈলেশ্বর। চল্লিশের ওপর বয়েস হবে মহিলাটির। নিষ্কলঙ্ক সাদা থান পরনে। পিছন দিক থেকে দেখে চেনবার কথা নয়। তবু হাঁটবার ভঙ্গী দেখে শৈলেশ্বরের মনে হ'ল, তিনি যেন চিনতে পেরেছেন।

মহিলাটি তখন একটি মেয়েদের কামরায় উঠে পড়েছেন। জানলা দিয়ে তাঁর মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে চমকে উঠলেন শৈলেশ্বর। তাঁর শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়েই অত্যন্ত দ্রুতবেগে বইতে লাগল। গাড়িটা তখন নড়তে আরম্ভ করেছে। শৈলেশ্বর ছুটতে ছুটতে গিয়ে সামনেই যে কামরাটা পেলেন, তাতে উঠে পড়লেন।

দু-তিনটি স্টেশন পরেই তিনি দেখলেন মহিলাটি নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপাশে যাচ্ছেন। তিনিও নেমে পড়লেন। দ্রুত পদক্ষেপে কাছাকাছি গিয়ে পিছন থেকে ডাকলেন, নিরুপমা!

সচকিত হয়ে ফিরে তাকালেন মহিলাটি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শৈলেশ্বরের মুখের দিকে চাইতেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। সমস্ত

মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, আপনাকেই—মানে, তোমাকেই বলছি নিরুপমা।

আমার নাম নিরুপমা নয়। আপনার ভুল হয়েছে। আমার নাম শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে যতটা সম্ভব নীরস এবং কঠিন স্বরেই বলবার চেষ্টা করলেন মহিলাটি। কিন্তু সত্যিকার দৃঢ়তা যেন ফুটল না গলায়। এবার আরও কাছে এগিয়ে গেলেন শৈলেশ্বর। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্পষ্টস্বরে বললেন, অস্বীকার ক'রে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না নিরুপমা। ভুল যে আমি করি নি তা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনই জান।

মহিলাটি কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

আজও ক্ষমা করতে পার নি দেখছি।

কিন্তু শৈলেশ্বরের এই বেদনার্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে স্পর্শও করল না। দৃঢ় পায়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। শৈলেশ্বরের কথাগুলো তাঁর কানে পৌঁছেছে কি না, তাও বোঝা গেল না। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলেশ্বর। তারপর তিনিও পিছু পিছু চললেন।

দু ধারে ছোট ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি। মাঝে লাল সুরকির পথ সোজা চ'লে গেছে। অনেকটা হাঁটবার পর চৌমাথা পড়ল একটা। শৈলেশ্বর সেখানে এসে আবার পিছন থেকে ডাকলেন, নিরুপমা!

শৈলেশ্বরের মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে দেখলেন মহিলাটি। তার পর নিতান্ত নির্লিপ্ত গলায় বললেন, এস।

ডান দিকের পথ ধ'রে কিছুটা গিয়ে একটা ছোট বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন তিনি। শৈলেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমার বাড়ি?

হ্যাঁ।

চমৎকার তো!

নিরুপমা এর কোনও উত্তর দেওয়া দরকার ব'লে মনে করলেন না। সেই সময় পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে এসে বললে, মাসীমা, মা আপনাকে একটু ডাকছেন।

নিরুপমা বললেন, এখন তো যেতে পারব না মা। তোমার মাকে ব'লো, একটু পরে যাচ্ছি। স্টেশনে আমার পুরনো মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। তাঁকে নিয়ে এসেছি কিনা!

মেয়েটি চ'লে গেল। সামনের উঠোনটা পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকবার সময় শৈলেশ্বর বললেন, মেয়েটিকে মিথ্যে বললে কেন?

বিচিত্র দৃষ্টিতে শৈলেশ্বরের মুখের দিকে চাইলেন নিরুপমা। তারপর বললেন, কেন, এতে কারও ক্ষতি হয়েছে নাকি?

ও।

মাথাটা নীচু ক'রে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে শৈলেশ্বর আবার বললেন, থান পরেছ দেখছি! এতেও বোধ হয় কারও ক্ষতি নেই?

বিদ্রূপের একটা তীক্ষ্ণ রেখা ছুরির ফলার মত জ্ব'লে উঠেই মিলিয়ে গেল নিরুপমার ঠোঁটে। বললেন, আমি কুলত্যাগিনী, আমার কাছে শাড়ি আর থান অনেকদিন এক হয়ে গেছে।

শৈলেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে একটা চেয়ারের ওপর ব'সে পড়লেন। নিরুপমা ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে স্টোভটা ধরিয়ে জল চড়িয়ে দিলেন।

বিকেলে নিরুপমা যখন চা নিয়ে এলেন, শৈলেশ্বর তখন দু হাতে মুখ ঢেকে কি যেন ভাবছিলেন। নিরুপমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে বললেন, একটা উপন্যাস নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি নিরুপমা। কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।

খাবারের ডিশটা টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে নিরুপমা বললেন, এর আগে যখন অতগুলো শেষ করতে পেরেছ, তখন নিশ্চয়ই পারবে। চেষ্টা কর।

তুমি কি আঘাত না দিয়ে কথা বলতে পার না?

না।

তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে তেমনই শান্ত স্বরে নিরুপমা

আবার বললেন, তোমার কিন্তু বেশি দিন এখানে থাকা চলবে না। আমার মেয়ের কলেজ বন্ধ হতে আর দেরি নেই। সে যে-কোন দিন আসতে পারে। তার আগেই তোমাকে চ'লে যেতে হবে। অঞ্জনা তোমাকে দেখে, এটা আমি চাই না।

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর শৈলেশ্বর বললেন, বেশ, তাই হবে।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটায় যখন রাত দশটা বাজল, শৈলেশ্বর তখন টেবিলের ওপর ঝুঁকে একখানা চিঠি লিখছিলেন। নিরুপমা ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়।

কলমটা বন্ধ করতে করতে শৈলেশ্বর বললেন, তুমি শোও নি এখনও?

না।

খাওয়া হয়েছে?

না।

নিরুপমা আর কোনও কথা না ব'লে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শৈলেশ্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন।

···তখন অনেক রাত। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শৈলেশ্বরের। তাড়াতাড়ি উঠে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কবিসত্তা ভাবল, সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে মত্ত ঐরাবতের মত ঝড়ের এই প্রাণোচ্ছ্বাসকে অনুভব করবে। অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন বারান্দায়। তার পর নিরুপমার ঘরের বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কি ভেবে ধাক্কা দিলেন দরজার গায়ে।

নিরুপমা বেরিয়ে এসেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, কি হয়েছে?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে শৈলেশ্বর বললেন, বাইরে ভীষণ ঝড়। আমার মনে হ'ল, তোমার ঘরের জানলাগুলো হয়তো খোলা রয়েছে।

নিরুপমা বারান্দার একেবারে প্রান্তে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তার পর পিছন ফিরে দেখলেন, শৈলেশ্বর তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন—সেইখানেই।

এ কি ! তুমি এখনও ঘরে যাও নি ?

না। তুমি একটু এস আমার ঘরে।—আস্তে আস্তে শৈলেশ্বর বললেন।

ঘরে এসে হ্যারিকেনটা জ্বাললেন তিনি। নিরুপমা নিষ্পলক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শৈলেশ্বর বললেন, এই চেয়ারটায় ব'স।

নিরুপমা টেবিলের ওধারে গিয়ে বসলেন। শৈলেশ্বর স্থুটকেসের ভেতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের ক'রে নিয়ে এলেন। বললেন, পনেরো বছর আগের সেই ঝড়ের রাত আবার ফিরে এসেছে নিরুপমা। আজকে তুমি শোন, তোমাকে না শোনালে উপন্যাসটা আমি শেষ করতে পারব না।

তার পর পড়তে লাগলেন। নায়ক অনিরুদ্ধের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনার ইতিহাস তাঁর আর্ত কণ্ঠস্বরে যেন রূপ ধ'রে ফুটে উঠল। নিরুপমা নিস্পন্দ পাষাণের মত ব'সে শুনে যেতে লাগলেন।

পড়া শেষ হ'লে শৈলেশ্বর দেখলেন, নিরুপমার দৃষ্টি পাশের দেওয়ালের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। বললেন, অমন ক'রে কি দেখছ ?

দেখছি, মানুষ ভূত হয়ে যখন রামনাম করে, তখন তার ঠোঁট অমনই ক'রেই নড়ে কি না !

শৈলেশ্বর চেয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে তাঁর ছায়াটা একবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল। এদিকে ফিরে দেখলেন, নিরুপমা বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে।

পরদিন রাত্রে কি একটা দরকারে নিরুপমাকে ডাকতে গিয়ে শৈলেশ্বর দেখলেন, একটা কালি-পড়া হ্যারিকেনের আলোয় ঝুঁকে নিরুপমা পরীক্ষার খাতা দেখছেন। সেদিকে চেয়ে নিজেকে আবার নতুন ক'রে অপরাধী মনে হ'ল তাঁর। ঠিক এমনটা হয়তো হ'ত না। স্কুল-মাস্টারির বাঁধা রুটিনের একঘেয়েমি ওর জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত অনুভূতিকে হত্যা করেছে। তাঁর বুঝতে ভুল হয়েছিল। নিরুপমার এই রুক্ষতা আসলে একটা নির্মোক মাত্র; আর এই ছদ্ম

আড়ালে ওর কর্মক্লান্ত মন দিনের পর দিন হাঁপিয়ে উঠেছে। এক অব্যক্ত স্নেহরসে তাঁর সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। টেবিলের সামনে গিয়ে বললেন, একটা কথা বলব নিরুপমা?

খাতা থেকে চোখ তুলে শৈলেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেন নিরুপমা। বললেন, বল।

কথাটা পাড়তে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল শৈলেশ্বরের। তাই ব্যাপারটা হালকা করবার জন্যে বললেন, ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে?

নিরুপমা এবার হেসে ফেললেন, সাহিত্যিক হ'লেই কি এমনিই বাজে বকতে হয়?

তা হ'লে চল, সামনের ওই ব্রিজটা থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

পথে এসে কেউ কোন কথা বললেন না। শুধু দুজনের পায়ের শব্দে সেই নিস্তব্ধ রাত্রি মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্রিজের রেলিঙে ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনে। নীচের তীব্র জলস্রোতের দিকে চেয়ে শৈলেশ্বরের মনে হ'ল, তাঁরা যেন স্রোতের বিপরীত দিকে ভেসে চলেছেন। এই সেতু কোন্ এক অশ্রুত অদৃষ্ট স্বর্লোকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের। যেখানে সংশয়ের আবিলতা জীবনকে কোনদিন খণ্ডিত করে না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, আমায় ক্ষমা কর নিরুপমা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিরুপমা বললেন, ও কথা বলছ কেন?

শৈলেশ্বর বললেন, সেদিন আমাকে তুমি ক্ষমা চাইবার সুযোগটুকুও দিলে না। ঘুমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বাড়ি থেকে। যাতে তার দায়টুকুও আমাকে না বইতে হয়।

নিরুপমা শৈলেশ্বরের হাত ধ'রে ব্যাকুলভাবে বললেন, ও কথা থাক্।

এতদিন তো ছিলই। আজ বলতে দাও। বিশ্বাস কর নিরুপমা, তোমার চাইতে কম শাস্তি আমি পাই নি।

অমন ক'রে বলছ কেন? আমার তো সে সব কথা মনেও নেই।

তা হ'লে ফিরে চল নিরুপমা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নিরুপমা বললেন, এখন আর ফেরা সম্ভব নয়।

এর পর আর কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু আগে যে ট্রেনটা স্টেশনে এসে থেমে ছিল, সেটা আবার চলতে আরম্ভ করল। সে শব্দে চমকে উঠে নিরুপমা বললেন, অনেক রাত হ'ল।

হ্যাঁ। চল, এবার যাওয়া যাক। আকাশে বেশ মেঘও করেছে দেখছি।

ফেরবার পথেও কেউ আর কথা বললেন না। বলবার কথা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে শৈলেশ্বরের মনে হ'ল, কে যেন ঢুকছে গেটটা দিয়ে। নিরুপমাও দেখলেন। দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপর শৈলেশ্বরকে বললেন, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও।

প্রায় ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকে নিরুপমা বললেন, কখন এলি অঞ্জনা?

এই তো এই গাড়িতে।

হঠাৎ চ'লে এলি যে?

কি করব, কলেজ যে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল মা।

আচ্ছা আচ্ছা, ঘরে চল্, পরে সব শুনব।

এই ব'লে তাকে এক রকম টেনে নিয়ে নিরুপমা তাঁর ঘরের ভেতর ঢুকলেন।

বাইরের অন্ধকারে নিস্পন্দ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলেশ্বর। অঞ্জনা তাঁকে দেখতে পায় নি এখনও, এ সুযোগ তিনি নষ্ট হতে দিলেন না। চোরের মত পা টিপে টিপে এপাশের ঘরে ঢুকলেন। যে দু-একটা জামা-কাপড় ছাড়া ছিল, সেগুলো তাড়াতাড়ি ভ'রে ফেললেন সুটকেসের ভেতর। পাণ্ডুলিপিটা সামনেই ছিল; আজ ওটা একটা অনাবশ্যক বোঝার মত লাগল তাঁর কাছে। তৎক্ষণাৎ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে সুটকেসের ভেতর রেখে দিলেন। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তখন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখলেন একটু। তার পর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

শ্রীদ্বৈপায়ন মিত্র

আমার জীবন-কথা

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ দাদামহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোটো ও জীবনীর উপকরণ প্রার্থনা করিয়া পূর্ণিয়াতে পত্র লিখি। তিনি তাহা শীঘ্র পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুন তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য দুমকা যাইতে হয়। সেখান হইতে ১৬।১।৪০ তারিখে লেখেন, "যা চেয়েছ তার দিন তো কাছিয়ে এসেছে ভাই, একটু চেপে যাও না।

"যা ছিল হয়ে গেছে যা নাই তা হবে না,
চুপি চুপি চ'লে যাব কেউ কিছু কবে না।

"নিজের ফোটো কোনদিন তোলাই নি, পাটনায় তোমরাই জিদ ক'রে তুলিয়েছিলে। পূর্ণিয়ায় লিখলুম, ছোট নাতি একবার বোধ হয় তুলিয়েছিল। তা ছাড়া, কবে কোন্ পুস্তক বেরিয়েছে, তার সংবাদও personal copy থেকে দিতে বললুম।...এ জীবনে তো তোমাদের পাওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য আমার কিছু নাই ভাই। দুর্লভ লাভের columnএ তার স্থান।" আট দিন পরে ২৪।১।৪০ তারিখে দুমকা হইতে তিনি লেখেন, "আজও পূর্ণিয়া হতে আবশ্যক সংবাদগুলি না পেয়ে আমি ভাই বড় বিচলিত হয়ে আছি। আজ আবার সেখানে লিখলুম। ফোটোর জন্যও ব্যবস্থা করেছি। অনেকেই আমার জীবন-কথা জানতে চেয়েছিলেন, শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্র দাসও। কিন্তু এ ব্যর্থ জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে পারি নি। কি জানি কেন, তুমি আবার চাইলে। তোমাকে 'না' বলতে পারলুম কই? ভালবাসা এই সব করায়, বিচারসহ নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের কাছে অপরাধী র'য়ে গেলুম।" অসুস্থ শরীর লইয়াই দাদামহাশয় নিজের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রস্তুত করেন ও ১৬।২।৪০ তারিখে তাহা আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়া লেখেন, "বড় দেরি হয়ে গেল। কি করব ভাই, তোমার কাজ পড়েছে এক বার্ধক্য-জীর্ণকে নিয়ে, ইংরাজি হিসেবে যার আজ ৭৮ বৎসর আরম্ভ হ'ল। তা ছাড়া, এখানে তার হাতে কাগজপত্র কিছু নেই, যা থেকে আবশ্যমত সাহায্য পাবে। তাই পূর্ণিয়ার মুখ চেয়ে

পত্র-লেখালেখি ক'রে বিলম্ব হয়ে গেল, তবু সাল-তারিখ প্রভৃতিই অনেক ক্ষেত্রে পেলাম না। প্রয়োজন বোধ কর তো তোমাকেই কষ্ট ক'রে তোমার লাইব্রেরি থেকে সে সব পূরণ ক'রে নিতে হবে। যা বিলম্ব হ'ল, সে জন্যই আমি লজ্জিত—ক্ষমা ক'রো। দ্বিতীয় কথা, এ কাজে আমি হাত দিতুম না, কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে, তোমাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজের মনে অশান্তি ভোগ করতে পারলুম না। তাই যতটা মনে এল, যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখে পাঠাচ্ছি। জানি, এসব তোমার দরকার হবে না, কিন্তু তোমার কল্যাণে আমার নিজের একটা কাজ হয়ে রইল। নচেৎ আমার নিজের চেষ্টায় আমার দ্বারায় এ কাজ হ'ত না। কারণ আমার মত লোকের জীবনীর মুল্য কতটুকু ভাই? যা হোক, তোমার চেষ্টায় এ ক্ষুদ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত একটা আভাস রইল। ··যা পাঠাচ্ছি তার সবটা তো তুমি ব্যবহার করবে না। তুমি ভাই রাজহংসের মত ও থেকে যা পুষ্টিকর পাবে তাই বেছে নিও। কিন্তু আমাকে দুর্বল ক'রো না। তাতে যদি ২।৪ পৃষ্ঠা বেশি লাগে সে কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার দাদামশায়ের জন্যে করবে ব'লেই আশা রাখি। একেবারে 'নমো নম' ক'রে সেরে দিও না ভাই। আমি খুব সংক্ষেপে দিয়েছি। যদি দিচ্ছই তো যতটা বা যা দিলে তোমাদের ভালবাসা না খোয়াতে হয়, দাদামশায়ের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, সেটার প্রতি দৃষ্টি রেখো বন্ধু। তোমাদের ভালবাসা ছাড়া আমার রেখে যাবার আর কিছু নেই।

"এইবার বিশেষ দরকারি কথাটা, অর্থাৎ তোমার কাজ হয়ে গেলে আমার এই সংক্ষিপ্ত (২২ পৃষ্ঠা) noteটি আমাকে রেজেষ্ট্রি ক'রে ফেরত দিও ভাই। এটি তুমিই করিয়েছ, আর কেউ বোধ হয় পারতেন না। যখন লেখাই হ'ল, আমার হাতের recordটা বাড়িতেই থাকবে। কারণ আমার দ্বারা তো ও-কাজ আর হবে না। তাই তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ রইল। সপ্তাহ-দুই পরে আমার পূর্ণিয়া ফেরবার কথা। তোমার কাজ হয়ে গেলে আমার পূর্ণিয়ার ঠিকানায় পাঠাইলেই হবে—কিন্তু রেজেষ্ট্রি ক'রে।" "পুনশ্চ" দিয়া পরে লিখিয়াছেন, "লিখেছিলে—'দাদামশায়ের জীবনী লেখবার অধিকার নাতির', আমি

তার সঙ্গে add করছি—'শ্রাদ্ধের'ও। সে দিনও সন্নিকট, পুত্রও নেই। তখন আমি আর Photo দিতে পারব না। মনে থাকবে তো?" বলা বাহুল্য, দাদামহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত "জীবন-কথা" আমরা তাঁহাকে ফেরত দিতে পারি নাই। ফেরত দিব না—এ কথা তাঁহাকে লেখাতে পূর্ণিয়া হইতে ২২।৩।৪০ তারিখে তিনি লেখেন, "লিখেছ—'আপনার স্বহস্ত-লিখিত notes হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিব, এত উদার আমাকে মনে করিলেন কেন?'—আমিও সাহিত্য-সম্পর্কে তোমার মত অনুদার নাতিদেরই পক্ষপাতী। যোগ্য হস্তে থাকাতেই ও-জিনিসের সার্থকতা। তুমি ওর একটা true copy (verified by your signature) আমাকে দিলেই হবে।—বাড়ির নাতিদের দাবি মেটাবার জন্যে বা তাদের সন্তোষের জন্যে। আমার শক্তি-সামর্থ্য থাকলে নিজেই লিখে দিতুম। তা আর পারব না ভাই।

"তোমার সব কথা দরকার হবে না ব'লেই তাড়াতাড়ি যতটা পারলুম লিখে পাঠিয়েছি। তাতে তোমার কাজ চ'লে যাবে। বাকি যা, তা বাড়িতে রাখবারই কথা। তাতে আর কার দরকার? তবে তুমি যে ওকে আদর ক'রে রাখতে চেয়েছ, সেটা ওর ভাগ্য।

"এখন তার মনে হচ্ছে, আরও কয়েকটি দরকারি কথা আমার noteএ থাকা উচিত ছিল। যদি পারি পরে পাঠিয়ে দেব, তুমি ওর সঙ্গে রেখে দিও। ৭৮ বছরের দীর্ঘ জীবনে অনেক কথাই থাকে, সবই বিশেষত্বহীন রে ভাই। তাই বেছে গুছে দিতে হয়। ভালবাসা অন্ধ, তাই আমার মত নগণ্যের জীবন-কথা চেয়েছ। সাহিত্যের সেবা ইচ্ছামত করতে পারি নি, কিন্তু নেশাটা ভরপুর ছিল, তাতে সব দিক খুইয়েছি। অন্য দিকে মনকে নিবিষ্ট হতে দিই নি। সাহিত্যের প্রেমে পড়লে অন্য দিক নষ্ট হয়ে যায়। Intense spiritual bent থাকলেও সে কেবল সমাজের দুর্দশা আর মধ্যবিত্তের কষ্টের কথাই ভাবত। যাক।

"সাহিত্যে politics-এর দরকার আছে সত্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যে অভাব!—লোকে romance পড়বে অথচ পলিটিক্স তার আত্মলুপ্ত অভিন্ন আত্মীয়ের মত থাকবে এবং তার charms লোকের চিত্ত চঞ্চল

করবে, অভাবনীয় ভাবনা-বাসনা জাগাবে, সহস্র দুঃখের মধ্যে দেশের দুঃখ এগিয়ে দেখা দেবে। জীবিকার্জনের জন্য লেখায় সে-কাজ হয় না। লেখকেরা গরিব, সে লেখা কে লিখবে, যার পেটে আঘাত আছে প্রাণে নাই, এ কাজ তার নয় ভাই। তা ব'লে হতাশ হ'লে চলবে না। কথাটা যখন উঠেছে, তখন লোকও জন্মেছে—এই আমার বিশ্বাস।"

পূর্ণিয়া হইতে ৩১।৩।৪০ তারিখে তিনি লেখেন, "তোমার প্রেরিত আমার জীবন-কথার true copy কাল পেয়েছি। ওটা বাড়িতে নাতিদের কাছে থাকবে, সুতরাং অত তাড়া ছিল না। তবু আনন্দ পেলুম এই কারণে যে, কাজ ফেলে রাখ না। ওইটি কাজের লোকের বড় লক্ষণ। বাকি আর যা কয়েকটি notes আছে, সেগুলির ব্যবহারের এখন তো আর অবকাশ নেই—পরে পাঠিয়ে দেব, পাবে নিশ্চয়ই।"

এই প্রসঙ্গে ৮।৬।৪০ তারিখে তিনি লেখেন, "Record যখন রাখলে তখন আরও দু-চারটে বিষয় আছে। সময়মত তোমাকে তা পাঠাবার ইচ্ছাও আছে। একটু সুস্থ হয়ে সে চেষ্টা পাব।"

এই "আরও দু-চারটে বিষয়" আর দাদামহাশয়ের নিকট হইতে আদায় করতে পারি নাই। ১৩৪৬ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে দাদামহাশয়ের দেওয়া উপকরণ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করি। আজ দাদামহাশয় নাই, তাঁহার সেই স্বলিখিত জীবন-কথা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার আর বাধা নাই।]

১। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কয়েকটি কথা।

২। নিবাস ও বাড়ি—দক্ষিণেশ্বর ২৪ পরগণা।

৩। জন্ম—৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবত্রয়োদশী (শিবরাত্রের পূর্বদিন) ইংরাজি 15th February 1863, Sunday.

৪। পিতা—৺গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেকার ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে থাকতেন। অবশিষ্ট সময় কাটত রামায়ণ মহাভারত দাশুরায় আর সংবাদ প্রভাকর নিয়ে।

শুনেছি—কাজ চালাবার মত (তখনকার) ইংরাজি লিখতে পড়তে

জানতেন। তীর্থে বেরিয়ে লাহোরের সান্নিধ্যে আটকে যান। তখনকার দিনে ধর্মশালায় (চটিতে) ইংরাজি জানা বাঙালি এলে নাকি স্থানীয় সাহেবকে জানাতে হ'ত, সেই সূত্রে ধরা প'ড়ে—ফিরোজপুরে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল।

অত্যধিক নেশা ছিল—কবির গানের, কবিসঙ্গীত রচনার চর্চাও রাখতেন। আমার বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, তখন তাঁর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর কয়েক দিন (সম্ভবত ৫।৭ দিন) পূর্বে আমাকে ডেকে, হাতে লেখা একখানি কবিগানের খাতা আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এখানি যত্ন ক'রে রেখো, এর পর দেখে খুব আনন্দ পাবে।" তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর সাড়া পেয়েছিলেন।

তাঁর পরলোকগমনের পর—সংসারের নানা পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলায় সে খাতার কথা একদম ভুলে যাই। দীর্ঘকাল পরে (সাহিত্যের স্বাদ পাবার পর) সে খাতার খোঁজ পড়ে। পেলুম না, কেবল অসহনীয় বেদনাই পেলুম। সেই মনোকষ্টে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ—বহু চেষ্টায় ও বহু কষ্টে প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করি।

৫। ভ্রাতা—আমরা ছিলাম তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মিয়ামিরে আচার্য কেশব সেনের ব্রাহ্মমিশনের উচ্চশিক্ষিত রামচন্দ্র সিংহের ছাত্ররূপে লেখাপড়া করতেন—এবং ক্লাসিক লিটারেচর প্রায় সবই তাঁর দেখা হয়েছিল। পড়ায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় ঐ সঙ্গে উর্দু ও ভাল রকম শিখেছিলেন। তাঁর উপর কেশববাবুর বিশেষ টান থাকায় এসব সংযোগ ঘটে। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার জন্য চাকরি স্বীকার করতে হয়। পড়ার নেশা কিন্তু ছাড়েন নি। সংস্কৃত না জানলে নিজেদের অমূল্য ভাণ্ডার সম্বন্ধে অন্ধ থাকা হবে, তাই তাঁকে ৩৮ বৎসর বয়সে চাকরি করতে করতে পণ্ডিত রেখে রাত ২টা পর্যন্ত ব্যাকরণ মুখস্থ করতে দেখেছি।

৬। শিক্ষা—দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্বেই দাদার আদেশমত উত্তরপাড়া H. E. Schoolএ ভর্তি হই।

নিত্য পারাপার থাকায়, মা এ ব্যবস্থা কোন দিনই সমর্থন করেন

নি। তাই দু বৎসর পরে কুটিঘাটা স্কুলে চ'লে আসি। সেখানে বছর আড়াই কাটে। এই সময় দাদা মিরাটে বদলি হওয়ায়, সাংসারিক কারণে বাড়ির সকলকেই মিরাটে চ'লে যেতে হয়।

তখন পশ্চিমাঞ্চলে—বিশেষ পাঞ্জাবের সন্নিকটে, বাঙালির ছেলেদের লেখাপড়ার কোন সুবিধাই ছিল না। স্কুল থাকলেও উর্দু বা হিন্দি অপরিহার্য থাকায় সহসা উচ্চশ্রেণীতে যোগ দেওয়া সম্ভবই ছিল না।

কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ দত্ত বাঙালির ছেলেদের এই অভাব দূর করবার জন্যে একটি স্কুল খোলেন। ইংরেজ Hd. master, একটি বাঙালী শিক্ষক ও নিজে পড়াতেন। সেই স্কুলেই ঢুকে পড়ি।

বৎসর দুই পরে দাদা অম্বালা বদলি হওয়ায় সেখানে যেতে হয়। সেখানে গোরার ছেলেদের জন্যে একটি কোচিং ইনষ্টিটিউট্ ছিল। অনেক চেষ্টা ও সুপারিশে আমি আর বেলঘর-নিবাসী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তাতে ঢুকতে পাই। সেখানে পড়াবার ধারা রীতি যত্ন যে কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, আজও তা মনে হ'লে শিক্ষক দুটির উদ্দেশে মস্তক নত করতে হয়।

পথে পথে বিদ্যার্জন চলছিল। তার পূর্বেই তখনকার এন্‌ট্রেন্স দেওয়া দরকার ছিল, নচেৎ পড়া বেকার হয়ে যায়। পরীক্ষায় যোগ দেবার আশায় তাই লক্ষ্ণৌ Canning Collegiate School-এ গিয়ে ভর্তি হই। সংস্কৃত ছাড়া কিছুই বড় দেখতে হ'ত না। আর কয়েক মাস থাকলেই উদ্দেশ্য এগোয়। কিন্তু লেখাপড়ায় আরম্ভ থেকেই ব্যাঘাত সঙ্গ নিয়েছিলেন। বাড়িতে আকস্মিক এক অভাবনীয় বিপদের টেলিগ্রাফ্ পেয়ে দক্ষিণেশ্বর রওনা হতে হয়।

দাদার এক বন্ধু আমার জন্য চাকরি স্থির ক'রেই এ কাজ করেছিলেন। বললেন, "গোপালের এই বিপদ, চাকরি থাকে ব'লে মনে হয় না, এখন তোমার চাকরি না করলে নয়। তোমার লেখাপড়ার উদ্দেশ্য তো জীবিকার্জন"—ইত্যাদি।

স্কুলে পড়ার এইখানেই শেষ।

(দাদা তখন ২৫০৲ টাকা বেতন পান। তাঁর নামে একটা charge দিয়ে তাঁকে suspend ক'রে রাখা হয়েছিল। ছয় মাস পরে

অফিসারের ভুল ধরা পড়ায় দাদা আবার সেই কাজেই প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে পড়তে বলেন। কেঁচে সে কাজ আর করা হয় নি।)

দাদা তখন 'Indian Mirror' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন আর আমাকে দিয়ে কাপি করাতেন। কখন বা বিষয়টা বাংলায় ব'লে দিয়ে ইংরাজিতে সেটা লিখতে বলতেন, পরে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিতেন। ক্রমে নিজের লেখার ঝোঁক চাপে। কয়েকবার নিজেও লিখেছিলুম—তিনি অবশ্য দেখে দিতেন।

দাদা গোড়া থেকেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নিতেন। বাংলা বই তখন অল্পই ছিল, এবং পশ্চিমে সে সব দেখবার উপায় বা সুবিধা ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'ই আমার একমাত্র বাংলা পাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি তার প্রত্যেক লেখাটি বার বার পড়তুম। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" "কমলাকান্ত" প্রভৃতি কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ইংরাজিতে লেখা শিক্ষিতদের অপরিহার্য ফ্যাশন ছিল, পত্রাদি লেখা তো বটেই। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন', বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল, ইংরাজি লেখার মোহ একদম মুছে গেল। সেজন্য দাদা দুঃখও করেন, তিরস্কারও করেন। বলেন, "বাংলা লিখতে নিষেধ করি না, কিন্তু ইংরাজি আমাদের জীবিকার্জনের ভাষা, তার উপর কর্মজীবনের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে, ওটা একেবারে ছেড়ো না।" কথা সত্য হ'লেও আমাকে তখন 'বঙ্গদর্শন' টেনেছে, বিশেষ "কমলাকান্ত" স্বয়ং।

আমার সাহিত্য-সংস্রবের প্রথম অধ্যায়

তাই প্রারব্ধ-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হই। ছেলেখেলা হ'লেও 'সংসারদর্পণ' একাদশ শতাধিক গ্রাহক পেয়েছিল। দুই বৎসর চালিয়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে সম্পাদন বন্ধ করতে বাধ্য হই। কারণ ছিল, তখনকার দিন ছিল লেখক-বিরল; সম্পাদকদের পত্রিকার প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠা পূরণের ভার নিতে হ'ত বা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'ত। তখন লেখক থাকলেও তাঁরা ছিলেন অল্পসংখ্যক, বোধ হয়

এখনকার মত সাহসীও ছিলেন না (বে-পরোয়া বলছি না)। বর্তমান যুগকে পাঠক-বিরল না বললেও এটা লেখক-বিরল যুগ তো নয়ই।

রোগমুক্ত হ'লেও সাহিত্যচর্চা ছাড়ল না। সেইটাই রোগ হয়ে রইল।

কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি কতকটা শান্তির জন্য। 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নাম দিয়ে আড়াই বৎসরের শ্রম ও চেষ্টায় প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে ১৩০১ সালে প্রকাশ করি। কবি হেমচন্দ্র তার বহু প্রশংসা ক'রে পত্র লেখেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধনা'য় একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

অনুমান ১৩০২।৩ 'রত্নাকর' নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক লিখে প্রকাশ করি। অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকাশের পর পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দেখাই। তিনি দয়া ক'রে দেখে দু-একটি দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং আনন্দ প্রকাশ ক'রে উৎসাহও দেন। স্টেজে ব্রহ্মহত্যাটি ছিল প্রধান দোষের এবং নিষিদ্ধও।

এই সময় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ব্যঙ্গরসিক শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চানন্দ" লিখতেন, এবং 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ও মধ্যে মধ্যে 'বঙ্গবাসী'তে নন্দিশর্মার 'নোট' বা ডায়ারি নামে আমার হাস্যরসাত্মক 'চুটকি' প্রায় তিন বৎসর দেখা দেয়। ক্ষোভের (সম্ভবত সুখের) বিষয়, নিজের 'ফাইল কাপি' নষ্ট হওয়ায়, সে সব আর পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নাই। নির্বাচনান্তে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, সে সম্ভাবনা আর নাই।

ওই সময় ঠাকুর-বাড়ি হ'তে 'বালক' নামে একখানি পত্রিকা দেখা দেয়। এক সংখ্যায় "লাঠি" ব'লে একটি লেখা বাহির হয়। সেই সংস্রবে বোধ হয় মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "লাঠির উপর লাঠি" চালান। আমি "লাঠালাঠি" লিখে সেটা শেষ ক'রে দি। পরে রবীন্দ্রনাথের 'চিরঞ্জীবেষু" ব'লে Young Bengal-দের প্রতি ঠাকুদ্দার উপদেশ দেখা দেয়। আমি "শ্রীচরণেষু" ব'লে তার উত্তর দি। বিষয়টি উভয়েই দু-তিন সংখ্যায় চালাই। তখন কে জানত যে, কার সঙ্গে এই বাচালতা করা হচ্ছে!

এখন দক্ষিণেশ্বরকে আমাদের সময়কার পল্লীগ্রাম বলা আর চলে না। তখন কলকেতায় চাকরি করতে যাওয়া মানে কাজ করতে যাওয়া অপেক্ষা যাতায়াতের চাকরিই ছিল বড় চাকরি। সে কাজে চার ঘণ্টা নিত, প্রস্তুত হবার হাঁপানি আর বিবিধ অসুবিধা বাদে। সুতরাং আমি ছিলাম তখনকার পাড়াগেঁয়ে, শহরের "চোখোলো মুখোলো" তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা না থাকায় সহজেই আমার দুখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি (Original Manuscript) সুমধুর মিষ্ট ভাষার মোহে পরহস্তে অগস্তগমন করে। কিছুদিন পরে তাদের রূপান্তরে ও নামান্তরে দেখতে পাই। আবার দাদার এক পরিচিত লোকের হাতে একখানি ছাপানো গ্রন্থের পঞ্চশতাধিক কাপি উই আর ইঁদুরের গর্ভে নাকি লোপ পায়। অসম্ভব নয়, 'পদ্যপাঠে' তাঁদের পরিচয়ও পড়া ছিল।

এই সব আঘাতই আমার সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্যসেবা থামিয়ে দেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি লিখে প'ড়ে স্বেচ্ছায় বদলি বরণ ক'রে জব্বলপুর চ'লে যাই। ব্যথাটা বড়ই লেগেছিল,—প্রিয়বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদ অতি সামান্য কারণে, অকারণেও ঘ'টে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

জব্বলপুরে সাত বৎসর কাটে। মানুষ একটা কিছু না নিয়ে থাকতে পারে না, পড়াটাই বন্ধু হয়ে রইল। ক্যাণ্টনমেণ্টে বাঙালিদের দুর্গোৎসব বা থিয়েটর ছিল না। দত্তপুকুর-নিবাসী ৺নৃত্যগোপাল লাহিড়ী ছিলেন কর্মী, উৎসাহী ও অভিনয়দক্ষ, তাঁকে অবলম্বন ক'রে দুর্গাপূজা আরম্ভ করা হয় এবং উৎসবের দিকটা সফল করা হয় থিয়েটরে।

চীনে 'বক্সার' হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে চীন যাত্রা করি। ইতিপূর্বে যুদ্ধ-সংস্রবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার আদেশ চারবার পাই। নানা ছলে সে সব এড়িয়েছিলুম, কারণ মা তখন বেঁচে ছিলেন। বার বার যুদ্ধে যাবার আদেশ অমান্য করায় তার কঠিন সাজাও স্বীকার করতে হয়েছিল, চাকরিতে আমার উন্নতির সকল পথই বন্ধ করা হয়। তা আমার গায়ে লাগে নি, মায়ের শান্তি-

বিধানের জন্য চাকরির মায়া ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। এখন মা ও দাদা উভয়েই পরলোকে, তাই চীনযাত্রাটা স্বেচ্ছায় করি। তাতে জগতের সমস্ত সভ্য (?) জাতিকে এক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ পাই। তাঁরা বক্সার হাঙ্গামা উপলক্ষ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে চীনের বুকে চেপে ব'সে ছিলেন।

লেখার উপর অভিমান ক'রে দিন কাটানো কঠিন ছিল। তাই চীনেও একটা কিছু নিয়ে থাকবার তরে officerদের সাহায্য নিয়ে টিনসিন শহরে Indian Recreation Club খোলা হয়। সেখানে নিত্য নিজেদের বসা, দাঁড়ানো, খেলা, বক্তৃতাদি ছাড়া ভারতের লোকেরা সেখানে guest হতে পারতেন, এবং হতেনও। তার মধ্যে Mr. ছত্রে। ইনি তাঁর মহারাষ্ট্রী সার্কাস নিয়ে আসেন। তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য করা হয়েছিল। যা পূর্বে কোনও "ফরেনারে"র ভাগ্যে কোনও দিন ঘটে নাই, বোধ করি ভারতীয় ব'লেই, পিকিন (Forbidden City) হ'তে তাঁদের সার্কাস দেখাবার জন্য ডাক পড়ে। রাজপরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী উক্ত ক্লাবে এসে ব্যবস্থা ক'রে যান। Mr. ছত্রে ফেরবার সময় ক্লাবকে একটি ঘড়ি ও একটি organ উপহার স্বরূপ দিয়ে যান। আমরাও তাঁকে অভিনন্দনপত্র ও স্বর্ণপদক (medal) দি।

১৯০৫ আগস্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ভারতে ফিরে কানপুর Store Office-এর ভার গ্রহণ করতে হয় এবং ওই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকদের ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানকার "বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ" লাইব্রেরির সম্পাদকত্ব স্বীকার করতেও হয়। স্থানীয় সর্বপ্রিয় যশস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। প্রবাসে—উৎসাহী, উদ্যমী, কর্মপ্রাণ, উদার, মুক্তহস্ত মনীষীদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বললেও যেন সবটা বলা হয় না।

আমাদের উভয়ের প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, বাঙালিদের জন্য তিনি একটা কাজের মত কাজ খুঁজছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে চিন্তা-চর্চা চলছিল, পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব করি—এ প্রদেশে বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি

অনুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টার আবশ্যক হয়েছে ; কিন্তু অগ্রণী হয়ে সহসা নিজেরা কিছু করতে গেলে সকলের সহানুভূতি পাওয়া সহজ হবে না। সব শহরগুলির চিত্তাকর্ষণ করতে হ'লে তাঁদের সামনে একটা সমষ্টিগত শক্তিমান প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ আদর্শ একবার ধ'রে দিতে হবে। এই বৎসর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, আমার প্রস্তাব ছিল সেই মণ্ডপের সুযোগ নিয়ে প্রথমে কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ"কে এ প্রদেশে আহ্বান ক'রে বাঙালিদের মধ্যে বাংলার ভাবধারা ও বঙ্গভাষার শক্তি-সামর্থ্য ও মাধুর্য সংক্রামিত করা এবং তাঁদের চিত্তে বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। প্রস্তাবটি Dr. Sen সোৎসাহে সমর্থন করেন।

পরে উদ্দেশ্যটি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ও উদ্দেশ্যের কারণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সুগঠিত ক'রে প্রধান প্রধান শহরগুলির লাইব্রেরি বা ক্লাবের সম্পাদকদের নিকট পাঠাই ও তাঁদের অভিমত আহ্বান করি। বিশেষ শ্রমসাধ্য হ'লেও সে সুযোগ না নষ্ট হয় সেই চেষ্টাই পাই।

সকলের অভিমত সংগ্রহের পর পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট আবেদন উপস্থিত করি। তাঁর আন্তরিক সমর্থনও পাই। কিন্তু তৎপূর্বে ময়মনসিংকে কথা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও ময়মনসিং-অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হতে পারলেন না, যেহেতু তাঁরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমি কলিকাতায় বদলি হওয়ায়, সকলেই, প্রধানত Dr. Sen, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আমি কথা দি—কলিকাতা অবস্থানকালে পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ পাব। আমার তিন মাস ছুটি পাওনা আছে, সেই সাহায্যে এ কাজটি ক রে যাব।

তা আর করতে হয় নি। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যের দিকে ধীরগতিতে আপনি রূপায়িত হয়ে থাকে। পূর্ব চেষ্টার ফলে ও প্রভাবে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও একটা নীরব জাগরণ—সঙ্ঘবদ্ধ হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েক বৎসর পরে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র

কাশীধামে—"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী" নামে প্রথম দেখা দেয়, এবং তাতে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

চাকরি কোনদিনই আমার ভাল লাগে নি। অথচ অফিসাররা সকলেই চাইতেন ও ভালবাসতেন। পুত্র হয় নি। কন্যা একটি মাত্র, সে সুপাত্রেই পড়েছিল। জামাই ছিলেন L. M. S. ডাক্তার। ভাবলুম—কেন আর ভূতের ব্যাগার খাটা! এ ইচ্ছা কানপুর থেকেই প্রবল হয়। কিন্তু চীনের ও পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য তখন নিখুঁত। নির্দিষ্ট কার্যকাল পূর্ণ হতেও বছর সাতেক বাকি। আমাকে চাকরি হ'তে অবসর দেবে কে? মন কিন্তু চাকরিবিমুখ। আমার অফিসার Major Smith, D. S. O. বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলি,—ছেলে নেই, কন্যাদায় মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয় নি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্যকরণীয় কাজ। সেটা র'য়ে গিয়েছে। সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম হতে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক! পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—"পাঁচটা বছর থাকলে, এখন যা পাবে তার তিন গুণ পাবে, নির্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন?" বললুম—সারাজীবন comfort-seekingএ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, এ কাজে ত্যাগই প্রথম সোপান,—আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝব—আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নাই। বললেন—"আমার বদলি আসন্ন, সেই সময় মনে ক'রে দিও।" তাঁর সাহায্য ছাড়া কর্ম হতে অবসর লওয়া আমার সম্ভব ছিল না।

কাশীগমন

১৯০৯এর নবেম্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যাই, পরে ১৯১০এর মে মাসে Medical Certificateএর সাহায্যে retire করি।

Habit is the second nature ব'লে একটা কথা আছে, আমরাও ব'লে থাকি "অভ্যাস যায় না ম'লে।" জোর ক'রে লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলুম। যদিও বিশ বৎসরের মধ্যে চীন হ'তে

"চীনপ্রবাসীর পত্র" নামে 'ভারতী' পত্রিকায় দুইবার মাত্র লিখি, শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তা থেকে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব উদ্ধৃত ক'রে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন ও সেই অত্যাবশ্যকীয় কথাগুলিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল, মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করাই চাই, এমন কি compulsory হ'লে ভাল হয়।

তার বছর খানেকের মধ্যে তা নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে, বোধ করি শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস উদ্‌যোগী হন।

অন্তরে কিন্তু সাহিত্য-প্রীতির আসন পাতাই ছিল। কোথাও না লিখলেও, বাড়িতে একখানা খসড়া খাতা খোলা থাকত, অবসর-বিনোদনের উপায়চ্ছলে। দশাশ্বমেধে সাধুসন্ত দেখে বেড়াই, সুযোগ হ'লে সঙ্গও খুঁজি। তদ্ভিন্ন বিশেষ কিছু চোখে পড়লে বাসায় ফিরে অন্তরকণ্ডুয়ননিবৃত্তি হিসেবে লিখে রাখি। খাতাখানি ক্রমে পুষ্ট হ'তে থাকে।

ইতিমধ্যে কলকেতার প্রেস তুলে এনে, মণিভূষণ নাথ ব'লে একটি ছেলে কাশীধামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে। আমার বৈঠকখানা চিরদিনই প্রিয় তরুণদের কাছে অবারিত থাকত। মণিভূষণও আসত যেত। সেই খসড়া খাতাখানির উপর তার নজর পড়ে ও আমার উপর তার আব্দার পড়ে। কোনও আপত্তিই কাজ দিলে না। শেষ শর্ত হ'ল আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে না। মণিভূষণ আমার 'বঙ্গবাসী' ও 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ব্যবহৃত pen-name—"নন্দিশর্ম্মা" ব্যবহার করে, পুস্তকের নামকরণ হয় "কাশীর কিঞ্চিৎ"।

শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু তখন কাশীধামে ছিলেন। লোকে তাঁকেই লেখক ব'লে ঠাওরায়। 'প্রবাসী' পত্রিকা লেখেন—এ লেখা হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাহারও নয়। তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "কাশীর কিঞ্চিতে'র একটি দীর্ঘ সমালোচনাচ্ছলে ললিতবাবু ব'লে দেন—লেখা তাঁর নয়। পরে বড়দিনের বন্ধে কাশী এসে আমাকে কেবল আবিষ্কারই করেন না, বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও স্থাপন করেন এবং বলেন, "বন্ধুদের বিতরণের জন্য

আমাকে আপনি 'কাশীর কিঞ্চিতে'র ষোল কাপি কিনিয়েছেন।" পরে নাছোড়বান্দা হয়ে, ভবিষ্যতে লেখবার (নিম্)রাজিনামা নিয়ে কলকেতায় ফেরেন। তারপর যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার ছিল। এমন রসগ্রাহী scholar সুধী বহু ভাগ্যে মেলে। তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমার সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। তাঁর তাগিদেই আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী হ'তে 'প্রবাসজ্যোতি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদনভার আমার উপরই ন্যস্ত হয়। এক বৎসর পরে তা পাক্ষিক কি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হওয়ায় আমি সে সংস্রব ত্যাগ করি। এখনকার 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্তী হন সহকারী সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় ললিতবাবুর বিশেষ আগ্রহে আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, কিন্তু শ্রীমান সুরেশের আন্তরিক চেষ্টা ও তাগিদ না থাকলে আমার এ কাজ দুদিনেই থেমে যেত।

এই সময় আমাদের প্রিয় সাহিত্যশিল্পী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র কাশী আসেন। কাশীতেই তাঁর সহিত সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য আমার ঘটে। পরে তা বন্ধুত্বে দাঁড়ায়। প্রেমিক দরদী একবার আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে একটি চাকর সঙ্গে কাশী এসে উপস্থিত। পাঁচ দিন থাকেন, অনেক কথাই হয়, পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠ দিন প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে কথা আজ কথামাত্র বোধ হ'তে পারে, কিন্তু সেদিন তা ছিল না।

পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দেখা। রূপনারাণ-তীরে তাঁর সামতাবেড় ভবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। নিজেই নিষেধ করেন, "পথ সুগম নয়—কষ্ট হবে।" পরে, উভয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ৩০০ মাইল থেকে যেতে হ'লেও তাঁর "বন্দনা"-সভায় না গিয়ে থাকতে পারি নি। শেষ দেখা—প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর কলিকাতা-অধিবেশনে গিয়ে। সেই সময় একত্রে তাঁর 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় দেখে আসি। তখন বলেছিলেন, "আর নয়, মাত্র দুখানি নাটক লিখে ছুটি নেব।" নিজে অত্যন্ত অপটু

থাকায় তাঁর শেষ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হ'তে পারি নি। বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে তাঁর কয়েকখানি পত্র রেখেছি মাত্র।

পেনশনের পর কাশীবাস ক'রে সাহিত্য নিয়ে থাকতে, মন মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ক'রে উঠত, এ কি করছি! এ যে যেমন অশোভন, ততোধিক লজ্জার কথা। পূজনীয় কবি আহ্মদাবাদ যাবার পথে শ্রদ্ধেয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের লক্ষ্ণৌ নিবাসে বিশ্রাম করছিলেন। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে আমার অভিভাষণ অতুলপ্রসাদের নাকি বড় ভাল লেগেছিল। সে কথা শুনে কবি আমাকে দেখতে চান, আমি নাগপুর হ'তে কাশীতে ফিরেছি মাত্র—সহসা 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্তীর নামে জরুরী টেলিগ্রামে অতুলবাবু কবির ইচ্ছা জানিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কবিসকাশে নানা আলোচনায় পাঁচ দিন মহানন্দে কাটে। সেই সুযোগে কাশীবাসান্তে সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আমার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা কবিকে জানাই। তিনি মৃদু হেসে বলেন, "মুক্তি চাও,—না?" পরে এক কথায় আমাকে নীরব ক'রে দেন। কথাটি এই,—"মুক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। মুক্তি না দিয়ে কেউ মুক্তি পায় না। তুমি যদি মুক্তিকামী হও, আর তোমার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা তোমার আত্মীয় হয়ে তোমার অন্তরে আছে, যার কথা তোমার মধ্যে বিক্ষেপ আনে, তোমার মনকে সহজভাবে জড়িয়ে থাকে ও টানে, তাকে মুক্তি না দিলে তোমার মুক্তি কোথায়? তাকে মুক্তি দিলে তবে তোমার মুক্তি।" ইত্যাদি। তার পর নাটক সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় খুব উৎসাহের সহিত অনেক কথা বলেন। "তোমরা (শরৎ, তুমি) সামাজিক নাটক লিখলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়।" বিষয়টি সারাদিন তাঁকে ত্যাগ করে নি, মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধে নিজেই বহু উপদেশ দেন। নানা কারণে আমার দ্বারা তা আর হয়ে ওঠে নি। প্রধান কারণ ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হওয়া, আর পত্রিকাদিতে contribution-এর তাগাদা। প্রতিভাবান ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লেখক ভিন্ন, তাগাদা তামিল ক'রে কেউ কোন work রেখে যেতে পারেন কি না সন্দেহ। আমার

স্বভাব ছিল স্বতন্ত্র। যতক্ষণ পেরেছি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারি নি, লিখতেই হয়েছে।

ললিতবাবুর তাড়ায় তখন আমি কেবল ভাবছিলুম—কি লিখব? আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্মক কথা—'সার্মন্' নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। সে সব পৃষ্ঠাগুলি না দেখেই বাদ দিয়ে যাওয়াই তো সাধারণ অভ্যাস। কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই। প্রয়াসটি আমার পক্ষে সহজ ছিল না, অথচ অন্য পথে পাঠকদের আকৃষ্ট করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্রপরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তাঁরা বহন ক'রে চলেছেন ও চলেন। দুঃসাহসের কাজ হ'লেও আমাকে তা হাসির আবরণে ব'লে যেতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের বলা চলে। তারপর বহু পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে যে তাঁদের সংসারের বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তা আমার জানা নাই। বাহ্যিক উন্নতিই চোখে পড়ে—তাও শহরে ও শহরতলিতে। তাই আমি আমার লেখায় কোথাও বিশেষভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহস পাই নি। কল্পনার উপর নির্ভর করি নি। গরীবদের লোক গরীব ব'লে এবং ধনীদের ধনী ব'লে জানে, মধ্যবিত্তদের সে আশ্রয় নাই, বাঁচোয়াও নাই। 'দেনা' আর 'উঠনো'ই তাদের মা-বাপ।

আমার ধারাবাহিক বা ক্রমশ-প্রকাশ্য লেখা—

পুস্তকাকারে প্রকাশের বৎসর—

(১) 'চীনযাত্রী' কাশী হ'তে প্রকাশিত 'অলকা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল,—

(২) 'কোষ্ঠীর ফলাফল'—'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়

১৩৩৮ আশ্বিন—(৩) 'ভাদুড়ীমশাই'—'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়

১৩৪২ (৪) 'আই হ্যাজ'—'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়

১৪৪৩ (৫) 'পাওনা'—কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকায়

অন্যান্য ছোটগল্প, নক্সা প্রভৃতি নিম্নলিখিত পত্রিকাদিতে প্রকাশ পায়—

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, উত্তরা, কল্লোল, কালিকলম, মানসী-মর্মবাণী, বিচিত্রা, শ্রীহর্ষ, বেণু, বসুমতী প্রভৃতি। পরে সেগুলি আমার নিম্নলিখিত গ্রন্থমধ্যে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে—

	প্রকাশ
(১) আমরা কি ও কে	১৩৩৪, বৈশাখ
(২) কবুলুতি	১৩৩৫ ঐ
(৩) দুঃখের দেওয়ালি	
(৪) পাথেয়	১৩৩৭
(৫) মা ফলেষু	১৩৪৩ আশ্বিন

প্রকাশ

১৩৩২ আশ্বিন—'শেষ খেয়া' (উপন্যাস) কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায় নি।

১৩৪১ 'উড়ো খৈ'—রহস্য কবিতা

১৩২২ পৌষ 'কাশীর কিঞ্চিৎ' সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি।

'সংসারদর্পণ'—মাসিক পত্রিকার কথা, 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'—সঙ্কলন ও প্রকাশের কথা, 'রত্নাকর'—নাটকের কথা, আমার সাহিত্যসেবার প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত।

'প্রবাসজ্যোতি'—মাসিকের কাশী হ'তে সম্পাদন। কিন্তু এটা আমার সম্মতি না নিয়েই মণিবাবু ছাপিয়ে দেন। এ সব ভালবাসার advantage নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন আমি বাধ্য হয়েই ও কাজ করি। তাই এটাকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আমি গণনা করি না। এটা accidentএর মত ঘাড়ে এসে পড়ে। সুতরাং কোনও অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে না।

সভাপতিত্ব

১। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের, দিল্লীর (প্রথম বারের) অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। সভার দু'দিনের কার্যশেষে, অসুস্থ বোধ করায় তিনি সভার

অবশিষ্ট কার্য সমাধা করবার ভার আমার উপর দিয়ে চ'লে যান। আমাকে কোনপ্রকারে সে কাজ সমাধা করতে হয়।

২। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পর-বৎসর মিরাট-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে আমাকে সভাপতি করা হয়েছিল।

৩। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমি নির্বাচিত হই ও সে কাজ করি।

৪। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কলিকাতা (টাউন হল) অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমি নির্বাচিত হই ও সে কাজ করি।

৫। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের গৌহাটী-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে সভাপতিত্ব করবার আহ্বান আসে (বোধ হয় 1938) তার কয়েক দিন মাত্র পূর্বে Vertigo রোগাক্রান্ত হওয়ায় টেলিগ্রাফ ক'রে অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হই।

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের (বোধ করি 1939) কুমিল্লা-অধিবেশনে মূল সভাপতির পদ-গ্রহণ জন্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আগ্রহপূর্ণ পত্র পাই (বোধ করি 1939, Octr. কি Nov.) তখন আমার Vertigo প্রবল। সুতরাং সে সৌভাগ্যও প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হই।

৭। University Instituteএ All Bengal Students Literary Conference & Bankim Centuary 1938 (?)—সাহিত্য-বিভাগে সভাপতিত্ব করতে হয়। (2nd July '38 সন্ধ্যা)।

৮। চন্দননগরে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সভায় (2nd July 1938 বৈকালে) সভাপতিত্ব করতে হয়।

৯। লাহেরিয়াসরাই সারস্বত সম্মেলনের আহ্বানে যেতে হয় ও সভাপতিত্ব করতে হয়। ১৩৪২ (?) ইত্যাদি ইত্যাদি।

Note—আমার হাতের কাছে কিছু না থাকায় অধিবেশনের সংখ্যা ও বৎসর দিতে পারলুম না। আবশ্যক হ'লে তোমাকে ভাই কষ্ট স্বীকার ক'রে পূরণ ক'রে নিতে হবে।

সম্মানপ্রাপ্তি

১। "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"র পর, "জয়ন্তী"র একটা যেন মরশুম আসে। শুনতে পাই "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী"র তরফ হ'তে আমার জন্যও নাকি ওইরূপ একটা প্রস্তাব হচ্ছে। তখনই পরিচালক-সমিতিকে পত্র লিখে প্রতিবাদ ও নিষেধ করি ও অনুরোধ ক'রে পাঠাই—ও কথাটি যে ক্ষেত্রে ও যাঁর জন্য ব্যবহার হয়েছে, সেইখানেই যেন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে ; ওর মর্যাদা ও মূল্য হানি করা যেন না হয়। আমার তাতে সম্মতি নাই। ইত্যাদি। পরে

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর গোরক্ষপুর অধিবেশন সভায়, সম্মিলনীর প্রতিনিধিরূপে পরিচালক-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় শাল দোশালা হ'তে রূপার দানসামগ্রী পর্যন্ত ও একটি সরস্বতীমূর্তি উপহার দেন।

আমার বলবার কিছু ছিল না। নিজের বয়স ও অবস্থা উল্লেখ ক'রে বলতে বাধ্য হই—"ষোড়শ উৎসর্গ করলে আরও সুখের হ'ত, দেখে যেতে পারতুম।"

২। Calcutta University হ'তে "জগত্তারিণী" Medal প্রাপ্তি 1933 (?)।

প্যাষ্টিম্

১। তরুণত্বের কোটায় Satire সৃষ্টির শখ চেপেছিল। একেবারে না ছাড়লেও সেটা ত্যাগ হয় গ্রামস্থ একজন পদস্থ সম্মানিতকে ক্ষুণ্ণ ক'রে। লর্ড রিপন আমাদের সংক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ায় গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের সাড়া প'ড়ে যায়। কমিসনারপদ-প্রার্থীদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হয়। সেই সময় "ভোটভিক্ষা" নাম দিয়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখি। লেখাটি বোধ হয় সকলের হয়ে কথা কয়েছিল। তাই দেশময় তা নিয়ে সাড়া প'ড়ে যায় এবং বহু পত্রিকায় সেটি উদ্ধৃত হয়। শুনেছি, শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকাতেও তা উদ্ধৃত ক'রে আলোচনাও হয়েছিল। আমাদের সম্মানিত সে-কালের রায় বাহাদুর, সেটিকে নিজের ব'লে গায়ে পেতে নেন। বস্তুত সেটি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে লেখা হয়েছিল। আঘাতটা

তাঁকে অতিরিক্ত লাগে। তাই গুরুজনদের একান্ত অনুরোধে সে পথ ত্যাগ করি।

২। তার পর "ফ্রেনলজি" আর "সামুদ্রিক" নিয়ে কিছু দিন কাটে।

৩। পরে, সাধারণত কারও কারও জীবনে যে ঝোঁকটা ধরে,—সাধুসঙ্গ, প্রাণায়াম-প্রীতি এস্তোক মিস্‌ম্যারিক্‌-সার্কল্‌। যাক, কোনটাই স্থায়ী হয় নি।

N. B. শেষ দেখলুম—(প্যাষ্টিম্‌ না বলতে পার) সবার বড় সাহিত্যের নেশা—যা পত্নীর সতীন।

সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ

জীবনে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু থাকে, সেটি—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদর্শন।

২। ধর্ম ও কর্ম বীর শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর দর্শনলাভ।

৩। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর দর্শনলাভ।

৪। শ্রীযুক্ত আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের দর্শনলাভ।

৫। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের দর্শন।

পরলোকগত সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-রথীদের সাক্ষাৎ লাভ।

১। সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যাঁর লেখায় সর্বপ্রথম সাহিত্যের আস্বাদ পাই।

২। শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৩। „ 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

৪। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৫। নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৬। রসরাজ অমৃতলাল বসু।

৭। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৮। সমাজ-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয় পাঠ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের লেখা নির্বাচনসাপেক্ষ নয়। সবই আমার শ্রদ্ধার বস্তু। তবে চয়নিকা (এখন সঞ্চয়িতা), নৈবেদ্য,

গীতাঞ্জলি, এগুলিকে "সাধ্যায়" বলা চলে। ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনা হাতের কাছে পেলে না-প'ড়ে থাকতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ' ও 'সমালোচনা' সম্বন্ধেও যথেষ্ট মোহ আছে।

শরৎচন্দ্রের সব লেখাই আনন্দ দেয়। আগের দিকের লেখাগুলি তদ্ভিন্ন আরও কিছু দেয়। শেষের কয়েকখানির সঙ্গে মতের কিছু কিছু অমিল থাকলেও পাঠের আনন্দে তা বাধা দেয় না।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা আমি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সহিত প'ড়ে থাকি।

এ সবের সঙ্গে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অবশ্যপাঠ্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তবে মহাপুরুষদের জীবনী আমার শ্রদ্ধার বস্তু ও সুখপাঠ্য।

ইংরাজি গ্রন্থের প্রিয়পাঠ্যের উল্লেখ নির্বাচনান্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

কলেজের অধ্যয়নে আমি বঞ্চিত। মেজর বেনেটের "ফেয়ারওয়েল" লিখেছিলুম, তিনি খুশি হয়ে তাঁর নিজের লাইব্রেরিটি আমাকে উপহার-স্বরূপ দিয়ে যান, তাই আমার বিদ্যার পুঁজি। পরে বিংশ শতাব্দীর **Continental Literature** আমার অল্পই দেখা হয়েছে। তাই প্রিয়পাঠ্য যা ছিল তার কয়েকখানির কথা আজও যা মনে আছে তারই উল্লেখ করছি—

এডিসনের **Spectator**এ তাঁর নিজের লেখাগুলি এবং **Mr. Steel** ও **Mr. Swift**এর লেখা।

Charles Dickens (not all his books) ও **Charles Lamb**-এর গ্রন্থ। টলষ্টয় ও টুরগানিভের গ্রন্থ। থ্যাকারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক **Jerome K. Jerome**এর **humorous** লেখাগুলি। **Mark Twain, Ruskin, Anatol France, Balzac**এর **Atheist's Mass** আর তাঁর **description** লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

মনে ক'রে লিখতে গেলে **detail** বেড়ে যাবে। সব মনেও নেই।

শেষ এখন দাঁড়িয়েছে **Amiel's Journals**এ। অর্থাৎ যাঁদের লেখা থেকে আমি সুর ও সাহায্য পেয়েছি, তাঁদেরই নাম করলুম।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর লেখা আমায় খুব আনন্দ দেয়, পেলেই পড়ি। গোত্রের নৈকট্য থাকায় আমার তা ভাল লাগতে বাধ্য।

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য-বিষয়ক রচনা, আলোচনা আমি যখন-তখন উপভোগ করি।

আর বেশির দরকার কি? আজ (16. 2. 40) ৭৮ আরম্ভ হ'ল। জীবন-কথার কি শেষ আছে ভাই!

পত্নীবিয়োগ—2nd July 1939 এই "মধুরেণ" পর্যন্ত থাকাই ভাল।

Dumka, 15. 2. 40 কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

শরৎকুমারীর জন্ম ১৮৬১ সনে। তাঁহার শৈশব লাহোরে অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতা—শশিভূষণ বসু (কলিকাতা চোরবাগানের বসু-বংশজাত) ১৮৬৩ সনে চাকুরী উপলক্ষে সুদূর লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সনের ১২ই মার্চ আন্দুলের বিখ্যাত-চৌধুরী বংশের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, এম-এ., বি-এল. এটর্নির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৮, ৭ই সেপ্টেম্বর অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি সুকবি ছিলেন; শরৎকুমারীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরণ মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৯২০ সনের ১১ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শরৎকুমারীর প্রথম রচনা—"কলিকাতার স্ত্রীসমাজ" ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয়।* ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত বহু রস-রচনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমি যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি তালিকা দিতেছি:—

'ভারতী ও বালক':	১২৯৮, আষাঢ় ...	শাশুড়ি বৌ
	আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ ...	একাল ও একালের মেয়ে
'সাধনা':	১২৯৮, মাঘ ...	আদরের না অনাদরের?
	১২৯৯, কার্তিক ...	আমাদের পুতুলের বিয়ে
	১৩০০, আষাঢ় ...	কন্যাদায়
	আশ্বিন-কার্তিক ...	শৈশবে ধর্ম্ম-শিক্ষা
'ভারতী':	১৩০৬, কার্তিক ...	স্বায়ত্ত সুখ

* 'ভারতী' অগ্রহায়ণ ১৩১৬ দ্রষ্টব্য।

	১৩১৫, আষাঢ়	...	শ্রীপঞ্চমী
	ভাদ্র	...	মেয়ে-যজ্ঞি
	১৩১৬, বৈশাখ	...	স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধা-কিশোর মাণিক্য
	জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র	...	দিদিমা
	ভাদ্র	...	ত্রিপুরার গল্প
	পৌষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৭	...	মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা
	১৩১৭, পৌষ	...	লক্ষ্মীর শ্রী
	১৩২০, ফাল্গুন	...	নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম
'বঙ্গদর্শন' :	১৩১৪, অগ্রহায়ণ	...	প্রবাসের পাঠশালা
'মানসী' :	১৩১৯, কার্তিক	...	দোষ পরিহার
'মানসী ও মর্ম্মবাণী' :	১৩২৪, অগ্রহায়ণ, পৌষ	...	যৌতুক
	১৩২৮, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-মাঘ	...	সোণার ঝিনুক
'বিশ্বভারতী পত্রিকা' :	৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা	...	ভারতীর ভিটা

একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া শরৎকুমারী চৌধুরাণীর আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।* মজুমদার-লাইব্রেরি ('বঙ্গদর্শন'-কার্য্যালয়) হইতে 'শুভবিবাহ' প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে (২৬-৩-১৯০৬); ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৮। এই সামাজিক চিত্রখানি বঙ্গসাহিত্যে লেখিকাকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ইহার যে সমালোচনা করেন, তাহাই প্রধানত তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে; আমরা 'আধুনিক সাহিত্য' হইতে ইহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"'শুভবিবাহ' একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের

* বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ১৯১৪, ১৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত "শরৎকুমারী চৌধুরাণী"র 'বনফুল, ১ম খণ্ড' নামে একখানি কবিতা-পুস্তকের উল্লেখ আছে। ইনি ও 'শুভবিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী অভিন্ন কি না এখনও স্থির করিতে পারি নাই।

ক্ষেত্রটি কলিকাতা কায়স্থসমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ-গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

"পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, এ-কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

"'শুভবিবাহে' লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুরপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ-কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্যমাত্র।...

"রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তবচিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য-সমাজের সর্বজনপূজ্য দাদামহাশয়ের মৃত্যু এ মাসের শোচনীয়তম ঘটনা। তিনি জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার গৌরবে বিদায় লইলেন সত্য, তবু আমরা সান্ত্বনা পাইতেছি না। জরাজীর্ণ দেহে সুদূর পূর্ণিয়াতে অবস্থান করিলেও তাঁহার অস্তিত্ব এবং বার্ষিক আশীর্বাদই আমাদিগকে অনেকখানি বল ও ভরসা দিত; তিনি আছেন এবং সস্নেহ কৌতুকে আমাদের সাহিত্য-খেলা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গত ১২ অগ্রহায়ণ (ইংরেজী মতে ২৯ নবেম্বর) সোমবার রাত্রি ৩-৫০ মিনিটের সময় মহাকাল আমাদের সেই আশ্বাসটুকুও কাড়িয়া



লইয়াছে। সুদীর্ঘ—প্রায় সাতাশি বৎসরের জীবনান্তে দাদামহাশয় সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার প্রায় সাতাত্তর বৎসরের জীবন-কাহিনী দাদামহাশয় স্বয়ং সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় অন্যত্র তাহা হুবহু মুদ্রিত করিলাম। বাকি রহিল শেষ দশ বৎসর। বার্ধক্যহেতু এই দশ বৎসর মোটেই ঘটনাবহুল নহে। বিধবা কন্যা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের লইয়া বিপত্নীক দাদামহাশয় এই কাল প্রধানত পূর্ণিয়ায় জামাতার গৃহেই কাটাইয়া গিয়াছেন, ক্বচিৎ কখনও সাহিত্যের আকর্ষণে দুই-চারিদিনের জন্য এখানে-ওখানে গিয়াছেন মাত্র। অবসর-যাপনের প্রধান অবলম্বন ছিল গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটকাদি লেখা, বিশেষ করিয়া স্মৃতিকথা লেখা। এইগুলি নানা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকাকারেও দুই-চারিটি বাহির হইয়াছে। দাদামহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকের কালানুক্রমিক তালিকা এবং আত্ম-জীবনকথায় উল্লিখিত কোনও কোনও ঘটনার সঠিক সংবাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহ করিতেছেন, আগামী পৌষ-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা প্রকাশিত হইবে। সম্ভব হইলে শেষ দশ বৎসরের জীবন-কথাও ওই সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যাইবে।

দাদামহাশয়ের শেষ জীবনের আর একটি বড় কাজ ছিল, সাহিত্যিক নাতিনাতিনীদের চিঠি দিয়া উৎসাহিত করা। সে চিঠির প্রত্যেকটি সহানুভূতি-সমবেদনায় মধুর এবং কৌতুক-রসিকতায় সমুজ্জ্বল। এগুলি একত্র সংগৃহীত হইলে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষটিকে আমরা আরও নিবিড়ভাবে পাইব। যাঁহাদের কাছে প্রকাশযোগ্য চিঠিপত্র আছে, তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিলে প্রথমে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় এবং পরে পুস্তকাকারে আমরাই প্রকাশ করিতে পারিব।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর উপরেই আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে; কলিকাতার আশেপাশের বংশপরম্পরায় কেরানীকুলকেই তিনি সাহিত্যে নবজন্ম ও নূতন মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা হাস্য-পরিহাস লইয়াই সাহিত্যের রেলপথে তাঁহার ডেলি-প্যাসেঞ্জারি এবং ক্যানভাসারি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উচ্চবিত্ত, রবীন্দ্রনাথ যেমন বুদ্ধিজীবী এবং শরৎচন্দ্র যেমন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীদের লইয়া সাহিত্য-সংসার রচনা করিয়াছেন, কেদারনাথ তেমনই দরিদ্র বাঙালী কেরানীদের লইয়া এক নূতন সংসার গঠন করিয়াছেন ; সেই রাজ্যের বাসিন্দারা কি ও কে, তাহা তিনি চিরদিনের জন্য নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, রসিকতা স্বতন্ত্র। কেদারনাথ এবং তাঁহার সৃষ্টি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে, ভবিষ্যৎ সমালোচকের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কেদারনাথ ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, ইহারা কেদারনাথকে সৃষ্টি করিয়াছেন ? এখনও দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে হয়তো এই প্রশ্নের জবাব মিলিতে পারে। ইহার পরে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একাকার হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

কেদারনাথ নিরহঙ্কার নির্বিরোধ অজাতশত্রু পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সাহিত্যিক তৃতীয় নেত্র সকল মানুষের শুধু দক্ষিণ মুখই দেখিত। পাছে কাহারও মনে দুঃখ দিয়া বসেন, এই ভয়েই তিনি সন্ত্রস্ত থাকিতেন ; পরকে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজেকে যতটুকু প্রকাশ করা আবশ্যক কখনই তাহার অধিক আত্মপ্রকাশ করিতেন না। ভালবাসা ও স্নেহ দিয়া সকলকে জয় করিয়া তিনি স্বভাবতই সকলের দাদামশাই স্থলাভিষিক্ত হইয়া আশীর্বাদ ও স্নেহের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁহাকে দাদামশাই বলিতে পারিলে খুশি হইতেন।

বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা লেখা আজ সম্ভব নয়। তাঁহার সাহিত্যিক দান লইয়া বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট মিলিবে। আজ মানুষ দাদামশাইকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার স্নেহ-সুকোমল পবিত্র-মধুর মূর্তিটি বারংবার আমাদের ঝাপসা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। তাঁহার ভালবাসা মায়ের আঁচলের মত আমাদিগকে ঘিরিয়া ছিল, সেই আঁচলটি যে অপসারিত হইয়াছে তাহা ভাবিতে কষ্ট হইতেছে।

তাঁহার অন্তিমবাসনা জীবন-সায়াহ্নের একটি অপ্রকাশিত ছন্দোবন্ধ নিবেদনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই একটি পঙ্গু কবিতাখণ্ডে সমস্ত

মানুষটি যেন তাঁহার রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ লইয়া দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

অন্তিম বাসনা

ওগো মোর বাংলার ভাই, ক্ষণেক দাঁড়াও বন্ধু,
ভাল ক'রে দেখি,
আজ মোর বিদায়ের দিন।
শত চক্ষু নাই,
থাকিলেও শক্তি তার ক্ষীণ।
ইচ্ছাই প্রবল মোর, তারি প্রেরণার
বহু আশে আসিয়াছি বিদায়-ভিক্ষায়।
যা দেখেছি যা পেয়েছি তাই মোর ঢের
পেতে হয় তোমাদেরি পাই যেন ফের।
নিজগুণে মনে রেখো—এই শেষ আশা,
হউক পাথেয় সেই সহভালবাসা।
জানি না কি গুণে বলো, "দাদামহাশয়"
সেও তোমাদেরি দান—সঙ্গে যেন রয়।
যা দিয়েছ পেয়েছি তা, চলিলাম রাখি
তোমাদেরি শুভকামী—তোমাদেরি থাকি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ চৈত্র ও ১৩৫৪ চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিনয়কুমার সরকার

এই মাসের ৮ তারিখ (২৪ নবেম্বর) বৃহস্পতিবার আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে একটি নার্সিং হোমে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে অকালে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের জীবনান্ত ঘটে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মালদহের ইংরেজবাজারে তাঁহার জন্ম হয়,

বাষট্টি বৎসর সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। এখনও তাঁহার যুবোচিত কর্মপ্রেরণা ও উদ্যম ছিল, স্বদেশের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করিবার সংকল্প তাঁহার ছিল। তাঁহার অসমাপ্ত কর্মের জন্য ক্ষোভ লইয়া দেশের কথা স্মরণ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বিনয়কুমার যৌবনে বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী অনুবাদ করিয়া 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' নামে প্রকাশ করেন। এই আদর্শে তাঁহাকে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, বাঙালী জাতির কর্মবীর। এত অধিক কর্মপ্রবণতা এ যুগের কোনও বাঙালীর মধ্যে দেখা যায় নাই।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন, নানা বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নানা ভাষা জানিতেন, পৃথিবীর সর্বত্র বার বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দেশের অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞান সম্পর্কে বিবিধ জনহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন—শুধু ইহাতেই বিনয়কুমারের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। ইহা তাঁহার খণ্ড পরিচয় মাত্র। তিনি আরও অনেক বড় ছিলেন, ভাবে কর্মে একটা গোটা জীবন্ত মানুষ ছিলেন। তাঁহার সুগভীর দেশপ্রেম এবং প্রবল বাঙালীয়ানা তাঁহাকে সর্বদাই বৃহতের পথে, ভূমার পথে, মহত্ত্বের পথে চালনা করিত। সকল বাধা ও অন্তরায় সত্ত্বেও বাঙালীকে 'বাড়তির পথে' চালনা করিবার স্বপ্ন ছিল তাঁহার। রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় সে স্বপ্ন যে তাঁহার কোনদিন ভাঙে নাই, তাহার প্রমাণ 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' দুই খণ্ডে মিলিবে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশে ভাব ও কর্মের যে বিপুল বন্যা আসিয়াছিল, গঙ্গাধরের মত বিনয়কুমার তাহা মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি বিপ্লবের স্রোতে ভাঙনের বন্যায় গা ভাসান নাই—সেই ১৯০৫ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গঠনের পথে কি করিয়া দেশকে উন্নত করিয়া পৃথিবীর মহাজাতিসমূহের অন্যতম করিয়া তোলা যায় তাহাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। এই কাজে ভিক্ষার ঝুলি হাতে তিনি বার বার বাহির হইয়াছেন, দেশের কৃতী ছাত্রদের বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য দলে দলে বাহিরে পাঠাইয়াছেন, রাধেশচন্দ্র শেঠ ও বিপিনচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় মালদহের জাতীয়

কার্যকরী শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া, 'গৃহস্থ' পরিচালনা করিয়া কলিকাতার জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার এই কালের শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কীয় মুদ্রিত পরিকল্পনাগুলি আজিও বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে, তাহার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রভৃতির মধ্য দিয়া তিনি স্বদেশের জ্ঞানবিস্তারে একাগ্রচিত্তে সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

বিনয়কুমার অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন, অলসভাবে কখনই বসিয়া থাকেন নাই; আত্মসুখভোগ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে এক মুহূর্তের জন্যও ব্যস্ত হইতে দেখা যায় নাই, দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সকল বিভাগে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন, কোথাও ভাল কিছু দেখিলে উপযাজক হইয়া উৎসাহিত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেন। দেশের লোককে কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি গড়িয়া লইয়াছিলেন, হাত-পা ছুঁড়িয়া অপ্রচলিত ও বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই ভঙ্গি ও ভাষা অনেকের উপহাসের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু বিনয়কুমার কখনও দমেন নাই; তাঁহার কারণ তিনি মনের মধ্যে কিছুই অস্পষ্ট রাখিতেন না, ফাঁকির সহিত তাঁহার কোনও কারবার ছিল না।

স্বদেশের মাটির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্বের আকাশে তাঁহার অবাধ বিহার ছিল। তাঁহার বিশ্বমুখীনতা তাঁহাকে কখনও কিন্তু মৃত্তিকা-উদাসীন করে নাই। তাঁহার কর্মময় জীবনের দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের (১৯০৫-১৯৪৯) সাধনা ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশকে কোন্ সিদ্ধির পথে লইয়া গিয়াছে বা যাইবে, গুণী ব্যক্তিরা তাহার বিচার করিবেন। আমরা আজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

বন্দে মাতরম্

এক

অর্কেস্ট্রাতে সুর যোজনা করিয়া গাহিতে পারা যায় না—এই অজুহাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ন্যায্য-প্রাপ্য মর্যাদা দান করিবার বিরোধী। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক সরকার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী 'বন্দে মাতরম্'কেই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিবার অনুকূলে মত দিয়াছেন। পণ্ডিতজী কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' সঙ্গীতটি গ্রহণের খুবই পক্ষপাতী, যেহেতু ইহা অর্কেস্ট্রাতে সুরযোজনা করিয়া গাহিবার উপযোগী সঙ্গীত।

'বন্দে মাতরম্' বনাম 'জনগণমন' বিতর্ক বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। গণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত 'জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটী'র সিদ্ধান্ত ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর আপাতত বিতর্কের অবসান হইয়াছে। সরকারী তালিকায় দুইটিকেই জাতীয় সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন বটে, তবে দুইটির জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' গীত হইবে কণ্ঠ-সঙ্গীত(Song)রূপে, আর 'জনগণমন' গীত হইবে যন্ত্র-সঙ্গীত-(anthem)রূপে। কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বনাম রবীন্দ্রনাথ মামলায় বিচারপতিরা বিচার করিয়া কোন রায় দেন নাই, আপোস-রফা করিয়া সালিশের রোয়েদাদ (award) দিয়াছেন। অন্য প্রদেশে এই সিদ্ধান্তে কোন প্রতিক্রিয়া হইয়াছে কি না, তাহা এখন পর্যন্ত বোঝা যায় নাই। আমাদের বাংলা দেশে নিরপেক্ষ বাঙালীরা খুশি হইয়াছেন এই ভাবিয়া যে, দুইটি সঙ্গীতই যখন দুই জন বাঙালী মনীষীর রচিত, তখন উভয়েই সমান মর্যাদা পাইয়াছেন। তবে বাদী বা প্রতিবাদী কোন পক্ষের বাঙালীই ইহাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই দুই পক্ষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে, এই ব্যবস্থা দ্বারা দুইটি সঙ্গীতেরই

সমাধি-রচনা করিয়া রাখা হইল। এই আশঙ্কার মূলে কোন যুক্তি আছে কি না জানি না। সম্ভবত ইহা অনুমান মাত্র।

কমিটীর কার্যে যে বাদী প্রতিবাদী পক্ষের কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই প্রমাণিত হইবে—

"...জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটি 'বন্দে মাতরম্' গানকেই জাতীয় সঙ্গীত করার সুপারিশ করিয়াছেন। তবু তাঁহারা 'জনগণ' সঙ্গীত একেবারে ভুলিতে বা বর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, মন্ত্রে 'বন্দে মাতরম্ এবং যন্ত্রে 'জনগণ' গাহিতে হইবে। জাতীয় সঙ্গীতের এই দুই ভাগে বিভক্ত করার ব্যাপারটাও কৌতুকাবহ। ভারত পাকিস্তান ভাগের মতোই কি উহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল? কণ্ঠসঙ্গীতে 'বন্দে মাতরম্' এবং যন্ত্রসঙ্গীতে 'জনগণ'—শ্যাম ও কুল দুই-ই রক্ষা পাইল। যেন সুরাসুরের সম্মিলিত সমুদ্র-মন্থনে অমৃত আহরণ!" ('যুগান্তর' ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, তারিখের সম্পাদকীয়)

'যুগান্তর' 'জনগণমন' সঙ্গীতের পক্ষপাতী হইয়াও কমিটীর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের অহিংস সংগ্রামে জয় হইল পণ্ডিতজীরই। হিন্দী বনাম হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা নির্বাচন-সমরে ভাগ্যলক্ষ্মী পণ্ডিতজীর ললাটে জয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। সদ্য পরাভবের গ্লানি মুছিয়া না যাইতেই তাঁহাকে যদি আর একটা পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী হয়তো বা অভিমান করিয়া পদত্যাগের হুমকিও দিতে পারেন। জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটী সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে এইরূপ দুর্ভাবনা সদস্যগণের বিচারবুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল কি না, তাহা অন্তর্যামী বলিতে পারেন। এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রাষ্ট্রভাষা-নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পণ্ডিতজী যখন হিন্দীর ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করিয়া উর্দুর নয়া সংস্করণ হিন্দুস্থানীকে রাজপাটে বসাইবার জন্য উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তখন গান্ধীজীর অনুকূল মতকেই তিনি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দীর সমর্থকেরা তাঁহার অস্ত্র প্রয়োগকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন এই বলিয়া যে, ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর হিন্দুস্থানীর প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে এবং গান্ধীজী জীবিত থাকিলে বর্তমান অবস্থায় তিনি হিন্দুস্থানীর দাবিকে সমর্থন করিতেন না। যুযুধান পণ্ডিতজীকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই হয়তো শেষটায় দূরদর্শী কুশলী নেতা মৌলানা আজাদকে খোলাখুলি বলিতে হইয়াছিল যে, দেশ-বিভাগের পরে আর হিন্দুস্থানীর প্রশ্ন উত্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু গান্ধীজীকে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী জানিয়াও এবং 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হওয়ার অনুকূলে তাঁহার সুবিবেচিত মত অবগত থাকিয়াও পণ্ডিতজী ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন।

তিন

মহাপ্রস্থানের কয়েক মাস পূর্বে গান্ধীজী ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উড্‌ল্যাণ্ডস্ ময়দানে ২৩শে আগস্ট প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৫৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্য" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পূর্বোক্ত সংখ্যায় তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ইংরেজী রিপোর্টের প্রতিলিপি (Photographic facsimile) প্রকাশিত হইয়াছিল।—

"গান্ধীজী গত বৎসর আগষ্ট মাসে যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ২৩ তারিখে আলিপুরে উডল্যাণ্ডস ময়দানে প্রার্থনার পর এক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি আল্লা-হো-আকবর এবং বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর যখন বাংলা অনুবাদ চলিত, সে সময়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব কর্মীদের কাজ লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং রিপোর্টারের জবানিতে বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া দিতেন।...সেই লেখা খাতা হইতে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যটুকু তাঁহারই নিজের লিপিতে প্রকাশ করা হইল :—

"He then came to *Bande Mataram*. This was no religious cry. t was a purely political cry. The Congress had to examine it. A

reference was made to Gurudev about it. And both Hindu and Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection. And he pleaded that they should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend Muslims. It was to be remembered it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. Though therefore he felt strongly about *Bande Mataram* an ode to Mother India, he advised his League friends to refer the matter to the League High Command. He would be surprised if in view of the growing friendliness between Hindus and Muslims the League High Command objected to the prescribed lines of *Bande Mataram*, the national song and national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was so far as I am (he was) aware aclaimed by both the Hindus and Muslims of Bengal."

গান্ধীজী জীবিত থাকিলে 'বন্দে মাতরম্'-এর পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্তিতে কোন ব্যাঘাত যে ঘটিত না, ইহা সুনিশ্চিত।

চার

নির্ধারিত ব্যবস্থায় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে যে সরকারী তালিকায় মূক অভিনয় করিতে হইবে, তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ গোড়াতেই দেখা যাইতেছে। জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটীর সিদ্ধান্ত গণ-পরিষদে যেদিন ঘোষিত হইল, সেদিন পরিষদেরই সদস্যা শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদ-ভবনে 'জনগণমন' গানটি গাহিয়াছিলেন। কমিটীর সিদ্ধান্তকে সঙ্গে-সঙ্গেই অমান্য করিয়া যন্ত্রসঙ্গীতটিকে নিরাপত্তিতে ও বিনা প্রতিবাদে কণ্ঠসঙ্গীতের আসন দেওয়া হইল। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতটি কোন অবস্থাতেই যন্ত্রসঙ্গীতের স্থান দখল করিতে পারিবে না, যেহেতু সরকারী ওস্তাদেরা 'বন্দে মাতরম্'কে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুপযোগী বলিয়া আগেই অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। পরিষদ্-সদস্য 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'র শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহে বেসরকারী ওস্তাদদের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা অর্কেস্ট্রাতে সুর যোজনা করাইয়া

লইলেন। তাঁহার এই সাফল্যের সংবাদ সংবাদপত্রে সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাশিত হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকারী ওস্তাদী মানদণ্ডে 'বন্দে মাতরম্' যন্ত্রসঙ্গীতের পংক্তিতে স্থান পাইল না।

প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্বে স্বদেশী যুগে একজন বিখ্যাত বাঙালী সুরশিল্পী ও সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত 'মার্শাই'-(Marseillaise)-এর সুর যোজনা করিয়া তাহা বিলাতে গাহিয়াছিলেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' "নানাকথা" স্তম্ভে এই সংবাদ সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর) তারিখের 'সঞ্জীবনী' হইতে গোটা প্যারাটাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ফরাসী সুরে "বন্দে মাতরম্।" বাবু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র; ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। সঙ্গীত-কুশল দিনেন্দ্রনাথ সেদিন বিলাতে এক বৈঠকে ফরাসীদের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত মার্শাই-এর সুরে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। য়ুরোপের উদ্দীপক স্বর সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত সেদিন বহু ইংরেজ নরনারীর প্রাণে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। এখানে কিন্তু বন্দে মাতরম্ রবে রাজপুরুষদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। মার্শাই-এর সুরে বন্দে মাতরম্ গীত হইলে 'ইংলিশম্যান' প্রমুখ এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্রের ক্ষিপ্ততা হয়তো আরও বৃদ্ধি পাইবে। তা হউক। আমরা আশা করিতেছি, শীঘ্রই বঙ্গদেশে এই নুতন সুরে বন্দে মাতরম্ গান শুনিয়া তৃপ্ত হইব।"

দিনেন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। ইঁহার পিতামহ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর। ভারতীয় সঙ্গীত-জগতে দিনেন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ গুণী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ কর্তৃক মার্শাই-সুরে অর্কেস্ট্রা-সহযোগে গীত 'বন্দে মাতরম্' গানে যাঁহারা অর্কেস্ট্রার সুর যোজনা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথা না বলাই ভাল।

পাঁচ

সরকারী অনুষ্ঠানগুলিতে জাতীয় সঙ্গীত কণ্ঠে কচিৎ গীত হয়, সাধারণত যন্ত্রেই গীত হইয়া থাকে। সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ কমিটীর ব্যবস্থামতে কার্যত 'বন্দে মাতরম্' অপাংক্তেয় হইয়াই রহিল। কেন, 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন' দুইটি সঙ্গীতকেই যখন জাতীয় সঙ্গীতের তালিকাভুক্ত করা হইল, তখন সম-মর্ষাদা দিবার পক্ষে কি বাধা ছিল? নানা যন্ত্রের সাহায্যে ঐক্যতান বাদ্যে 'বন্দে মাতরম্'-এর সুর-যোজনার অনুপযুক্ততা? এই আপত্তির যে কোন ভিত্তি নাই, তাহা আমরা পূর্বেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। সুর সম্পর্কে স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করা কি কমিটীর কর্তব্য ছিল না? সরকারী সুর-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে চূড়ান্ত ও প্রামাণিক বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইলেন কি হেতুতে ও কোন্ যুক্তিতে? পৃথিবীর প্রায় সমুদয় স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত সরকারী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে একটি করিয়াই। দুইটি জাতীয় সঙ্গীতকে সমমর্যাদা-সম্পন্ন করিয়া তালিকাভুক্ত করার দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও আপাতত দুইটি রাষ্ট্রে উহার সন্ধান পাইয়াছি; যথা সার্বিয়া ও নেদারল্যাণ্ডস্। ইতালিতে গ্যার্বেত্তি রচিত 'Royal Italian March' সঙ্গীতটি যাবতীয় সরকারী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতরূপে যন্ত্রে গীত হইয়া থাকে এবং গ্যারিবল্ডীর বিখ্যাত 'Hymn' সঙ্গীতটি রণ-সঙ্গীতরূপে কণ্ঠে গীত হয়। শেষোক্ত জাতীয় সঙ্গীতটি রাষ্ট্রীয় তালিকায় রহিয়াছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মার্কিন বিশ্বকোষ ("The Encyclopedia Americana" 1944 Edition, Vol. 19) হইতে এই সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"The only national air of Italy is Garbetti's 'Marcia Reale Italiana' (Royal Italian March) played on all official occasions. The famed Garibaldi's 'Hymn' (q. v.) is a martial strain."

রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত না হইলেও জাতীয় সঙ্গীত রাষ্ট্রের অনুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবস্থাকে ইতালীয় ব্যবস্থার অনুরূপ বলা যাইতে পারে না।

ছয়

ঐতিহ্যের দিক দিয়া 'বন্দে মাতরম্'-এর দাবি অস্বীকার করা সম্ভব নহে জানিয়া 'জনগণমন'-এর সমর্থকদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন যে, "আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, আজ স্বাধীনতাপহারক শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের সাধনা শেষ হইয়াছে" সুতরাং 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রয়োজন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং "ইহার বিষয়বস্তুও রাজনীতিক অবস্থা বিবর্তনের ফলে অনেকটা সার্থকতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।" ('যুগান্তর', ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ এবং ১৩৫৬, ৯ই অগ্রহায়ণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) রাষ্ট্র কোন কালেই নির্বৈর হইতে পারে না, তাহার শত্রু থাকিবেই। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ঘরে ও বাহিরে কি শত্রু বৃদ্ধি পায় নাই? তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর শত্রুশূন্য হইয়াছে বলিয়া "আর বৈর-নিপাতের প্রশ্নই উঠে না," তবে সেই যুক্তিতেই 'বন্দে মাতরম্'-এর দাবি নাকচ হইতে পারে না। 'যুগান্তরে'র প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গ-ক্রমে যে 'মার্শাই' সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা উহারই নজিরে পূর্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতেছি।

ফরাসীজাতির বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সঙ্গীত 'মার্শাই' (Marseillaise) রচিত হইয়াছে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার রচয়িতা Rouget de Lisle একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্বেচ্ছাচারী রাজার স্বৈর-শাসনে একদা ফ্রান্সের গণ-চিত্তে যখন বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন এই সঙ্গীতটি মার্শাই শহরের অধিবাসীগণের কণ্ঠে সর্বপ্রথম গীত হয়। ক্রমে ফ্রান্সের সর্বত্র সঙ্গীতটি গীত হইয়া ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। ফলে, জনগণের মধ্যে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এবং গণ-চিত্তে উপচীয়মান বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে বিস্ফোরণের উপযোগী করিয়া তোলে। রচয়িতার প্রদত্ত সঙ্গীতের আদি নাম— "রাইন-বাহিনীর রণ-সঙ্গীত" বা Battle song of the Rhine Army"; পরবর্তী কালে স্থানের নাম অনুসারে সঙ্গীতটি 'মার্শাই' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে এবং অদ্যাবধি পৃথিবীময় এই নামেই পরিচিত ও খ্যাত। 'মার্শাই' সঙ্গীতের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত

রণোন্মাদনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়াছে। এই অমর সঙ্গীতের পদে পদে গীত হইয়াছে স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের আহ্বান, স্বজাতিদ্রোহী অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতকের নিধনের বাণী, দেশবৈরীর কলুষিত রক্তস্রোতে জন্মভূমির মৃত্তিকা রঞ্জিত করিবার উদ্দাম উত্তেজনা।

মার্শাই সঙ্গীতের প্রথম প্যারাটির সম্পূর্ণ অংশ (ইংরেজী অনুবাদ) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"Come, children of the fatherland,
The day of glory now is here ;
By tyranny against us
The bloody banner is raised ;
Do you hear in the land
Those ferocious soldiers roar ?
Up to our arms they come,
Strangling our sons, our women ?
To arms, citizens, form your battalions,
Let us march, let us march !
That the foul blood may drench our furrows.

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্যারার প্রথম দুইটি লাইনও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"What seeks this horde of slaves,
Of traitors and conspiring kings ?"
... ...
"What ! shall these foreign cohorts
Make the law in our homes ?"
... ...
"Tremble, ye tyrants and traitors
The shame of every faction,
Tremble !" ... ...

(The Encyclopedia Americana, 1944 Edition, Vol. 18 হইতে উদ্ধৃত)

সাত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বৈরশাসনাধীন শৃঙ্খলিত ফ্রান্সে রচিত ও গীত 'মার্শাই' সঙ্গীত বর্তমান যুগের বন্ধন-মুক্ত স্বাধীন ফরাসী জাতির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীতের তালিকা হইতে পরিত্যক্ত

হয় নাই। এই মহাসঙ্গীত একমাত্র জাতীয় সঙ্গীতরূপে সশ্রদ্ধ-সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। ফ্রান্স খণ্ডিত ভারতের মত দুর্ভাগা দেশ নহে। স্বদেশের হিতার্থ জীবন-দান, দুঃখ-ভোগ, সর্বস্ব ত্যাগ এবং যুদ্ধ-জয় ও জাতির মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভের যে বিরাট ঐতিহ্য 'মার্শাই' সঙ্গীতের মধ্য দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ফরাসী জাতি কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। ঐতিহ্যের সেই মহিমান্বিত স্মৃতি আজ দেড় শত বৎসরের অধিক কাল 'মার্শাই' সঙ্গীতকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

মার্শাই সম্পর্কে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক লামার্তিন-(Lamartine)এর প্রশস্তিবাণী—"It was the fire-water of the Revolution which instilled into the senses and soul of the people the intoxication of battle." 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কেও গান্ধীজী যে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, পূর্বেই তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী কার্লাইল 'মার্শাই' সঙ্গীতের বর্ণনা করিয়াছেন এই ভাবে:—"the luckiest musical composition ever promulgated, the sound of which will make the blood tingle in men's veins, and whole armies and assemblages will sing it, with eyes weeping and burning, with hearts defiant of Death, Despot and Devil." এইরূপ অভিমত আমাদের 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কেও প্রযুজ্য। এই সকল পাশ্চাত্য মনীষী আজ পর্যন্ত জীবিত থাকিলে তাঁহাদের মুখে আমরা 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশংসা কেন, হয়তো বা তদপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসাই শুনিতাম।

আট

ঐতিহ্যের দিক দিয়া 'বন্দে মাতরম্' জগদ্বিখ্যাত 'মার্শাই'য়ের সমকক্ষ না হইলেও কবিত্বে, ভাব-সম্পদে, সুরে, ছন্দে, সাহিত্য সুষমায় শ্রেষ্ঠতর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 'বন্দে মাতরম্' রচিত হইয়াছে মাত্র ৭০ বৎসর পূর্বে এবং ব্যাপকভাবে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইতেছে আজ ৪৫ বৎসর ধরিয়া। সুতরাং ইহাকে আশ্রয় করিয়া এই অল্প

কালের মধ্যে 'মার্শাই'য়ের মত ঐতিহ্য গড়িয়া উঠা সম্ভবপর নহে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবীন হইলেও দ্রুতগতিতে ইহার ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সে ঐতিহ্য অভিনব ও বিচিত্র।

'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহ্যের বিশদ আলোচনার পূর্বে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, গান্ধীজী ব্যতীত ভারতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জননায়কেরা 'বন্দে মাতরম্'-এর উদ্দেশ্যে প্রশস্তিবাণী নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতেছি।

'বন্দে মাতরম্' যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সঙ্গীত, তাহা আজ বাংলার বাহিরে শিক্ষিত সমাজও অবগত আছেন। সভা ডাকিয়া প্রস্তাব পাস করিয়া ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। প্রায় ৫৪ বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে তরুণ কবি সুকণ্ঠগায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত, কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' গীত হয় নাই। স্বদেশী যুগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া অদ্য পর্যন্ত ইহা কংগ্রেসে ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানে নিখিল-ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-রূপে গীত হইতেছে। লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয়, বাঙালীর তথা ভারতবাসীর সেই 'রিন্যাসেন্‌স্' বা নবজাগৃতির যুগে বাংলা দেশে আপনা হইতেই 'বন্দে মাতরম্' ব্যাপকভাবে সর্বপ্রথম জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়, এবং 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় ধ্বনিরূপে নবজাগ্রত বাঙালী জাতির সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সঙ্গীত যেমন মার্শাইয়ের অধিবাসীগণের কণ্ঠে সর্বপ্রথম গীত হইয়াছিল এবং তাহাদেরই মাধ্যমে দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের ভারতব্যাপী প্রচারের গৌরবও তেমনই বাংলা ও বাঙালীর প্রাপ্য।

নয়

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্'-কে 'মহামন্ত্র' আখ্যা দিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরং মহামন্ত্রটি বঙ্গ-সাহিত্যেরই দান" বলিয়া তিনি গর্ব ও গৌরব অনুভব করিতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষ্যে নিখিল-ভারত শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩রা ও ৪ঠা মাঘ) এক সারস্বত-সম্মিলনের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই, যাহা সত্য, যাহা কষ্টকল্পনা নহে, তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এত কাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশী জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম, অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেই জন্ম আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলা ভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে, তবে আর-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে কবি-গুরুর অন্য রচনা হইতেও উদ্ধৃতি দিতেছি। স্বদেশের মুক্তিকামী ত্যাগব্রত তরুণ সাধকেরা 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠাবান, রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় তাঁহার অনবদ্য রচনার মধ্য দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঋষি-কবি বলিতেছেন—

"তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে, যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া

থাকেন বিধাতা জগৎ-সমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দে মাতরম্।...

"হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ কবিবে, তখন, আমি নিশ্চয় জানি—তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের কি কর্মের কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কাল-ভুজঙ্গের বিষাক্ত দর্প পরিশ্রান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না।...

"দেশের হৃদয়-নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রিগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি। বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্।"

যে সকল উগ্র রবীন্দ্র-ভক্ত কবি-গুরুর কণ্ঠে গীত জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-কে এবং তাঁহারই উচ্চারিত এই মহামন্ত্রটিকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, তিনি আজ জীবিত থাকিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অপচেষ্টার প্রতিরোধ করিতেন।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাদেশিকতার অন্যতম প্রধান পুরোধা বরেণ্য দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আত্মচরিতে ('A Nation in making' নামক গ্রন্থে) যে হৃদয়গ্রাহী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The song of which *Bande Mataram* are the opening words occurs in Bankim Chunder Chatterjee's well-known novel, *Anandamatha.* It is a Bengalee song, but so rich in Sanscrit vocabulary that it is understood in every part of India by educated men. Its stately diction, its fine musical rhythm, its earnest patriotism, have raised it to the status and dignity of a national song, and it forms a fitting prelude to the business of great national gatherings. Bankim Chunder

Chatterjee could hardly have anticipated the part which it was destined to play in the Swadeshi movement, or the assured place it was to occupy in all national demonstrations. Dante, when he sang of Italian unity, had no conception of the practical use to which his song would be put by Mazzini and Garibaldi, or the part it would play in the political evolution of the Italian people. Men of genius scatter their ideals broadcast. Some of them fall on congenial soil. Time and the forces of Time nurse them. They ripen into an abundant harvest fraught with unspeakable good to future generations."

দশ

বঙ্গবিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলন যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, তখন পূর্ব-বাংলায় 'ফুলারী' শাসনকালে কোন কোন জিলায় সরকারী আদেশে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা কিংবা 'বন্দে মাতরম্' গান করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা নেতা 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সম্পর্কে তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"পূর্ব্ব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কেহ রাজ-পথে কিম্বা কোন প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলে সে দণ্ডনীয় হইবে।" ইহার বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ছোট ছোট বালক-বালিকারাও দণ্ডের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ কোন ইংরেজ দেখিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দে মাতরম্' বলিত। ইহাতে ইংরেজ রাজপুরুষগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে বালক-বালিকারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলে, ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইতেন। তাহারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ইংরেজ-দিগকে ক্ষেপাইবার নিমিত্ত অনেকেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিত।"

স্বদেশী যুগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১লা ও ২রা বৈশাখ) বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনের দিন ধার্য হয়। এই উপলক্ষ্যে বরিশালে সমাগত বাংলার জননায়কগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের প্রথম দিবসেই পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হইয়াছিল। প্রতিনিধিগণ ও যুবক স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন শোভাযাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া

সম্মিলিত-কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে 'রাজা বাহাদুরের হাবেলী' নামক প্রাঙ্গণ হইতে সম্মিলন-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন, তখন ইংরেজ শহর-কোতোয়াল মিঃ কেম্পের পরিচালনাধীনে বহু লাঠিধারী পুলিস-কন্স্টেব্‌ল শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালনা করিতে থাকে। নির্মমভাবে প্রহৃত হইয়া এবং অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়াও 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া জন্মভূমিকে বন্দনা করিতে বিরত হন নাই, কেহই ভীত বা সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করেন নাই, সহস্র সহস্র লোকের শোভাযাত্রা হইলেও নেতৃবর্গের আদেশ অমান্য করিয়া অন্যায়রূপে প্রহৃত ও আহত হইয়াও পুলিসের উপর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টিত হন নাই। বাংলায় অনুসৃত এই প্রতিরোধনীতি ১৬ বৎসর পরে গান্ধী-যুগের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় রণাঙ্গণে সত্যাগ্রহরূপে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহাকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বাঙালীর অগ্রগামী চিন্তাধারার প্রতি ভারতবিশ্রুত জননায়ক গোপাল কৃষ্ণ গোখলের উচ্চারিত প্রশস্তি-বাণী—"বাংলা আজ যাহা ভাবে, অবশিষ্ট ভারত পরদিন তাহা ভাবে।"

শোভাযাত্রীদিগের মধ্যে বীর যুবক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতার উপর যে অমানুষিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণহানির আশঙ্কা ঘটিয়াছিল। একাধিক লাঠিধারী পুলিস কর্তৃক উপর্যুপরি প্রহৃত এবং গুরুতরভাবে আহত হইয়াও তিনি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। সংজ্ঞা লোপ না হওয়া পর্যন্ত তরুণ ভক্ত-পূজারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল দেশমাতৃকার বন্দনা-বাণী 'বন্দে মাতরম্'। চিত্তরঞ্জন স্বনামখ্যাত নেতা সুবক্তা ও সুলেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র। আহত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ময়মনসিংহের বিখ্যাত গায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর আঘাতও গুরুতর ছিল। তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হয় এবং হাত ভাঙিয়া যায়। পরবর্তী সপ্তাহের (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ, ইংরেজী ১৯০৬ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখের) 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশদ বিবরণ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প কালকোর্ত্তাপরা বহুসংখ্যক সাধারণ পুলিস ও খাকিকোর্ত্তাপরা রিজার্ভ পুলিস লইয়া বেলা ১টার সময় হইতে রাজবাটীর ফটকের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডণ্ট একটি বালক মাত্র। তিনি অশ্বারোহণে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহু সংখ্যক বাঙ্গালী ইনস্পেক্টার সব-ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও রাজবাটীর ভিতরে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহারা এণ্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। রাজবাটীর নিকটে রাস্তার অপর পার্শ্বে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার কাছারী। সেই বাটী পুলিসের কেল্লায় পরিণত হইয়াছে। সেই বাটীতে বহু সংখ্যক পুলিস বন্দুক লইয়া সমবেত হইয়াছে।

"প্রতিনিধিগণ দেখিয়াছিলেন, সাধারণ পুলিস ও রিজার্ভ পুলিস বড় বড় লাঠি লইয়া রাস্তায় রহিয়াছে। প্রতিনিধিগণ দেখিয়াছিলেন, নবাবের কাছারীতে বন্দুকধারী পুলিস সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। প্রতিনিধিগণ দেখিয়াছিলেন, রিজার্ভ পুলিসের সুবাদার এক হাতে লাঠি ও কোমরে তররারী ঝুলাইয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ দেখিয়াছিলেন, মিঃ ডণ্টের কোমরে তরবারী ঝুলিতেছে। তবু বরিশাল সহরের রাস্তায় বন্দে মাতরং বলিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বহির্গত হইলেন। ফুলারের বেআইনী সার্কুলার অগ্রাহ্য করিয়া রাজপথে বন্দে মাতরং বলিবার জন্য বহির্গত হইলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ রাজপথে বহির্গত হইলেন, তাঁহাদের পশ্চাতেই এণ্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ। ইঁহারাও কতক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের দল রাজপথে বাহির হইল, সেই মুহূর্ত্তে এক দল লাঠিয়াল পুলিস তাঁহাদের সম্মুখে ও আর একদল তাঁহাদের পশ্চাতে প্রবেশ করিল। চক্ষের পলকে পূর্ব্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া বহু কালকোর্ত্তা ও খাকিকোর্ত্তাওয়ালা পুলিস তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। মিঃ কেম্প তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তোমাদের উত্তরীয় (Badge) পরিত্যাগ কর।" তাঁহারা বন্দে মাতরং অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কেম্প বলপূর্ব্বক উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা হস্ত দ্বারা বক্ষোপরি উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন কেম্প স্বয়ং ও তাঁহার অনুচর পুলিস তাঁহাদিগকে

প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা বন্দে মাতরং ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। কেম্প ও পুলিস বলপূর্ব্বক তাঁহাদের উত্তরীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইঁহাদের উপর লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল। তবু ইঁহারা শ্রেণীভঙ্গ হইলেন না। বন্দে মাতরং ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পুলিসের লাঠিতে শচীন্দ্রনাথের বদনমণ্ডল ফাটিয়া রক্তপাত হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, চিত্তরঞ্জন লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হইল, তবু কেহ বন্দে মাতরং বলিতে নিবৃত্ত হইল না। এণ্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত হইল, তবু কেহ ভীত হইল না বা শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল না। তখন পুলিস নিরুপায় হইয়া ৩।৪ জনে এক একজন প্রতিনিধিকে ধরিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ জলপ্রণালীতে তাঁহাদিগকে ফেলিয়া দিয়া কাহাকেও জুতার লাথি, কাহাকেও লাঠির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কয়েকজন পুলিস চিত্তরঞ্জন গুহকে প্রহার করিয়া এক পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন প্রহার খায়, আর বন্দে মাতরং বলে। পুলিস জলে নামিয়া প্রায় সংজ্ঞাশূন্য চিত্তরঞ্জনের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল—তখনও তাহার মুখে বন্দে মাতরং। তাহার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল বলিল, "আর মারিও না, ও যে মরে।" তখন কনষ্টেবলরা নিবৃত্ত হইল। তখন দুইজনে মিলিয়া তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিল। চিত্তরঞ্জন বাবু মনোরঞ্জন গুহের পুত্র। তাহার পৃষ্ঠে যে কত লাঠির দাগ তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। তাহার পা লাঠির আঘাতে পঙ্গুর মত হইয়াছিল।"

প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিত্তরঞ্জন চেতনা ফিরিয়া পাইলে পর তাঁহাকে এবং ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সঙ্গে লইয়া মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সম্মিলন-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। পরবর্ত্তী বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ইবাবু মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা এক টেবিলের উপরে দক্ষিণে ব্রজেন্দ্র এবং বামে চিত্তরঞ্জনকে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া অনেক নর-নারী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বহু সংখ্যক লোকের মুখে কি যে দৃঢ় সঙ্কল্প

ফুটিয়া উঠিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সভামণ্ডপ মহোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "মেঘনাদবধ কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম, পুত্রশোককাতর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

'যে শয্যায় আজ তুমি শুয়েছ কুমার,
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবল দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়, শতধিক তারে।'

"আজ আমার রক্তাক্ত পুত্র ও নিগৃহীত বালকদিগকে দেখিয়া আমার মুখ হইতে সেই কথাই বাহির হইতেছে। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "আমার পুত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। এই সংবাদ শুনিয়া যখন আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন চিত্তরঞ্জন আমাকে বলিয়াছিল—"বাবা, শেষ পর্য্যন্ত আমি বন্দে মাতরম্ বলিয়াছি। লাঠির আঘাতে মাথা ঘুরিতেছিল, আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুষ্করিণী হইতে না তুলিলে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত।" আমি পুত্রকে বলিয়াছিলাম "বাবা, দেশের জন্য যদি তুমি মরিতে তবে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হইত না।" এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া বহু যুবকের প্রাণে যে সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল অল্পদিন পরেই তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিল।"

মিত্র মহাশয় বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্কল্পের ইঙ্গিতই করিয়াছেন এবং পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বিপ্লব-আন্দোলন সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন।

এগারো

'বন্দে মাতরম্' স্বদেশী যুগে সৃজিত ও সঞ্চিত ঐতিহ্য সগৌরবে বহন করিয়া দ্রুতগতিতে বিপ্লবের অগ্নিযুগে আসিয়া পড়িল। 'আনন্দমঠ'এর সন্তান-সম্প্রদায়ের মাতৃভূমির বন্দনা-গান ও মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' বিপ্লবযুগে কিশোর ও তরুণ বঙ্গসন্তানকে মুক্তিসাধনায় দুঃখ-বরণ, ভাগবত সমর্পণ ও আত্ম-বলিদানের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। সে-যুগের দীক্ষিত সন্তানেরাই নির্বাসনে কারাগারে ও দ্বীপান্তরে অসহনীয় নিগ্রহ-নির্যাতনের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া ও মরিয়া সেই ঐতিহ্যের

সম্পদসম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছে। 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' তাঁহারাও সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

মরণজয়ী বিপ্লবী বাহিনীর মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক 'Bande Mataram' রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল সেই মহামন্ত্রের শিরস্ত্রাণ পরিয়া। শত্রু-মিত্র সকলের কণ্ঠে ওই মহামন্ত্র যেন জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সঠিক উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি "Bande Mataram" নামের পূর্বে "The" শব্দ যুক্ত করেন নাই। 'বন্দে মাতরম্'এর প্রতি এমনই অনুরাগ ও নিষ্ঠা রহিয়াছে নবজাতীয়তার মহান আচার্য শ্রীঅরবিন্দের। তাঁহার সহনায়ক বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাস প্রভৃতি পরিচালিত বিপ্লবী দলের মুখপত্র বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'—'বন্দে মাতরম্'এর রক্ত-তিলক ললাটে অঙ্কিত করিয়া শক্তি-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল। এমনই করিয়া বাংলা হইতে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে পর্যন্ত মুক্তি-তীর্থের যাত্রীদলের কণ্ঠে ওই মহাসঙ্গীত গীত এবং মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভারত-বিখ্যাত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান "অনুশীলন-সমিতি"র আদ্য মধ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা লইবার কালে দীক্ষার্থী কর্মীকে "ওঁ বন্দে মাতরম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীক্ষাদাতা গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতে হইত। অন্যান্য বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যেও 'বন্দে মাতরম্' অনুরূপ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠান করিয়াছে।

বারো

অগ্নিযুগের পরে মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রামের যুগ। ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে নবাগত মহানায়ক গান্ধীজী প্রগতিশীল জাগ্রত জাতিকে অভিনব রণকৌশল শিক্ষা দিলেন। হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং গুর্জর হইতে বঙ্গ-আসাম পর্যন্ত রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। অহিংস সংগ্রামের অভিযানেও অগ্রগামী সৈন্যদলের কণ্ঠে গীত হইয়াছে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এবং ধ্বনিত হইয়াছে জাতির মর্মবাণী 'বন্দে মাতরম্'। গান্ধী-যুগে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে, আইন-অমান্য আন্দোলনে এবং সর্বশেষ ১৯৪২ সনের আগস্ট বিপ্লবের অভিযানেও 'বন্দে মাতরম্'

নিজস্ব ঐতিহ্য লইয়া সমতালে জয়যাত্রার পথে চলিয়াছে। আগস্ট-বিপ্লবের সমসাময়িক নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামেও 'বন্দে মাতরম্' স্থানচ্যুত হয় নাই। ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ্ সরকারের বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রতিদিন বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রাণস্পর্শী সুরে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের কংগ্রেস-অনুমোদিত অংশ গীত হইত এবং তৎপর কার্যসূচী অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্য চলিত। 'গান্ধীজীকী জয়', 'নেতাজীকী জয়' এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকপ্রিয় নব জয়ধ্বনি 'জয় হিন্দ্' নিনাদের মধ্যেও 'বন্দে মাতরম্'এর বিনাশ বা বিলোপ ঘটে নাই।

আমাদের এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্তরে স্তরে 'বন্দে মাতরম্'কে আশ্রয় করিয়া অর্ধশতাব্দীর অনধিক কালের মধ্যে যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বিপুল ও বিশাল, অভিনব ও বিচিত্র! পৃথিবীর কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত কোন কালেই অনুরূপ ঐতিহ্য সৃজন করিতে পারে নাই। 'বন্দে মাতরম্'এর ঐতিহ্য ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি। এই মহাসঙ্গীত সামগানের মত শাশ্বত, এই মহামন্ত্র প্রণব-মন্ত্রের ন্যায় নিত্য। 'বন্দে মাতরম্'এর ভালে স্বয়ং মহাকাল সস্নেহ-সমাদরে অমরতার যে চন্দন-তিলক পরাইয়া দিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর। কোন মানব-হস্তই কোন কালে সে ললাটিকা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। 'বন্দে মাতরম্'এর সঙ্গে আত্মদানে ভাস্বর ও ত্যাগে সমুজ্জ্বল যে মহান ঐতিহ্য সম্পৃক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা মহাজাতির স্মৃতি হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। এই মহাদেশের উত্তর প্রান্তে অভ্রভেদী হিমালয় যেমন তাহার বিরাট বিচিত্র অক্ষয় অবয়ব লইয়া স্মরণাতীত কাল হইতে অবস্থান করিতেছে, তেমনই এই মাতৃবন্দনা-গীতি 'বন্দে মাতরম্' তাহার অবিনাশী ঐতিহ্য লইয়া নিজস্ব মহিমায় ও স্বকীয় গৌরবে নগাধিরাজের মত অটল হইয়া সমুন্নতশিরে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

১৫-১২-৪৯ শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

কেদারনাথ ও বঙ্গসাহিত্য

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

'সংসার দর্পণ'।—গত সংখ্যায় "আমার জীবন-কথা"য় কেদারনাথ "প্রারব্ধ-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে" দুই বৎসর 'সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কথা বলিয়াছেন। পত্রিকাখানির কোন সংখ্যা বর্তমানে মিলিবার উপায় নাই, কাজেই উহার প্রকাশকাল সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক। ১৮৮৭ সনের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় আমি 'সংসারদর্পণে'র উল্লেখ পাইয়াছি। ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২১ জুলাই ১৮৮৭ (শ্রাবণ ১২৯৪)। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-সম্পাদকের নাম ছিল—"প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়" ; উহা "Published at 13, Jorabagan Street, Calcutta. Published by Editor. Copyright Editor." পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—"A new Magazine started with the object of improving the domestic life of the Hindus of Bengal. A monthly paper, pp. 32." ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে সম্পাদক-রূপে কেদারনাথের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু স্বত্বাধিকারী—প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।

'প্রবাস-জ্যোতিঃ'।—ইহা প্রথম বর্ষে মাসিক আকারে কাশী হইতে প্রকাশিত হয়—১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে। কেদারনাথ ১ম বর্ষের 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'প্রবাস-জ্যোতিঃ' সম্পর্কে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি পত্রে (১২-১০-১৯২০) কেদারনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

> "...গত বারের আপনার—নিজেও দুটান টানে! বড় চমৎকার বড় উপভোগ্য হয়েছে। কালী ঘরামীও অনিন্দনীয়। প্রায় সকলগুলিই ভাল হইয়াছে।...
>
> আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব—যেখানে দু চক্ষু যায়!...
>
> আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বজায় থাকিলে প্রবাস-জ্যোতিঃর আর যাই হোক্, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই।..."

গ্রন্থপ্রকাশ

কেদারনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ; এগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। ইহাতে বন্ধনী-মধ্যে সাল-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **রত্নাকর** (অভিনয় কাব্য)। দক্ষিণেশ্বর ১৩০০ সাল (১২-১০-১৮৯৩)। পৃ. ৯৩।

২। **গুপ্তরত্নোদ্ধার** বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ। দক্ষিণেশ্বর বৈশাখ ১৩০১ (ইং ১৮৯৪)। পৃ. ৩০৪।

৩। **কাশীর-কিঞ্চিৎ** (রসকবিতা)। বড়দিন, ১৩২২ সাল (ইং ১৯১৫)। পৃ. ১০২।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে "শ্রীনন্দী শর্ম্মা" এই ছদ্ম নাম আছে।

৪। **চীনযাত্রী** (ভ্রমণ)। ইং ১৯২৫ (ভাদ্র ১৩৩২)। পৃ. ১৮৭।

ইহা প্রথমে কাশী হইতে প্রকাশিত 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' পত্রে আরম্ভ করেন ও শেষ হয় 'অলকা'য় (১৩২৮, ফাল্গুন—১৩৩০, বৈশাখ)

৫। **শেষ খেয়া** (উপন্যাস)। ইং ১৯২৫, মহাষ্টমী ১৩৩২। পৃ. ১৭৯।

৬। **আমরা কি ও কে** (লিপি-চিত্র)। বৈশাখ ১৩৩৪ (২৪-৪-১৯২৭)। পৃ. ১৯৩।

স্থচী : আমরা কি ও কে, আনন্দময়ী দর্শন, দেবী-মাহাত্ম্য, পুরসুন্দরী, মুক্তি, ভগবতীর পলায়ন, আমাদের সন্ডে-সভা, থাকো, বিবর্ত্তন।

৭। **কবলুতি** (লিপি-চিত্র)। বৈশাখ ১৩৩৫ (১-৬-১৯২৮) পৃ. ১৮২।

স্থচী : কবলুতি, দিল্লীর লাড্ডু, পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ, দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি, আমাদের সন্ডে সভা (২), পেন্সনের পর, পূজার প্রসাদ, স্মরণে, ছাতু।

৮। **কোষ্ঠীর ফলাফল** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৬ (১৩-৯-১৯২৯)। পৃ. ৫০৮।

ইহা প্রথমে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়। ১৩৩০, মাঘ-সংখ্যায় সুরু হইয়া শেষ হয় ১৩৩৫, শ্রাবণ-সংখ্যায়।

৯। **পাথেয়** (গল্পসমষ্টি)। [কার্তিক] ১৩৩৭ সাল (ইং ১৯৩০)। পৃ. ১৮৫।

সূচী : দূরের আলো, ধম্মা, হারু, অন্নপূর্ণা, দুর্ভিক্ষের দান।

১০। **ভাদুড়ী-মশাই** (উপন্যাস)। দেবী-পক্ষ ১৩৩৮ (১৫-১০-১৯৩১)। পৃ. ৩২৯।

ইহা প্রথমে 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ; সুরু হয় ১৩৩২, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়, শেষ হয় ১৩৩৭, পৌষ-সংখ্যায়।

১১। **দুঃখের দেওয়ালী** (গল্পসমষ্টি)। শ্রাবণ ১৩৩৯ (২৩-৮-১৯৩২)। পৃ. ২০৩।

সূচী : মূল্যদান, নন্দোৎসব, বিচিত্রা, লক্ষীছাড়া, ব্যথার-ব্যথী, কালী ঘরামী, রেল্-দুর্ঘটনা, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, জাগৃহি, সব্জি-ফল, নিষ্কৃতি, শান্তিজল।

১২। **উড়ো-খৈ** (রহস্য কবিতা)। জন্মাষ্টমী ১৩৪১ (১৩-৯-১৯৩৪)। পৃ. ৬৩।

১৩। **আই হ্যাজ্** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৪২ (১৪-৯-১৯৩৫)। পৃ. ৩১১।

ইহা প্রথমে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ; সুরু হয়—১৩৩৬, কার্তিক-সংখ্যায়, শেষ হয়—১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়।

১৪। **পাওনা** (উপন্যাস)। মে, ১৯৩৬ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)। পৃ. ২৬৬।

ইহা প্রথমে 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয়।

১৫। **মা ফলেষু** (গল্পসমষ্টি)। আশ্বিন ১৩৪৩ (২-১১-১৯৩৬)। পৃ. ১৮৪।

সূচী : মা ফলেষু, দাদার দুরভিসন্ধি, দান-পত্র, নামরূপ, ভাগ্যই মূল, প্রবন্ধ-বিপত্তি, অদ্বিতীয়ের ফ্যাঁসাদ, রকম ফের, মধুরেণ।

১৬। **সন্ধ্যাশঙ্খ** (গল্পসমষ্টি)। আশ্বিন ১৩৪৭ (২৬-১১-১৯৪০)। পৃ. ১৬৮।

সূচী: ১। দেবা ন জানন্তি—(ক) সুরমার দন্তশূল, (খ) সজ্জন সঙ্গ, (গ) রিলেটিভ্, (ঘ) শান্তিপর্ব্ব; ২। ভোলানাথের উইল; ৩। মায়ের অনুগ্রহ; ৪। দাদার শ্বশুরবাড়ী; ৫। স্নেহের চাঁদ; ৬। চাটুয্যে সংবাদ; ৭। কালাচাঁদের চতুবর্গ; ৮। দেবদাসের দুর্গোৎসব। শেষোক্ত গল্পটি 'কবলুতি' পুস্তকে "পূজার প্রসাদ" নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৭। **নমস্কারী** (গল্পসমষ্টি)। ব্রতপক্ষ ১৩৫১ (৪-৯-১৯৪৪)। পৃ. ১১৪।

সূচী: মাথুর, অপরূপ কথা, নিতাই লাহিড়ী, বেয়ান বিভীষিকা, লুপ্তোদ্ধার, খুড়োর পরলোক-দর্শন, বিদ্যুৎবরণ, না-মঞ্জুর গল্প।

১৮। **স্মৃতি-কথা**। কার্তিক ১৩৫২ (ইং ১৯৪৫)। পৃ. ১৪৮।

সূচী: মীরাটে, জব্বলপুর প্রবাসে, দেবতা বদল, নগদ বিদায়, শিল্পীর বেদনা, লছমন ঠাকুর, পাঁচালী, চীনের নিদ্রাভঙ্গ, চীনের স্মৃতি।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—কেদারনাথের কোন কোন রচনা এখনও 'সংসারদর্পণ,' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "মোহ-মুক্তি" নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহা ১৩৩৬ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। "হিসেব-নিকেশ" নামে একটি কথাচিত্র ১৩৫২-৫৪ সালের 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল; ইহার শেষ দু-একটি অধ্যায় তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সাহিত্য-সেবার পুরস্কার

সাহিত্য-সেবা দ্বারা কেদারনাথ দেশবাসীর নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি:—

ইং ১৯২৭, ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মীরাট-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

১৯২৯, ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

ইং ১৯৩৩: কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী-সুবর্ণপদক প্রাপ্তি।

১৯৩৩, ডিসেম্বর: গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১১শ অধিবেশনে কেদারনাথের জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার উক্তি উদ্ধারযোগ্য:—

"গোরখপুর-যাত্রার পথে কাশীতে 'অভিনন্দনে'র আভাস পাই। চিরদিন চাকরি করেছি,—সার্টিফিকেটই বুঝি। আমার, ভবিষ্যৎ না থাকলেও, জন্মান্তর তো আছে। সম্মেলনের ও স্বতন্ত্রভাবে মহিলা-সম্মেলনের পক্ষ হইতে আমার কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর হস্ত হইতে কৃতজ্ঞ অন্তরে দুইখানিই গ্রহণ করি। তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসাপূত পত্রদ্বয় যে আমাকে কতটা ও কি দিলে এবং কতটুকু উপলক্ষ্য ক'রে, সেটা আমার দেবতাই জানেন।—এদের পশ্চাতে যখন কতকগুলি শাল-ঢাকা রূপোর দান-সামগ্রী উপস্থিত হ'ল, তখন অবাক্ হয়ে ভাবলুম—'এত বড় ভুলও করে! দু-দিন সবুর সইল না?—সাহিত্যিকের ঘটার ষোড়শও হ'ত, শোভনও হ'ত, নতুন কিছুও হ'ত।'"

ইং ১৯৩৪ ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

১৯৪১ ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কাশী-অধিবেশনে মূল সভাপতি। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্মেলনে পঠিত হয়।

ইং ১৯৪৮: ১৩৫৪ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পূর্ণিয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাহার কয়েক পংক্তি এইরূপ—

"হে দরদী রসস্রষ্টা!...বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষকে আপন হৃদয়ের সমস্ত মধুর রস উজাড় করিয়া দিয়া অপমান ও বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ। হাসির আবরণ দিয়া বেদনার অশ্রুজলে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জনকে নিষিক্ত করিয়া তুমি মানব-জীবনের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছ, তোমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় "অশরীরী মায়ার ধাত্রী মায়ের জাতিরা" কৃতার্থ হইয়াছেন। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কেরাণী-নামে কলঙ্কিত বাঙালী-জীবনের সকল গৌরব, সকল গ্লানি, অপরিসীম ধৈর্য্য ও অকথিত লজ্জা-অপমানকে শুধু তুমি বাণীরূপ দাও নাই, তাহাদের প্রাণে আশা ও ভরসার সঞ্চার করিয়াছ। তোমার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তাহারা চিরকালের আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি তাহাদের অন্তরে প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছ।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও আলো

আঁধারের রুদ্ধ দ্বারে
ভাবি বারে বারে
তমোময় দেউলে আমার
জ্বলিবে না দীপ ?
একটি প্রদীপ
দেখি ক্ষণে জ্ব'লে জ্ব'লে নিভিছে আবার।
ক্ষুব্ধ অন্ধকার
বেষ্টনে শ্বাপদসম ঢাকে দেবতায়।
হায় প্রিয়, হায়!
তোমার অমর আলো আঁধারে মিশায় ?
তমসার অন্তরালে সন্ধানী দিঠিরে
পাঠাও, পাঠাও ফিরে।
দেখ তমো চিরে
জ্বলিছে প্রেমের আলো।
নয়ন-আভায়
দেবমূর্তি জেনো প্রিয়, শুভ্র দীপ্ততায়
এখনো প্রকাশ পায়।
সংশয়ে তোমার
আমার দেউলে নামে দুরন্ত-আঁধার ;

ডুবে আলো যায়।
ডুবে যায় আলো।
তবু বন্ধু, আজও দ্বন্দ্ব!—বাসি নাই ভাল?
তবে কেন চৌর্যবৃত্তি স্পন্দিত তিমিরে?
কেন এতবার
হৃদয়ে করিতে চাই বড় আপনার?
ভুলে যাই নীতিশাস্ত্র, ভুলে যাই আমি
ক্ষুধিত রাহুর মত মম দিবাযামী
করিবে না ও-জীবন সর্বগ্রাস কভু।
কাছে আসি তবু,
ক'রে ফিরি অন্যায় যা জানি আমরণ।
তাই বুঝি দেবতার তমো-নিমজ্জন!

চিত্ত শতদল
পুলক-বেদনা স্পর্শে করে টলমল।
পঙ্কজের জন্ম নিত্য পঙ্কের আড়ালে।
বাহুটি বাড়ালে
ডুবে যাবে সে কমল।
দূর হতে তাই
গন্ধ ল'য়ে তৃপ্ত থাকি—কাছে নাহি যাই।
সহস্র-বন্দিতা ব'লে জেনেছ আমায়;
আমি কারে করি নি বন্দনা।
যে জ্যোতির কণা
খুঁজেছি জীবন ভরি,
রেখেছে শর্বরী
অন্তরাল ক'রে মম দৃষ্টিপথ হতে।
হায় প্রিয়, হায়!
জান নাকি সেই জ্যোতি দেখেছি নয়নে
অন্ধকার পথে।

দেহের শঙ্কিত—অন্ধ শর্বরী মলিন,
তারি বুকে জ্বলে প্রেমে শিখা ক্ষয়হীন,
ক্ষণে ক্ষণে অমরত্ব নয়নে তোমার
আমার আঁধার রাতি করে তোলপাড়।
ও-নয়নে ম্লান জানি এ আলোক-রেখা,
তবু যেন অন্ধকারে পাই তার দেখা,
দ্বিধাহীন—স্বার্থশূন্য প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে।
সেই আলো জ্বালা থাক অন্ধকার মনে।

শ্রীমতী বাণী রায়

ডানা

১৭

জরুরি তার এসেছিল রত্নপ্রভার বাপের বাড়ি থেকে। পয়লা বৈশাখ সেখানে খুব উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে যেতে হবে। যেতেই যখন হচ্ছে, তখন বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্মগুলোও মিটিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন অমরবাবু। কিছুদিন আগেই এটা ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাখির ব্যাপারে সম্প্রতি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কথাটা মনে ছিল না। মনে পড়াতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যাপারগুলোর কি হবে ভেবে। এতগুলো পাখি ধরা হয়েছে, নানা গাছে পাখির বাসা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো আস্ত পাখি বম্বে পাঠানো হয়েছে ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে, পাখির ঘর তৈরি করবার জন্যে নানা রকম খাঁচা করতে দিয়েছেন, ইট পোড়ানো হচ্ছে, তিনি না থাকলে এসব দেখবে কে? মল্লিক পারবেন না। অথচ তাঁকে যেতেই হবে। এখানকার ব্যাপারের সমস্ত ভারটা ডানার উপরেই দিয়ে যেতে চান তিনি। কোন্ পাখিকে কি খেতে দিতে হবে, তার ফর্দ এবং বই ডানাকে তিনি দিয়েছেন। পাখির যে-সব বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ পাখি আসা সম্ভব তারই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এখন। হাতে বই ছিল একটা। হঠাৎ বললেন, দেখুন, ডিউয়ারের (Dewar) এ বইখানা আমি নিয়ে যাব। আপনি বরং নোটই ক'রে নিন।

ডানা কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে বসল।

পাখিরা সাধারণত কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা করে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ আছে এতে। লিখুন, বড় হেডিং দিন—বাড়ি। তারপর সাব-হেডিং—দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে। লিখুন—চড়াই, হুপো (মানে মোহনচূড়া), শালিক, কুটুরে-প্যাঁচা, কুটুরে-প্যাচা অবশ্য পুরোনো বাড়িই আশ্রয় করে বেশি, নীলকণ্ঠ, দোয়েল, খঞ্জন (মানে Pied Wagtail)—যেগুলো এ দেশে থাকে। তারপর সাব-হেডিং—পরলে বা কড়ি-বরগার ফাঁকে—কালিশ্যামা, পায়রা, ঘুঘুও অনেক সময়, শালিক। আবার সাব-হেডিং—উঁচু ছাদ (যেমন চার্চের ছাদ)—শকুনি, ইনি বলছেন ছাদের উপর টিট্টিভও নাকি কখনও কখনও বাসা বাঁধে, আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নদীর ধারের বাড়িটায় লক্ষ্য রাখবেন একটু। তারপর সাব-হেডিং দিন—বাইরের দিকের দেওয়ালে, পরলের কাছে—তাল-চোঁচ, মানে—Indian Swift, সোয়ালো, ক্র্যাগ মার্টিন।

সোয়ালো কোন্‌গুলো বলুন তো, দেখেছি কি? ক্র্যাগ মার্টিন কি এদেশী পাখি?

সোয়ালো আপনাকে দেখিয়েছি। ল্যাজে সরু তারের মত—Wire-tailed নাম সেইজন্যে। জগদানন্দবাবু ওর বাংলা নাম দিয়েছেন 'নকুটি'। ক্র্যাগ মার্টিনের পুরো নাম হচ্ছে ডাস্কি ক্র্যাগ মার্টিন (Dusky Crag Martin), আমিও খুব বেশি দেখি নি এ অঞ্চলে। তারপর লিখুন—কড়ি বা বরগা থেকে, কিংবা কোন তার থেকে যেসব পাখি বাসা ঝুলিয়ে দেয়—টুনটুনি, বাবুই। বারান্দায় টবের গাছে যারা বাসা বাঁধে—দর্জিপাখি, বুলবুল। বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ হয়ে গেল। এইবার বাইরে যাওয়া যাক। নদীর তীরে যারা গর্ত ক'রে বাসা বাঁধে—গাংশালিক, বাঁশপাতি (গ্রীন ব্লুটেল্‌ড্‌ও), মাছরাঙা (কমন পায়েড, হোয়াইট-ব্রেস্টেড)। গাছে যারা গর্ত ক'রে বাসা বানায়—বসন্তবউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা (গোল্ডেন ব্যাক্‌ড—সেদিন যেটা দেখলাম, আর পায়েড, মারহাট্টা)। এরা গাছের গুঁড়িতে বা ডালে নিজেরাই গর্ত বানায়। আর কতকগুলো পাখি

থাকে, তারা গাছের গুঁড়িতে যেসব ফাটল বা গর্ত থাকে, তাতে বাসা বানায়—যেমন পাওয়াই (দু রকমই—গ্রে-হেডেড, ব্ল্যাক-হেডেড), এরা শালিক জাতীয়, সাধারণ শালিকও এসব জায়গায় বাসা বানায়, চড়াই, কালিশ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হুপো, প্যাঁচা, টিল, মানে ছোট ছোট হাঁস। হয়েছে ?

ডানা তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছিল, চোখ তুলে একটু হেসে বললে, টিল বললেন ?

হ্যাঁ, টিল। কুম্‌ব্ ডাকও লিখুন। কুম্‌ব্ ডাক বুঝলেন তো ? নাক্‌টা যাকে বলে। এইবার সাব-হেডিং হবে—ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের নীচের দিকে।

ডানা লেখা শেষ ক'রে বললে, হয়েছে, এইবার বলুন।

বাধা পড়ল। রত্নপ্রভা এসে ঢুকলেন। চকিতে বৈজ্ঞানিকের এবং ডানার দিকে চেয়ে নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। মিনিট কয়েক আগে নবুর মার মুখে তিনি পল্লবিত কাহিনীটি শুনেছেন, ডানা নাকি বৈজ্ঞানিকের পিঠে উঠে নদীর ধারে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। কাহিনীটি সালঙ্কারে বিবৃত করার ফলে নবুর মায়ের চাকরিটি গেছে। রত্নপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে দূর ক'রে দিয়েছেন তাকে।

রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, ডানাও চলুক না আমাদের সঙ্গে। তোমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে।

অসম্ভব। এখানে তা হ'লে দেখা-শোনা করবে কে ? ওঁর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি এখানকার। অতগুলো পাখির বাসা টাঙানো হয়েছে, কোন্ পাখি কোথায় বাসা বাঁধে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো ?

একা একা ওঁর ভাল লাগবে কি ?

তা লাগবে।—ডানা হেসে বললে।

আনন্দবাবুও থাকবেন। তাঁর উপরও ভার দিয়ে যাব। নিন লিখুন। এইবার লিখুন—যেসব পাখি ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা গাছের নীচের দিকে বাসা বানায়।

রত্নপ্রভা উঠে গেলেন। তিনি যা জানতে এসেছিলেন, তা জেনে

গেলেন। নবুর মা ইঙ্গিতে যা প্রকাশ ক'রে গেল তা যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে ডানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক উল্লসিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর উপর ক্ষণিকের জন্যও সন্দেহ হয়েছিল ব'লে অনুতাপ হ'ল তাঁর। রাগও হ'ল। নবুর মাকে আবার ডাকতে পাঠালেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক আরম্ভ করলেন, ঝোপে-ঝাড়ে বা গাছের নীচের দিকে—সাব-হেডিং দিয়েছেন? এইবার লিখুন—ছাতারে, হোয়াইট আর সবজে মুনিয়া, বুলবুল, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, বাবুই, টুনটুনি। হ'ল? তারপর লিখুন—কুয়োপাখি, আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন বাদামী-কালো, ঘুঘু; আরও কয়েকটা নাম আছে, থাক্ সেগুলো। এইবার সাব-হেডিং দিন—যে সব পাখি গাছের উপরে মগডালের কাছাকাছি বাসা বাঁধে—সবরকম চিল, কাক, হাঁড়িচাঁচা, ফটিকজল, ফিঙে, শকুনি, সব রকম বাজ, হরিয়াল, বক, সারস, মুণ্ডক, পানকৌড়ি, গগনভেড় ইত্যাদি। আরও অনেক নাম আছে, সেসব এখানে দেখতে পাবেন না। তারপর সাব-হেডিং দিন—যারা ফসলের ক্ষেতে কিংবা নলখাগড়ার বনে কিংবা বড় বড় ঘাসের ঝোপে বাসা বানায়—হলদে-চোখ ছাতারে, বুলবুল, দর্জিপাখি, রেনওয়ার্বলার (হিন্দীতে যার নাম ফুৎকি), টুনটুনি, নীল বগলা, যার ইংরেজী নাম Purple Heron। এইবার লিখুন—উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বা ফাটলে যারা বাসা বানায়—চিল, শকুনি, বাজ, নীল পায়রা। এইবার লিখুন, ও, হয় নি বুঝি এখনও?

হয়েছে। বলুন।

লিখুন—মাটিতে যারা বাসা বানায়—কালিশ্যামা (কদাচিৎ), বগেরি, ভরতপাখির দল, নাইট্‌জার, ময়ূর, বনমুরগী, বটের, তিতির, সারস, হুকনা, বাটান, কাদাখোঁচা, টিট্টিভ, গাংচিল (হুইস্কার্ডগুলো নয় কিন্তু)। এইবার সাব-হেডিং দিন—ঝিলে বিলে যারা বাসা বানায়—জলমুরগী, কূট অর্থাৎ কারণ্ডব (এ দেশে যাদের বাবাজী বলে), জলপিপি, পানডুবি, অর্থাৎ Dabchick, Whiskered Tern, গুঁপো গাংচিল বললে কি খুব খারাপ শোনাবে?

ডানা লেখা শেষ ক'রে হেসে বললে, এর অনেক পাখি কিন্তু চিনি না।

সালিম আলি আর হুইসলার ছবি রেখে যাব। দেখে নেবেন। ছবি দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না।

কবি এসে হাজির হলেন।

আসুন, আসুন, আপনারই প্রতীক্ষা করছি। আমার অবর্তমানে আপনি আর ইনি আমার পাখিগুলোর তদারক করবেন। পাখিদের সম্বন্ধে যদি নতুন কিছু দেখেন, লিখে রাখবেন।

আমি লিখব কবিতায়, তা আপনার কাজে লাগবে না তো।

বেশ, আপনি কবিতাতেই লিখবেন। ইনি লিখবেন গদ্যে। দুটো মিলিয়ে দেখা যাবে, আমার সঙ্গে কোন্‌টা বেশি মেলে।

ডানার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কবি বললেন, আমার সঙ্গে কিছু মিলবে না। আপনি সেদিন প্যাঁচার জাতি বংশ নখ পালক নিয়ে অত বক্তৃতা করলেন, কিন্তু আমার কবিতায় যা ফুটল সে একেবারে অন্য জিনিস।

কবিতা লিখেছেন নাকি?

এনেওছি সঙ্গে।

পড়ুন।

কবি পকেট থেকে কবিতার খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর-বিলাস
মার্জারের শব্দহীন সুগোপন শিকারান্বেষণ
তীক্ষ্ণ তব নখ-চঞ্চু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাধা-বিদারণ
চীৎকার-ছুরিকাঘাতে নিশীথের স্তব্ধতা-বিনাশ
কর যবে হে পেচক,
শান্তরে অশান্ত কর, কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা আকাশ।

অতি স্বচ্ছ দিবালোকে শুনি গান অসংখ্য পক্ষীর
হিংস্র শ্বাপদেরা জানি অন্ধকারে করে সঞ্চরণ
উভয়ের প্রাণধর্ম করিয়াছ তুমি সংহরণ

অন্ধকার প্রাসাদের দ্বারপাল, হে গুরু-গম্ভীর,
শক্তিধর, হে পক্ষী-পাঠান,
হে অদ্ভুত, হে বলিষ্ঠ, হে বাহন জীবন-লক্ষ্মীর।

চমৎকার হয়েছে তো!—বৈজ্ঞানিক বললেন, প্যাঁচার চরিত্রটা বেশ ফুটেছে।

বেশ ফুটেছে?—ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কবি। ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল, তারপর বললে, সত্যিই বেশ হয়েছে।

কবিতার কথা কিন্তু চাপা প'ড়ে গেল পর-মুহূর্তেই।

বৈজ্ঞানিক কবিকে বললেন, কোন্ কোন্ পাখি কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা বানায়, তার মোটামুটি ফর্দ দিয়ে গেলাম একটা এঁর কাছে। লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের তৈরি বাসাগুলোতে কোনও পাখি আসে কি না!

বেশ।

পাখিদের খাবার যদি বাসার চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত, তা হ'লে খাবারের লোভে পাখিগুলো আসত অন্তত। তারপর বাসা পছন্দ হ'লে হয়তো থেকেও যেত। দাঁড়ান, পাখিদের খাবারেরও আইডিয়া একটা দিয়ে দিই আপনাদের।

বৈজ্ঞানিক উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বই খুঁজতে লাগলেন।

কবি ডানাকে বললেন, কি টুকছিলে এতক্ষণ? দেখি।

ডানা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল কবির।

এই সব রাবিশ লিখে যেতে হচ্ছে ওকে প্রত্যহ! ডানাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করাতে তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। এখন কষ্ট হতে লাগল। খাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ব'সে রইলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল, ছ্যাকড়া-গাড়িতে ঘোড়াই জোতা উচিত ছিল অমরবাবুর, ময়ূরকে এ কাজে লাগানোটা ঠিক হয় নি। আর কিছু নয়, অশোভন। ময়ূরের কথায় মনে পড়ল

ময়ূরবাহন কুমার কার্তিকেয়কে। তারপরই মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

তস্মাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্যবিভূতিভিঃ।

যিনি নিজের বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী দেববালাদের বেণী বিমোচন করতে পারেন, তিনিই ময়ূরবাহন হওয়ার উপযুক্ত।

একগাদা বই নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

এই বইগুলো আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। অনেক রকম খবর পাবেন এগুলোতে।

বইগুলো খুলে খুলে প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে শুরু করলেন। দিতে দিতে সক্ষোভে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, সত্যি, আমরা কিছুই করছি না, এরা কত রকম ভাবে পাখির বিষয়ে লিখেছেন দেখুন। ইনি কেবল পাখির ওড়া নিয়েই বই লিখেছেন একটা। ইনি লিখেছেন গান নিয়ে। পাখির বাসা নিয়ে, ডিম নিয়ে, দেশভ্রমণ নিয়ে, খাদ্য নিয়ে এঁদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই। রিপ্লে সাহেব হামিং বার্ড দেখবার জন্যে ডাচ নিউগিনি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। আমরা কি করলাম জীবনে?

আপনিও করুন না। বাধাটা কিসের?—হেসে বললেন কবি।

অত টাকা কোথায় মশাই? আমার যদি টাকা থাকত, আমিও নিউগিনি গিয়ে থেকে আসতাম কিছুদিন।

আপনার টাকা নেই? বলেন কি?

যা আছে, তা যথেষ্ট নয়। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিজের ছোটখাট একটা জাহাজ থাকা দরকার। আমি একা তো যেতে পারব না। রত্নাকে চাই। তা ছাড়া আরও লোকজন চাই। ভাল একজন ফোটোগ্রাফার চাই। দোভাষীও দরকার প্রতি পদে। খরচ অনেক।

কিন্তু আপনার তো আয়ও অনেক শুনেছি।

খরচ নেই? চারটে স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় কাছারি আছে, কর্মচারী আছে। আমার মায়ের নামে একটা

হাসপাতাল করিয়ে দিতে হবে, তাতেই দশ-বারো লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাবে। জগুচকের প্রজারা ধরেছে, তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে একটা লক্‌গেট ক'রে দিতে, প্রতি বছর বানে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ক'রে দিতেই হবে। পাখির পিছনে খুব বেশি টাকা খরচ করব কোথা থেকে? এখানে যা ফেঁদেছি, তাতেই লাখখানেক বেরিয়ে যাবে। এইটেই অপব্যয় মনে হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকের মুখে অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল একটা। তারপর সে ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

এই বইটাও আপনি পড়বেন আনন্দবাবু,—**Hunters and the Hunted,** বিশেষত পাখির অধ্যায়টা। আপনার কল্পনারও অনেক খোরাক আছে ওতে।

বেশ, রেখে যান।

ক্রমশ

"বনফুল"

অনাদ্যন্ত

ইতিহাস-মরুপথে নানা দলে এল যাত্রীদল,
অনেক শতাব্দীপুঞ্জে সুষুপ্ত তাদের সাদা হাড়,
পদচিহ্ন মুছে গেছে তৃষাতপ্ত হাওয়ার তাড়সে,
চারিদিকে চেয়ে আছে বাঁকা বাঁকা বালির পাহাড়।
দীর্ঘরেখ মরুপথে চলিয়াছে সার্থবাহশ্রেণী—
রুক্ষ আঁকাবাঁকা পথ, যেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মত,
আকাশ নিস্পৃহ নীল, ভূমি তাম্রফলক-কঠিন
দগ্ধদেহ শূন্যতায় যাত্রীদল মৃত্যুবাণাহত।
হঠাৎ আগ্রহে ঘন, কালো জল দিগন্ত-সীমায়
অনেক তরঙ্গ তপ্ত, সূর্যালোকে বুঝি ঝলসায়
যাত্রীদল, চল চল, মিলে গেছে পথের নিশানা
এবার নিশ্চিন্ত নীল, নদী ডাকে আশ্বাসের মত

তার পরে চেয়ে দেখি ক্রুদ্ধ কালো রাত্রি দেয় হানা
মহাশঙ্খে সে কি সুর, বাজে শুনি বিশুষ্ক হাওয়ায়।

২

পথের তো শেষ নেই—এ ভূমিতে প্রান্তর কেবলই
এ দিগন্ত শেষ হয়—আবার দিগন্ত জেগে ওঠে
সমুখে যেতেই হবে নিরুপায় জীবনের বলি
দুরাশা দুঃসহ দিন, তারই মাঝে সম্মুখেতে ছোটে।
কত পথ চেয়ে দেখি : উঠে ফের ডুবেছে ছায়ায়
পালল শিলার স্তরে কত পথ লুপ্ত-পরিচয়
বিষাক্ত ব্যঙ্গের মত মাঝে মাঝে মূর্তি জেগে ওঠে
বিদ্রূপের মত ব'লে মনে হয় অনন্ত সময়।
অতীতের মরুক্ষেত্রে, সময়ের ইঙ্গিত জটিল
দুরূহ দুর্বোধ আজও : অজানিত অক্ষর কালের
নিরুদ্দেশ শূন্যতায় নিত্য চলে সম্মুখে নিখিল
ঊষর বালিতে শুধু সংখ্যা বাড়ে নরকপালের।
অতীত নিস্পন্দ মূক, যে ভবিষ্যে পথের প্রসার
তাতে বাজে সেই সুর অন্তিমের অন্ধ হাহাকার।

৩

তবুও আহ্বান আসে মরুপথে উটের সওয়ার
যাত্রা করে নানা দিকে সাথে নেয় কত পণ্যভার
তবু চোখে স্বপ্ন নামে—মরুকুঞ্জ জেগে ওঠে মনে—
বাঁকানো খেজুর-ছায়া, তলে তার ঝিরিঝিরি জল,
ভিজে ভিজে বালি ঘাস, কাঁটাগাছ, এ-কোণে ও-কোণে
কোথাও নরম মাটি, ঈষৎ সবুজ সম্বল।
হঠাৎ তাই তো আসে, ঊর্ধ্বমুখী উদ্ধত প্রহর
সংবেগ সংঘাতে মন হঠাৎ করে যে থরথর—
সে কোন্ পথের প্রান্তে আমাদের ক্ষুধিত কবর
সে কথা এখন থাক্। মন বলে, কর যাত্রা কর—
অন্তিম থাকুক অন্তে, আদি সে তো নিত্যই আদিম

অস্তিত্ব চঞ্চল প্রাণ, কোনদিন শাস্তি মানে নাকো
থেমে তো থাকে নি কেউ ; জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি
তোমার বিভ্রান্ত প্রশ্ন অন্তরের রুদ্ধ তলে ঢাকো।

উপসংহৃতি

অর্থের তরে নিরর্থ হাহাকার
অনন্ত লোকে আত্মা অনুপলব্ধ
স্বাক্ষর থাক্ আমাদের যাত্রার
আদিতে অবাক অস্তিমে নিস্তব্ধ
এ-দিকে ও-দিকে থাকুক অন্ধকার
জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্বে দোলাই সার
লক্ষ্য না থাক্ গতি হোক বেগবান্
আমাদের এই বিচিত্র যাত্রার ॥

শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য

অন্যপূর্বা

বারো

দেবেশ সেদিন সুস্থতম মস্তিষ্কে একটা শুদ্ধতম পাগলামি করল। কি যেন একটা অজুহাতে সেদিন সে তার বেতার-বক্তৃতা স্টুডিওতে রেকর্ড ক'রে এল। দেবেশ জানত যে, ইলেট্রিক্যাল রেকর্ডিংয়ে তার গলার স্বরে কি রকম যেন একটা ধাতব কুশ্রীতা—মেটালিক্ নয়েজ্—আসে। তবু সে রেকর্ড করল। মনে মনে বলল, আজ আমার সমালোচনায় যা বলছি, তা পুরোপুরি আমার মত নয়, অনেকটা মালতীর; তেমনই আজ আমার গলাও যদি পুরোপুরি ঠিক আমার গলার মত না শোনায়, তা হ'লে ক্ষতি নেই। ক্ষতি না হয় নেই, কিন্তু লাভ? মা ফলেষু কদাচন। জলে রুটি তো ভাসিয়ে দেওয়া যাক, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বাইবেল দুই-ই মিথ্যে না হ'লে কিছু না কিছু ফিরবেই।

কথা ছিল নটায় যাওয়ার। কিন্তু তার অনেক আগে, আটটাও বাজে নি তখন, দেবেশ গিয়ে হাজির হ'ল মালতীর দরজায়। গেট

খুলল সে নিজেই, পরের দরজাটা খুলল চাকর। চাকরের কাছে পরিচয়প্রদানের পূর্বেই মালতী নিজে এসে উপস্থিত হ'ল। দেবেশকে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অজ্ঞাতে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আরে, আপনি?—সতর্ক হয়ে কথা বললে 'আরে' কথাটার দেখা মিলত না মালতীর উক্তিতে।

বসবার ঘরটা পেরিয়ে তারপরে মালতীর শোবার ঘর। সেখানেই সে ব'সে ছিল রেডিও খুলে। সাধারণত রেডিওটা খোলা থাকে পরোক্ষ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। আলনা-গোছানো বা খবরের কাগজ পড়ার আবহসঙ্গীত যেন। রেডিও শোনার জন্যেই রেডিও খোলা নয়। উঠে বন্ধ করবার উৎসাহ নেই ব'লে খোলা আছে, নয়তো গোলমালটা খুব ভয়ানকভাবে কানে বাজছে না ব'লেই বাজতে দেওয়া হচ্ছে। আজ কিন্তু মোটেই তা নয়। আজ শোনবার জন্যেই মালতী রেডিও খুলে একেবারে সামনে এসে বসেছে। দূরে ভৃত্যে এবং পাচকে কি নিয়ে যেন একটু বচসা হয়েছিল। মালতী উঠে গিয়ে অধৈর্যের সঙ্গে ধমক দিয়ে ব'লে এসেছে, তোমরা আস্তে কথা বলতে পার না? আমি আর যেন গোলমাল না শুনি। ঘরে একটু শান্তিতে বসবার জো নেই তোমাদের জন্যে!

কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট ব্রিটিশ গাড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড একটা মার্কিন হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল। মালতীর ইচ্ছা হয়েছিল উঠে গিয়ে গাড়ির মালিককে অশোভন অসঙ্গতিটার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে। ধৈর্য-ধারণ ক'রে মালতী ব'সে রইল রেডিওর পাশে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি এই প্রতীক্ষা। আশা-আশঙ্কার দুই অনিশ্চিত অন্তিমের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়া নয়, নিশ্চিত সৌভাগ্যের জন্যে অপেক্ষা করা; অবারিত হৃদয়ের দ্বারে সমগ্র সত্তার প্রদীপ প্রজ্বলিত ক'রে আকাঙ্ক্ষিত অতিথির পথ চেয়ে ব'সে থাকা; নিজেকে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকে শুধুমাত্র গ্রহীতার আগমনের জন্যে পরিপক্ক ফলের ন্যায় বৃন্তচ্যুত হবার প্রতীক্ষা করা—এমন অনুভূতি দ্বিতীয় আর নেই জগতে। এ চাওয়া বুঝি পাওয়ার চেয়েও সহস্রগুণে মধুর!

আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি।

আসলে কিছুই নয়, শব্দ মাত্র। অন্তত তাই ছিল দিন কয়েক আগেও। কিন্তু আজ তা নয়। আজ সে যখন দেবেশের বক্তৃতা শুনবে তখন তা শুধু কান দিয়ে শোনা হবে না। সে মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, দেবেশ এখন ভাবাতিশয্যে তার দক্ষিণ হস্তকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে অদৃশ্য শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে; তারপর কোনও সময় মালতী স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, দেবেশ এখন তার গলার টাইটাকে নিয়ে খেলা করছে; কখনও বা স্পষ্ট দেখবে যে, যদিও দেবেশ লেখা পাতা থেকে পড়ছে, তবু এমন একটা ইতস্তত করবার ভান করছে, যেন এখনই ভেবে আবিষ্কার করেছে কোন একটা নতুন এপিগ্রাম বা পান্। সামান্যতম হস্তসঞ্চালন, মৃদুতম ভ্রূকুঞ্চন, আজ তার সব কিছু মালতীর কাছে দিবালোকের মত রহস্যমুক্ত হয়ে প্রতিভাত হবে। মালতী যে অপেক্ষা করতে পারছিল না, সে তো স্বাভাবিক।

আবার তার একটু পরেই—এদিকে আটটা বাজতে আর মিনিট কয়েক মাত্র বাকি—দরজার কড়া ন'ড়ে উঠল। মালতীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হতে তখন বাকি অল্পই।

তারপরেই সশরীরে দেবেশের প্রবেশ।

দেবেশের এ... অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মালতীর আপত্তি ছিল। যদি কেউ দেখে ফেলে? যদি এখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী এসে পড়েন? তখন কি বলবে মালতী? কি ক'রে ব্যাখ্যা করবে তার ঘরে দেবেশের উপস্থিতি? শাশুড়ী 'বেতার-জগৎ' দেখেন না, কিন্তু নাম শোনা মাত্রই নিশ্চয়ই তিনি এমন কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে বসবেন, যার গ্রহণযোগ্য মিথ্যা উত্তর দেবেশের সামনে দিলে দেবেশ নিজেই অবাক হবে। হয়তো বা প্রতিবাদই ক'রে বসবে। শাশুড়ীর সন্দেহ-ভঞ্জন হবে, এদিকে দেবেশেরও প্রতিবাদের কারণ হবে না, এমন কি বলা যেতে পারে? মালতীর উদ্ভাবনী শক্তি হার মানল। দেবেশকে সে তার শোবার ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে রেডিও আছে, সে ঘরে নিয়ে যেতে সাহস করল না। বাইরের বসবার ঘরে বসিয়ে জেরা ক'রে জানতে চেষ্টা করল, দেবেশ কেন তার বেতার-বক্তৃতা ফেলে আগে চ'লে এসেছে? সে কি মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে? সেটা

এমনই আশাতীত সম্ভাবনা যে, সেটাকে সম্ভব ব'লে ভাবতেও মালতীর ভয় হ'ল। তবে?

যে অবাধ্য প্রশ্নটা কেবলই মনের মধ্যে বিনানুমতিতে অপ্রতিহতবেগে আনাগোনা করছিল, তাকে লুকোবার জন্যেই যেন মালতী বলল, আচ্ছা, কালকের ছবিটায় ওই অনাথ ছেলেরা গোড়ার দিকের ওই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের পরে হঠাৎ আবার যখন বেকার হ'ল, তখন এমন বিপথে গেল কেন? তা হ'লে আর পরিবর্তন হ'ল কি? তা হ'লে কি এই বুঝতে হবে না যে, ওদের পক্ষে পরনির্বাচিত কাজ ছিল অন্যান্য নেশারই মত আর একটা নেশা মাত্র, যার কমতি হওয়া মাত্র অন্তর্নিহিত দুর্বলতার অজগরগুলি অদম্য সমারোহে বেরিয়ে এল? আমি অবিশ্যি সবটা বুঝি নি, তবে—

দেবেশ মালতীকে বাধা দিয়ে সোল্লাসে বলল, একেবারে ঠিক বুঝেছেন। ওরা ধর্মকে বলে—আফিম। আমি ওদের এই নব্য সংস্কারপন্থাকে বলি—কোকেন বা মরফিয়া। আরও সঠিক তুলনা হবে—উত্তেজক কোন ভয়ঙ্কর নেশা। আফিম যে খায়, সে তো ঘুমোয়, কাউকে মারতে যায় না, তাতে যা ক্ষতি সে তার একান্তই নিজের। এদিকে ওদের নেশার ফল একেবারে বিপরীত। এতে যে লোক অলস হয় না, হয় অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং তার ফল মারাত্মক। এই কথাটাই আমার আলোচনায়—

দেবেশ মালতীকে বাধা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছিল। তার বাধা পড়ল সরোজের আগমনে।

সরোজ ভেবেছিল, আসবে না। কিছুতেই না। কাল যা হয়ে গেছে, তার পরে আবার মালতীর কাছে যাওয়া, কুকুরের মত, না, কোনও মতেই না।

আপিস থেকে ফিরে বাড়ি যায় নি সরোজ। আসা-না-আসার দুরূহ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে মালতীর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পথে পায়চারি করতে করতে। সমাধানটা আত্মসম্মানসম্মত হওয়া চাই—এই ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল, সম্মানের প্রশ্নটাই এ প্রসঙ্গে অবান্তর। প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা আরও শিথিল হ'ল যখন মনে

এল যে, মালতী তাকে আজ যেতে বলেছিল। মালতী না হয় তাকে ভালবাসে না, তাই ব'লে সৌজন্যের কথাও বিস্মৃত হতে হবে কি? আসবে না, এই কথাটা যে একবারও সে কল্পনা করতে পেরেছিল এ জন্যে সরোজ নিজেকে তিরস্কার করল এবং পরক্ষণেই দেখল, কখন সে দ্রুতপদে পদচালনা ক'রে একেবারে মালতীর বাড়ির সিঁড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ঘরে প্রবেশ ক'রেই যখন দেখল যে, দেবেশ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবেশ—ঈষদুত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলছে এবং মালতী তাই অবিভক্ত একাগ্রতার সঙ্গে শ্রবণ করছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সরোজ তখন আবার নিজেকে ধিক্কার দিল তার নির্লজ্জ নিবুর্দ্ধিতার জন্যে। সম্মানের প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'ল না। সরোজের এমনিতেই নিমজ্জমান অন্তর এখন আত্মগ্লানির পঙ্কে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হ'ল।

আগন্তুকের প্রবেশেই দেবেশ চুপ করেছিল। মালতীর পিঠ ছিল দরজার দিকে, তাই সে দেখতে পায় নি। দেবেশের আকস্মিক নৈঃশব্দ্যে পিছনে তাকিয়ে দেখল সরোজকে। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, এস সরোজ।

সরোজ এগিয়ে এল। মালতী অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সরোজকে কেউই ভয় পায় না, মালতী তো দূরের কথা। তা নইলে মালতী ভীত হ'ত; শুধু অপ্রস্তুত নয়। ধরা পড়েছে যেন, কিন্তু তার চাইতেও আশু সমস্যা হচ্ছে, মালতী ওদের পরিচয় করিয়ে দেবে কি ক'রে? সরোজ তার কে? দেওর?—সে তো পুরো সত্য নয়। আর দেবেশেরই বা কি পরিচয় দেবে মালতী? বন্ধু?—এটা মালতীর নিজেরই কাছে চরম মিথ্যা ব'লে মনে হ'ল।

সম্বন্ধের সমস্যা এড়িয়ে মালতী কোনক্রমে শুধু মাত্র দুজনের নাম ঘোষণা ক'রে তখনকার মত কর্তব্য সমাধা ক'রে পলায়নের উদ্দেশ্যে যোগ করল, সরোজ, তুমি ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও, আমি এখনই চা নিয়ে আসছি তোমাদের জন্যে।

যে প্রশ্নটা মালতী কিছুতেই জিজ্ঞাসা ক'রে উঠতে পারছিল না,

সরোজ তাই দিয়েই আলাপ শুরু করল ভয়ে-ভয়ে, আজ রাত্তিরে আটটায়ই না আপনার— ?

দেবেশের উত্তরটা শুনতে মালতী একটু দাঁড়াল। দেবেশ মালতীকে একটা বিস্ময় উপহার দিতে চেয়েছিল। আগে থেকে তার একটুও আভাস দেবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু ছবির আলোচনার কথা বলতে গিয়ে মুহূর্তকাল পূর্বেই সে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে, বক্তৃতা সে বাদ দিয়ে মালতীর এখানে আসে নি। এখন সরোজের প্রশ্ন শুনেই বলল, মালতীর দিকে তাকিয়ে, তা, আটটা বাজতে তো আর বেশি বাকি নেই। অতএব—। কথাটা শেষ না ক'রে দেবেশ যখন একটু মাত্র হাসতে শুরু করেছে, অমনই বাইরের ঘরের বৃহৎ প্রাচীন দেয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজতে লাগল, আর মালতী অমনই ছুটে রেডিওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেতে যেতে সরোজের উদ্দেশ্যে বলল, এস আমার ঘরে।

আমন্ত্রণটা যে মুখ্যত দেবেশেরই উদ্দেশ্যে, সরোজের সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। বেচারী মুষড়ে পড়ল। যে হীনতা-ভাবের অভিশাপ থেকে মালতীই একদিন তাকে মুক্তি দিয়েছিল, আজ তাই আবার তাকে আচ্ছন্ন করল। পার্শ্ববর্তী দেবেশের দিকে তাকিয়ে সরোজের নিজেকে বড় নগণ্য ব'লে মনে হ'ল, বড় ক্ষুদ্র, বড় অকিঞ্চিৎকর! নিরুৎসাহ পদক্ষেপে সরোজ দেবেশকে নিয়ে মালতীর ঘরে প্রবেশ করতেই রেডিওতে দেবেশের চিত্র-সমালোচনা শুরু হ'ল।

সরোজ সবিস্ময়ে দেবেশের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করল, দেবেশ দৃষ্টি এড়াল। অদ্ভুত শোনাচ্ছিল নিজের গলাটাকে! যেন নিজের নয় ওটা! মালতীর মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাতে মন চাইল না, নয়তো দেবেশ এখনই উঠে বন্ধ ক'রে দিত রেডিওটা। গলাটা শুনতে মন্দ নয়, রেকর্ডিংয়েও নয়, কিন্তু কি যেন নেই যা সজীবতার পরিচায়ক। প্রাণ যা আছে সে যেন গ্যালভ্যানির ম্যাজিক; এ গলায় মৃত ভেকের দেহের লম্ফন আছে, নেই যেন জীবন্ত হৃদয়ের ছন্দিত কম্পন। দেবেশ অসহ্য সঙ্কোচে মুখ ঢাকল সামনের হাত-পাখাটা তুলে নিয়ে।

স্বরকে না হয় বিকৃত করেছে যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু ভাষা? দেবেশ নিতান্ত অস্বস্তির সঙ্গে বক্তৃতাটা শুনছিল আর কেবলই মনে হচ্ছিল, এখানে এ শব্দটা অপ্রয়োজনীয়, ওখানে ও শব্দটা অপপ্রযুক্ত। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেকার লেখা বক্তৃতাটা। কি ভয়ানক মূর্খ ছিল দেবেশ সাত ঘণ্টা আগেও! দেবেশের কান্না পেল নিজের ইদানীন্তন মূর্খতায়, আক্ষেপের সীমা রইল না মালতী কি ভাবছে সেই আশঙ্কায়।

বক্তৃতাটা শেষ হতেই দেবেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সসঙ্কোচে মালতীর দিকে তাকাল। সরোজও সেদিকে সকরুণ দৃষ্টি যোগ করল। আর মালতী? মালতী নিষ্পলক নেত্রে দেবেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে দৃষ্টিতে আনন্দ ছিল, সে আনন্দ শুদ্ধমাত্র শ্রবণের নয়। সে দৃষ্টিতে প্রশংসা ছিল, সে প্রশংসা প্রায় স্তুতি। সে দৃষ্টিতে পূজা ছিল, সে পূজার বলি কোনও নিরপরাধ প্রাণীরূপী প্রতীক নয়, পূজারিণী নিজে। স্তব্ধা মালতীর মুখরা দৃষ্টিতে সেই পরম মুহূর্তে যে মধুরা বাণী মূর্ত হ'ল, তার অশ্রুত গুঞ্জনে মালতীর ক্ষুদ্র ঘরখানি কানায় কানায় ভ'রে উঠল। তেমনই ভ'রে উঠল দেবেশের হৃদয়।

শুধু অসীম শূন্যতার মাঝে বিদায় নিল অবহেলিত সরোজ। পরাজয়ের গ্লানি গোপন করবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে যাবার আগে দেবেশকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল, সত্যি, আপনি অদ্ভুত ভাল বলেন! অভিনন্দনটা অনান্তরিক ছিল না একটুও, তবু সরোজের স্বরে যা শ্লেষ ছিল সে শুধু অশ্রুরোধের করুণ প্রয়াসের অনিচ্ছাদত্ত ইঙ্গিত। দেবেশ আর সকলেরই মত প্রশংসাপ্রিয়, কিন্তু একেবারে সামনে কেউ প্রশংসা করলে বড় অপ্রস্তুত বোধ করে। এখন একজন অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত ব্যক্তির এমন অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক প্রশংসাজ্ঞাপনে বড়ই বিব্রত বোধ করল এবং সময়োপযোগী কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে অসহায়ভাবে মালতীর দিকে তাকাল।

এই অসহায়তাকে সরোজ ভুল বুঝল অবহেলা ব'লে। কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত, একবার মালতীর দিকে আর একবার দেবেশের দিকে তাকিয়ে সরোজ প্রায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, আচ্ছা, চলি মিস্টার মুখার্জি। দেবেশ যখন হাত তুলে অভিবাদন জানাতে যাবে, তখন

সরোজ মালতীর দিকে তাকিয়ে আরও যেন অদ্ভুত একটা স্বরে ব'লে উঠল, দিদি, চলি। গুড বাই।

কেউ কিছু বলতে পারবার আগেই সরোজ বিদ্যুৎবেগে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেবেশ কিছু বুঝতে পারল না, চুপ ক'রে রইল।

মালতীর লজ্জার সীমা ছিল না। এমন একটা বিশ্রী দৃশ্য করবে সরোজ, এবং তা দেবেশের উপস্থিতিতে, মালতী কল্পনাও করে নি এমন অবস্থার কথা। ছি ছি, দেবেশ কি না যেন ভাবছে সরোজের সম্বন্ধে এবং মালতীর সম্বন্ধে! তার চেয়েও মারাত্মক, মিলিতভাবে দুজনের সম্বন্ধে!

কিছুক্ষণ দুজনেই নিতান্ত অস্বস্তির সঙ্গে নীরব থাকবার পরে মালতী অনিশ্চিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন চুপ ক'রে?

দেবেশ আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, কই, কিছু না তো!

মালতী স্বগতোক্তির মত বলল, আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু একটু আগে যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটা হয়ে গেল, এতে আমার উপর দয়া ক'রে অপরাধ নেবেন না যেন। আমি জানতাম না যে—

কিন্তু এইটি স্পষ্ট ক'রে জানুন যে, আমি একটুও অপরাধ নিই নি।—দেবেশ বলল মালতীকে বাধা দিয়ে। তারপরে যোগ করল, একটু রহস্যময় ব'লে মনে হয়েছে শুধু। আর কিছু নয়। একটু যেন নাটকীয়।

মালতী তবু নিশ্চিন্ত বোধ করল না। একবার মনে হ'ল, দেবেশকে এখন যেতে দিলেই ভাল। পরক্ষণে মনে হ'ল, না, এতগুলি ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ওকে যেতে দেবে না। বেরুবার মত পোশাক মালতীর পরাই ছিল। শুধু চটিটা ছেড়ে জুতোটা প'রে নিয়ে বলল, চলুন, বেরুনো যাক।

দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, নাটকীয়, না? কিন্তু কি নাটক? প্রহসন, না, ট্র্যাজেডি?

দেবেশ জানত না। উত্তর এড়িয়ে কোন এক ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলল, দুটোয় মূলগত প্রভেদ নাকি সামান্যই। ঘটনা

এক এবং অভিন্ন—নিজের জীবনে ঘটলে সে হয় ট্র্যাজেডি আর অপরের জীবনে হ'লে তাকে বলি প্রহসন।

কথাটা মালতীর মনে ধরল। বলল, কিন্তু হাসবার আগে বিষ্কম্ভকটা শুনবেন কি কোথাও ব'সে একটু ধৈর্য ধ'রে?

দেবেশ সাগ্রহে ও সানন্দে মালতীর অনুসরণ ক'রে পথে বেরুল।

ক্রমশ

"রঞ্জন"

উষা-স্তোত্র

আজি আমি হেরিতেছি নয়নের আগে,
প্রান্তরের প্রান্তখানি উদ্ভাসিত করি
জ্যোতিস্নাতা উষারাণী ধীরে ধীরে জাগে—
আলোকের বর্ণোচ্ছ্বাসে, আহা মরি মরি!
মানস-সঙ্গিনী ওগো বিভাবতী উষা,
শুচি-শুভ্র হাস্য ল'য়ে পূর্বাচল পারে—
ছড়াইয়া পথে পথে শ্রীঅঙ্গের ভূষা—
কোথা যাও একাকিনী দিবা-অভিসারে?

বারেক দাঁড়াও সখি,—ব'স ওইখানে,
কামনার বহ্নি জ্বালি হাতে হাত রাখি,
অন্তরের যত কথা কহি কানে কানে,
গুঞ্জরিছে মর্মমাঝে যাহা থাকি থাকি।
তমিস্রার গহনতা ঘুচাইয়া দাও,
কৈশোরের স্বপ্ন জাগে,—উদ্দাম উধাও।

*　*　*

অনন্ত তোমার দ্যুতি হে দেবি আমার,
আমারে প্রবুদ্ধ কর ঐশ্বর্যের দানে,
একাকার হয়ে যাক,—উদ্দেশে তোমার
স্তব করি নিত্য নব জাগরণী গানে।
এক আত্মা, এক মন, এক প্রাণ হয়ে

৩৭।-১৩।৫

আনন্দের সমুচ্ছ্বাসে দোঁহে ভেসে যাই—
দিক্-দিগন্তরে চলি তব বাণী ব'য়ে,
জীবনের যজ্ঞ-সত্রে যদি মেলে ঠাঁই।

একচক্র রথ ছুটে ওই হের দূরে—
সত্য-সন্ধী অশ্ব ধায়,—ভুবন-মোহিনী,
সুপ্তিমগ্ন মানবের চেতনার সুরে
বিহঙ্গের কলস্বরে জাগে সনাতনী।
দেখিতে দেখিতে, হায়, বেলা বেড়ে যায়,
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি কিসেরি মায়ায়!

* * *

একা আমি ব'সে আজি বাতায়ন 'পরে,
গ্রাম্য-বালকেরা খেলে স্থির নদীজলে—
চাষী বুনিতেছে ধান চর হতে চরে,
যাযাবর হাঁস উড়ে নীল নভতলে,—
বিস্তারিয়া দুই পক্ষ শূন্যে করি ভর,
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে কাকলি আলাপে—
সূর্যের কিরণধারে নাহিয়া ভাস্বর;
ও-পারের শ্যামঘন বনান্তর কাঁপে।

মধ্যাহ্নের খর তাপে যমুনিয়া-কূলে
চরিছে মহিষ আর অগণিত গাভী—
সবুজ শস্যের শিষ বাতাসেতে দুলে,—
অতীতের স্বপ্ন লাগে, কত কি যে ভাবি!
নীলিমার ছায়া চোখে,—সারা চরখানি
আমারে ভুলায়ে ল'য়ে করে টানাটানি।

* * *

অপরাহ্ণ-বেলাশেষ,—ওই পরপারে
মালদহী জেলে যেথা বাঁধিয়াছে ঘর,
ইচ্ছা করে বাঁধি বাসা ওরি এক ধারে
চরুয়ার মাঠে যাপি নিস্তব্ধ প্রহর।

চর-রাখালের সাথে হাতে লয়ে বাঁশী
সুন্দরের করি পূজা,—প্রকৃতির সনে
এক হয়ে মিশে যাই পুলকে সম্ভাষি,
কোলাহল নাই যেথা প্রশান্ত বিজনে।

মহাশূন্যে জ্যোতিপুঞ্জে পথ রচি ধাই,—
ক'য়ে যাই চুপে চুপে অকথিত বাণী
যদি কোন রহস্যের পরিচয় পাই,
ভুবনের দ্বারে তারে ধ'রে দিব আনি।
সেই দিন হবে মোর সার্থক জীবন
প্রতীক্ষিয়া আছি ব'সে সেই শুভক্ষণ।

* * *

তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁখি দুটি ঘুমে ঢুলে আসে,
কে বুঝিবে বক্ষে এই কত ব্যথা বাজে—
ব্যর্থ এ জীবন মম,—সসঙ্কোচে ত্রাসে
কাহার অস্তিত্ব খুঁজি চক্রবাল মাঝে!
বেদনা-পাণ্ডুর নভে কত তারা খসে—
দ্বাদশীর ক্ষীণ চাঁদ গভীর নিশীথে,
উদ্বোধিত ক'রে যায় কত ভাব-রসে,
দাবদগ্ধ এ হিয়ার তৃষ্ণা নিবারিতে।

শেষ হয়ে এল বুঝি আশ্বিনের আয়ু,
একখানি ক্ষুদ্র তরী যায় পাল ভরে,—
ঝিল্লী-মন্দ্রে ঝাউ-রন্ধ্রে পশে নাকো বায়ু
পুষ্পে পত্রে নীহারের আশীর্ব্বাদ ঝরে।
স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-খণ্ড মেঘ ভেসে ভেসে যায়—
কাঁদিতেছে প্রাণ আজি কারে ঘিরি হায়!

শ্রীশান্তি পাল

ভদ্রলোকের দুঃখ

ভদ্রলোকটির বড় দুঃখ—নাম আছে না বশ;
অমুকের নাম সবাই করে, সকলেই তাঁর বশ।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।"

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ

অপরাহ্নের গান

মনে হয় যেন ছুটি হয়ে গেছে, জীবনের পড়া শেষ।
নিজের মনকে নিংড়ে নিংড়ে অনেক পাংশুমনে
ইন্দ্রধনুর রঙ লাগিয়েছি আজ নেই তার লেশ—
মেঘের অঙ্গে সূর্য কেবল ক্ষণিক স্বপ্ন বোনে।

শরৎকালের বিত্তবিহীন মেঘেরা এসেছে ভেসে
হালকা হাওয়ায় পালকের মত,—আষাঢ়ের মেঘ নয়,
যারা একদিন ঢেকেছিল মোরে সুগভীর আশ্লেষে,
বিদ্যুৎহাস কখনো, কভুবা অভিমানে ছায়াময়।
গুরুজলভারে অলসগমন পুরনো মেঘের এরা
যেন প্রেতাত্মা, খোঁজে মহাকাশে মহাপরিনির্বাণ—
তাই তো আকাশে হাওয়ার খেয়ালে নিরুপায় হয়ে ফেরা,
দ্যুলোক দূরেই থাকে, পৃথিবীর বাড়ে শুধু ব্যবধান।
এমনি অনেক মোনালিসা-মুখে দেখেছি বুদ্ধহাসি,
রঙ মুছে-যাওয়া শুভ্রতা দিয়ে প্রজ্ঞাকরুণা আঁকা,—
জরামৃত্যুর ব্যাধির আধার এ পৃথিবী পচা বাসি,
মিথ্যা মায়ায় হৃদয় যা চায় সে শুধু স্বপ্ন ফাঁকা।

ভরা পৃথিবীকে ফাঁকা দেখে যারা প্রজ্ঞার অভিমানে,
জানে না শুভ্র সূর্যের তেজ ফুলের বর্ণে হাসে,

তারা বেঁচে থাক্ চিরজীবী হয়ে ইতিহাসে অভিধানে ;
অনন্তকাল রব না জানি তা ; যারা আছে মোর পাশে
আজ আর কাল, বিধাতার চেয়ে তারা মোরে ভালবাসে।

কেন তুমি শুধু স্বপ্নের মত এলে,
আমার জীবনে কি চিহ্ন রেখে গেলে ?
স্বপ্ন-জীবনে কোনদিন বুঝি রাখীবন্ধন হবে না,
মাটির স্পর্শে সূর্যের আলো ফুল হয়ে ফুটে রবে না ?

মরুর সূর্য বিদ্বেষে নিষ্ঠুর,
মেরুর সূর্য উদাসীনতায় দূর,
তবু পৃথিবীর সূর্যস্বপ্ন অরণ্যে ফুলে ফলে
সৌরভে রসে বর্ণে বর্ণে অনন্তকাল জ্বলে।

আমার স্বপ্ন মৃগতৃষ্ণার মায়া,
মেরু-সূর্যের হেলার হাসিতে উদাসীন আলো-ছায়া ;
জানি তুমি তবু কোন্ অরণ্যে ঝলকে ঝলকে ঝরি
সপ্ত-বর্ণ ভেঙে ভেঙে রাখো রঙের পাত্র ভরি।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বাস্তহারা

আলেক মোড়ল দাড়িতে মেহেদি-পাতার রস ঘষিতে ঘষিতে জিজ্ঞাসা করিল, বাচ্চু মিঞা, ওই পাড়ার কয় জন গেল ? আমাগোর পাড়ার তো জ্ঞাবেনবাবু, রাখাল মিত্তির, সুনীলবাবু, আগেই চইল্যা গেছে, আছে কেবল স্থান-বাড়ির মুরলীবাবু। আরে, সেই মজার কাণ্ডটাই জান না ? সাঁঝরাতে ওর গরুর পিঠে এমন কইষ্যা এক বাড়ি দিল পীরু ভাই যে, গরুডার চীৎকারের লগে লগে মুরলীবাবুও চেঁচাইয়া উঠল, ভাবল বুঝি ওর নিজের পিঠটাই ফাইট্যা গেল! শালাদের টাকা থাকলেই অইল ? কিচ্ছু না, সাহস একেবারেই নাই। দেখ না, আইজকাল কেমন কুত্তার মত ঘুরাঘুরি করে আমার বাড়ি আর বৈঠকখানার পাশ দিয়া ?

বাচ্চু মিঞা হুঁকার ছিদ্রটি হাতের তালু দিয়া মুছিয়া লইল। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি অতি-সূক্ষ্মভাবে-ছাঁটা গোঁফজোড়ার উপর দিয়া কয়েকবার বিপরীত দিকে টানিয়া লইল। ক্রমাগত কয়েকটি দীর্ঘ টানের পর ধোঁয়ার মেঘের ভিতর হইতে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কি বলিল, স্পষ্ট বোঝা গেল না। ধোঁয়া পাতলা হইবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, হঃ, মোড়ল সায়েবের যেমন কথা! নেজমুদ্দি কইছিল, মুরলীবাবুর ঘুরাঘুরির পিছনে উদ্দেশ্য আছে। ভারি চালাক, বুঝলা না মোড়ল? খোঁজ লওনের লাইগ্যা আসে, আমরা কিছু বলাবলি করতাছি কি না! নেজমুদ্দি পষ্ট কইরা না কইলেও আমার বুঝ্ হয়, হ্যান মশায় তলে তলে এই জায়গা ছাড়নের মতলব করতাছেন। তুমি এর কিছু জান মোড়ল?

না জানলেই বা কি? বাড়িঘর তো আর লইয়া যাইতে পারব না, জমিজিরাতও রাইখ্যা যাইতে অইব। তবু খোঁজ রাইখ্যো, বিশেষ কইরা টাকাপয়সাগুলার দিকে। সরাইয়া ফালছে কি—

সে সব ফক্কা।—বাচ্চু মিঞা মোড়লকে বাধা দিল—শালার আধিয়ার, সহরদ্দি, সেদিন কইতাছিল যে, সে সব নাকি সরাইয়া ফালছেন অনেকদিন আগেই। তা ছাড়া হিন্দুস্থানের বুঝাপড়া অইছে আমাগোর লগে। আমরা নাকি ওই সবে হাত দিতে পারমু না।

কে কইল?—মোড়ল দাড়ির উপরে হস্তসঞ্চালন বন্ধ রাখে।

সহরদ্দি। আবার কেডা? মুরলীবাবুর কাছে নাকি শুনছে।

ও, সহরদ্দির কথা! বাদ দেও, বাদ দেও। তারপর কি অইল, কও?

বাচ্চু মিঞার ইচ্ছা হইল, একবার সহরদ্দিনকে এই বৈঠকে হাজির করে। কিন্তু মোড়ল না হুকুম করিলে কেমন করিয়া হইবে?

তারপর, আইজকাল মুরলীবাবুর বাড়িতে গেলেই কেবল শুনায়, আজম্মার বছর লাগলো বাচ্চু ভাই, পাইট আধিয়াররে দিয়া-থুইয়া খোরাকির চাউল-ডাইল থাকে না, কিননের পয়সাও নাই। কিন্তু শালার দালান-বাড়ি ঠিকই আছে, কুরসী খাটের একটাও কমতি হয় নাই। নেজমুদ্দি দেইখ্যা আইছে ওঁর খাওন-দাওনের বহর; মাছ

গোস্ত কোন দিনই বাদ যাইতাছে না। আমাগোর সাথে দেখা অইলেই এমন আদাব দেন—

আদাব, মোড়ল সায়েব। এই যে বাচ্চু মিঞা, আদাব। আরে সর্দার সায়েব কতক্ষণ? আদাব।—মুরলীবাবু বিনয়-নম্র ভাষণে উপস্থিত সবাইকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনেক দিন আসেন না। গত সন্ধ্যার গরুর ব্যাপারটা কতদুর গড়াইয়াছে, হয়তো তাহাই জানিতে চেষ্টা করিবেন।

আলেক মোড়ল পুনরায় হুঁকা সাজাইবার আদেশ দিয়া বলিল, তারপর মুরলীবাবু, কাইল রাতে অত হৈ-চৈ শুরু করছিলেন ক্যান? খড়ের গাদায় গরু মুখ লাগাইছিল, তারে গোটা দুই বাড়ি দেওনেই অত চেঁচামেচি!

আজ্ঞে, প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি। তারপর ব্যাপারটা জানতে পেরে মনে মনে ভাবলাম, ঠিকই করেছেন পীরু মিঞা, গরু তো গরু, মানুষও যদি অমনই আপনাদের না-জানিয়ে খড়ের আটি খুলে নিত, তবে খুন করলেও আপসোস করবার ছিল না। আমাদের পাকিস্তানে অমন অন্যায় আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না; সে অন্যায় এখন যেই করুক। দেব বদমাইস গরুটাকে বিক্রি ক'রে। বিক্রি কেন? এমনই দিয়ে দেব কাউকে।

শেষোক্ত কথায় সকলের মুখে তৃপ্তি ফুটিয়া উঠে। হাত কচলাইতে থাকেন মুরলীবাবু। এই সেদিন পর্যন্ত পীরু মিঞা তাঁহার বাড়িতে ছোটখাট কাজ করিত এবং তাহার বদলে দুই বেলা আহার পাইত। দিনকাল পবিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আজ পীরু মিঞাও গ্রামের একজন মাতব্বর। তাই মুরলীবাবু তাহাকে আর 'তুই' বলেন না, একেবারে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করেন।

এই যে মুরলীবাবু! এতিমখানার চাঁদাডা?—ঢাকনার উপরে ছিদ্রযুক্ত তালাবন্ধ একটি গোল বাক্স ঝুলাইতে ঝুলাইতে পানাউল্লা প্রবেশ করিয়া গোটা দুই ঝাঁকি দিয়া বাক্সমধ্যস্থ মুদ্রাগুলির অবস্থান জ্ঞাপন করিল।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—মুরলীবাবু মনিব্যাগ উজাড় করিয়া দিলেন।—শেষ গোটা দুই টাকা ছিল, তাই দিলাম।

মাত্র দুই টাকা!—বাচ্চু মিঞা বিস্ময় প্রকাশ করে।

এই নিন এখন, আমি তো আছিই বাচ্চু মিঞা। এতদিন পরে স্বাধীন দেশের মানুষ হলাম, সব কিছুর জন্যে ভাবতে হবে। শিশু-রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা আমরা না করলে, কে করবে? ওই হিন্দুস্থানের লোক? কি বলেন মোড়ল সায়েব;—মুরলীবাবু তাঁহার মন্তব্যের সমর্থন খোঁজেন।

বাচ্চু মিঞা মোড়লের কানে কানে কি যেন বলে।

আপনি নাকি এ জায়গা ছাইড়া যাওনের মতলব করছেন?—হুঁকায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া মোড়ল জিজ্ঞাসা করিল।

তোবা, তোবা! এও কি সম্ভব? অত ভীতু আমি নই মোড়ল সায়েব।—মুরলীবাবু মোড়লদের ভাষা দুই-একটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

শুনছ তোমরা? আরে, যারা যাওনের, তারা যাইবই, ঠেকান যাইব না, কিন্তু তাই বইল্যা কি মুরলীবাবুও যাইবেন? যত সব বাজে গুজব।

মুরলীবাবু প্রথমে মোড়লের দিকে, তারপর আর সকলের দিকে ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আচ্ছা, আসি এখন। আদাব মোড়ল সায়েব, আদাব বাচ্চু মিঞা, আদাব, আদাব।—মুরলীবাবু তাঁহার আনুগত্যের পরীক্ষা আর একবার দিলেন।

পড়েন দেখি কাগজডা। কি যে চিঠিপত্রের গোলমাল আরম্ভ অইছে। সাত দিন আগের পত্রিকা আইজ আইল! কইলকাতা থাইক্যা আইতেই যদি এত দেরি হয়, তবেই কাম অইছে আর কি! মোড়ল খবরের কাগজটি বাড়াইয়া দেন।

মুরলীবাবু সংবাদের বড় বড় হেডিংগুলি পড়া শেষ করিয়া হঠাৎ থামিয়া যান।

তা হইলে ঠিকই। ভারত-সরকার বাস্তুহারাদের জন্য ব্যবস্থা

করিতেছেন। আনন্দবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন, একবার গিয়া হাজির হইতে হয়। আনন্দবাবু, নাগ মহাশয়, ভগবানবাবু, ওঁরা সবাই আছেন, ব্যবস্থা একটা হইবেই। নাঃ, যাওয়াই ঠিক। লোকজন ঠিক করিতে কতক্ষণ এখানে? পয়সার কাছে সবাই কাবু, টাকার শব্দে ডুবিয়া যাইবে বাচ্চু মিঞা নেজমুদ্দিনের চীৎকার, থামিয়া যাইবে নেংড়ু সরকারের হম্বিতম্বি —মুরলীবাবু ভাবিতে থাকেন।

কি, থাইম্যা গেলেন যে?

ন', মানে, এই আর কি? মানে, এই জবর খবরটা শোনেন মোড়ল সায়েব? যে যা বলুক, আমরা সহজে ছাড়ছি না।—কাশ্মীরের কোন খবর জোর গলায় শুনাইলেন মুরলীবাবু।—হিন্দুস্থানের কাগজ রেখে-ঢেকে লিখবেই। কিন্তু দেখুন, কি মরদের বাচ্চা পাঠানগুলো!—মুরলীবাবু প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

সাবাস, সাবাস!—চীৎকার করিয়া উঠিল মোড়ল আর মাতব্বর সকলেই।

কাগজটা আমি নিয়ে যাই। বিকেলে ফেরত দেব।

তা নেন। পড়নের আর কেই বা আছে?—মোড়ল হুঁকাটি দেয়ালে কাত করিয়া রাখিলেন।

আসি তবে, আদাব।—মুরলীবাবু বাহির হইলেন।

ভ্যাবেনবাবুর বাড়িডার কি অইল? মানুষজন নাই ওই মুল্লুকে। আমার বাড়ির বউ-বেটারা কয়, শেষ রাতে ওই বাড়ির পাশ দিয়া যাইতে নাকি ডর লাগে। অত বড় বাড়ি খাঁ-খাঁ করতাছে—

ক্যান? তোমার কেডা নাকি আইছে হিন্দুস্থান থাইক্যা! দেও ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকাইয়া।—বাচ্চু মিঞা এনতাজকে পরামর্শ দেয়।

থাম, যা-তা কইরো না। গফুর দারোগা ঢোল পিটাইয়া নুটিশ দিছে—বাড়ি-ঘর কারও বেদখল করা যাইব না। ঢুকছ কি একেবারে মাজায় দড়ি বাইন্ধা চালান দিব।—মোড়ল উহাদিগকে নিরুৎসাহ করিল।

স্ত্রী-মেয়ের দোহাই দিয়া, বাড়িটা দখল করিবার সুখ-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়াতে এনতাজ মন-মরা হইয়া বিদায় লইল। বাচ্চু মিঞাও পিছু

পিছু চলিল। বেলা হইয়া গিয়াছে, নিত্যকার জটলা এই সময়েই শেষ হয়। আবার বসে সন্ধ্যায়। আজ সন্ধ্যায় আর আগামী কাল দুই বেলাই কোন পরামর্শসভা বসিবে না। আলেক মোড়ল এক আত্মীয়ের বাড়ি যাইবে গ্রামান্তরে। খবরটা মুরলীবাবু না জানিলেও, মোড়লের সাকরেদরা সবাই জানে। জানাতে লাভ আছে। মোড়লের অবর্তমানে বাচ্চু মিঞা, পীরু মণ্ডল সবারই দাপট বাড়িয়া যায়। ভিন্ জাতের লোকের নিকট হইতে তখন যে কোন অজুহাতে কিছু আদায়ের সুবিধা হয়। মোড়লের কানে না যাইলেই হইল।

* * *

দুই দিন পর সন্ধ্যায় বিরাট আলোচনা শুরু হইয়াছে। মোড়ল ও-বেলা আসিয়াই খবরটা শুনিয়াছে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার; তাই তাহার সাকরেদরা আসিয়াছে। বিশেষ তলবে আরও অনেকে আসিবে। মুরলীবাবু কাল রাত্রেই চলিয়া গিয়াছেন। গফুর দারোগার হাতে বাড়ির চাবি দিয়াছেন, অথচ এই ব্যাপারটা নাকি কাহারও নজরে পড়ে নাই।

এই শালা নেজমুদ্দি সব জানত—

আমি কইছিলাম না আগে? তুমরাই তো মিছা কথা ঠাওর কইরা উড়াইয়া দিলা, অখন দোষ অইল আমার—। বাচ্চ মিঞাকে কথা শেষ করিতে দিল না নেজমুদ্দিন।

অখন আর সাফাই গাইতে অইব না। আমি জানি না বুঝি? রাতে যখন মুরলীবাবু যায়, এই নেজমুদ্দিই সাথে ছিল। পথ বাতলাইয়া দিছিল কে? কেমন কইরা জানল, মোড়ল সায়েব সেদিন থাকব না এখানে?—পানাউল্লা উষ্ণ হইয়া উঠে।

অস্থির হইয়া উঠে বাচ্চু মিঞা, নেংড়ু, সহরুদ্দিন, আরও অনেকে। ভীতিবিহ্বল নেজমুদ্দিনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকে মোড়ল।

কাল্লাডা যদি এখন কাইট্যা ফেলি?

কাইট্যা ফেল মোড়ল, শ্যাষ কইরা দেও বেইমানরে।—হুঙ্কার দিয়া উঠে সকলে।

উত্তেজনা হ্রাস করিবার জন্য মোড়ল বলে, রাখ, এখন রাখ। একটা কিছু ঠিক করতেই অইব। নেজমুদ্দির বিচারও অইব। তবে সে তো আছেই এখানে, সবুর একটু করলে ক্ষতি নাই। কিন্তু মুরলীবাবু সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। আইজ রাতে আমি চিন্তা করি, তারপর দেখি কি করা যায়! অত কইরা হলফ করল—এখান থনে যাইব না। কথা ঠিক রাখে না?

* * *

কথা দিয়ে কথা রাখেন না কেন? সেদিন বলেছিলেন আজ আসতে, নিশ্চয়ই পাব। এখন নানান অসুবিধের কথা বলছেন। ট্রাউজারের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘাড় আর মুখ মুছিয়া লইল অজিত।

দেখুন, বাস্তুহারাদের আইনকানুনের গণ্ডির ভেতরে আপনি থাকলেও সত্যিকারের দুঃস্থদের দেওয়াই প্রথম দরকার, এ আপনিও বোঝেন নিশ্চয়ই। কাজেই তাদের দিয়ে যদি কিছু থাকে, তবে আপনি পাবেন। সেদিন অবশ্য বলেছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন ব্যবস্থা করার দরকার হয়ে পড়েছে।—উত্তর দেন সুবিমলবাবু। ভদ্রলোক ঠাণ্ডা প্রকৃতির, নম্রভাষার ব্যতিক্রম কদাচিৎ হয়। তবু দিনের পর দিন কৈফিয়ৎ দিয়া আজ একটু বিরক্ত হইয়াছেন।

যাচ্ছি তবে আপনার বড় সায়েবের কাছে।

তার আগে একটু ওঁর কাছে যান।—সুবিমলবাবু মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে দেখাইয়া দেন।

একগাদা ফাইলের পিছনে বসিয়া আছেন দ্বিতীয় কারণিক মৃত্যুঞ্জয়বাবু। কি যেন লিখিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বক্‌বক্ করিয়া যাইতেছেন।

দেখুন এদিকে একটু—

দেখেছি অনেক আগেই।—মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মুখের ভাবান্তর হয়।

আমার কেস্‌টা দেখেছেন?

ও, এই কথা বলছিলেন? আমি ভেবেছিলাম, আপনার পোশাক আর আর চেহারাটা বুঝি দেখতে বলছেন—

তাই যদি ব'লে থাকি—অদ্ভুত কিছু দেখছেন কি ?

হ্যাঁ, দেখছি, দিব্যি হাওয়াই শার্ট লাগিয়েছেন, ধোপদুরস্ত ট্রাউজার পরেছেন, ডান হাতে লাগানো ঘড়িটার দামও নেহাৎ কম নয়, অথচ এসেছেন রিফিউজি স্টাইপেণ্ড নিতে! এত পোশাকের বহর, তবু কয়েকটা টাকার জন্যে দুঃস্থ হতে বাধছে না ?

দ্যাট্‌স্ নট্ ইওর লুক্ আউট্। গভর্মেণ্ট টাকা দিচ্ছেন, আমরা নেব। রিফিউজি রিফিউজিই। তার ব্যাখ্যা করবার ভার আপনার মত সামান্য মাইনের কেরানীর ওপর নেই নিশ্চয়ই।—ঘড়িটা দেখিয়া লইল অজিত।

আপনার জন্যে স্টাইপেণ্ড মঞ্জুর হয়েছে, কলেজে খবর যাচ্ছে।—সুবিমলবাবু প্রবেশোদ্যত অপর একটি ছাত্রকে দেখিয়া বলিলেন।

দেখুন, নিজের সঙ্গে ওদের তুলনা করুন, প্রকৃত দুঃস্থ কে ? কম মাইনের কেরানীর যে বিবেচনাশক্তি আছে, অত বড়লোকের ছেলে হয়েও আপনার তা নেই, অথবা বড়লোকের ছেলে হয়েছেন ব'লেই বিবেচনাশক্তি হারিয়েছেন। মুরলীবাবুর ছেলে আপনি—

ও, তা হ'লে চেনেন ওঁকে।

ব্যস্, আর দরকার হবে না, ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব।—গজগজ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল অজিত।

কে মুরলীবাবু ?

সুবিমলবাবুর কাছে আপাতত ভিড় নাই। আরে, সেই যে লাল-বাড়িটা আমাদের পাড়াতেই, এই সেদিন বিক্রি হয়ে গেল। এই ছোকরার বাবা কিনেছেন। ছোকরাটা নাকি পাকিস্তানের কোন এক কলেজে পড়ত, হোস্টেল ছেড়ে এখন বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাড়ায় বেশ কাপ্তানি শুরু করেছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বিড়ি ধরাইয়া লন।

ঐ মুরলীবাবুর বাড়িতে সেদিন ছখানা কম্বল দিয়ে এলাম, কন্‌ট্রোলের কম্বল।—বুধু টানা-পাখার দড়িটা পুলির খাঁজের ভিতর দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল। স্থানীয় লোক বলিয়া বুধু সস্তাদরে কম্বল পায় নাই, রিফিউজি হইলে দুই টাকাতেই একখানা পাইত;

পাইলে ক্ষতি কি? নিজের প্রয়োজনে না লাগিলে, কিনিবার লোকের অভাব হইবে না, চাই কি কিছু চড়া দামেও বিক্রয় হইতে পারে। বদনের কথাগুলির মধ্যে পূর্বের মত অনুনয়ের ভাব যেন নাই। তাহাকে বেশি ঘাঁটাইতে ইচ্ছা হইল না, পাছে সব ফন্দি ফাঁস করিয়া দেয়!

আচ্ছা, তুই ভেবে দেখ, আমি ও-বেলা আবার আসব।—মুরলীবাবু ফটিকের বাড়ির দিকে অগ্রসর হন।

আমিও তাই কই, একটু ভাইব্যা দেখি। আর সব ভিটা-ছাড়ার লগে একটু আলাপ কইরা লই, তারপর যা হয় জানামু।—বদন মুরলীবাবুর পিছু পিছু কিছুটা হাঁটিয়া ফিরিয়া যায়।

* * *

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুরলীবাবু চিন্তান্বিত মুখে চলিয়াছেন। ও-বেলা ফিরিবার পথে কানাঘুষা শুনিয়াছেন, স্থানীয় কয়েকজন লোক নাকি তাঁহার চলাফেরায় সন্দেহ করিতেছে। বদন ফটিক প্রভৃতিকে টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য—শোধ আর সুদের তাগিদে তাহাদিগকে একেবারে গোলাম করিয়া রাখিবেন, এইরূপ অনেক কথা নাকি কেহ কেহ বলিতেছে।

এসব নিশ্চয়ই ওই ফটিকের বদমায়েসি। আজ সকালবেলা সে কতকগুলি কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছে। দেশে হতভাগা কেঁচো হইয়া থাকিত, এখানে এত সাহস পাইতেছে কেমন করিয়া? উস্কাইয়া দিবার লোকের তো অভাব নাই! তা হোক অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটীর হোমরা-চোমরা কয়েকজন হাতে আছে। তাঁহাদেরই একজনের নিকট হইতে সেদিন দুই হাজার টাকা দিয়া খানিকটা জমি কিনিবেন বলিয়া বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, অন্য সময় ও-জমির দাম দুই শত টাকা হইত কি না সন্দেহ। কি করিবে ফটিক? তাঁহার গ্রামের নেজমুদ্দিনের কথা মনে পড়িল। কোন এক আলোচনা-প্রসঙ্গে সে বলিয়াছিল, মুরলীবাবু, চাচা চৌকিদার অইলে চুরের আর ভয় কি? কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু—

মুরলীবাবুর দ্রুতগতিতে যেন বাধা পড়িল। চোর? না না, তিনি তো চোর নন।

না, কখনও না, এ হতে পারে না।—একটু জোর গলাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চান। অনুমানে বুঝিলেন, দিনমণির বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছেন, অন্ধকারের ভিতর হইতে ফটিকের কথা শোনা গেল।

পারে, পারে, সবই অইতে পারে। টর্চডা একটু এই জানলা দিয়া ফ্যালেন, ছাখেন ব্যাপার।

মুরলীবাবু বিনা প্রতিবাদে টর্চ ফেলেন।

অজিত ভিতরের বারান্দায় দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া যায়।

হাসিয়া উঠে ফটিক, বলে, আমাগোর বড় দরদী সাজছেন বাপ ব্যাটা। এই শালা দিনমণির ডাগর মাইয়াডার লগে অজিতবাবুর বড় ভাব। তাই তো কই, রোজই খোকাবাবু এখানে আসেন ক্যান? বাপ ঘুইরা বেড়ায় প্যাটের ধান্ধায় দিন-রাইত, আর তার মাইয়ার ছিমছামের কি বহর, য্যান ম্যামসায়েব! দরদ দেখানো বাইর করতাছি আইজ। তকে তকে আছিলাম, আইজ ধরছি হারামজাদারে, শ্যাষ কইরা তারপর অন্য কথা।

দৌড়াইয়া যান মুরলীবাবু। পুত্রের প্রাণের জন্য অনুনয় করিতে থাকেন, তোর ধারের টাকা তুই নাই বা দিলি, তোর টিনও আমি চাই না ফটিক, কিছু বলিস নি কাউকে।

তা অইলে অখন বাড়ি ফির‍্যা যান। বদনও কইছে, টিন ছাড়ব না। সরকারী টাকা আইস্যা গেছে, তাই দিয়াই কিনব।

টাকা এসে গিয়েছে?—মুরলীবাবু হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

রিলিফ অফিচার তাই তো কইলেন বিকালবেলায়।

রিলিফ অফিসার যখন বলেছেন, তখন ঠিকই। আচ্ছা, আসি তা হ'লে ফটিক। মুরলীবাবু বাড়ি ফিরিয়া চলেন।

খোকাবাবুকে নিষেধ কইরা দিবেন, এই এলাকায় যেন পা না বাড়ায়।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, ওকে কালই কলকাতা পাঠিয়ে দেব।—দূর হইতে মুরলীবাবুর উত্তর আসে।

* * *

নোটগুলা দেইখ্যা লইও, আমাগোর নোট য্যান হয়।—আলেক মোড়ল বাচ্চু মিঞাকে আদেশ দেয়।

সে সব ঠিক বদলে এনেছি।

নেজমুদ্দির বুদ্ধি আছে, কি বল বাচ্চু মিঞা, একেবারে হাজার টাকা!

মোড়লকে বাধা দিয়া মুরলীবাবু বলিলেন, তিন হাজার পেয়েছিলাম। এতিমখানায় এক হাজার দিলাম। দেব, সে তো সেবারেই বলেছিলাম। বাকি টাকাটা হিন্দুস্থানের পাওনাদারদের দিতেই শেষ হয়ে গেল।—মুরলীবাবু একবার সকলকে দেখিয়া লইলেন, তাহার এই মিথ্যা ভাষণ কেহ ধরিয়া ফেলিল কি না!—যা জিনিস-পত্রের দাম সেখানে! একেবারে ফতুর হয়ে আবার এলাম আপনাদের আশ্রয়ে।

আবার কবে যাইবেন? ফসলের পর নাকি?—নেংড়ু ব্যঙ্গ করিয়া ওঠে।

তোবা, তোবা!—প্রয়োজনীয় ভাবা এখনও ভোলেন নাই মুরলীবাবু, নিজের দেশ ছেড়ে কখনও অন্যত্র যেতে আছে?

সিগারেটের টিনটা সকলের সামনে একবার করিয়া ধরেন।

ফটিক, বদন, ওরা আইল না?—বাচ্চু মিঞা জানিতে চায়।

নেজমুদ্দিন সায়েবের চিঠি পেয়ে ওদের বলেছিলাম, ওরা রাজী হ'ল না। বললে, চাঁদা-ফাঁদা দিতে পারব না।

ও, তাই বুঝি নেজমুদ্দির লগে বন্দোবস্ত কইরা আগেভাগেই হাজার টাকা বরাদ্দ কইরা রাখছেন?—নেংড়ু খোঁচা দিবার সুযোগ ছাড়ে না।

বাচ্চু মিঞা নোট গুনিতে গুনিতে একবার মোড়লের দিকে অর্থপূর্ণ চোখের ইশারা করিল। মুরলীবাবু সদ্য এক হাজার টাকা দিয়াছেন, আবার পুরাতন কথা কেন?

তুই থাম্ নেংড়ু। তারপর, আর কি কইল ফটিকরা?

মোড়লের মেহেদিপাতার রস আসিয়া গিয়াছে।

শালাদের সাহস দেখে অবাক হয়ে যাই! চাল-চুলো তো ভেঙে

পড়বার যোগাড়। না খেয়ে থাকবে, তবু পৈতৃক ভিটেয় ফিরবে না। হতভাগারা আবার আমায় বলে, আপনার টাকা আছে, আপনি মোড়লদের ঠিক ক'রে নিতে পারবেন। তা ছাড়া আপনি না গিয়েও পারবেন না, অত জমি প'ড়ে রইল সেখানে! আমাদের কি আছে? বার বার জায়গা বদলানো পোষায় না আমাদের। এখানেই থাকব, যা হয় হবে।

মানে, কুমীরের কফই বা কি, শেলেম্মাই বা কি—সেই বিত্তান্ত আর কি! কি বলেন মুরলীবাবু?—মোড়লের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নেংড়ু থামিয়া গেল।

আচ্ছা, এখন যান।

মোড়লের চিরুনির দ্বারা দাঁড়ি আঁচড়ানো শেষ হইয়াছে, এখন রঞ্জন শুরু হইবে।

সিগারেটের টিনটি রাখিয়া দিয়াই মুরলীবাবু বিদায় লইলেন।

*   *   *

লাল বাড়িটাতে এক নূতন ভদ্রলোক থাকেন। কি এক তদন্তে জনকয়েক দেশী-পোশাক-পরিহিত ভদ্রলোক আসিয়াছেন, সঙ্গে খাকী ট্রাউজার ও হাফশার্ট পরিহিত সরকারী কর্মচারী। বদন, ফটিক ও দিনমণির তলব হইয়াছিল, তাহারাও আসিয়াছে। তদন্তের ফলে প্রকাশ পাইল, মুরলীবাবু নূতন ভদ্রলোকটির কাছে বাড়ি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন, যথারীতি দলিলও রেজেস্ট্রি করা হইয়াছে; আপাতত তাঁহার ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উপস্থিত কেহ কেহ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন যেন একটু বেশি বিচলিত হইলেন। অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটীর দেওয়া টিন একখানাও এ বাড়িতে ব্যবহৃত হয় নাই।

মুরলীবাবুর চ'লে যাবার খবরটা বড্ড দেরিতে পাওয়া গিয়েছিল। আপনি আগে কিছু জানতেন না, আনন্দবাবু? ভগবানবাবু কি বলেন?—খাকী-পোশাক-পরা ভদ্রলোকটি এতক্ষণ ইংরেজী-বাংলা মিশাইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন, তদন্তের শেষে জিজ্ঞাসা করলেন।

দুইজনেই যুগপৎ দক্ষিণে ও বামে বারকয়েক মাথা নাড়িলেন।

নাগ মহাশয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তবু তিনিও একই ভাবে উত্তর দিলেন। সাহেবের কপালে চিন্তারেখা দেখা দিল। ফটিক বদনের কানে কানে বলিল, সব জানতেন ওঁরা। ওঁদের সাহসেই তো পলাইয়া গেলেন মুরলীবাবু। আর থাকনের উপায় ছিল অত কাণ্ড-কারখানার পর?

চুপ কর্ চুপ কর্।—আনন্দবাবুর দৃষ্টি পড়িতেই বদন ফটিককে থামাইয়া দিল।

স্ব স্ব স্থানের দিকে ভদ্রলোকেরা রওনা হইলেন।

বাস্তুত্যাগীদের বস্তির দিকে রওনা হইল বদন, ফটিক আর দিনমণি। সাহেবটিকে দিনমণি পূর্বে দেখে নাই। তাহার সব ব্যাপারে মুরলীবাবুই গরজ করিয়া তদ্বির তদারক করিতেন। আজ ওই সাহেবটির পরিচয় জানিবার কৌতূহল হইল।

কে রে ওই সায়েবডা?

রিলিফ অফিচার।—উত্তর দিল ফটিক।

শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী

সিন্ধুতটে সন্ধ্যা

নামিছে মধুর সন্ধ্যা স্নিগ্ধ শান্তিময়া
মহা এ মুহূর্ত যেন স্তব্ধ বৈরাগিণী,
ডুবিছে দিগন্তে সূর্য ঢালি অরুণিমা
চরাচরে বাজে ওই অমর্ত্য রাগিণী।
পরম মাধুর্য নামে সমুদ্র আবরি
দিগন্তে নিবিয়া গেল প্রভাতের রবি
আকাশ-সমুদ্রে মাতি সায়াহ্নের খেলা
ছায়াময়ী ধরা যেন কল্পনার ছবি।
অসীম রহস্য ভরা অতল জলধি
ঢেউগুলি কি চাহিছে আছাড়ি-বিছাড়ি
অনন্ত আকাশে জাগে মূক ব্যাকুলতা
আর কত এ জীবনে দিতে হবে পাড়ি

বসি এ সাগরতটে বালুকা-বেলায়
লভিলাম আজি মনে পরম সান্ত্বনা
মন্দ-বায়ু ধীরে বহি আপন খেয়ালে
সযত্নে ঘুচায়ে দিল সমস্ত বেদনা।
চরাচর ডুবে গেল পরম আবেশে
ভুবন ভরিয়া জাগে বিরাট বিশ্রাম
সঞ্চিত বেদনা যত সুখ দুঃখ ব্যথা
এ শান্তির পাদপীঠে আজি সঁপিলাম।

শ্রীবিভা সরকার

ছড়াছড়ি

পিছন ফিরে দৃষ্টি মেলেই আমি
সবিস্ময়ে হঠাৎ গেনু থামি।
একজন কে আসছে পিছে পিছে—
সত্য যার পরম রিপু, মিত্র যার মিছে।
ক্রমাগত করছে জুয়াচুরি
অসহায়ের বুকে বসায় ছুরি।
পিছনে মোর এমন জন! সভয়ে গেনু থামি,
চমকে ভাঙে, যখন বুঝি, সেই জনটি আমি।

* *

প্রেম করে কোন মেয়ে নাম তার কুঁড়ি,
মনের আকাশে তাই ওড়ালাম ঘুড়ি।
কুঁড়ি গেল পতি-বাড়ি, ঘুড়ি গেল কেটে—
লাটাই উনুনে দিয়ে, ভেজে খাই মেটে।

* *

বেশি দিও না আদর
হবে তা হ'লে বাঁদর,
বেশি দিও না বাধা
হবে তা হ'লে গাধা।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

বাংলা দেশের বর্তমান যুব ও ছাত্র সমাজ দুর্বিনীত আদর্শভ্রষ্ট স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল—এই আর্তনাদ সর্বত্র মুহুর্মুহু উঠিতেছে শুনিতেছি। হয়তো এ সকলই সত্য, কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? ছেলেরা—অভিভাবক ও শিক্ষকদের আয়ত্তাধীন ছেলেরা একদিনেই নদীর মত কুলকুল করিয়া বহিয়া যায় না, পাহাড় ফাটাইয়া বাহির হইতে সময় লাগে। তাহাদিগকে এই সময় দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি অভিভাবক বা শিক্ষক কাহারও যথোচিত দৃষ্টি ছিল না, যুগপ্রবৃত্তিই তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ বাঙালী ছেলেদের সম্মুখে ছিল—ব্রহ্মচর্য ত্যাগ দেশসেবা দরিদ্রনারায়ণ পৌরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছিল কল্পনায়। বাস্তবে বাঙালী দেখিল বিবেকানন্দ ও তাঁহার মিশন। ফলে স্বদেশী আন্দোলন। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' ও শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' বাঙালী যুবকের সাধনায় শৃঙ্খলা শক্তি নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা ও ভক্তি আনিল। তারপর প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। ব্যাপক মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের নবতন শিক্ষাগুরু ইউরোপ দেহসর্বস্ব হইয়া উঠিল, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল, যৌনবিকৃতি দেখা দিল—সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র। সে ধাক্কা বাংলা দেশেও লাগিল, পথভ্রষ্ট হইল বাংলা সাহিত্য, বাংলার শিক্ষা। বিপুল অর্থাগমের বন্যায় অভিভাবকগণের পুরাতন আদর্শের ভিত্তি টলিল, শিক্ষকরা ধর্মচ্যুত হইলেন—স্বার্থদুষ্ট আত্মসর্বস্বতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিল। আদর্শভ্রষ্ট জাতির সম্মুখে আসিল অসহযোগ-আন্দোলন। ভাঙার কাজেই উচ্ছৃঙ্খলের আনন্দ; গান্ধীজীর গঠনমূলক দিক—চরকা-খদ্দর বাঙালীকে আকৃষ্ট করিল না। 'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা' করিতে করিতে চারণের মুখে কালবোশেখীর ঝড়ের গান শুনিতে শুনিতে তাহারা উদ্দাম হইয়া উঠিল। তত-দিনে-আত্মস্থ অভিভাবকেরা আর তাল সামলাইতে পারিলেন না।

* * *

ইংরেজরা বলিয়া থাকে, ইটনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে জাতির গৌরবের পত্তন। বৈদেশিক সরকারের দোষ দিব না।

আমাদের নেতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভুলে এই দুইটি স্থানই হইল অবহেলিত। তাহার ফল এতদিনে ফলিতেছে। আর উপায় নাই।

এ যুগের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকগুলি যদি কেহ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, এই অবহেলা কতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে! বাঙালীর চিত্তে যে সকল পুস্তক এককালে সংযম ও দৃঢ়তা আনিয়াছিল—ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ,' চন্দ্রনাথ বসুর 'সংযম-শিক্ষা,' অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ,' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'চরিত্রগঠন' ও 'ঋদ্ধি' : যে সকল পুস্তক আনিয়াছিল আশা ও আশ্বাস—ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি,' বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' 'বিবিধ প্রবন্ধ' 'ধর্মতত্ত্ব'; এবং সমস্ত জাতির প্রাণে যাহা সঞ্চার করিয়াছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা—সেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী বাঙালীর ছেলেরা আর পড়ে না। আগে টডের স্টুডেণ্ট্‌স ম্যানুয়েল, কবেটের অ্যাড্‌ভাইস টু ইয়ংমেন, অ্যাডাম্‌সের সিক্রেট অব সাকসেস ও প্লেনলিভিং অ্যাণ্ড হাইথিঙ্কিং এবং স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের সেল্‌ফ্‌হেল্‌প ডিউটি থ্রিফ্‌ট হইতে বাঙালী ছেলেরা মনের খোরাক সংগ্রহ করিত—এখন এই সকল বই হাজারে একজনের কাছেও দেখা যায় না। ইহার ফল বাঙালীর পক্ষে ভাল হয় নাই। এইগুলিই আবার পড়িতে বা পড়াইতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু ছেলেদের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবক-শিক্ষকদের যে অবহিত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

গান্ধীজীর জীবিতকাল হইতে বিজ্ঞাপিত বিশ্বশান্তি-সম্মেলন তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে শান্তি-নিকেতনে ও ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত হইল। সংবাদ-পত্রে প্রতিদিন এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই শান্তি-সম্মেলনের সুদূরপ্রসারী কোন সম্ভাবনা আছে কি না, এই প্রশ্ন সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যতম সদস্য শ্রীনির্মলকুমার বসুকে করাতে তিনি এই লিখিত জবাব দিয়াছেন—

"শান্তিনিকেতনে ও সেবাগ্রামে সম্প্রতি শান্তি-সম্মেলন শেষ হইয়া গেল। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সম্মেলনের চেষ্টায় বিশ্বের কোনও

দেশে কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? সম্মেলন কি স্থায়ী কোনও কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, না, একবার মেলার মত অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া তাঁহারা যে যাহার দেশে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন? এক কথায়, বিশ্বের প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন দেশ হইতে জাহাজ ভাড়া দিয়া ষাট-সত্তর জন প্রতিনিধিকে আনিয়া লাভ শেষ পর্যন্ত কি হইল?

"এই প্রশ্নের সম্বন্ধে বিবেচনা করার পূর্বে সম্মেলনের ইতিহাস একটু আলোচনা করা যাক। গান্ধীজী ১৯২০ সাল হইতে ভারতবর্ষে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহার একটি প্রত্যক্ষ এবং একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্ত করা। কিন্তু শুধু ইংরেজের নিকট হইতে শৃঙ্খলমোচনের ব্যাপারে গান্ধীজীর তত বেশি উৎসাহ ছিল না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দেশের জনসাধারণকে পরশ্রমজীবী ব্যক্তিবৃন্দের নাগপাশ হইতে মুক্ত করা। গান্ধীজীর নিকট যাহা মূল উদ্দেশ্য ছিল, যাহার সাধন-স্বরূপ তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা কিন্তু অধিকাংশ স্বাধীনতাকামীর চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। যাহাদের চিত্তে এই আদর্শ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় নগণ্য। যাহারা শুধু স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে বরণ করিয়াছিল, সেই অগণিত জনসমষ্টি গান্ধীজীর অবশিষ্ট আদর্শকে খানিকটা খেয়ালের মত গণ্য করিত, এবং নেতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার উপদেশ যথাসম্ভব পালন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিত। ফলে, স্বাধীনতালাভের পর যখন গান্ধীজী ভারতবর্ষের হিন্দুকে পরমতসহিষ্ণু হইতে বলিলেন, যখন তিনি ভারতবাসী মুসলমান জনতার চিত্তকে নিরপেক্ষ আচরণের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন স্বীয় দেশবাসীর হস্তেই তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইল।

"মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে গান্ধীজীর নিকট বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। বিগত যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত দেশে পর্যন্ত বহু ব্যক্তি যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব দেশের গভর্মেণ্টের যুদ্ধনীতিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহাদের নানাবিধ

পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কেহ কেহ আজও কারার অন্তরালে বিরাজ করিতেছেন। গান্ধীজী এইরূপ শান্তিবাদীদের সম্মেলন সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক গঠনই এমন যে, তাহার ফলে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠে। অতএব যুদ্ধের স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে শুধু যুদ্ধকালে গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করা পর্যাপ্ত নহে। দুই যুদ্ধের মধ্যকালে শান্তিবাদীদের অপর একটি বৃহত্তর কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য হইল, অনুরাগী মানুষের সমবেত চেষ্টার দ্বারা শোষণবিহীন, সহযোগিতামূলক জীবনযাত্রার বীজ বপন করা এবং অধ্যবসায়সহকারে তাহার অঙ্কুর উদ্‌গমে সহায়তা করা।

"গান্ধীজীর মৃত্যুর পর প্রস্তাবিত শান্তি-সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবার কথা হয়। কিন্তু বহু বিবেচনার পর স্থির হয় যে, সম্মেলন হওয়াই উচিত এবং যাঁহারা আসিবেন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সর্বতোভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করাও কর্তব্য।

"বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে শান্তিনিকেতনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গান্ধীজী শোষণবিহীন সমাজ রচনার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? গ্রাম-উদ্যোগ-সমিতি বা বনিয়াদী-শিক্ষার স্বরূপ কি? যে সকল প্রতিষ্ঠানের মারফত এই সকল কাজ করা হয়, তাহাদের গঠনতন্ত্র কিরূপ? গভর্মেণ্টের সহিত বিরোধ বাধিলে কি উপায় অবলম্বন করা হইত? গঠনকর্মে লোকের উৎসাহ বা আস্থা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছিল কি না? ভারতবর্ষের মত প্রাকৃতিক-সম্পদবহুল দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম রচনা করা সম্ভব হইলেও অন্যান্য দেশে তাহা সম্ভব কি না? এবং যদি বা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে রচিত গ্রাম রচনা করা সম্ভব হয়, তাহার দ্বারা সারা পৃথিবীর জনসমূহের দারিদ্র্য এবং অভাব মিটানো সম্ভব হইবে কি না?

"এ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দের আয়ত্তে ছিল না। তাঁহারা যথাসাধ্য উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। কিছু উত্তর অন্যান্য দেশের সত্যাগ্রহীগণ দিবার চেষ্টা করিলেন। রিচার্ড গ্রেগ

নামক জনৈক আমেরিকান লেখক এবং চাষী, রেজিল্যাণ্ড রেনলড্‌স ও উইল্‌ফ্রেড ওয়েলক নামক দুইজন ইংরেজ, রেনে বুভার নামক জনৈক সুইস এবং ডিডরীচ লুণ্ড নামক জনৈক নরোয়েবাসী স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে অংশত উপরোক্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নিকট গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির বিষয়ে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্মেলনের সকলেই লাভবান হইলেন। ইহাও সকলে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, শুধু গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এমন কি অহিংস-অসহযোগ পর্যন্ত নিরর্থক হইয়া যায়, যদি শান্তিকামী নরনারী অসীম ধৈর্যের সহিত গড়ার কাজেও আত্মসমর্পণ না করেন। এবং এই গড়ার কাজ বিভিন্ন দেশে একই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই নীতি অনুসারে পরিচালিত হইলেও তাহার বাহিরের রূপে নানাবিধ প্রভেদ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোন্ দেশে কিরূপ কর্মধারা অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল।

"সত্যাগ্রহ এবং গঠনকর্মের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে সম্মেলনের প্রত্যেক সভ্যই আলোচনার অন্তে নূতন নূতন সত্যের আভাস পান। ইহা কম লাভের বিষয় নহে।

"ইহা ছাড়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতেও একটি বিশেষ লাভের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ভারতবাসী সমবেতভাবে বহুদিন যুদ্ধ করে নাই। যুদ্ধ হিংসার পথেই হউক অথবা অহিংসার পথেই হউক, ইহা আমাদের অভ্যাসের বাহিরেই চলিয়া গিয়াছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমরা যতটুকু ত্যাগস্বীকার করিয়াছি কূপমণ্ডূকের মত আমরা তাহাকে খুব বড় বলিয়াই মনে করিতাম। সত্যাগ্রহের মধ্যে কারাবাস অথবা মৃত্যুবরণকে ছোট করিয়া দেখিবার দরকার নাই। কিন্তু আমাদের জাতি যতখানি ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে অকারণে বড় বলিয়া ভাবিবারও কোন কারণ নাই। অথচ, উৎসাহের বশে, ঝোঁকের মাথায় আমরা সেরূপ করিতে পশ্চাৎপদ হই না। আর ঝোঁকের মাথায় সত্যাগ্রহীর দল ইহাও ভুলিয়া যান যে, জনসাধারণের সমর্থন, তাঁহাদের প্রদত্ত সম্মান, এমন কি ফুলের মালা বা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে ছবি বা নাম বাহির হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই

যোদ্ধাগণের হৃদয়কে দৃঢ় রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে। বন্ধুদের সমর্থনে দুর্গম পথের অনেকখানি কষ্ট লঘু হইয়া যায়।

"ইহার তুলনায় ইংলণ্ডের সত্যাগ্রহী নহে, সাধারণ দেশভক্ত সৈনিক গতযুদ্ধের সময়ে দেশরক্ষার জন্য যে পরিমাণ কষ্ট বরণ করিয়াছিল, যে সাহসের সহিত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহার মূল্য কোন অংশে কম নহে। আর ইংলণ্ড বা আমেরিকার সত্যাগ্রহীদল যখন নিজের দেশে সমাজের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে, স্বীয় গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করিয়া ন্যায় এবং সত্যের মর্যাদারক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, যে অপরিসীম নিষ্ঠার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা স্বীয় মনুষ্যত্বের দীপশিখাকে প্রজ্বলিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিয়া শান্তি-সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ সত্য-সত্যই লাভবান হইলেন এবং নম্র হইবার শিক্ষা লাভ করিলেন। ভারতে গান্ধীজীর মত মানুষ সংগ্রামে অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশবাসী ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত ভাবে স্বাধীনতার ব্রতে ব্রতী নরনারীকে সমর্থন করিয়াছিলেন; আর অপর দেশে নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় অপমান এবং লাঞ্ছনা, বেদনা এবং মৃত্যুর মধ্যেও যাহারা ধর্মকে পরিহার করেন নাই, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেরই নমস্য।

"বিশ্ববাসী শান্তিকামীদের এই প্রথম সম্মেলন পরস্পারের সঙ্গ এবং ভাব ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের অতিরিক্ত কিছু করিতে না পারিলেও যে সার্থক হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই।"

সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, বিহার সরকার শিক্ষা-খাতে একটা মোটা টাকা ব্যয় ও বরাদ্দ করিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দ হইল। বিহার শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত পিছনে আছে, এখন বিহার সরকারের শিক্ষার দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—তাঁহারা বিশেষ তৎপরতা ও নিষ্ঠার সহিত তাহাই করিতেছেন। কিন্তু বাংলা দেশ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপারে গোটা উনবিংশ শতাব্দীটা মহাবীর অর্জুনের মত বিপুল আগ্রহ, প্রবল উদ্যম, প্রভূত কর্মশক্তি ও আশ্চর্য রণকৌশল দেখাইয়া

সমগ্র ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ের গৌরব লাভ করিয়াও চেষ্টাহীন জড়ত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, যে ইংরেজ-শ্রীকৃষ্ণ উদ্যোগ-পর্বে কুরুক্ষেত্রে তাহাকে গীতামাহাত্ম্য শুনাইয়া উৎসাহিত করিয়াছিল, তাহার ক্রম-অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-অর্জুনের হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার বিজয়শঙ্খ আর নিনাদিত হইতেছে না। সে আজ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের মত অন্ধ হইয়া শুধু জ্যেষ্ঠত্বের গর্বে আস্ফালন করিতেছে। দস্যুরা আসিয়া চোখের সম্মুখেই একে একে যাদব-রমণীগণকে তাহার আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া লইতেছে, তাহার কিছুই করিবার নাই। এই শোচনীয় দুর্দশা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার কোনও চেষ্টাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। যাঁহাদের হাতে বাংলা দেশের শিক্ষার ভার, তাঁহারা অক্ষম, অপারগ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা-লেশহীন, শিক্ষা-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক বরাদ্দ টাকা শুধু যথাযথ খরচ করিবার মত উদ্যমের অধিকারীও ইঁহারা নহেন। দেশের জনহিতকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ইঁহারা কোনও যোগই রক্ষা করেন না, কোনও প্রয়োজনে ইঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জবাব পাইতে বৎসর ঘুরিয়া যায়। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর চারি পাশে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর মত ছয় জন সেক্রেটারি এবং ছত্রিশ জন আণ্ডার সেক্রেটারি লালদীঘির সুবৃহৎ কেরানী-ভবনের তেতলার সুরক্ষিত দুর্গের পূর্বদক্ষিণ-কোণের বারান্দায় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছেন, বাংলা দেশের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কাহারও তাঁহাদের সহিত রীতিমত দরবার না করিয়া দেখা করিবার হুকুম নাই। লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা।

* * *

এই সকল ক্লেশকর কথা বলিবার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ ঘটা করিয়া শিক্ষা-ব্যাপারে কতকগুলি বেসরকারী কমিটী নিয়োগ করিয়া বসিলেন, সম্ভবত নিজেদের সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার কথা সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য—প্রাইমারি এডুকেশন কমিটী, বেসিক এডুকেশন কমিটী, অ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটী—আরও কত কি! আমরা অ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটিতে ছিলাম। শ্রীঅতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে কখনও কাউন্সিল হাউসে, কখনও রাইটার্স বিল্ডিংসে, কখনও বা যাদুঘরে সমিতির

অধিবেশন বসিল এবং শেষ পর্যন্ত সমিতি একটা সিদ্ধান্তে আসিলেন। বাংলা সরকারের আওতায় এই রীতিবিগর্হিত কাজ সম্ভব হইল শুধু গুপ্ত মহাশয়ের জিদে,—এত দ্রুত কাজ শেষ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করা ইতিহাসবহির্ভূত। শেষ অধিবেশনগুলি গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতেই করিতে হইয়াছিল। সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন ডি. পি. আই. অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকৃশন। তিনি একদিন হঠাৎ উদয় হইয়া সরকারের পক্ষে জানাইলেন যে, সরকারের টাকা নাই, সুতরাং রিপোর্ট দাখিল করিলেও কোনই কাজ হইবে না। সরকারী বিভাগ হইতে গতানুগতিক ভাবে যাহা স্থির হইবে, টুকটাক করিয়া তাহাই চলিবে। কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা খরচ করার অক্ষমতাহেতু যেখানে বাজেয়াপ্ত হয়, সেখানে টাকা নাই কেন—এই প্রশ্নের জবাব মিলিল না। রিপোর্ট দাখিল হইল এবং যথারীতি ধামাচাপা পড়িল। ছয় মাস পরে গুপ্ত মহাশয় তাহা নিজের উদ্যমে, ব্যয়ে ও দায়িত্বে প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এই জাতীয় ঘটনা—ইহা একটি মাত্র নয় বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। যাহা বরাবর ঘটিয়া আসিয়াছে এবং আজও ঘটিতেছে, ইহা তাহার সামান্য নমুনা মাত্র। স্বাধীনতা লাভ করিয়া আরক্ষাবাহিনীর মত কুশিক্ষাবাহিনীরও কোনই পরিবর্তন হয় নাই।

* * *

গান্ধীজী-প্রবর্তিত নঈতালিম লইয়াও একই ধরনের রসিকতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিয়া আসিতেছেন। সরকারী প্রচারকার্যে সৌভাগ্যশালী দুই-একটি শিক্ষাকেন্দ্রের সবাক চলচ্চিত্র পর্যন্ত সুকৌশলে প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু আসলে এই পদ্ধতির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আস্থা বা সহানুভূতি নাই, অতি কষ্টে টিম্‌টিম্ করিয়া কেবলমাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এগুলি চলিতেছে। পুরাতন পদ্ধতিতেই সরকারের এই বিভাগ বিশ্বাসী, সম্ভবত অন্তঃসার-শূন্য পুরাতনের মধ্যে এখনও কিঞ্চিৎ রস আছে বলিয়া—টেক্‌স্টবুকের রস, পরিদর্শন-ভাতার রস। এই জুয়াচুরি সরকার আর কতদিন করিবেন? রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে বক্তৃতায় এবং ঘন ঘন বিবৃতিতে গান্ধীজীর নামে অশ্রুবিসর্জন করিয়া কাজে তাঁহাকে দুই বেলা জুতাস্ত

করার বর্তমান রীতি তাঁহারা ছাড়িয়া দিন, সনাতন এল. পি., ইউ. পি. এবং গুরুট্রেনিং লইয়াই মহাসমারোহে তাঁহারা কারবার করিতে থাকুন, এবং জয়গান করিতে হইলে সেই পদ্ধতিরই করুন।

—

যখনই কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র তোষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া চলে তখনই তাহার সর্বনাশ ঘটে, এবং তাহার মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ-বিধান হইলেও সে উদ্দেশ্য আর সংসাধিত হয় না। তদ্দ্বারা ব্যক্তি বা দলেরই স্বার্থসিদ্ধি হয় এবং অবাঞ্ছিত অযোগ্য লোকদিগকে কারণে বা অকারণে তুষ্ট করিতে গিয়া জনসাধারণের ক্ষতিই হইয়া থাকে। কলিকাতা-বেতার-কেন্দ্র বর্তমানে উল্লিখিত দোষে সকলের ক্ষতির কারণই হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য দিল্লী কতখানি দায়ী, অথবা কলিকাতা-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিদারুণ অক্ষমতা-সঞ্জাত ছায়াভয়চকিতমূঢ়তা দায়ী কি না, তাহার বিচার করিব না। আমরা শুধু এইটুকুই বলিব যে, প্রোগ্রামের উন্নতি করার চেষ্টা এখানে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের (অবশ্য কলিকাতার কর্তৃপক্ষ যাঁহাদিগকে ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের) এবং সমালোচনাকারী সংবাদপত্রের সন্তোষবিধান অথবা মুখ চাপা দিবার কাজেই পর্যবসিত হইয়াছে। ঘুষের দ্বারা ঘুসি রোধ করিয়া হতভাগ্য স্থানীয় কর্মচারীরা কোনও রকমে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কয়েক জন অক্ষম ব্যক্তির চাকুরি বজায় রাখাটাই যদি বেতার-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না; কিন্তু বেতারের সম্ভাবনা বিপুল, উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পের প্রসার বেতারের সহযোগিতায় যত দ্রুত হইতে পারে, এমন আর কিছুতে হয় না। পৃথিবীর বহু দেশে বেতার আজ জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ সহায়। কিন্তু আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে সকলই বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। এখানে এক দিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বাহ্বাস্ফোট ও আত্মপ্রচার, প্রদেশপাল-কন্যার বাল্যলীলা-বর্ণন, কেন্দ্রাধ্যক্ষ-বান্ধবীর কুৎসিত নাটক, প্রোগ্রাম-সহযোগীর খাতিরের লোকের জঘন্য ভাষাভঙ্গি ও উচ্চারণ আমাদিগকে শুনিতে

হয় ; অন্য দিকে কখনও মজুমদার কখনও গ্যাঙ্গোপাধ্যায়দের ডালে-ঝোলে-ঝালে-অম্বলে অবাধ বিহার সহ্য করিতে হয়, বাজে ভাঁওতায় তাঁহারা কর্তাদের ভীতির সঞ্চার করিতে পারেন বলিয়া। শত্রু মিত্র দুই পক্ষেই আমরা মার খাইতেছি। আমাদিগকে রামেও মারিতেছে, রাবণেও মারিতেছে।

এই পদ্ধতির পরিবর্তন সর্বাগ্রে আবশ্যক। সকলকে তুষ্ট করিবার যে বেশ্যা-মনোবৃত্তি, যত দিন পর্যন্ত কলিকাতার কর্তৃপক্ষ তাহা পরিহার না করিতেছেন, সকলের মুখ চাহিয়া রাম শ্যাম যদু মধুর পরামর্শ লইয়া চলিবার প্রণালী ছাড়িয়া নিজেদের শক্ত পা ও সুচিন্তিত বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিতেছেন, তত দিন কলিকাতা-বেতার-কেন্দ্র ব্যভিচার ও বীভৎসতার শ্রীক্ষেত্রই হইয়া থাকিবে, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে পারিবে না। ইহার জন্য শিক্ষিত মার্জিত আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী-নির্বাচন সর্বপ্রথম প্রয়োজন—লালফিতার শক্ত বাঁধনে যাহাকে-তাহাকে বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। ইহা মূলত শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সঙ্গীত প্রচারের প্রতিষ্ঠান (অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে সরকারের নিজস্ব প্রচারের পর)—এখানে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সহিত সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা বজায় রাখিবার জন্য কোট-প্যাণ্টালুন-বুশশার্ট, ঠোঁট-বেকানো ইংরেজী উচ্চারণ, নিখুঁত রঙ-মিলানো টাই, টেবিল-চেয়ার, টাকা-আনা-পাই, চুক্তিপত্র ও লগবুকই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ এগুলি একেবারেই না হইলে চলে ; কিন্তু সহৃদয় প্রীতির সম্পর্ক একান্ত আবশ্যক। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা স্বভাবত অভিমানী ও স্পর্শকাতর, তাঁহারা (পৃথিবীর সর্বত্রই) একটু আদরে ও আপ্যায়নেই গলিয়া যান, নিখুঁত কেতাদুরস্ত হৃদয়হীন ভদ্রতাকে ঘৃণা করেন, একটু ঢিলে-ঢালা বাহুল্য পছন্দ করেন, দু-দণ্ড সরস আলাপের কাঙাল, একেবারে ঘড়ি-ধরা হিট্ অ্যাণ্ড রান তাঁহাদের ধাতে সয় না। বর্তমানে আদবকায়দা-ফর্মদুরস্ত কলিকাতা-কেন্দ্র এই কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের অর্থোপার্জনের কেন্দ্রই হইয়া আছে, তাঁহাদের সহিত ইহার প্রাণের যোগ নষ্ট হইয়াছে। এমন লোক এখানে প্রয়োজন, যাঁহারা এই যোগ পুনঃসংস্থাপন করিবেন। হিসাবনিকাশ মাপজোক লগ সহি রসিদ স্ট্যাম্প অবশ্যই থাকিবে,

কিন্তু একটু অন্তরালে। কারণ এগুলি গৌণ—মুখ্য হইতেছে সরস শ্রুতিসুখকর শিক্ষাপ্রদ প্রোগ্রাম। এখন প্রোগ্রাম গৌণ, মুখ্য হইতেছে কায়দাকানুন। এই জন্যই কলিকাতার বিভিন্ন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের দুই-চারিজন করিয়া লোককে নিয়মিত প্রোগ্রাম দিয়া হাতে রাখিতে হইতেছে; পাছে কেহ চটিয়া কিছু লিখিয়া বসে। তাই সকলকেই কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিয়া ঠাণ্ডা রাখা হইতেছে, প্রোগ্রাম ভাল করিয়া সকলকে খুশি করিবার কোনও চেষ্টা নাই। ইঁহারা তাহার প্রয়োজনও আর অনুভব করেন না। কারণ দশের হইয়া যাঁহারা কথা বলিবেন বা আপত্তি জানাইবেন, তাঁহারা বশে থাকিলে আর ভয় কি! অথচ শুনিতে পাই এই প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের সহিত, শিল্পীদের সহিত যোগ রাখিবার জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা আছে, স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌-রক্ষাকারী, সংযোগরক্ষাকারী কর্মচারীর বাহুল্যই আছে! খাদ্য নাই খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়া সাধারণের অশান্তি যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, কলিকাতা-বেতার-কেন্দ্রে তেমনই আসলে ফাঁকি এবং ঠাটের বাহুল্য ঘটিতেছে বলিয়া শ্রোতারা অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অশান্তির প্রকাশ সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। কর্তৃপক্ষ এই সকল বিরুদ্ধ আন্দোলনকে হিংসাপ্রসূত বলিয়া অথবা যেখানে জবাব দিবার কিছু নাই, সেখানে দিল্লী-কেন্দ্রের উপর দোষ চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে অশান্তি দূর হইবে না—বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। আমরা বাঙালী-পরিচালিত কলিকাতা-কেন্দ্রের হিতার্থী বলিয়াই তাঁহাদিগকে সচেতন করিতেছি। একটু সাবধান, সহৃদয় ও আত্মবিশ্বাসী হইলেই অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ইঁহারা রোধ করিতে পারিবেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস ঃ কলিকাতা-৪

"বনফুলে"র

স্বপ্ন-সম্ভব

হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই উপন্যাসে সত্যকার মিলনের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তিন টাকা

অগ্নি

অগ্নিযুগের উপন্যাস। দুই টাকা

সপ্তর্ষি

বাংলা দেশের রাজনীতি এই উপন্যাসের পটভূমি। সাড়ে তিন টাকা

সে ও আমি

উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

অনুপম টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

জঙ্গম

প্রথম খণ্ড। চার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড। চার টাকা
তৃতীয় খণ্ড। সাড়ে ছয় টাকা

বৈতরণী-তীরে

শুধু ভূতের গল্প নহে, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও গল্প। দুই টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রাচীন দেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। সাড়ে চার টাকা

জলসাঘর

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

দুই পুরুষ

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন-আদৃত নাটক। দুই টাকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চিত্র। আড়াই টাকা

রসকলি

মনের উপর দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাতজনিত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

রাইকমল

প্রেমিক বৈষ্ণবীর দুঃখময় প্রেম-কাহিনী দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই টাকা

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমাবেশ

*

শ্রীআর্যকুমার সেনের

অভিনেতা

নূতন ধরনের গল্প-সংগ্রহ। নয় সিকা

"মহাস্থবির"-বিরচিত যে বই প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-
সাহিত্য-জগতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, যে বই বাংলা দেশের শুধু
মনীষীবৃন্দ কর্তৃক নয়—পাঠকসমাজ কর্তৃকও অভিনন্দিত
হইয়াছে, সমস্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র যে বইয়ের
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই

মহাস্থবির জাতক

পুস্তকের

মূল্য চার টাকা

মহাস্থবির জাতক

চতুর্থ মুদ্রণ। মূল্য চার টাকা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা-৪

শনিবারের চিঠি
বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৬

নিবেদন

মরমাহত সাঁঝের পাখী পেয়েছে ভালোবাসা,
এ ঋণ আমি শুধিতে পারি, না করি হেন আশা,
এ চন্দন-সুরভি মোরে নন্দিয়াছে গরবী ক'রে,
কূজনহীন কণ্ঠে মোর ফুরে না কোন ভাষা !

কানন-সভা মুখর করে নূতন পাপিয়ারা,
স্বপন দেখে তরুণমতি তেমনি মাতোয়ারা,
অপটু পাখা স্বভাব-বশে উড়িতে তবু চায় যেন সে,
তিয়াত্তরে তেপান্তরে হয় গো দিশাহারা !

এমন দিনে নূতন ক'রে ডাকিলে কেন মোরে ?
ব্যথায় শুধু মলিন চোখে আসিছে জল ভ'রে।
সাজায় শরশয়ন জরা, বধূর মত স্বয়ম্বরা ;
ফুরায়ে গেছে মাধবী রাতি, গিয়াছে মালা ঝ'রে !

আকাশ মোরে করে গো যাদু সাগর-কিনারায়
দিগন্তরে তরীর আলো জলছবিতে ভায়,
কে যেন বাঁশী বাজায় দূরে উতলা করে পূরবী সুরে,—
মেঘের কোলে পাহাড় দোলে ঝড়ের ইশারায়।

শুভ্রকেশে নিলাম তুলে আদর-উপহার,
নিলাম তুলে সবার সেরা প্রসাদ সারদার ;
এ গৌরব, এ সম্মান —দরদীদের হিয়ার দান—
লভিয়া আমি ভাগ্যবান ; লও গো নমস্কার।

১।১।৫০ শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা

[১৩৫৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ বাংলা বর্ষগণনার সংস্কার বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে সুধীজনের কয়েকটি সুচিন্তিত মতামত ভঞ্জ মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে শ্রীরাজশেখর বসু ও অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মন্তব্য মুদ্রিত হইল। বিষয়টি এমন জটিল যে, যত শীঘ্র ইহার সমাধান হয় ততই ভাল।]

সমস্ত ভারতের জন্য একই অব্দ গ্রহণীয়। তাহা শকাব্দ বা সংবৎ যাহাই হউক, সৌরমাণে গণিত এবং মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইওরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে Leap year ধরা যাইতে পারে। কিছু কাল পূর্বে ইওরোপে নূতন প্রকার মাসগণনার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা এখনও বিবেচনাধীন আছে। ইহাতে প্রতি মাস ২৮ দিনে, ১৩ মাসে বৎসর, প্রতি মাসে রবি প্রভৃতি বারের ক্রম সমান, বৎসরের শেষে একটি বার-হীন দিন যোগ করিয়া ৩৬৫ দিন পূর্ণ করা হয়, চার বৎসর অন্তর আরও একটি বার-হীন দিন যোগ করিয়া জ্যোতিষিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। এই রীতি যদি ইওরোপে গৃহীত হয়, তবে এ দেশের অব্দেও অনুরূপ মাস গণনা করা যাইতে পারে। বার ও রাশি গণনা কৃত্রিম, দ্বাদশ স্থানে ত্রয়োদশ রাশি ধরিলে দোষ হইবে না। অবশ্য ফলিত জ্যোতিষ মানিলে এই পদ্ধতি অচল।

রাজশেখর বসু

গোল বাধাইল পৃথিবী। ৩৬০ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিলেই হইত, সব মাস আমরা ৩০ দিনে ধরিতে পারিতাম। 'মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত'—হিসাব সহজ হইত। কচি ছেলেকে

Thirty days have September,
April June and November

—এই অপূর্ব কবিতা মুখস্থ করিতে হইত না। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যদি পাঁচ দিনে সৃষ্টি শেষ করিয়া ষষ্ঠ দিনে বিশ্রাম লইতেন, তবে সপ্তাহ ছয় দিনে হইত। আর পাঁচ-ছয় যখন তিরিশ, তখন প্রতি মাসের পয়লা একই নির্দিষ্ট বারে পড়িত।

কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা লইয়া আক্ষেপের প্রয়োজন নাই, যাহা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাক।

পৃথিবী ৩৬৫ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অতএব সব মাস সমান হইল না, Thirty days have September ইত্যাদির প্রয়োজন হইল। কিন্তু ঠিক ৩৬৫ দিন নয়, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। সুতরাং গোঁজামিলনের ব্যবস্থা করিতে হইল।

সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের পার্থক্য প্রায় ১২ দিন। মুসলমানেরা চান্দ্রমাণ অনুসারে চলে। উহাদের উৎসবাদি প্রতি বৎসর প্রায় ১২ দিন করিয়া আগাইয়া আসে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ঘুরে। কিন্তু হিন্দুর পূজা-পার্বণ ঋতুর সহিত জড়িত। শারদীয়া পূজা মাঘ মাসে বা বাসন্তী-পূজা ভাদ্র মাসে হইলে বড়ই বেখাপ্পা হইত। অতএব হিন্দু-জ্যোতিষী তিথিকে এক মাসের বেশি আগাইতে দিলেন না, যেই তাহার উপক্রম হয়, অমনই একটা মাসকে মলমাস ধরিয়া উহার civil death সাব্যস্ত করিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য দেশ তাহাদের ক্যালেণ্ডারে বৎসর সম্বন্ধে এই রকমের এক ব্যবস্থা করিলেন। বৎসরে ছয় ঘণ্টা করিয়া বাড়িয়া যেই এক দিনে দাঁড়ায়, অমনই একটি মাসের সহিত ঐ দিনটা জুড়িয়া দেওয়া হয়। দিন-মজুরের লোকসান নাই, কেরানীর দুর্ভোগ। এই ব্যবস্থায় কবিতার আর দুইটি লাইন বাড়াইতে হইল—

But a leap year once in four
February then has one day more.

কিন্তু তবুও হিসাব মিলিল না। দেখা গেল, প্রদক্ষিণ-কাল ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা নয়, ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.৫১ সেকেণ্ড। কয়েক শতাব্দীতে ভুলটা জমিয়া কয়েক দিনে দাঁড়াইবে। শিশুদের জন্য কবিতায় আর লাইন যোগ করা হইল না, তবে স্থির করা হইল যে, শতাব্দীর শেষ বর্ষ যদি ৪০০ দিয়া বিভাজ্য হয়, তবে একদিন বাড়ানো হইবে, নচেৎ বাড়ানো হইবে না। ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সাল Leap year বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কিন্তু ২০০০ সাল হইবে। এই ব্যবস্থাতেও যে ভুল থাকিবে, তাহা জমিতে জমিতে ৪০০০ বৎসরে একদিন দাঁড়াইবে, সুতরাং তাহা এখন ধামা-চাপা রহিল।

পাশ্চাত্য দেশে তো এইরূপ ব্যবস্থা হইল, কিন্তু হিন্দু পঞ্জিকা অন্য পথ ধরিলেন।

জ্যোতিষীদের ভাষা অনুসরণ করা যাইতেছে। আকাশে তারা-মণ্ডলের মধ্যে বারোটি পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বৃত্তাকারে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে ঘুরিতেছে। এই বারোটি বিশেষ তারা-মণ্ডলের পরস্পর দূরত্ব সমান, পরস্পর সমান্তরালে থাকিয়া পৃথিবী বেড়িয়া মহাকাশে বৃত্তপথে ঘুরিতেছে। এই ১২টি মণ্ডলকে দ্বাদশ রাশি বলা হয়। দ্বাদশ রাশির চক্রের নাম রাশিচক্র। সূর্য রাশিচক্রের উপর দিয়া ১২ মাসে একবার পরিক্রমণ করে। প্রত্যেক মাসে এক-একটি রাশির ক্ষেত্রে থাকিয়া পরের মাসে পাশের রাশির ক্ষেত্রে চলিয়া যায়। সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে থাকে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে সংক্রান্ত হয়, অর্থাৎ চলিয়া গিয়া সমস্ত মাসটা সেইখানেই থাকে, এইভাবে বৎসর ব্যাপিয়া ১২টি রাশি পর পর ভোগ করে।

ভাঙাচূরা দিন লইয়া তো মাস ধরা যায় না। পূর্ণসংখ্যক দিন রাখিতে হইবে। অতএব এই ব্যবস্থা হইল যে, যে-দিন সংক্রমণ হইবে, তাহার পরের দিনকে পরবর্তী মাসের ১লা ধরা হইবে। তবে সংক্রমণ যদি রাত্রি বারোটার পর হয়, তবে সে দিন নয়, তাহার পরের দিনকে সংক্রান্তি ধরা হইবে এবং তাহার পরের দিন হইবে নূতন মাসের আরম্ভ।

গোঁজামিলন-পদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য ক্যালেণ্ডারে এবং হিন্দু পঞ্জিকায় একরূপ না হওয়ায় মাঝে মাঝে গোলযোগ উঠিতে লাগিল। দেখা গেল, এক এক বৎসর বাংলা তারিখে ও ইংরেজী তারিখে গরমিল হয়। দৈনন্দিন কার্যকলাপে আমাদিগকে দুইটা পদ্ধতিই মানিয়া চলিতে হয়, কখনও এটা কখনও ওটা। মাসকাবারি মাহিনার জন্য ইংরেজী ১লার দিকে তাকাইয়া থাকি শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের আমলেও। পক্ষান্তরে পিতৃশ্রাদ্ধে বসিয়া 'অক্টোবর মাসি শুক্লপক্ষে'ও বলিতে পারি না। এই দোটানায় অনেক সময় ধাঁধায় পড়িতে হয়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। আমাদের দেশের বিগত মনীষিগণের জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকীতে ইংরেজী তারিখ অনুসরণ করি। রবীন্দ্রনাথ ২৫শে বৈশাখ ৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু দেখা গেল ১৩৫৩ সনে ২৫শে বৈশাখ হইল ৮ই মে। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গেলেন—

চিরনূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

অতএব পঁচিশে বৈশাখেই তাঁহার জন্মদিনের উৎসব করিতে হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের মৃত্যুদিন লইয়া কোন কবিতা রচনা করিয়া যান নাই, অতএব অন্য এক বৎসর ৭ই আগস্ট ২২শে শ্রাবণ না হইলেও ইংরেজী হিসাবে ৭ই আগস্ট তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইল।

এরূপ গোলমাল এড়াইবার উপায় কি? শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিব।

দেখা যাইতেছে। তিনিও a leap year comes once in four-এর পক্ষপাতী। তবে তিনি সোজাসুজি এ কথা বলেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন আর দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ পঞ্জিকা প্রতি চতুর্থ বৎসরে একটি করিয়া অতিবর্ষ গণনা করিয়া ঐ বৎসরের চৈত্র মাস ৩১ দিনে ধরিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহাতে কি আলোচিত সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইবে?

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জের হিসাবে দাঁড়াইতেছে

চৈত্র then has one day more।

তাহা হইলে ইংরেজী ফেব্রুয়ারির শেষ হইতে বাংলা চৈত্রের শেষ পর্যন্ত এই দেড় মাসের ঘটনাবলী তো পূর্ববৎ দুই নৌকায় পা দিয়া চলিবে। এই সময়ের মধ্যে আসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-দিন। সে সম্বন্ধে তো গরমিলের অবসান হইল না।

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ যখন ব্যাপারটিতে হাত দিয়াছেন, তখন একটু ভাল করিয়া লাগিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি তো জানেন যে, গুপ্ত প্রেস পি. এম. বাগচি প্রভৃতি পঞ্জিকা সূক্ষ্ম জ্যোতিষ অনুবর্তন করে না; বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গণনা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। কিন্তু তবুও দেশে কয়টা লোক বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা অনুসারে চলে? শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ আমাদের রক্ষণশীলতাকে আর একটু বেশি করিয়া নাড়াচাড়া দিন। যখন দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন হিন্দুজ্যোতিষী যে সূক্ষ্ম গণনা-

পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহা চিরদিন উজ্জ্ব হইয়া থাকিবে। কিন্তু দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর, মাপজোকের অ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মিত হইবার পরও কি সেই পুরাতন পদ্ধতি আঁকড়াইয় ধরিয়া থাকিতে হইবে? Nautical almanacএ প্রদত্ত রাশি য নির্ভুল হয়, তবে সেই রাশি লইয়া প্রস্তুত বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিক অনুসরণ করিলে কি আমাদের ধর্মকর্ম একেবারে ভণ্ডুল হইয় যাইবে? শ্রীনারায়ণ ভঞ্জের নিকট আমাদের অনুরোধ, তিনি ব্যাপক ভাবে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রচলন করিতে চেষ্টিত থাকুন। তাঁহা বর্ষমাণ-সমস্যার সমাধান তো সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ বঙ্গাব্দের উৎপত্তির কথা স্মরণ করিয়া মুহ্যমা হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছি। এক ২৫শে ডিসেম্ব বড়দিনের দিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে বিশ্ববরেণ্য পাদ্রী ডক্ট হোম্‌স্ যে অভিভাষণ দেন, আমার তাহা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল সেই অভিভাষণ হইতে জানিলাম যে, যীশুখ্রীষ্ট ৮ B. C.-তে জন্মগ্রহ করেন। সাদা বাংলায় কথাটা এই দাঁড়ায় যে, খ্রীষ্ট খ্রীষ্টজন্মের ৮ বৎস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তবে আর বঙ্গাব্দ লইয়া দুঃখ কি?

সমগ্র এশিয়ার নেতৃত্ব করিবার ভার ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতেছে জাপানে প্রচলিত অব্দ সপ্তবিংশ শতক। ভারতবর্ষকে নিশ্চয়ই উহা উপর টেক্কা দিতে হইবে। ভারতবর্ষে পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীনত যুধিষ্ঠিরাব্দকে পুনরুজ্জীবিত করুন। শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর সহি পরামর্শ করিয়া যুধিষ্ঠিরের একটা জন্মদিন ঠিক করিয়া ফেলুন শ্রীজওহরলালকে ধরুন। এশিয়ার নেতৃত্বভার তো তাঁহার উপর ন্য হইতেছে। আপনাদের প্রস্তাব পাইবামাত্রই তিনি উহা গ্রহ করিয়া আইনে পরিণত করিয়া দিবেন। তাহার পর দিনের পর দি প্রতিদিন ৩০ কোটি লোক ঐ সন-তারিখ ব্যবহার করিতে থাকিে ভবিষ্যতে কে আর উহাকে চ্যালেঞ্জ করিবে? সত্য তো পুনরাবৃত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অন্যপূর্বা

তেরো

ভাষার সৃষ্টি ভাবকে গোপন করবার জন্যে—এ কথাটা অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং, অন্তত আমাদের দেশে, অল্প কিছু দিন আগেও এটা সত্য ছিল না। পল্লী অঞ্চলে বোধ করি আজও ভাষার এই বিকৃত ব্যবহার শুরু হয় নি। এমন কি শহরেও বৃদ্ধ, বিশেষ ক'রে, বৃদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, নাগরিক জীবনের এই কপটতা এখনও সংক্রামিত হয় নি। তাঁরা নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করেন, কত মাইনে পাই এবং চাকরি স্থায়ী কি না? এই আপাত-অশোভন প্রশ্নের পশ্চাতে নেই কোনও কুৎসিত ইঙ্গিত বা ঈর্ষার জ্বালা, তাই বিব্রত বোধ করলেও রাগ করা শক্ত। কিন্তু এই স্পষ্টবক্তারা দ্রুতবেগে বিদায় নিচ্ছেন আমাদের সামাজিক মঞ্চ থেকে। সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হচ্ছে সর্বপ্রকার আন্তরিকতা।

আমাদের দেশে যথার্থ নগর আজও গ'ড়ে ওঠে নি, কিন্তু নাগরিকতার নানা অভিশাপ পরিব্যাপ্ত হয়েছে চতুর্দিকে। পরিবর্তনটা বহুলাংশেই বাইরের। ভিতরের মনটায় না আছে কালকের আন্তরিকতা, না আজকের নাগরিকতা। অশথগাছের শীতল ছায়া নেই শহরের জীবনে, অথচ গাঁয়ের গাছতলার উষ্ণ পরনিন্দা চলেছে প্রতি মোড়ের চায়ের দোকানগুলিতে।

দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে দরজার কাছে আসতেই মালতীর সেই কর্মহীন, শিক্ষাহীন, রুচিহীন ইতরগুলির কথা মনে পড়ল। ওই রাস্তার ধারের দোকানটায় ব'সে আছে শকুনগুলি। ভয় নয়, ঘৃণা হয় ওদের কথা ভাবলে। কিন্তু কাউকে যে ঘৃণা করতে হয়, না ক'রে উপায় থাকে না, এতেও যেন নিজেকে নীচ করা হয়। এদের এড়িয়ে চলায় তাই ভীরুতা নেই, আছে রুচির পরিচয়, আছে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখবার, আপন ভদ্রতাবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখবার বুদ্ধিসম্মত প্রচেষ্টা। মালতী তাই দেবেশকে সঙ্গে নিয়ে ওই মোড়ের চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে গিয়ে ওদের কুৎসিত আলোচনায় ইন্ধন যোগাতে অস্বীকার করল। দরজায় একটু দাঁড়াবার পরেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দুজনে সেইটেতে উঠে বসল।

সরোজের অমন আকস্মিক নিষ্ক্রমণ, তার পর মালতীর অদ্ভুত নীরবতা, তার পর তা ভাঙবার জন্যে আরও দুর্বোধ দু-একটা অসংলগ্ন উক্তি—দেবেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে মনে সে সন্ধ্যাটির যে মধুর রূপ পরিকল্পনা করেছিল, তার কিছুই সত্য হয়ে দেখা দিল না। বেসুরো সন্ধ্যায় দেবেশ চুপ ক'রে রইল। তাকিয়ে রইল ট্যাক্সির বাইরের গতিশীল ও অপসরমান দোকানের সারির দিকে।

মালতীর মনে শুধু নৈরাশ্যই ছিল না, যদিও তার কল্পনার সন্ধ্যা দেবেশের সন্ধ্যার চাইতেও সহস্রগুণ রঙিন ছিল। তার বেলায় নৈরাশ্যের বোঝার উপর ছিল এক রাশি সমস্যা। সরোজ এবার কি করবে কে জানে? আর, কিছু করলে তার কতটুকু দায়িত্ব মালতীর? মালতী যা করেছে, তা থেকে অন্যরূপ করাই কি উচিত হ'ত? এখনই বা তার কি কর্তব্য? প্রশ্নগুলি দেবেশকে জিজ্ঞাসা করবে করবে ভেবেও কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছিল না একটা বর্ণও। এদিকে দেবেশও অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকিয়েছিল মৌন হয়ে। বাতাসে তার অবাধ্য চুলগুলি উড়ে এসে কপালের উপর পড়ছিল, কিন্তু সেগুলিকে সাজাবার সামান্য চেষ্টাও করছিল না দেবেশ। অসহ্য নৈঃশব্দ্যে অধৈর্য হয়ে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে, বোধ হয় ময়দানের কাছাকাছি হবে, মালতী ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলল। নেমে কিছুদূর এগিয়ে এসে একটা বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করল।

তবু মুখে কারও কথা নেই।

আর একটু আগে নাগরিকতার অভিশাপ নিয়ে যে কথা বলেছি, তার আর একটা অভিব্যক্তি হচ্ছে কৌতূহলের চেষ্টাকৃত অপ্রকাশে। এটা ইংরেজদের কাছ থেকে শেখা। প্রতিবেশী সম্বন্ধে, এমন কি আত্মীয়দের সম্বন্ধে পর্যন্ত, কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আজ বর্বরতা ব'লে পরিগণিত। জানতে চাওয়া যেন অমার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু তাই ব'লে জানবার অভিলাষ নেই—এমন বললে সত্য বলা হবে না। জন্মজন্মান্তরের কৌতূহল অবলুপ্ত হয় নি দুটো সংক্ষিপ্ত শতাব্দীর বিদেশী সভ্যতার সান্নিধ্যে, সেই কৌতূহলের প্রকাশ শুধু হয়েছে নিষিদ্ধ। মালতী-দেবেশের যুক্ত নৈঃশব্দ্যের এইটেই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

যদিও একজন বলতে ব্যাকুল হয়েছিল এবং অপরজনও শোনবার প্রত্যাশী হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তবু তাই একজনও প্রসঙ্গটার উত্থাপন করতে পারছিল না। ব্যক্তিগত কথা জানতে চাওয়াই শুধু আইনবিরুদ্ধ নয়, জানাতে যাওয়াও যে ভদ্রতাসম্মত নয়! মালতী জানতে চায় দেবেশের কথা, জানাতে চায় নিজের কথা। কিন্তু উপায় নেই। আজ পর্যন্ত যা কিছু কথা হয়েছে তা হয় বই নিয়ে, নয়, ছবি নিয়ে। নিজের কথা বলে নি কেউ। কথায় কথা বেড়েছে, সঙ্গে বেড়েছে অতৃপ্ত কৌতূহল।

সুযোগ এল সরোজ-সমস্যার ছদ্মবেশে।

হঠাৎ মালতী বলল, একটা গল্প বলি শুনুন। আমি শেষ না করা পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না কিন্তু।

আমি বক্তা কেমন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু আমি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রোতা—আমার এ দাবি নিয়ে অন্তত কেউ আজও বিবাদ করে নি।

মালতী মৃদু হাস্যে রসোপভোগের ইঙ্গিত জানিয়ে শুরু করল, এক ছিল একাকিনী বালবধূ। বালবিধবার জন্যে যে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হয়ে থাকে, তার এক বিন্দুও ওর জীবন-মরুর কোনও ক্ষুদ্রতম কোণকে করে নি একটুখানি সজল। বিধবার জীবনে যে নিঃসীম শূন্যতা, তাও জোটে নি ওর মন্দভাগ্যে। ওর জীবনটা ভরা ছিল সেইখানে যেখানে নিশ্বাসবায়ুর প্রবেশপথ, আর ফাঁক ছিল ঠিক সেখানে যেখানে প্রয়োজন ছিল পূর্ণতার। এমন একটা ঘর, যেন—যার ছাদ নেই রক্ষার জন্যে, জানালা নেই হাওয়ার জন্যে। মা-বাবা পর হলেন, শ্বশুর-শাশুড়ী সে আসন দাবি করলেন কর্তব্যের রুদ্রবেশে। ফল সুখের হ'ল না কোনও পক্ষেই। নিঃসঙ্গিনী মেনে নিল ভাগ্যের এই পদাঘাত নিঃশব্দে। সান্ত্বনার সন্ধান করল না কলহের কুৎসিত উত্তেজনায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সে, এগুলি সামান্য ক্ষতি। এহ বাহ্য। আগে চল আর।

আগে চ'লে যে দেওয়ালে এসে কপাল ঠেকল, সে দেওয়ালের লেখার কাহিনী কেউ জানে না। বেচারী জানায় নি কাউকে। যাকে

তাকে জানানো যায় না সে কথা। জানাবার মত লোকই মেলে নি হতভাগিনীর।

অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল না কিছুই। কিন্তু উৎকর্ণ দেবেশ স্পষ্ট শুনতে পেল মালতীর মৃদু দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুদ্র আলপিন পড়লে যেখানে শোনা যেত, সেখানে কি অশ্রুত থাকবে দীর্ঘ ছুরিকার মর্মভেদী নিম্নগতি?

কিন্তু থাক্ সে কথা। অভাগিনীর জীবন থেকে সুর না হয় দূরই হ'ল, ছন্দ না হয় নাই রইল, দুয়ে মিলে যে সঙ্গীত হতে পারত তাও না হয় নাই হ'ল—কিন্তু কথা? দুটো কথা কইবার সাথীও কি পাবে না সে? চতুর্দিকে সবাই সদাব্যস্ত। তার জন্মে এক দণ্ড সময় নেই কারও। এদিকে তার নিজের সময় অফুরন্ত, অচলন্ত। কি করবে সে? আপনি কি করতেন ওর অবস্থায়?

বাধা দেব না বলেছি। আপনি বললেও না।

ভাল। ঠিক এমনই সময় বেচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এমনই আর এক বেচারীর। পুরোপুরি মিল হ'ল না—না, এমন ভাগ্য সে সঙ্গে আনে নি—কিন্তু বলা যাক একে, অন্তত অংশত, লিওনাইন্ মিল। শেষ পর্যন্ত নয়, শুধু মাঝখানে একটা জায়গায় মিল। নাই-মিলের চেয়ে কানা-মিল ভাল। একাকিনী তাই নিল, মনে তুলে নয়, মাথায় তুলে।

আচ্ছা।—মালতী একটু থেমে বলল, মন আর মাথায় দুস্তর দূরত্ব, তাই নয়?

দেবেশ এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছে। কিনারা পায় নি। অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিল, কি জানি! দূরত্ব আছে জানি, সে দূরত্ব যে দুস্তর তাও জানতে বাকি নেই। বিরোধটাকে পাশ্চাত্য দার্শনিক গণতন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। সে মাথা-গুনতিতে মাথার মাত্র একটি ভোট, আর মনের আছে দুটি। এই দ্বন্দ্বে মনের জয় আর মাথার শোচনীয় পরাজয় তো অবশ্যম্ভাবী।

ঠিক তাই। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? আপনার বেলায় অনুপাতটা বিপরীত—দুটো মাথা আর একটা মন।

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়, দেবেশ তা অন্তত নিজের কাছে অস্বীকার করল না। মাথার তুলনায় মনটা বোধ হয় তার সত্যই অপেক্ষাকৃত অপরিণত। দেবেশ ভাবতে লাগল এ সম্বন্ধে, কিন্তু মালতীর কাহিনী শোনবার কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বলল, আপনার গল্পে ছেদ পড়েছে কিন্তু।

আচ্ছা। দুই বেচারীতে দেখা হ'ল। কিন্তু এ কেমন দেখা? আমার বান্ধবীর জীবন ভরল না, শুধু সময় ভরল। কিন্তু তার বান্ধবের শুধু সময় ভরল না, জীবনও ভ'রে উঠল কানায় কানায়। বাহিরের কথা— অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা যত কিছু, সব ক্ষতির বুঝি পূরণ হ'ল আমার বান্ধবীর দাক্ষিণ্যে। শুধু মাত্র বাহিরের কথা হ'লে ক্ষতি ছিল না, বিরোধ বাধত না তা নিয়ে, কিন্তু আপত্তি এল ঘর থেকে। সে বান্ধবের ঘরে না ছিল মন, না মান। ঘরের বাইরে সাময়িক আশ্রয় যখন মিলল, ঘর তাকে করল একঘরে।

বান্ধবী নিজেও জানত তার আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী অস্থায়িত্বের কথা, ভঙ্গুর এ আশ্রয় ভেঙে গেলে আশ্রিতের পূর্বতন আশ্রয়হীনতা যে সহস্রগুণ কঠোর হয়ে বাজবে, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল না আশ্রয়দাত্রীর। জানত সে, সে তো নয় ছাতা, যে পথিকের সঙ্গে যেতে পারবে। সে শুধু ধনীর গৃহের পোর্টিকো, দিতে পারে একটু ছায়া, একটু ঢাকা, যে কটা মুহূর্ত দাঁড়াবে তার তলায়। পরেই তোমার এগুতে হবে, পিছনে থাকবে পোর্টিকো, মাথার 'পরে আকাশ আর রোদ-বাদল।

দেবেশ চুপ ক'রে শুনছিল। ভাল লাগছিল ছন্দসমৃদ্ধ গদ্য-কবিতার আবৃত্তি যেন। একটু থেমে মালতী আবার শুরু করল।

পথিককে পোর্টিকো স্মরণ করিয়ে দিতে পারত, সাবধান ক'রে দিতে পারত যে, বন্দোবস্তটা আদৌ চিরস্থায়ী নয়। ভেবেও ছিল দেবে ব'লে। চেষ্টা করেছে বহুবার। পারে নি। কিছুটা সংকোচ, তার চেয়ে বেশি মমতা এসে বাধা দিয়েছে। বলতে গিয়ে থেমে গেছে আশ্রিতের মলিন মুখ দেখে। নিরাশ্রয় তো বেচারী হবেই একটু পরে, আগে থেকে ওকে নিরাশও কি করতে হবে তাই ব'লে? সঙ্গীহীনার সাধ্য ছিল সামান্যই ভাল করবার বা মন্দ করবার। আনন্দও দিতে পারল না

কাউকে। আর একজনের এমনই ভাগ্যদোষ যে, সে এসে ঠাঁই নিল কিনা এই ভাগ্যহীনারই কাছে! আপনি বলুন, তাকে তাড়িয়ে দিলেই কি নারীধর্ম রক্ষিত হ'ত? মায়া, মমতা, দয়া, করুণা, এগুলি কি এমনই অক্ষমণীয় অপরাধ?

মালতীর কণ্ঠে ছিল তীব্র ক্ষোভ। তার প্রশ্নেরই মধ্যে নিহিত ছিল তার আপন তিক্ত উত্তর। দেবেশ কিছু বলল না। সমর্থনেও না, প্রতিবাদেও নয়। মালতীর বিবৃত কাহিনীতে বিবরণ ছিল অসম্পূর্ণ, তাই থেকে দেবেশ ঠিক বুঝতে পারছিল না—কি হয়েছে এবং কেন, যদিও বর্ণনার সুরে নির্ব্যক্তিক নিরাসক্তি এতই অল্প ছিল যে, কাহিনীর নায়িকার আসল পরিচয় অনুমান করা শক্ত ছিল না। মালতী একটু থেমে আবার আগের চেয়েও করুণ সুরে তার অসমাপ্ত কাহিনীর আবৃত্তি শুরু করল।

অথচ এই জন্যেই, এই মায়া-মমতার জন্যেই আমার বান্ধবীকে কি চরম মূল্য দিতে হ'ল! আরও যে কত দিতে হবে, কে জানে! প্রথম আঘাত এল বান্ধবের বঞ্চিত অন্তঃপুর থেকে। অশিক্ষিতা সে অনাদৃতার অভিমান যে কুশ্রী কদর্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা অগ্রাহ্য করা যদিবা সম্ভব হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটার সেইখানেই সমাপ্তি ঘটানো ততটা সহজ হ'ল না। তারও কারণ, যতটা দম্ভ, তার চেয়ে বেশি করুণা। অন্তঃপুরের অন্তর্দাহ এই নিয়ে নয় যে, যা তার ছিল তা ছিনিয়ে নিয়েছে আর কেউ; যা তার ছিলই না, কখনই না, তাই যে অন্য একজনের কাছে গেছে, ব্যর্থ বিবাহের পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে নিক্ষিপ্ত একজন যে অন্যত্র আশ্রয় লাভ করেছে, এইটেই হ'ল অসহ্য। হীনতা হ'লেও এতে বেদনা আছে। সহানুভূতির যোগ্য না হ'লেও একে উপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু নিরাশ্রয় পলাতক যেখানে এসে স্থান নিয়েছে, আপনিই বলুন, সেখান থেকে বিতাড়িত হ'লেই কি সে বিধিনির্ধারিত বাহুপাশে ফিরে যেত? আর ফিরে গেলেও কি লাভ হ'ত কোন পক্ষের? না, ফিরিয়ে দেওয়াই হ'ত বেচারীর প্রতি সুবিচার?

পূর্বের প্রশ্নগুলির মত এরও কোন উত্তর দিল না দেবেশ। কাহিনীর তিনটি ভুজের অন্তত অস্পষ্ট একটা সন্ধান সে এতক্ষণে

মনে হ'ল, সেটাও বোধ হয় ঠিক নয়। তিনটেই বোধ হয় মাথা, মন ব'লে বোধ হয় কোনও বালাই নেই এর। মালতী গভীর নৈরাশ্যের সুরে আস্তে আস্তে বলল, অদ্ভুত লোক আপনি! সবাই দেখেছি সাহিত্যের বিচার করে জীবনের ফিতে নিয়ে। আর আপনি দেখছি জীবনকে মাপেন সাহিত্যের মাপকাঠিতে।

কথাটার সত্যতা দেবেশ নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারল না। চুপ ক'রে রইল। একটু পরে পালাবার পথ পেল পাল্টা প্রশ্নে, কিন্তু আমরা তো কাহিনীই আলোচনা করছিলেম, তাই নয়?

মালতী গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কাহিনীই বটে!

অর্থাৎ কাহিনী নয়? অর্থাৎ সত্য? অর্থাৎ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে বানানো সুখ-দুঃখের রঙমাখা অভিনয় নয়? অর্থাৎ এখানে একজনের হাতে এবং অপরজনের বক্ষে যে লাল তরল জলজ্বল করছে, তা আলতা নয়? রক্ত? দেবেশের কাছে সমস্ত সমস্যাটার চেহারা যেন নিমেষে বদলে গেল। গল্পটা যে একেবারে গল্প নয় এমন সন্দেহ হয়েছিল আগেও, কিন্তু মালতীর স্বীকৃতিতে সন্দেহ উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে দেবেশকে যেন প্রবলভাবে আঘাত করল। ব্যথা নিয়ে পরিহাস করার জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত হ'ল।

তবু ভাল যে মালতীর সম্বন্ধে কিছু ব'লে ফেলে নি। একটু আগেও তো সে ছিল জ্যামিতিক একটা ত্রিকোণের তৃতীয় ভুজ মাত্র। এখন দেবেশ তার পার্শ্ববর্তিনীর দীর্ঘ ছায়ার দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। ছায়াটাকে মনে হ'ল, কোন অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতার উদ্দেশ্যে উত্থিত মালতীর বাদী দুটি বাহু ব'লে। অনেক ইতস্তত ক'রে অনুতপ্ত কণ্ঠে দেবেশ বলল, ক্ষমা করবেন। আপনার বান্ধবী ও তাঁর বান্ধবকে নিয়ে পরিহাস করবার কোনও দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। যদি কোনও ব্যথা দিয়ে থাকি, তা একান্তই অনভিপ্রেত জেনে ক্ষমা করবেন।

ক্ষমা চাইবার কিছু নেই দেবেশবাবু। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলেম যে, বড় দুঃখ ছোটর উপর পড়লেই ছোট হয়ে যায় না, বড়ই থাকে। বরং সে ছোট ব'লেই দুঃখটা বোধ হয় আরও বড় হয়ে বাজে।

পরিতপ্ত দেবেশ আর কিছু বলবে না স্থির করেছিল। তাই চুপ ক'রে রইল। নির্ব্যক্তিক স্তর থেকে যে আলোচনা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চ'লে এসেছিল, তাতে যোগ দিতে আর তার সাহস ছিল না।

মালতী দেবেশের নীরবতায় অধৈর্য হয়ে বলল, বলুন দেবেশবাবু, আপনি যা বলেন তা কঠোর; কিন্তু যখন কিছু না ব'লে শুধু ভাবেন, তখন ভয় হয়, আরও কঠোরতর কিছু ভাবছেন বোধ হয়।

কঠোরতার উল্লেখটা দেবেশের কানে করুণ আবেদনের মত শোনাল। প্রায় সিক্ত কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কঠোর নই আদৌ, তবু যা বলি সে যদি কঠোর শোনায়, সে শুধু আমার প্রকাশেরই দৈন্য।

মালতীর ভাল লাগল কথাটা। এবারে যেন দেবেশকে কিছুটা অন্তত স্বাভাবিক অনুভূতিশীল মানুষ ব'লে মনে হ'ল।

একটু পরে দেবেশই আবার বলল, তা ছাড়া কি জানেন, অনেক সময় পরবর্তী কালে বৃহত্তর কঠোরতা এড়াবার জন্যেই বর্তমানে মৃদু কঠোরতার প্রয়োজন হতে পারে।

দেবেশের এই উক্তিতে সরোজের প্রতি মালতীর বর্তমান মনোভাবের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তাই সে খুশি হ'ল, কিন্তু চুপ ক'রে রইল। জানত যে, দেবেশ নিজেই বলবে। বললও।

একটু আগে আপনি দুঃখ সম্বন্ধে যা বলছিলেন, তাও বোধ হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। দুঃখ দুঃখই, তা সে যারই হোক। কিন্তু তার আঘাতের প্রবলতায় অসীম তারতম্য ঘটে পাত্রভেদে। ক্ষুদ্র যে, তার দুঃখও ক্ষুদ্র, কেন-না বৃহৎ দুঃখ, তার চেয়ে বলি মহৎ দুঃখ, ধরবার মত কল্পনাই তার নেই, অনুভূতিও নেই। এই জন্যেই দেখবেন, বিশ্ব-সাহিত্যের প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে নায়ক হচ্ছে মহদ্‌গুণবিশিষ্ট। সাধারণ লোক নয়। সাধারণের সুখও যেমন স্থূল, দুঃখও তেমনই স্থূল। কোনটাই মহৎ নয়। একটুকু ছোঁয়া বা একটুকু কথা শুনে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করতে যেমন অসাধারণ কল্পনার প্রয়োজন, তেমনই বেদনা আহরণ করতেও চাই অনুরূপ গভীর অনুভূতিশীলতা। তাই কোন কোন সময় যাকে অশান্তির অশান্ত তরঙ্গ ব'লে ভ্রম হয়, তখন অনুকম্পার

আতিশয্যে তাতে হাত দিলে জলের আলোড়নটা বাড়ে, কমে না। হস্তসম্বরণ করলে অল্প কালের মধ্যেই হয়তো সে জল তার আপন সমতল ফিরে পাবে। জলের ধর্মই তাই, অধিকাংশ মানুষেরও।

এখানে মালতী বাধা না দিলে দেবেশের বক্তৃতা আরও কতক্ষণ চলত কে জানে! মালতী বলল, হয়তো আপনি যা বলছেন তাই ঠিক। কিন্তু, কিন্তু—। মালতী একটু থেমে, প্রায় মনে মনে, বলল, কিন্তু কারও উপরে কঠোর হতে গিয়ে দেখি সবচেয়ে বেশি কঠোর হতে হয় নিজের উপর!

দেবেশ তৎক্ষণাৎ বলল, কঠোর হবার অধিকার তো আছে একমাত্র এমন লোকেরই।

অল্পক্ষণ আগে দেবেশ যে ট্র্যাজিক মহদ্‌গুণের উল্লেখ করেছিল, মালতীর উক্তিতে সে যেন সেই এপিক গুণেরই অস্পষ্ট একটু আভাস পেল। মনে মনে বলল, ইনি সামান্যা নন, ইনি সামান্যা নন।

মালতী ভাবছিল, অধিকার হয়তো আছে। কিন্তু পারে কই কঠোর হতে? শেষ পর্যন্ত চরম কঠোরতাই করা হয়, অকর্মকভাবে, যেমন আজ হ'ল সরোজের বেলায়; কিন্তু সময় থাকতে হয়ে ওঠে না কিছুতেই। অবশেষে নিজের দুঃখও বাড়ে বহুগুণ, অপরেরও। নিজেরটা না হয় নীরবে সহ্য করা গেল, কিন্তু অপরে তা মেনে নেবে কেন? তারপরেই শুরু হয় দোষারোপ। বন্ধু অ-বন্ধু হয় না, হয় বৈরী।

দীর্ঘকালের পারস্পরিক নীরবতার পরে মালতী বলল, কিন্তু কঠোর হ'লে সেখানেই যে সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে, এমন কোন নিশ্চয়তা তো নেই।

নিশ্চয়তা নেই। সম্ভাবনা আছে।

হবে। হয়তো সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মালতীর ধারণা, তার বেলায় সকল সম্ভাবনা কি ক'রে যেন অসম্ভব হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক তাও যেন ঘ'টে ওঠে না, কেবলমাত্র সে ঘটনা মালতীর ভাগ্যের অনুকূল ব'লেই। দেবেশের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই মালতী ভরসা পেল না। নিরুৎসাহ নীরবতায় বিষণ্ণ সন্ধ্যাকে অগ্রসর হতে দিল তামসী রাত্রির অভিমুখে।

দেবেশ নির্বোধ নয়। সে জানত যে, মালতীর বর্ণিত কাহিনী আদৌ কল্পিত নয়। কিন্তু তবু দেবেশ পারে না তার নাগরিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে। পরস্পরের সম্বন্ধে প্রশ্ন পারে না পরস্পরের মধ্যে উত্তুঙ্গ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করতে। দুর্দম জিজ্ঞাসা পারে না দুস্তর সংকোচকে অতিক্রম করতে। আগেকার মত নির্লিপ্ত নির্ব্যক্তিকতার সুরে দেবেশ বলল, সংসারে ধ্রুব ব'লে খুব বেশি জিনিস নেই। তাই অধিকাংশ সময়েই নির্ভর করতে হয়, ল অব প্রবেবিলিটির উপর।

প্রবেবিলিটি, না, ছাই! মালতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তার কাহিনীর সত্যতা যে দেবেশের কাছে গোপন ছিল না, তাতে মালতীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবু যে দেবেশ এমনভাবে কাহিনীটার আলোচনা ক'রে চলছিল, নানা তার্কিক আইনকানুনের নজির টেনে—যেন মঙ্গল-গ্রহের কারও ব্যাপার এটা, পার্শ্ববর্তিনী মালতীর নয়, এতে মালতী নিতান্ত নিরাশ হ'ল। নাকি, মালতীর ঘটনা হ'লেও দেবেশের কিছু এসে যায় না? কাছে থেকে এমন দূর রচনা করা কেন? ব্যক্তিকে কেন এমন নিক্তির ওজন করা, যেন তর্কের বিষয়বস্তু ব্যতীত এর অন্য অস্তিত্ব নেই? দেবেশ আগাগোড়া এমনভাবে কথা বলছিল, যেন মালতী মালতী নয়, এক্স্। সরোজ সরোজ নয়, ওয়াই। এমন কি দেবেশও দেবেশ নয়— না, জেড্ নয়—যেন দেবেশ মুখার্জি, জে। একটা পরচুলা হ'লেই যেন চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।

এলোমেলোভাবে নানা কথা নিজের মনের মধ্যে ওলট-পালট ক'রে ভেবে মালতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, আর দুজনের না হয় বিহিত হ'ল। কিন্তু আমার কথা কিছু বললেন না তো?

আর উপায় নেই। তর্ক তার মুখোশ ফেলে দিয়েছে। স্তব্ধ দেবেশ সময় নেবার জন্যেই তার পকেটে সিগারেটের সন্ধান করতে থাকল। মালতীর প্রশ্নের সঙ্গত উত্তরের চেয়ে সেটা সহজলভ্য হতে বাধ্য।

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা ক'রেই মালতীর নিজেরও সঙ্কোচের সীমা রইল না। দেবেশ কি ভাবছে কে জানে! কিন্তু জ্যামুক্ত শর নিয়ে অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই। আর এইটে এমন স্পষ্ট ক'রে কোন না কোন সময়

কেউ না বললে তো শুধু দার্শনিক তর্কের ধূম উদ্‌গীর্ণ হ'ত অনন্তকাল ধ'রে। শুধু কথার পরে কথা জমত। তা হ'লে এই কাহিনীর অবতারণাই বা করা কেন? সত্যি কথা। মানল মালতী। তবু সংকোচ যে হয়, সেটাও যে সমান সত্য। মালতীও তার ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকল। কিছু পাবে এই আশা ক'রে নয়, শুধু খোঁজবারই জন্যে।

মালতী মনে মনে বলল, ধরা দিয়েছি, এবারও কি ধরা দেবে না? সব দিয়েছি, এবারও কি কিছু পাব না?

দেবেশ সিগারেট ও দেশলাই নিয়ে ব'সে ছিল। ধরায় নি। ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার। দেশলাইয়ের আগুনও। আর বাড়ায় লজ্জা।

অনেক ভেবে-চিন্তে দেবেশ বলল, আপনি নারীধর্মের প্রশ্ন তুলেছিলেন একটু আগে। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে অক্ষম। ওটা শরৎবাবুর রাজ্য, ওখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই। মানবধর্ম থেকে স্বতন্ত্র নারীধর্ম ব'লে কিছু আছে কি না, বা থাকা উচিত কি না, তাও জানি নে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার যোগ্যতাও নেই আমার। তবে আপনার বান্ধবী—

আর তো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই, সোজাসুজি বলুন।

বেশ। আপনি যা করেছেন, তা ন্যায়ের বিচারে ভাল কি মন্দ তার বিচারের ভার আমার উপর নেই। আপনারও উপর নেই। কিন্তু তার ফল যে শুভ হয় নি, সে তো প্রত্যক্ষ।

অন্তত অংশত যে শুভ হয় নি, সে তো স্বীকার করতেই হবে।

অংশগুলি অপ্রধান নয়, মিসেস গুপ্ত, বিশেষ ক'রে মানুষের জীবনে। জীবনের সমগ্রতাটা এমনই একটা ব্যাপক ব্যাপার যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আধুনিক লেখকরা পর্যন্ত তাকে পুরোপুরি দেখতে পারবার আশা পরিহার ক'রে স্লাইস্ অব্ লাইফ্ নিয়ে তুষ্ট রয়েছেন। সেই আংশিক বিচারে আপনার এই বন্ধুত্বটি কোন পক্ষেরই সুখের কারণ হয় নি।

মালতী আবার বাধা দিয়ে বলল, সর্বাংশে হয় নি। কিন্তু প্রারম্ভে

সরোজ সঙ্গিনী পেয়েছে, ফিরে পেয়েছ আত্মবিশ্বাস। তার স্ত্রীর কথা তুলে কাজ নেই। তার লাভও হয় নি, ক্ষতিও হয় নি। আর আমার? আমার নিঃসঙ্গতার অন্তত আংশিক নিরসন হয়েছিল বইকি।

ঠিক কথা। কিন্তু এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, সমাধানটা কি মারাত্মক রকম স্বল্পায়ু! তার কারণ, এই সম্বন্ধটার ভিত্তিই যে একেবারে অস্থায়ী! বিক্ষিপ্ত দুজন নরনারী সাময়িক সুবিধার জন্যে যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করল, তার পিছনে না রইল অচ্ছেদ্য কোন অনুভূতির বন্ধন, না কোনও সামাজিক অনুশাসনের দৃঢ় শৃঙ্খল। এর অকালমৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী।

সত্যি। এত স্পষ্ট, অথচ সময় থাকতে এসবের কিছুই মনে হয় নি। সময় পেরিয়ে না গেলে বুঝি এই বিশ্বের কোনও কিছুই বুঝবার উপায় নেই! মালতী অসহায় অনুনয়ের স্বরে বলল, আচ্ছা, এখন যে কঠোর হব, তাতে অন্যায় কি বাড়বে না?

কার প্রতি অন্যায়? সরোজের স্ত্রীর প্রতি? নিশ্চয়ই নয়, বরং উলটো। সরোজের প্রতি? ও শিশু নয়। সে জানত, সে কি করছে এবং তার জন্যে মূল্য দিতে যদি সে প্রস্তুত না থেকে থাকে, তা হ'লে তাকে বাঁচাবে কে?

হঠাৎ দেবেশের স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন এল। সে স্বরে সংসারোধ্বর্ব বিচারকের অবাস্তবতা নেই। তাতে যেন পাওয়া যায় অস্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গ মৃত্তিকার স্পর্শ। সেই সুরে দেবেশ ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু আমি এখন ওদের কথা ভাবছি নে মিসেস গুপ্ত। আমি ভাবছি আপনার কথা। মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত; ভাল করবারও, মন্দ করবারও। সেই সামান্য সাধ্যটুকু সাধারণত কেবলমাত্র নিজেরই উপর প্রযোজ্য। তাই যেটুকু আমরা ভাল করি, তা শুধুই নিজের। যা অন্যায় করি, তাও অন্যের প্রতি নয়, নিজের প্রতি। নিজের কথা ভাবুন।

মালতী গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার সমর্পণ সম্পূর্ণ করল, বলল, আমি আর ভাবতে পারি নে মিস্টার মুখার্জ্জি। আপনি ব'লে দিন।

বলেছি তো। সরোজ সরল ব্যক্তি। তাকে তার সমতল খুঁজে

পেতে দিন। জলের মত। সামাজিক আইনকানুনগুলি একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। সাধারণের জন্যে তাদের সার্থকতা অপরিসীম। সরোজের পক্ষে তাই যূথভ্রষ্ট হওয়া মানেই ভ্রষ্ট হওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেশরী পারে নির্ভয়ে বিচরণ করতে, মেষের পক্ষে সে দুঃসাহস করতে যাওয়া বৃথা। সরোজ সামান্য ব্যক্তি। আপনি ওকে অসামান্যের সম্মান দিলেই তো ও অসামান্য হয়ে উঠবে না।

সরোজ না হয় গেল, যদিও এসব সত্ত্বেও ওর জন্যে অনুকম্পা হয়। তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রমাণিত হয়, সরোজের অনুকম্পা-যোগ্যতা নয়।

কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি।

আমি বলতে ভয় পাচ্ছি, পাছে তাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য ব'লে তুচ্ছ করেন। মিসেস গুপ্ত, আমি ভালবাসতে পারি নে। আমার নাকি হৃদয় ব'লে কিছু নেই। আমি ভক্তি করতে পারি নে। আমি জানি, আমার অন্ধ বিশ্বাস নেই। কিন্তু বুদ্ধি আমার জাগ্রত। তাই নিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারি। আপনি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

মালতী এতটা আশা করতেও সাহস পায় নি কখনও। দেবেশের এত বড় কথাটা বিশ্বাস করবে যে সাহস হয় না, না করবে যে এমন জোর কই?

দেবেশ তাকে সম্রাজ্ঞী করেছে। সেই সম্রাজ্ঞীরই সুরে বলল, চলুন, এবার ওঠা যাক।

ট্যাক্সির জন্যে বড় রাস্তায় আসতে কিছুটা হাঁটতে হ'ল পাশাপাশি। সেই সুযোগে মালতী বলল, আপনি উদার। আপনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু আহত সরোজ যখন সব কথা—হয়তো আরও কিছু বেশি—সবাইকে গিয়ে বলবে, তখন মালতী গুপ্তার নিন্দায় কান পাতা যাবে না কোথাও।

লোকনিন্দা সম্বন্ধে দেবেশের অসীম অবজ্ঞা, তাই প্রসঙ্গটা উঠতেই সে বলল, নিন্দা জগতে কার নেই? আমি তাই কান পাততেই যাই নে ওদিকে। কান তো এজন্যে নয়, কান হচ্ছে বেঠোফেনের জন্যে।

সত্যি কথা। কিন্তু মালতী পারে কই জয় করতে এই নিন্দার ভয়, উপেক্ষা করতে এই লোকাপবাদের শঙ্কা ?

বিস্তৃত ময়দানের প্রসারিত মুক্তির দিকে মালতী একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। মায়া হ'ল, এমন স্থান ছেড়ে আবার তার ক্ষুদ্র কক্ষের বন্দীত্বের মধ্যে ফিরে যেতে। রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেলে দুজনে সেইটেতে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে মালতী বলল, আমাকে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে না। আপনি আপনার বাড়ির কাছে নেমে পড়লে আমি ট্যাক্সিটাকে নিয়ে চ'লে যাব।

দেবেশ ঠিক বুঝতে পারল না মালতীর এই নির্দেশের অর্থ। মালতী নিজেই ব্যাখ্যা করল, মিস্টার মুখার্জি, আপনার খ্যাতি আপনার গুণগ্রাহী অসংখ্য অপরিচিতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, আর সামান্য অখ্যাতি যদি কিছু থেকেই থাকে তা শুধু জনকয়েক ঈর্ষাদগ্ধ ব্যর্থমনোরথ পরশ্রীকাতর পরিচিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিন্দা সম্বন্ধে আপনি পারেন উদাসীন হতে।

দেবেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মালতী আবার বলল, কিন্তু আমার জগৎটা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। খ্যাতি বলতে আমার কিছু নেই, যা আছে তা আত্মীয় ও পরিচিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ। সে খ্যাতি শুধু এই যে, আমাকে নিয়ে ওরা আলোচনা করবে না। কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে অখ্যাতি রটনা করা সম্ভব, তবে তার কলরবে আমার ক্ষুদ্র বিশ্ব এমন ভ'রে ওঠে যে, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। দেবেশবাবু, আমি ক্ষুদ্র, আমার জগৎ ক্ষুদ্র, আমার সম্বল সামান্য, সাহস সামান্যতর। হাতে প্রাণ নিয়ে বাইরে এসে মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসবার সৌভাগ্য দেব নিজেকে ; কিন্তু আপনাকে নিয়ে সেই ক্ষুদ্র জগতে প্রবেশ করব, এমন সাহস নেই আমার। তাতে নিজেকেও বড় করব না, হয়তো বা আপনাকে ছোট করব। সে হতে দেব না।

দেবেশ একেবারে আচ্ছন্ন, বিমূঢ় বোধ করল। কিছু বলতে পারল না, কিছু বলবার প্রয়োজনই আছে ব'লে মনে করল না। শুধু ট্যাক্সির

সীটের উপর অযত্নে-ফেলে-রাখা মালতীর ব্যাগটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকল। পরে ব্যাগটার মালিক যখন ওটাকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল, তখন দেবেশের হাতে তার স্পর্শ লাগল। আজ আর সে অসীম ত্রস্ততায় তার হাত আগের দিনের মত সরিয়ে নিল না। মালতীরও মনে হ'ল না যে, সে একটা প্রস্তরমূর্তির উপর হাত রেখেছে মাত্র।

ব্যাগটার 'পরে যুক্তস্বত্ব বহাল রেখে দেবেশ মনে মনে বলল, আত্মা আছে কি না জানি নে। তাই ফাউস্টের মত কোন বার্টার করতে পারব না। কিন্তু, এখন, এই চিরন্তন মুহূর্তে, অঙ্গীকার করছি যে, আমার তিনটে মস্তিষ্কের বিনিময়ে একটি হৃদয়ের একটুখানি কণাও গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।

কথাটা মনে মনে বলা, কিন্তু তবু মালতী তা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল।

ক্রমশ

"রঞ্জন"

বহুৎ আচ্ছা

নিজের বিচারে দিয়াছিনু আমি নিজেরে ফাঁসি,
মনের আপীলে স্থির হ'ল শেষে দ্বীপান্তর
যাবজ্জীবন। মন একদিন কহিল হাসি,
কালাপানি পারে না হয় থাকিও দশ বছর।
মহা ভাবনায় প'ড়ে গেনু, মন কহিল শেষে,
সশ্রম কারাদণ্ড হউক বছর তিন।
তাহাও ঠেকিল বিনাশ্রমের দণ্ডে এসে।
দেখিতে দেখিতে মনের কৃপায় এল সুদিন।
মন বলে মোরে, বহুৎ আচ্ছা, করেছ বেশ,
এই কাজ ক'রে কত জনে পেল পুরস্কার।
শুনিতে শুনিতে মনে রহিল না লজ্জালেশ
মাথা উঁচু করি নিজেরে করিনু নমস্কার।

বন্দে মাতরম্

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁহার অন্যান্য কয়েকখানি উপন্যাসের ন্যায় ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' মাসিক-পত্রে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাপ্ত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ওই ১২৮৯ সালে ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। "বন্দে মাতরম্" গান 'আনন্দমঠে' বর্ণিত সন্তান-সম্প্রদায়ের জন্মভূমির বন্দনা-গীতি ও সমর-সঙ্গীত; এবং "বন্দে মাতরম্" 'আনন্দমঠে'র সন্তানগণের জয়-ধ্বনি, রণ-নিনাদ ও শঙ্খ-বাণী।

'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ভাব ও স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হইতেছিল। যদিও এই জাগরণ এক শ্রেণীর প্রগতিশীল শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহারা বস্তুতই বেদনা বোধ করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ভণ্ডামির লেশমাত্র ছিল না। এইজন্য দ্রুতগতিতে না হইলেও তাঁহাদের প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। 'আনন্দমঠে'র প্রকাশকালে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই। ইহার ৫।৬ বৎসর পূর্বে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশভক্তগণ কলিকাতায় "ভারত সভা" (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশবাসীগণের মধ্যে রাজনীতিক অধিকারবোধ ও স্বাদেশিকতার ভাব জাগাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের স্বদেশসেবার আদর্শ ও কার্য দ্বারা বাংলার ছাত্র ও শিক্ষিত যুবসমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে লাগিল।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে 'আনন্দমঠে'র প্রকাশ ও প্রচার দেশভক্ত বাঙালীর শিরে দেবাশীর্বাদের মত বর্ষিত হইল। 'আনন্দমঠে' প্রচারিত স্বদেশপ্রেম-ধর্ম বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'religion of patriotism' গ্রহণ করিবার

এবং 'আনন্দমঠে'র প্রাণবাণী "বন্দে মাতরম্"-কে উপলব্ধি করিবার উপযোগী ক্ষেত্র বাংলায় আংশিকভাবে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। সেই মহান আদর্শ মুক্তিকামী বাঙালীকে পথের সন্ধান দিল, সেই মহাসঙ্গীত বাঙালীকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিল।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক রচনায় দেখিতে পাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে তিনি ভারতবর্ষের হিন্দু-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার এবং তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে "মহাহিন্দু সমিতি" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহার ৪ সংখ্যক ও ৯ সংখ্যক বিধির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(৪)"…মহাহিন্দু সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে, তাহাতে 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে। পদ্মপুষ্প এ দেশে ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি এবং দেবপূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে।…"

(৯) (ঘ) "…যদ্যপি সমিতির কোন অনুষ্ঠীয়মান কার্য সম্বন্ধীয় কোন বিবেচনার বিষয় থাকে, প্রস্তাব পাঠ ও বক্তৃতা না হইয়া কেবল তাহাই আলোচিত হইবে। বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ অপেক্ষা কার্য অধিক প্রয়োজনীয়। সভার কার্যের পর 'বন্দে মাতরং' 'জয় ভারতের জয়' প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে।…"

ইহা হইতে দেখা যায় যে, 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার অল্প কাল পর হইতেই "বন্দে মাতরম্" দেশভক্ত বাঙালীকে আর্কষণ করিতে থাকে। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র (১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল) মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক গমন করিলে ঐ উপলক্ষ্যে যে সকল প্রবন্ধ এবং কবিতা রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতে আমাদের জাতীয় জীবনে 'আনন্দমঠ' ও "বন্দে মাতরম্"-এর প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লিখিত ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী' মাসিক-পত্রে প্রকাশিত "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জন্মভূমিকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় বঙ্কিম তাহার উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এখন সংবাদপত্রে, বক্তৃতায় স্বদেশবাৎসল্যের ছড়াছড়ি। তর্জন-গর্জন চিৎকারে কর্ণ প্রায় বধির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু স্বদেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় বঙ্কিমই একা তাহা শিখাইয়াছেন। ভারতমাতার সম্বন্ধে অসংখ্য গীত গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতা কাহার স্মরণ আছে? কিন্তু এমন হতভাগ্য বাঙ্গালি কয়জন আছে যাহাদের 'বন্দে মাতরং' অন্তত এক ছত্র স্মরণ নাই? সেই কয়টি কথা বঙ্কিম বাঙ্গালির হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছামত তাহা স্মরণ করিতে অথবা ভুলিতে পারা যায় না। যে হৃদয় হইতে এমন কথা উৎসারিত হইয়াছে সে হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি কেমন গাঢ় অনুরাগ তাহা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। ধমনীর ছন্দে, হৃদয়ের শোণিতে, চক্ষের অশ্রুতে সে অনুরাগ মিশ্রিত ছিল। জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিখিয়া বাঙ্গালি উন্মত্ত শূর বীর হইতে পারে বঙ্কিম তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন।"

তিন

'ভারতী'র ন্যায় 'নব্যভারত'ও ছিল এক কালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মাসিক-পত্র। ইহার স্বনামখ্যাত সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতাকামী একনিষ্ঠ সেবক। ইনি ম্যাট্‌সিনির দেশানুরাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়া 'আনন্দমঠে'র আদর্শকেও সহজে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" তাঁহাকে স্বাধীনতার সাধনায় যে কিরূপ প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিম-প্রয়াণ উপলক্ষ্যে দেবীপ্রসন্ন 'নব্যভারতে' "প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র"-শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন :—

"...তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরও বদ্ধমূল

এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যপ্রভায় এ দেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া 'বন্দে মাতরম্' মহাসঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃপূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর এবং অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বদেশপ্রেম, নিষ্কাম ধর্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র' উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন।..."
—১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-সংখ্যা 'নব্যভারত'।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে দেবীপ্রসন্ন দূরদর্শিতার দূরবীক্ষণে ভাবী কালের যে চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, এগারো বৎসর পরে বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যাইবার মত সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। "বন্দে মাতরম্, ডেমক্রেসি ও দারিদ্র্য-সমস্যা" নামক (১৩১৩—কার্তিক-সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত) অপর একটি প্রবন্ধে তিনি পূর্বোক্ত উক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া মাতৃভূমির মুক্তির জন্য দেশবাসীকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষা লইতে ও ডেমক্রেসির আদর্শ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর উপেক্ষিত জনগণের উদ্ধার এবং ভারতে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান ভিন্ন যে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে, এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে তিনি স্বদেশবাসীকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"...বোধ হয়, ভারতের দারিদ্র্যসমস্যার পূরণের জন্য এতদিন পরে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সর্বত্র আদর হইতেছে। ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা অতি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার সম্যক পূরণ না হইলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব।...

"...নিম্নশ্রেণীর উদ্ধার ভিন্ন এ দেশের মঙ্গল নাই। 'বন্দে মাতরম্' এই কঠিন সমস্যার পূরণ করিবে—...

"...প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র-ভগীরথ বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার জন্য 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্ররূপ গঙ্গা অবতরণ করাইয়া গিয়াছেন। এতদিন পর, উহার কার্য আমাদের উপর আরম্ভ হইয়াছে।..."

চার

"বন্দে মাতরম্"-এর দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য-সমস্যা, নিম্ন শ্রেণীর সমস্যা ইত্যাদির সমাধান কি করিয়া সম্ভব হইবে, এই প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকের মনে জাগিতে পারে। লেখক তাহা সোজাসুজি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই; কেন না, তৎকালে বিদেশী রাজার আইনের নাগ-পাশ হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিয়া দেশসেবককে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইত। লেখক এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বাঙালী যদি 'আনন্দমঠে'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া "সন্তানে"র ন্যায় "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে জননী-জন্মভূমির বন্ধন-মোচন সম্ভবপর হইবে। আর দাসত্বের পাপ হইতে জাতি মুক্তি পাইলে তাহার দারিদ্র্য-সমস্যা এবং তদনুরূপ অন্যান্য সমস্যার সমাধান কঠিন হইবে না।

আইনের নাগ-পাশের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এই স্থলে বলিয়া রাখা ভাল। পরাধীন দেশে দেশসেবকের আদর্শ, উদ্দেশ্য বা বাণী প্রচারে গোড়াতেই যাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেই কারণেও লেখক, বক্তা বা প্রচারককে বৈদেশিক রাজ-বিধির বেড়া-জাল এড়াইয়া চলিতে হয়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে 'আনন্দমঠে'র আখ্যায়িকার পটভূমিকা রচনা করিতে হইয়াছে,—বিশ্বাসহন্তা দেশদ্রোহী অপদার্থ মুসলমান নবাব মিরজাফরের শাসন-কালে অরাজকতার অবস্থায় এবং মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ সুপরিকল্পিত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'আনন্দমঠে'র বিচার-বিশ্লেষণ করিতে এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ বলিয়াই এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা মুসলমান বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে জাতি-বিদ্বেষের অন্যায় অভিযোগ আনিয়া থাকেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা" কবিতা এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতসঙ্গীত" আমাদের জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনাবলীর মধ্যে উচ্চাসন পাইয়াছে। একই কারণে তাঁহাদিগকেও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অনুরূপ পটভূমিকার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। নতুবা কবি রঙ্গলাল কি লিখিতে পারিতেন?—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায় !"

ঐরূপ পটভূমিকার আশ্রয় ব্যতীত কবি হেমচন্দ্রও কি বলিতে পারিতেন ?—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে ?
... ...
জপ, তপ আর যোগ-আরাধনা
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা !"

পাঁচ

প্রসিদ্ধ কবি দেবেন্দ্রবিজয় বসু বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনে ব্যথিত হইয়া "প্রতিভা পূজা" ('নব্যভারত', বৈশাখ ১৩০১) নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। মাতৃপূজার ওই মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" কবি-চিত্তকে কি রূপ ভাবোদ্বেল করিয়াছে, তাহার পরিচয় "প্রতিভা পূজা"য় মিলিবে। নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"কি অদ্ভুত মাতৃভক্তি এই,
শিখাইল মা-সোহাগী ছেলে।
কিবা মহাপূজা আয়োজন,
ল'য়ে মার সন্তান সকলে।
'বন্দে মাতরং' মন্ত্রবলে,
করিল যে শক্তি আবাহন।
কালগর্ভে সেই শক্তি বলে,
যেই বীজ হইল বপন,

"...বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বন্দে মাতরম্ বাঙ্গালার গান..."

পূর্বোক্ত উপন্যাস তিনখানির বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উত্থাপন করিয়া চিন্তাশীল বিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন—

"এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গভঙ্গের সময় যখন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি খাস বাঙ্গালার উপর নিপতিত হইল, তখন 'বন্দে মাতরম্' বাঙ্গালীর কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মালমসলা বঙ্কিমচন্দ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গভঙ্গে সে সময় ও সুযোগ দেখা দিল, আর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, এবং সীতারাম নূতন ভাবে বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইল। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী।...

"...বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।"

এই অনবদ্য প্রবন্ধের সমাপ্তি করিয়াছেন লেখক এই বলিয়া—

"...যে ভাবে 'বন্দে মাতরম্' মহাগীতি ফুটিয়াছিল, সেই ভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও ফুটিয়া উঠিবে। সেটা বিধাতার কৃপা-সাপেক্ষ। তাই আমিও উহাদের নাম দিয়াছি—ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিনখানিও বুঝিবার দিনকাল আছে, যোগ্য মানুষ আছে।"—'নারায়ণ', ১৩২১-২২বঙ্গাব্দ ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড।

কবি মানকুমারী বসু তাঁহার স্বদেশী-যুগে রচিত (১৩১২ বঙ্গাব্দ আশ্বিন-সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত) "আনন্দমঠ"-শীর্ষক কবিতায়

'আনন্দমঠে'র উদ্দেশ্যে প্রশস্তি নিবেদন করিয়াছেন। কবিতাটি শেষ করিয়াছেন এই ভাবে—

“আজি এ আনন্দমঠে
পবিত্র মঙ্গল ঘটে,
কল্যাণী স্বদেশ-লক্ষ্মী শুভ অধিষ্ঠান,
হিয়া ভরে পদ্মগন্ধে,
প্রাণ ভরে প্রেমানন্দে,
উল্লাস-গঙ্গায় ছোটে আনন্দ তুফান,
মা আজি এসেছে ঘরে
সন্তানে করুণা তরে,
এ শুভ মাহেন্দ্র যোগ ক'ত মূল্যবান
পূজিবে রাজীব পদ সমগ্র সন্তান।”

“বন্দে মাতরম্”কে উপলক্ষ্য করিয়া 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বদেশী-যুগে যে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লোকপ্রিয় হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উহার দুইটি চরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“মাগো যায় যেন জীবন চ'লে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
“বন্দে মাতরম্” ব'লে ॥
... ...
আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে 'মা' ফেলে ?”

স্বদেশী-যুগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে “বন্দে মাতরম্” নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যখন বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, তখন শোভাযাত্রীরা “বন্দে মাতরম্” গানের সঙ্গে পূর্বোক্ত সঙ্গীতটিও গাহিয়াছিলেন।

যজ্ঞবিদ্বেষী দানবের অত্যাচারে মাতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া গেল। যজ্ঞের ঋত্বিক উদ্‌গাতা আয়োজক সেবক প্রভৃতি দানবীয় আক্রমণে লাঞ্ছিত ও আহত হইলেন। যজ্ঞভূমি বরিশাল পূজার্থী ভক্তজনের রক্তে রঞ্জিত হইল। বাংলার সেই পীঠস্থানের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি নিবেদন করিয়া আহত চারণ-কবি কাব্যবিশারদ গাহিলেন :—

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'ল লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়। (বন্দে মাতরম্ বলে)
রক্ত বইছে শতধার
নাইকো শক্তি চলিবার
এরা, মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না,
সহে অত্যাচার !
এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির
তবু হাত তোলে না কারো গায়।..."

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একটি জাতীয়-সঙ্গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল !
প্রণয়-বিহ্বলে ধ'রে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল 'বন্দে মাতরম্',...
... ...
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে,
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয় স্বরে,
ভারত-জগৎ মাতিল !"

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের কতকাংশ পূর্বোক্ত গানটির অঙ্গীভূত করা হইয়াছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত একটি জাতীয়-সঙ্গীতের দুইটি চরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি,
স্বদেশের ধূলি মস্তকে মাখি,

নব আনন্দে উজ্জ্বল আঁখি—
গাহ 'বন্দে মাতরম্'।
... ...
গাহ দুর্দিনে গাহ পার্বণে,
জন্মে মরণে, জপ, তপ, রণে,
দীক্ষামন্ত্র ঐক্যমন্ত্র—
গাহ 'বন্দে মাতরম্'।"

এই সঙ্গীতের প্রত্যেক চরণের শেষ পদ—"গাহ 'বন্দে মাতরম্'।"

কাব্যবিশারদের রচিত বরিশালের প্রশস্তি-গানটি যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) 'লাঞ্ছিতের সম্মান' নামক গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গান দুইটি যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'সোনার বাংলা' নামক জাতীয়-সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাত

"বন্দে মাতরম্" আনন্দমঠে'র প্রাণবাণী। 'আনন্দমঠে'র তত্ত্ব-কথা এই প্রাণবাণীর মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে শুধু জন্মভূমির বন্দনা-গানরূপে গাহেন নাই, তাঁহাদের কণ্ঠে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে রণ-সঙ্গীতরূপেও গীত হইয়াছিল। 'আনন্দমঠে' প্রতিষ্ঠিত দেবী-মূর্তিকে প্রণাম করিবার কালে তাঁহারা যেমন "বন্দে মাতরম্" বলিয়া প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন, তেমনই সমরাঙ্গণে তাঁহাদের কণ্ঠে ইহা কখনও জয়-ধ্বনি কখনও বা রণনিনাদ-রূপে ধ্বনিত হইয়াছে।

'আনন্দমঠে'র প্রথম খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র দেবীমূর্তির মধ্য দিয়া মাতৃভূমির তিনটি রূপের বর্ণনা দিয়াছেন—'মা যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন' এবং 'মা যা হইবেন'। 'আনন্দমঠে'র ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ নবাগত মহেন্দ্রকে মায়ের তিনটি রূপ দেখাইবার পূর্বে যখন বিষ্ণুর অঙ্কোপরি মায়ের মূর্তি দেখাইলেন, তখন মহেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, ইনি মা। "মা কে?" জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।" আবার যখন প্রশ্ন হইল, "কে

তিনি ?” ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, “সময়ে চিনিবে; বল বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।”

ইহার পর মহেন্দ্রকে ‘মা যা ছিলেন’ সেই মূর্তি দেখাইয়া ব্রহ্মচারী তাঁহাকে ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ‘কালীমূর্তি’ দেখাইলেন। পরবর্তী বর্ণনা এইরূপ ঃ—

“ব্রহ্মচারী বলিলেন, ‘দেখ, মা যা হইয়াছেন।’

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, ‘কালী।’

ব্রহ্ম। কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হাতে খেটক খর্পর কেন ?’

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মা’র হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল—বন্দে মাতরম্।

বন্দে মাতরম্ বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন।”

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক মহেন্দ্র এবং আর একজন নবাগতের সন্তানধর্মে দীক্ষিত হইবার বিবরণ আছে। উভয় দীক্ষার্থীর সহিত সত্যানন্দের কথোপকথনের পর তিনি তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন—

“তোমরা গাও, ‘বন্দে মাতরম্’।

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।”

ইহার পর তৃতীয় খণ্ডে নবম, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলে আমরা শুনিতে পাইব রণোন্মত্ত ‘সন্তান’-সেনার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—রণ-ধ্বনি “বন্দে মাতরম্”, এবং গীত হইতেছে—সমর-সঙ্গীত “বন্দে মাতরম্”। নবম পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ যখন ইংরেজের তোপ কাড়িয়া লইবার জন্য আদেশ দিলেন, তখন “অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ” দশ সহস্র সন্তান-সৈন্যকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই অভিযানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ উভয়েই ক্ষত্রিয়-

বাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। একে অন্যকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় দুইজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হইল। অতঃপর পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হইয়াছে এই ভাবে :—

"ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, 'মরিবার প্রয়োজন হয়, আজই মরিব, যেদিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেইদিনই মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি?'

জীব। তবে এস।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান-সৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদের ভূমে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। এমন সময় ভবানন্দ বলিলেন, 'এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এমন সময় গাও 'বন্দে মাতরম্'!' তখন উচ্চনিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্র কণ্ঠে সন্তান-সেনা তোপের তালে গায়িল, 'বন্দে মাতরম্'।"

দশম পরিচ্ছেদের আরম্ভেই আছে :—

"সেই দশ সহস্র সন্তান 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া, অতি দ্রুতবেগে তোপ-শ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ডবিখণ্ড, বিদীর্ণ, উৎপতিত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তান-সৈন্য ফেরে না।"

ইহার পর একাদশ পরিচ্ছেদেও যুদ্ধের আরও বর্ণনা দিয়া যুদ্ধ শেষ করা হইয়াছে। এই বর্ণনার প্রথমাংশেই আছে :—

"...ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিনজন এই তোপটা দখল করি।' তখন তিনজনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাঁহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার

উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, 'বল বন্দে মাতরম্!' সকলে গায়িল 'বন্দে মাতরম্!'

বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে ভবানন্দ মারাত্মক ভাবে আহত হইলেন। "একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।" তথাপি তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। "ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছেন।" "ভবানন্দের বাম বাহু ছিন্ন হইল।" জননী-জন্মভূমির বীর সন্তানকে সস্নেহ-সমাদরে বৈকুণ্ঠ ধামে লইয়া যাইবার জন্য মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া—

"ভবানন্দ বলিলেন, 'সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি।'

"তখন ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে 'বন্দে মাতরম্' গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শব্দ রহিল না।

"সেই মুহূর্তে ভবানন্দ মুখে 'বন্দে মাতরম্' গায়িতে গায়িতে, বিষ্ণুপদ *ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।"*

আট

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে তরুণ কবি সুকণ্ঠগায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত 'বন্দে মাতরম্' তৎকালে শ্রোতৃমণ্ডলীকে কিরূপ মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট করিয়াছিল, উহার বিবরণ তথায় উপস্থিত বাংলার খ্যাতনামা দার্শনিক সাহিত্যিক ও মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ হইতে দিতেছি। তিনি 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন উহার নাম দিয়াছিলেন **"Genesis of 'Bande-mataram' the divinely inspired national anthem of India"**। সেই প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তিনি 'মার্শাই' সঙ্গীতও গীত হইতে শুনিয়াছেন। তাহা সত্যই মানুষকে প্রেরণা দান

করে। 'বন্দে মাতরম্' গানও যদি ঠিকমত গীত হয়, তবে শ্রোতার চিত্তে অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন—

"I have heard *La Marseillaise* sung by a deep tenor voice. It is really inspiring. It sheerly lifts you out of yourself and transports you to the region of the super-sensual. The '*Bande Mataram*' song, when rightly sung, has exactly the same effect. I had many years ago the good fortune of hearing '*Bande Mataram*' sung at the opening of a session of the Indian National Congress at Calcutta. The singer on the occasion was no other than Rabindra Nath Tagore. As I watched from the platform the vast audience gathered together from all parts and provinces of India, I could see that they were visibly moved. For the moment they were lifted out of themselves and their consciousness caught something of the spiritual message of the song—the message of one-pointed devotion to the Common Mother and of determination to stake one's all at the altar of patriotism."

পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পরে হীরেন্দ্রনাথের 'দার্শনিক বঙ্কিম' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হইয়াছে।

ভারতের প্রবীণতম সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও কংগ্রেসের পূর্বোল্লিখিত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"...রবীন্দ্রনাথের গীত এই 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিলাম।"... 'নারায়ণ', ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩২১-১৩২২ "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র"।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি,—"সুদূর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণে বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্ত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে—'বন্দে মাতরম্'।"

প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন :—

"...আজ আমার সেই দিনের কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সমগ্র

বঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' গানে মুখরিত। 'বন্দে মাতরম্'এর উদাত্ত সুর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কীর্তনের সুর পর্যন্ত কত সুরে কত জন এই গান গাহিতেছে! তখন ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া স্বধর্মত্যাগী কর্মযোগী ব্রহ্মবান্ধব স্বজাতিকে সরল ভাবে তাঁহার জাতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন—'সন্ধ্যা' তাঁহার প্রচার-বেদী; আর বিদেশী শিক্ষার মুকুটময়ূখে স্বদেশী ভাবের স্বরূপ নির্ণীত করিয়া ধ্যানযোগী অরবিন্দ ইংরাজী-শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে সে ভাব বুঝাইতেছেন—'বন্দে মাতরম্' তাঁহার বক্তৃতা-মণ্ডপ। ব্রহ্মবান্ধব বঙ্কিম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।..."

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীত হওয়ার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আর কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্' গীত হয় নয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে গীত হইতে থাকে। কিরূপ রাজনীতিক 'পরিস্থিতি'তে 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে স্বদেশী-যুগের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি:—

"বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলনের পূর্বে লর্ড কার্জনের উগ্র শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডেরাইসমাইল খাঁ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের একটি জেলা। শ্রীযুক্ত টহলরাম সেই জেলার একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তিনি লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কিয়ৎ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন এক আইন করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অধীন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন করিয়া, পাঠ্য পুস্তক হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলিয়া দিয়াছিলেন। বে-সরকারী কলেজসমূহে যে আইন পড়ান হইত, লর্ড কার্জনের প্রভাবে রিপণ কলেজ ব্যতীত আর সমস্ত কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে হাই স্কুল ও কলেজ সংখ্যা বেশী হওয়াতে উচ্চশিক্ষিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। লর্ড কার্জনের পরামর্শে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লর্ড কার্জন দেখিয়াছিলেন উকিলেরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা। উকিলের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার কমিয়া যাইবে। তাই আইন-কলেজের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে যুবকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং অত্যাচারী রাজপুরুষকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, তাই ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নানা কারণে লর্ড কার্জনের উপরে ভারতের শিক্ষিত সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত টহলরাম কলিকাতা আসিয়া ছাত্রদের প্রধান মিলনের স্থল কলেজ স্কোয়ারে লর্ড কার্জনের কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া অনেকগুলি যুবক তাঁহার অনুগত হয়। তাহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে পড়িত, সে হৃদয়-উন্মাদক গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিবার জন্য সহস্র লোক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইত। যে বন্দে মাতরং সঙ্গীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' লিপিবদ্ধ ছিল, হেমচন্দ্রই প্রথমে সেই সঙ্গীত কলেজ স্কোয়ারে গান করিয়া সহস্র লোককে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিত। ক্রমে দেখা গেল, কতকগুলি লোক টহলরামের বক্তৃতায় বাধা দিতে লাগিল।

"টহলরাম যুবকদিগকে "God bless our Mother Ind" এই সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন। যুবকগণ এই সঙ্গীত গান করিতে করিতে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিত। কতকগুলি অজ্ঞাত লোক ইহাদের উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিত। টহলরামের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিধিমত আয়োজন হইতে লাগিল। একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, কয়েক জন বলবান লোক তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া গোলদীঘির জলে ডুবাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। টহলরাম তবু বক্তৃতা বন্ধ করিলেন না।

"একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, কে একজন গোলদীঘির গাছের উপর হইতে বিষ্ঠার ভাণ্ড তাঁহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার দেহ বিষ্ঠায় আবৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মস্তক হইতে রক্তপাত হইতেছিল। তিনি সঞ্জীবনী আফিসে পুরীষপ্লাবিত দেহে আশ্রয় লইলেন। আমরা তাঁহার গাত্র হইতে পুরীষ প্রক্ষালন করিয়া এবং তাঁহার মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

"আর একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন একজন দুর্দান্ত লোক বৃহৎ লাঠি দ্বারা তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দেয়। রক্তে তাঁহার সমস্ত বস্ত্র লাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি সঞ্জীবনী আফিসে প্রবেশ করেন, কয়েক জন দুর্দান্ত লোকও তাঁহার অনুসরণ করিয়া সঞ্জীবনী আফিসে প্রবেশ করে। আমি একখানা ভুজালি লইয়া দ্বারদেশে গমন করি এবং যে টহলরামকে প্রহার করিবে তাহারই দেহে ভুজালি বিদ্ধ করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করি। তখন দুর্দান্ত লোকেরা দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। টহলরামের মস্তক হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল বরফের দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া দিই। তিনি একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দিই। সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতির পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন।"

কলিকাতার পুলিস গুণ্ডার সাহায্যে টহলরামের উপর পূর্বোক্তরূপ কাপুরুষোচিত অত্যাচার করাইয়াছিল বলিয়া তৎকালে অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। এই প্রকার সন্দেহের প্রধান কারণ এই যে, টহলরাম ছিলেন অন্য প্রদেশের অধিবাসী, এবং তিনি কলিকাতায় নবাগত বলিয়া কাহারও সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না; বিশেষত ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন মিত্র মহাশয়ের আত্মচরিতে বর্ণিত কারণে শিক্ষিত জনসাধারণের এতটা অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসন-নীতির কঠোর সমালোচনা শুনিয়া কিংবা তাঁহার তীব্র নিন্দা শুনিয়া কলিকাতাবাসী শ্রোতাদের মধ্যে কাহারও ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন সঙ্গত হেতু ছিল না।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন স্বদেশী-যুগে জাতীয়-সঙ্গীত গাহিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিদেশী সরকারের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং বরিশাল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে পুলিসের লাঠির আঘাতে আহত হইয়াছিলেন। লেখক তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে কলিকাতার তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটিতে সহকর্মী ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' গান সম্পর্কে মিত্র মহাশয়ের বর্ণনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাহা নির্ভুল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কি তাঁহাকে 'বন্দে মাতরম্' গান করিতে তখন উপদেশ দিয়াছিলেন, না, তিনি নিজ হইতেই তাহা গাহিতে আরম্ভ করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপদেশেই তিনি ঐ সময় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করেন। তবে সেই সময় তিনি ছাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন সিটি স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক।

নয়

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম—"কেন, 'বন্দে মাতরম্' এবং 'জনগণমন' দুইটি সঙ্গীতকেই যখন জাতীয়-সঙ্গীতের তালিকাভুক্ত করা হইল, তখন সম-মর্যাদা দিবার পক্ষে কি বাধা ছিল?"

প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত করিবার পূর্বেই ২৫শে জানুয়ারির দৈনিক সংবাদপত্রে আমরা একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। ২৪শে জানুয়ারি গণতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার পর ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জাতীয়-সঙ্গীত সম্পর্কে এই মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, 'জনগণমন' ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয়-সঙ্গীত-(National Anthem)-রূপে ব্যবহৃত হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে 'বন্দে মাতরম্' একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, উহাকে তুল্যভাবে সম্মানিত করা হইবে এবং সম-মর্যাদা দেওয়া হইবে।

"The composition and music of the song known as 'Jana Gana Mana' shall be used for official purposes as the National Anthem and the song 'Vande Mataram,' which

has played a historic part in our struggle for freedom, shall be honoured equally and shall have equal status with it."

প্রেসিডেণ্টের পূর্বোক্ত বিবৃতি গণপরিষদে সদস্যগণ কর্তৃক বিপুল আনন্দধ্বনির সহিত অভিনন্দিত হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়-পতাকার পরিকল্পনা ও প্রবর্তনের বহু পূর্বে বাংলা দেশে স্বদেশী-যুগে ইহা পরিকল্পিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত জাতীয়-পতাকায় সংস্কৃত অক্ষরে 'বন্দে মাতরম্' অঙ্কিত ছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক স্মরণোৎসবে কলিকাতায় পার্শিবাগান স্কোয়ারে বিরাট জনসভায় জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট (১৩১৩ বঙ্গাব্দ ২৪শে শ্রাবণ) তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সেই অনুষ্ঠানের যে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মিঃ আবদুল হালিম গজনবি সুরেন্দ্রবাবুর হস্তে নবনির্মিত জাতীয় পতাকাটি প্রদান করিলেন; সবুজ, পীত ও লাল রঙের জমির উপর প্রথম লাইনে আটটি পদ্ম, দ্বিতীয় লাইনে সংস্কৃত অক্ষরে বন্দে মাতরং, এবং শেষ লাইনে সূর্য ও অর্ধচন্দ্রাকৃতিই জাতীয় পতাকার চিহ্ন হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং গগনবিদারী বন্দে মাতরং ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন।..."

স্বদেশী-যুগে 'বন্দে মাতরম্' বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জনচিত্তে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মাত্র একটি ঘটনা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাই নগরে দশ সহস্র লোকের এক বিরাট সভায় "স্বদেশীয়তা" (Swadeshism) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভার বিস্তারিত বিবরণ এবং সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী বক্তৃতা ৩০শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সেই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেলে, ডাঃ এম. জি. দেশমুখ, অধ্যাপক এন. বি. রানাডে, মিঃ এম. গ্যাড্‌গিল প্রভৃতি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার উদ্বোধন করা হয় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিয়া এবং সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করা হয় সমবেত কণ্ঠের বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অভিভাষণের মুখবন্ধেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"...Nothing was more gratifying to me than the shouts of 'Bande Mataram' (loud cries of Bande Mataram) with which you welcomed me on my arrival here. It is our national cry—(Hear, hear), (loud cries of 'Bande Mataram')—not our battle-cry (laughter) but the cry of peace, good will and harmony among the different Indian races. (Hear, hear.) It is not a militant appeal to the goddess *Kali* to lead us to victory against the English (laughter)—but a soft, generous and fervent patriotic effusion reminding us of our great duty to our motherland (Hear, hear.) It has become the cry of Bengal. It has become the cry of Bombay. (Hear, hear.) It has extended to the farthest south and from the extreme south it has gone on in one grand sweeping march to the farthest north. May it prove one more bond to unify the Indian races (Hear, hear) in the services of our motherland (Hear, hear.)..."

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের ভবানীপুর অধিবেশনে 'বাঙ্গালার কথা' নামে বাংলা ভাষায় যে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' এবং স্বদেশী-আন্দোলন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁহার সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তখনও তিনি দেশবাসীর নিকট হইতে "দেশবন্ধু" আখ্যা পান নাই এবং নিখিল

ভারতের জননায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। তাঁহার পূর্বোক্ত ভাষণের এক স্থলে তিনি বলিতেছেন :—

"...তার পর বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাঙ্গালার মূর্তি গড়িলেন—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।' কিন্তু আমরা তো তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।'..."

তারপর তিনি 'শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মে পুনরুত্থানের আন্দোলন' সম্বন্ধে সংক্ষেপে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া স্বদেশী-আন্দোলনের প্রসঙ্গে আসেন। "আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার।" তাঁহাদের উক্তির অসারতা চিত্তরঞ্জন অল্প কয়েকটি সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়া দেন। তারপর তিনি বলেন :—

"...স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের

গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।' বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়। বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্ক-রাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জানিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।…"

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনে

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিস্বরূপ 'স্বাগতম্' নামে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গালার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ-বারি-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মা'র কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীর্বাণী—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী তুলিতে থাকে, মা-ও যেন প্রাণমন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।"

অভিভাষণের সমাপ্তি করিয়াছেন এই বলিয়া :—

"হে সাগ্নিক! আসুন, তবে সমস্বরে মা'কে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরে স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মা'র ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন। মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নীকৃতবাসে বলিব,—জননি, জাগৃহি!"

দশ

স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষীদিগের অন্যতম। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান, সাহিত্যিক প্রতিভা ও দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত শিক্ষিত বাঙালী সুপরিচিত। 'বন্দে মাতরম্'কে তিনি মন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষির আসন দিয়াছেন। অনুরূপ যুক্তিতে শ্রীঅরবিন্দ হীরেন্দ্রনাথেরও বহুপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি আখ্যা দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই দুইজন বাঙালী মনীষীর রচনা হইতে 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের প্রতি হীরেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, যখন একশ্রেণীর মুসলমান ইহার কতকাংশ বাদ দিবার জন্য প্রস্তাব করে, তখন তাঁহার ন্যায় ধীরস্থির মনীষী ব্যক্তিও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার তৎকালীন উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সম্প্রতি এই 'বন্দে মাতরম্' গীতের অঙ্গহানি করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। যাহারা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছে, তাহাদিগকে আমি পামর বিবেচনা করি।"—'দার্শনিক বঙ্কিম', "বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি"।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে সর্বজনীন করিবার জন্য পরে পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাব কংগ্রেসকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহারই ফলে ভারত-ব্যবচ্ছেদের কিছুকাল পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতেরও অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। তদবধি কংগ্রেসের অনুমোদিত অংশই জাতীয় অনুষ্ঠানে গীত হইয়া আসিতেছে।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"...কিন্তু 'আনন্দমঠ'ই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মহোজ্জ্বল মূর্তি। তাহার বহু পূর্বে রচিত কমলাকান্তের "আমার দুর্গোৎসব" মনে পড়ে কি? কি মাতৃভক্তির উদ্বেলিত উচ্ছাস!...

"কমলাকান্তের এই দুর্গোৎসবেই আমরা আমাদের অমোঘ অমিতদ্যুতি জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'এর উৎস দেখিতে পাই। যাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে এই মন্দাকিনীধারা উৎসারিত হইয়াছিল—যিনি দেশবাসীকে এই অমোঘ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তিনি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হন, তবে ঋষি কে?

"এ সঙ্গীত দৈবপ্রেরণায় রচিত। বঙ্কিমের হৃদয়তন্ত্রী সাময়িক ভাবে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের স্পর্শে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাই বঙ্কিম ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র—রচয়িতা নন।...

"এই অমোঘ জাতীয় সঙ্গীত যে 'আনন্দমঠে'র প্রাণস্বরূপ—সেই 'আনন্দমঠ' আদ্যোপান্ত ঐ মহোজ্জ্বল স্বাজাত্যবোধের ঝঙ্কারে মুখরিত, ঐ অতুল্য স্বদেশানুরাগের সুষমায় মণ্ডিত।...

"আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাজাত্যবোধের আদ্যাচার্য বলিতে চাই—The real father of Indian Nationalism."

শ্রীঅরবিন্দ কেবল বিপ্লবী ভারতের অন্যতম স্রষ্টা নহেন এবং বিপ্লবের অগ্নিযুগের মহানায়ক নহেন,—তিনি একজন মহাকবি ও মনীষী। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের তিনি ইংরেজীতে পদ্যানুবাদ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি ইহার ইংরেজীতে গদ্যানুবাদ করেন। অনুবাদকের বক্তব্যের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ এইরূপ মন্তব্য করেন, "বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে মাধুর্য, ভাব-দ্যোতনার প্রাঞ্জলতা এবং কবিত্ব-ব্যঞ্জনা-শক্তির অনন্যসাধারণ সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া ইহার অন্য ভাষায় পদ্যানুবাদ করা কঠিন। সেদিকের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক যাহাতে মূল সঙ্গীতের সঠিক ভাবে যথাসম্ভব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে আমি প্রতিটি ছত্রের গদ্যানুবাদ করিয়াছি।

"It is difficult to translate the National Anthem of Bengal into verse in another language owing to its unique union of sweetness, simple directness and poetic force. In order, therefore, to bring the reader unacquainted with Bengali nearer to the exact force of the original, I give the translation in prose line by line."

পূর্বোক্ত গদ্যানুবাদ, শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরে তাঁহার 'Bakim-Tilak-Dayananda' নামক পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে।

"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম এবং 'আনন্দমঠ,' 'বন্দে মাতরম্,' 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি রচনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি 'ঋষি (Rishi) ও 'সাধু' (Saint) বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি তাঁহার সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র 'বন্দে মাতরম্'এর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং পরে উহা তাঁহার 'Bankim-Tilak-

Dayananda' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন :—

"পরবর্তী কালের ঋষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামও স্থান পাইবে, কেন না, যে বন্দে মাতরম্ সঞ্জীবন-মন্ত্রে নব ভারতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা তাঁহারই দান।"

শ্রীঅরবিন্দের মতে, "বঙ্কিম-রচনাবলীর তত্ত্বকথাই হইল স্বদেশপ্রেমধর্ম এবং ইহাই 'আনন্দমঠে'র প্রাণ-বাণী। যে 'বন্দে মাতরম্' আজ অখণ্ড ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, সেই মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ওই প্রাণ-বাণীর অনবদ্য ছন্দোময় প্রকাশ।...মায়ের দর্শনলাভের উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দিয়াছেন।

"...The religion of patriolism,—this is the master idea of Bankim's writings....In Ananda Math this idea is the keynote of the whole book and received its perfect lyrical expression in the great song which has become the national anthem of United India...he gave us the vision of the Mother...

শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন :—

"বত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্কিম এই মহাসঙ্গীত রচনা করেন এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই তখন ইহা মনোযোগ দিয়া শুনেন। কিন্তু দীর্ঘকালের মোহ-নিদ্রাবসানে জাগরণের এক আকস্মিক মুহূর্তে বাংলার জনগণ সত্যের সন্ধানে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এবং এক শুভক্ষণে কোন ব্যক্তি 'বন্দে মাতরম্' গাহিয়া উঠিল। মন্ত্র দেওয়া হইল এবং একদিনেই সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। জননী সন্তানের কাছে আত্মপ্রকাশ করিলেন। জাতি একবার যখন মাতৃদর্শন পাইয়াছে, তখন সে পর্যন্ত আর উহার বিরাম নাই, শান্তি নাই, নিদ্রা নাই—যে পর্যন্ত না পূজামন্দির নির্মিত হয়, প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় এবং বলিদান হয়। যে মহাজাতির মাতৃদর্শন হইয়াছে, উহা কখনও আবার বিজেতার দাসত্ব-জোয়ালের নীচে আপনার ঘাড় নোয়াইতে পারে না।"

সেদিন শ্রীঅরবিন্দের মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়াছি :—"বাংলা

দেশ যে নিখিল ভারতের নেতৃত্ব করিবে এবং জাতীয় অগ্রগতিতে বাংলা যে পুরোভাগে থাকিবে,—ইহা বিধাতারই নির্দেশ।"

শ্রীঅরবিন্দ ঋষি, এবং ঋষি-বাক্য সত্য হইয়াছে। দেশ আজ স্বাধীন, জাতি আজ মুক্ত। কিন্তু ভারতকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে, জাতির আর্থিক জীবনে ধনী-নির্ধনে বৈষম্য দূর করিতে হইলে, সামাজিক জীবনে উচ্চ-নীচ ভেদ তুলিয়া দিতে হইলে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মহাভাবকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে— আবার আমাদিগকে 'আনন্দমঠে'র সন্তানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, এবং 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে। দেশকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিতে, জাতিকে দুর্ধর্ষ করিয়া গড়িতে, দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতে সন্তান-ধর্মের সর্বস্ব-সমর্পণের ও নিঃশেষে নিজকে বিলাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

নূতন সন্তান-দল গড়িয়া তুলিবার জন্য বাংলা আবার চাহিতেছে 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর ন্যায় একজন মহানায়ক। সেই মহানায়কের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য বাঙালীকে আবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের বাঞ্ছিত মহানায়কের আবির্ভাবে যেন আবার সেই সন্তান-দল গঠিত হয়, যাহারা 'আনন্দমঠে'র ভবানন্দের মত বলিতে পারিবে—

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—"

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

সংযোজন ঃ—গত বারে "কেদারনাথ ও বঙ্গসাহিত্য" প্রবন্ধে কেদারনাথের /০ আনা মূল্যের একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে; উহা—নন্দি শর্ম্মার 'কাশী-সঙ্গীতাঞ্জলি'। 'কাশীর-কিঞ্চিৎ' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২৭) ইহার বিজ্ঞাপন আছে।

নব-সংহিতা

হুড়ুম্বু ডাকিল, ভাই রে তুড়ুম্বু, ওঠ।

তুড়ুম্বু চোখ রগড়াইয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, বাঁশী বাজে কই?

হুড়ুম্বু বলিল, কল বিগড়ে গেছে। আর বাজবে না।

তুড়ুম্বু ব্যস্ত হইয়া বলিল, তাই নাকি? এখন কটা?

সাতটা। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি।

সর্বনাশ!—তুড়ুম্বু এক লাফে বিছানা ছাড়িয়া রুটিন-মাফিক প্রাতঃকৃত্যগুলি সারিতে লাগিল।

হুড়ুম্ব তুড়ুম্বু ২২০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক।

লাল-সাদার বর্তমানের দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে ভূগোলক লালে লাল হইয়া। পৃথিবীর সমাজ ধনতান্ত্রিকতা, ঔপনিবেশিকতা, সামন্ত-তান্ত্রিকতার খোলশ ছাড়িয়া সোশ্যালিজ্‌ম, তাহার পর প্রায় কম্যুনিজ্‌মের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাহার যেমন সাধ্য তেমনই খাটিবে, যাহার যেমন প্রয়োজন তেমন লইবে—এই নীতি সমাজ-জীবনে রূপান্তরিত হইয়াছে বিশ্বরাষ্ট্রের সীল-মোহরে খোদাই হইয়া।

হুড়ুম্বু তুড়ুম্বু সেই যুগের লোক।

হুড়ুম্বু হাসপাতালের ডাক্তার, তুড়ুম্বু ওয়্যারলেস কারখানার মজুর।

তবে দুইজনেই সমান। একই ব্যারাকে থাকে, একই ব্রেকফার্স্ট খায়, একই খবরের কাগজ পড়ে, একই মিলের জামা-কাপড় পরে। বাল্যশিক্ষার গুণে একই মহানেতার নামে উভয়ের হৃদয় একই তালে নৃত্য করে। তফাত এই, তুড়ুম্বু ডাক্তারী বিদ্যা জানে না। হুড়ুম্বু বেতার-উৎপাদনের সব রহস্যের খবর রাখে না। ইহা ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ নাই। তুড়ুম্বু যে ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে পারে নাই, তাহা তুড়ুম্বুর পিতার কোন অর্থ-কৃচ্ছ্রতার ফল নয়।

আসল কথা হুড়ুম্বু বা তুড়ুম্বু কাহারও কোন পিতা নাই। অর্থাৎ পিতা বলিতে এখন দুর্দশাগ্রস্ত যে লোকটির ছবি ফুটিয়া উঠে, যাহাকে বিবাহের পর হইতেই ছেলে-মেয়ে মানুষ করিবার ধান্ধায় চোখে অন্ধকার দেখিতে হয়, চাল নুন লকড়ি হর্‌লিক্‌স বার্লির ফাঁসে লটকাইয়া একদা-প্রিয়ার বর্তমান মুখনাড়া ও গঞ্জনায় যাহার দুই দণ্ড

ঘরে টিকিবার উপায় নাই, তেমন কোন ব্যক্তি আর ২২০১ সালে নাই। রাষ্ট্র আসিয়া তাহাকে ভারমুক্ত করিয়াছে। রাষ্ট্রই এখন অন্নদাতা, শিশুপালক। সেই পালক পিতার তরফ হইতে ল্যাবরেটরিতে মাপজোক করিয়া দেখা গিয়াছিল, শল্যবিদ্যায় হুডুম্বুর হাত খুলিবে আর তুড়ম্বুর হাতে ভেল্কি খেলিবে কারখানার হাতুড়ি। সেই মাপজোকের পরই দুইজনে দুই দিকে গিয়াছে।

হুডুম্বু তুডুম্বু জন্মিয়াছিল একটি মেটার্নিটি হোমে। সেই দিন সেখানে আরও ৫৯২১টি মাণবক প্রথম সূর্যের আলো দেখিয়াছিল। হুডুম্বু তুডুম্বুর নম্বর পড়িয়াছিল ৫৭০৪ ও ৫৭০৫। পাশাপাশি নম্বর বলিয়াই দুইজনে ভাব হইয়াছিল, বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। মেটার্নিটি হোম হইতে একই কিণ্ডারগার্টেনে আসিয়াছিল তাহারা। হুডুম্বু তুডুম্বুর মাতারা মেটার্নিটি হোম হইতে মুক্ত হইয়া কর্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়। ছুটিছাটায় মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইত। একটু বড় হইলে মায়া কাটিয়া গেল। মাতারা আশা ছাড়িলেন। কারণ আরও অনেকগুলি কিণ্ডারগার্টেনে তাহাদের যাইতে হইত।

রাষ্ট্রের দফা শুকাইয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যেমনটি বলা হইয়াছিল আর কি! সমস্ত সমাজ একটি অতিকায় একান্নবর্তী পরিবার। উহার ড্রাইভিং ফোর্স হইল—খাট, খাও-দাও, স্ফূর্তি লোট। আছে বড় বড় সর্বজনীন ব্যারাক, ইটিং হাউস, মেটার্নিটি হোম, হাসপাতাল, কিণ্ডারগার্টেন। মানুষ আর সংসারবিব্রত ন্যুব্জপৃষ্ঠ জীব নয়। মেয়েরাও আর হাঁড়িকুড়ি ও আঁতুড়ঘরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আদমের পঞ্জরাস্থি-নির্মিত অবলা প্রাণী নয়। ছেলেরাও সমানে প্রজাপতি, মেয়েরাও সমানে মক্ষিরাণী।

ভূতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

তুডুম্বু ব্যারাকের ক্যান্টিনে বিবিধ ভিটামিনযুক্ত মহার্ঘ প্রাতরাশ সারিয়া কারখানায় ছুটিল।

হুডুম্বু গেল হাসপাতালে ডিউটিতে।

বাহির হইবার পূর্বে হুডুম্বু বলিল, আজ বিকালে চিচিম্বু আসবে নাকি তুডুম্বু?

তুড়ুম্ব্ নির্বিকার কণ্ঠে বলিল, বলতে পারি না। জিজ্ঞাসা করব।

সুরটা কেমন যেন নির্লিপ্ত। হুড়ুম্ব্ চিন্তিত হইল।

হুড়ুম্ব এবং তুড়ুম্ব্ শিশুকাল হইতে উভয়েই একই অবস্থার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই রকমের হইয়া উঠিয়াছে সম্ভবত। তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্কট সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে, বন্ধুত্ব বুঝি ছুটিয়া যায়।

দুইজনের দৃষ্টি একই দিকে। দুইজনেই তাহা জানে। কিন্তু অবস্থা এখনও তত সঙ্কুল হয় নাই বলিয়া উভয়েই চুপচাপ আছে। দুইজনেরই গভীর বিশ্বাস, অন্যকে হটাইয়া দিবে।

চিচিম্ব্ তুড়ুম্ব্দের কারখানাতেই কাজ করে। বেতার-পরীক্ষক। যন্ত্রে কথা বলিয়া পরখ করে, যন্ত্রগুলি ঠিক হইয়াছে কি না! চোখে কথা বলে তুড়ুম্ব্র সহিত। অন্য কাহারও সহিত বলে কি না তুড়ুম্ব্ দেখে নাই। তুড়ুম্ব্র ধারণা, বলে না। তবে হুড়ুম্ব্র কথা আলাদা।

কারখানায় যাইবার পথে হুড়ুম্ব্র উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। হুড়ুম্ব্র আক্কেলখানা কি? চিচিম্ব্ তাহারই বান্ধবী। তাহার সহিত একদিন ব্যারাকে আসে। সেই সূত্রেই হুড়ুম্ব্র সহিত আলাপ। হুড়ুম্ব্ এখন তাহাকে লটকাইবার তালে আছে!

হাসপাতালের পথে হুড়ুম্ব্ ভাবিতেছে, তুড়ুম্ব্টি একটু বুদ্ধু। ভাবে, চিচিম্ব্ বুঝি তাহারই ধ্যানজ্ঞান-জপে বিভোর। সাদামাটা মানুষ। অমন খলিফা মেয়েকে চেনে নাই। চিনিবে কি করিয়া? মোটে তো কিণ্ডারগার্টেন পাস। তাহার পরই কারখানায় কল ঘুরাইতেছে। ডাক্তারি পড়ে নাই। চিচিম্বুর থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাজ যে অ্যাব্‌নর্‌ম্যাল, তাহা সে জানিবে কি করিয়া? তুড়ুম্ব্ শ্রেণীর লোককে এ শ্রেণীর মেয়ে বেশিদিন সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু তুড়ুম্ব্ তো স্বপ্নবিভোর।

চেম্বারে ঢুকিয়াই হুড়ুম্ব্ লাফাইয়া উঠিল, মিস চিচিম্ব্ যে! কাজে যান নি?

চিচিম্ব্ ব্যথাকাতর মুখে বলিল, যাব তো। কিন্তু বড় যে সর্দি।

সর্দি? দাঁড়ান, ওষুধ দিচ্ছি।

মহোৎসাহে আলমারি হইতে হরেক রকম শিশি বাহির করিয়া

ফেলিল সে। এক এক শিশি হইতে এক এক অনুপান লইয়া এক অত্যাশ্চর্য ভেষজ তৈয়ারি করিয়া ফেলিল।

নিন, রোজ তিন দাগ।

সর্দি সেরে যাবে ওতে?

হুড়ুম্বুর মুখে করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। আপনার তো একদিনের সর্দি। যা ওষুধ বানিয়েছি, তিন পুরুষের সর্দি ডাক ছেড়ে পালাবে।

চিচিম্বু ঔষধের শিশিটি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, ওযুধটা রেখে দিন তা হ'লে।

হুড়ুম্বু বিস্মিত হইল যৎপরোনাস্তি।

কেন? খুব ভাল ওযুধ দিয়েছি যে—

অসুখটা অত তাড়াতাড়ি সারাতে চাই না। সারালেই বিপদ।

বিপদ? বলেন কি?

সারলেই তো আবার কাজ। বরং কিছু দিন বুকে পুষে রাখলে—

হুড়ুম্বু হাসিল, তাই বলুন।

সে নূতন ঔষধ দিল। সর্দি কমিয়া যাইবে।

ঔষধ লইয়া চিচিম্বু বলিল, দেখুন দেখি অন্যায়। রোজ রোজ কাজ ভাল লাগে কারও?

হুড়ুম্বু মাথা চুলকাইয়া বলিল, কি করবেন বলুন? ভগবান এমনই বিধান করেছেন।

এর মধ্যে ভগবানের বিধানটা কোথায়? করেছে তো সব মানুষেই। ভগবান কি কোন অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন যে, লোককে এমনই রোজ আপিস যেতে হবে, না হ'লে সৃষ্টি বরবাদ হবে?

কিন্তু সবাই কাজ না করলে জগৎ-সংসার চলবে কি ক'রে?

চিচিম্বু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, আগে চলত কি ক'রে? সে যুগে তো কেউ কোন কাজ করত না। কিন্তু জগৎ কি অচল হয়ে গিয়েছিল?

নীতি—একেবারে রাজনীতির প্রশ্ন তুলিয়াছে মেয়েটি। হুড়ুম্বু বিশদ বুঝাইতে লাগিল, সে যুগে জগৎ-সংসার কি ভাবে চলিত। তাহারা কাজ করিত না বটে, তাহাদের হইয়া খাটিয়া মরিত প্রলিটেরিয়েটগণ। বড় কষ্ট পাইত তাহারা। কারখানায় ক্ষেতে খামারে তাহারা সোনার ডিম

পাড়িত, মামলেট খাইত অন্য লোকে। এই অসঙ্গতি প্রথম যাহার চোখে পড়ে, সকাল সন্ধ্যায় রেডিও টেলিভিশনে নিত্য তাহার স্তবপাঠ হয়। তাহা তো মিস চিচিম্বু শুনিয়াছেন। তিনিই সংহিতা রচনা করিয়া ঐ মামলেট খাওয়া বন্ধ করিবার পথ বাতলাইয়া দেন। সেই সংহিতা অনুসারেই—। বেশি আর কি বলিব? ছেলে-বেলায় স্কুলে এসব তো পড়িয়াই আসিয়াছেন।

চিচিম্বুর আজ বোধ হয় মাথা-খারাপ হইয়াছে, সে যত রাজ্যের উল্টা কথা, নিষিদ্ধ কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টটা একেবারে পুরাপুরি গেল কোথায়? এই যে রোজ সকালে বাঁশী আমার ঝুঁটি ধ'রে বিছানা থেকে উঠিয়ে কারখানায় পুরে কানে ধড়াচুড়া আঁটিয়ে সাত-আট ঘণ্টা চেয়ারে আটকে রাখছে, আমার এ কষ্ট কি কষ্ট নয়?

ও কাজ ভাল না লাগে, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে যান। অন্য কাজ দেবে।

সে কাজও তো আমায় করতে হবে?

তা হবে।

অর্থাৎ সেই একই দুর্ভোগ।

কিন্তু উপায় নেই। কাজ না ক'রে সংসারে থাকা অসামাজিক।

ব্যাপারটা কেমন জবরদস্তি নয় কি? আমার স্বাধীনতা—

ফাঁকি দেবার স্বাধীনতা? আপনার ভাগের কাজ করবে কে?

অন্যকে দিয়ে যদি করিয়ে নিতে পারি?

সেটা পিছনে ফিরে যাওয়া।

হুড়ুম্বু বুঝাইতে লাগিল, মিস্ চিচিম্বু মাথা খারাপ করিবেন না। এ সংসারের নিয়মই এই। কাজ না করিয়া জীবনধারণের চেষ্টা চৌর্যবৃত্তিরই মত অপরাধজনক। নিরাপদও নয়। ধরা পড়িলে জেল ফাঁসি হইতে পারে। হাঙ্গামায় কাজ কি? নমঃ নমঃ করিয়া শিবের মাথায় যেমন বিল্বপত্র দিতেছেন দিয়া যান। মাত্র ছয় ঘণ্টা তো!

এত দিন সেরেছি। আর তো পারি না। আজ বাঁশী বাজে নি। ভেবেছিলাম, রবিবার। জেগে উঠে দেখি, লেট।

আর সেইজন্যেই বুঝি অমনই সর্দি ধরল।

হুড়ুম্বু চক্ষু বুজিয়া চিন্তায় স্টার্ট দিল।

পেয়েছি, পেয়েছি, মিস চিচিম্বু। আপনার কিংকং রোগ হয়েছে।—কিছুক্ষণ চিন্তার পর হুড়ুম্বু বলিল।

কিংকং রোগ!

হ্যাঁ। আপনাকে এখন কিছুদিন হাসপাতালে পরীক্ষাধীনে থাকতে হবে।

তাহাকে ইন্‌ডোর পেসেণ্টরূপে ভর্তি করিয়া লইল হুড়ুম্বু।

করিয়া মনে মনে হাসিল।

একসঙ্গে তিনটি পাখি মারিবার ব্যবস্থা হইল। তুড়ুম্বুকে তফাতে রাখা। চিচিম্বুকে খুশি করা। নতুন রোগের গবেষণা করা বলিয়া নাম-প্রচার।

বিকালে তুড়ুম্বু ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।—হুড়ুম্বু, চিচিম্বু তো ফুড়ুৎ। আজ আপিসে আসে নি। নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে—

হুড়ুম্বু মুখে এক পোঁচ বিষাদ লেপিয়া বলিল, চিচিম্বুর কথা বলিস না ভাই। সে বাঁচে কি না-বাঁচে।

বটে?

হ্যাঁ। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাকে মারাত্মক কিংকং রোগে ধরেছে।

তুড়ুম্বু শিহরিয়া উঠিল, কিংকং রোগ! সে কেমন রোগ? কোন দিন তো নাম শুনি নি।

হুড়ুম্বু বুঝাইয়া দিল, রোগটা নূতন। ইহাতে লোকে সমাজ-সংসারের উপর সর্বদা খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। কাজকর্মে মন বসাইতে পারে না। সব কিছু ভাঙিয়া-চুরিয়া তচনচ করিতে চায়।

তুড়ুম্বু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, চিচিম্বু বাঁচবে তো ভাই?

বলা যায় না। কিছুদিন পরীক্ষা ক'রে দেখি তো আগে।

রজনীগন্ধার ঝাড় ও নানাবিধ ভোজ্যবস্তু লইয়া তুড়ুম্বু পরদিনই হাসপাতালে চিচিম্বুকে দেখিতে গেল।

রজনীগন্ধার ঝাড় টেবিলের নীচে ফেলিয়া দিয়া বিস্কুটের টিন ও

জেলির শিশিটি লইয়া বসিল চিচিম্বু। হাসপাতালে রোগীর ডায়েটে পেট চোঁ-চোঁ করিতেছিল। মুঠা মুঠা বিস্কুট জেলিযোগে সবেগে সৎকার করিতে লাগিল।

কিছু মনে ক'রো না তুড়ুম্বু। তোমার এই হুড়ুম্বু বন্ধুটি একের নম্বরের পাজী। কি ক'রে জেনেছে, তোমার সঙ্গে আমার একটু ইয়ে আছে। আর অমনই বাজে ডায়েট দেওয়া শুরু করেছে। তুমি রোজ রোজ এমনই কিছু খাবার,—শুধু শুকনো বিস্কুট নয়, টিনফুডও সঙ্গে এনো।—দুই-তিন গ্রাস বিস্কুট শেষ করিয়া তুড়ুম্বুর কানে কানে বলিল চিচিম্বু। তাহার পর টেবিলের নীচের রজনীগন্ধার দিকে তাকাইয়া বলিল, শুধু শুধু এগুলি আনা। তার চেয়ে ওই পয়সায় কিছু স্যাণ্ডউইচ এনো।

তুড়ুম্বু যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে।—নিশ্চয়ই। তুমি শিগগির ভাল হয়ে ওঠ।

চিচিম্বু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি কবে ভাল হব, ভগবান জানেন। এ রোগের ছাই ওষুধও নেই নাকি শুনছি।

তুড়ুম্বুর মন হু-হু করিয়া উঠিল। চিচিম্বু তাহা হইলে মরিয়া যাইবে? ব্যথাটা টনটন করিয়া মোচড় দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। চিচিম্বু ডাকিল, শোন। আমি তো এই হাসপাতালে প'ড়ে আছি। নতুন কি ফ্যাশান উঠল, খোঁজখবর রাখতে পারছি না। আমার হয়ে তুমি একটু ওদিকটা লক্ষ্য রেখো। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাসি ফ্যাশানের জামা-কাপড় প'রে আমায় যেন বেকুব বনতে না হয়।

তুড়ুম্বু সানন্দে ঘাড় নাড়িল।—ফ্যাশানের আবহাওয়ার উপর নজর রাখতে আমি আজ থেকে কাপড়ের দোকানগুলিতে টহল দিচ্ছি—

তুড়ুম্বু চলিয়া গেলে হুড়ুম্বু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুড়ুম্বু কি বললে?

চিচিম্বু রঙিন হাসিল, তোমার এই তুড়ুম্বু বন্ধুটি এক নম্বরের গবেট। ভেবেছে, বুঝি কিংকং রোগে আমি ম'রেই যাব।

চিচিম্বু হুড়ুম্বু উভয়েই সশব্দে হাসিতে লাগিল।

বাহকের মস্তকে টিনফুড স্যাণ্ডউইচ জ্যাম জেলি বিস্কুট নতুন ডিজাইনের শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি চাপাইয়া পরদিন বিকালে তুড়ুম্বু আবার আসিল।

তাহার সাপ্তাহিক বেতনের পনেরো আনা নিঃশেষ হইয়াছে।

প্রায় তিন মাস চিচিম্বু হাসপাতালে কাটাইল।

তুড়ুম্বু হালফিল শাড়ি ও র‍্যাশন যোগাইল। হুড়ুম্বু জোগাইল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট।

এই কয় মাসে তুড়ুম্বু রীতিমত সাত্ত্বিক হইয়া উঠিয়াছে। পুরানো জামাকাপড় সুনিপুণ রিপু করিয়া লইয়াছে। জুতাজোড়াকেও তদ্রূপ সূচিকার্যশোভিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে চুল ছাঁটে নাই একবারও। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সে যুগের শহীদদের স্টাইলে চুল রাখিতেছি। পূর্বে কিন্তু সে মাসে অন্তত দুই বার নিপুণ নরসুন্দরের হস্তে মস্তক সমর্পণ করিত। সিনেমা টেলিভিশন পান সিগারেট ছাড়িয়াছে। শনি-রবিবারে বন্ধুদের লইয়া একটু গলা ভিজাইত। চিচিম্বুর অসুখের পর সে বিলাস বন্ধ হইয়াছে।

তবু চিচিম্বু কেমন যেন। তুড়ুম্বুর দুঃখ হয়, এত করিয়াও—

তিন মাস পরে চিচিম্বু ছাড়া পাইলে হুড়ুম্বু বলিল, এখনও ভাল ক'রে সারে নি। সাবধানে থাকতে হবে। না হ'লে বিংশ শতাব্দীর চিঠির মত রোগটা আবার চাগিয়ে উঠতে পারে।

চিচিম্বু কাজে যোগ দিবার কয়েকদিন পরই কারখানার কয়েকটি মেয়েকে কিংকং রোগে ধরিল।

সঙ্গে সঙ্গে তুড়ুম্বুর মত তাহাদের বন্ধুদেরও পনেরো আনা বেতন অদৃশ্য হইতে লাগিল। হুড়ুম্বু গবেষণার খাতায় নোট করিল : রোগটা সংক্রামক।

মাস দুই পরে আবার চিচিম্বুকে রোগে ধরিল।

তুড়ুম্বুর জামাকাপড়গুলি একটু ভদ্র হইবার অবকাশ পাইতেছিল। বন্ধ হইয়া গেল। আবার পনেরো আনা বেতন অদৃশ্য হইতেছে।

ডাঃ হুড়ুম্বুর যশসৌরভ কিন্তু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

যেসব মেয়ের কিংকং রোগ ধরিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, তাহারা হুড়ুম্বুর হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল।

এমন ডাক্তার আর হয় না। হুড়ুম্বুকে নোবেল প্রাইজ দিবার আন্দোলনও শুরু করিয়াছিল তাহারা।

এবার হুড়ুম্বুর কপাল ভাল। মাস খানেকের মধ্যে চিচিম্বু ছাড়া পাইল। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য মাত্র।

প্রায়ই চিচিম্বুর কিংকং রোগ দেখা দিতে লাগিল এবং যথারীতি তুড়ুম্বুর পনেরো আনা বেতন অদৃশ্য হইতে লাগিল। তুড়ুম্বু হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, চিচিম্বুর কাজে উপস্থিতির দিনসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

একদিন তুড়ুম্বু দেখিল, বন্ধু নিশুম্বেরও অমনই মলিন বেশ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি, তোমার বান্ধবীরও কিংকং রোগ হইয়াছে?

নিশুম্ব ম্লান হাসিল।

তুড়ুম্বু দেখিল, সে শুধু একা নহে। সংখ্যাটা যেন বাড়তির দিকে।

চিরকালের আকাশে ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বৃষ্টি-ধোয়া নির্মল নীল আকাশে লঘুপক্ষ শরতের মেঘ, যাহা দেখিয়া বন্যযুগ হইতে বুর্জোয়াযুগ পর্যন্ত মানুষের চিত্ত নাচিয়া উঠিয়াছে, এই সব একাকারের যুগেও সেই আকাশ বাতাস তাহার সে নষ্টামি দুষ্টামি ছাড়িল না। তুড়ুম্বুর মনটা উন্মনা হইয়া উঠিল।

চিচিম্বু এখন ভাল আছে। কিছুদিন হইতে হঠাৎ রোগটা কমিয়াছে।

তুড়ুম্বু একদিন বলিল, সমুদ্রে বেড়াতে যাবে চিচু? তোমার চেঞ্জের কাজ হবে।

তুড়ুম্বুর ইচ্ছা, সেই ফাঁকে সে প্রপোজ সারিয়া ফেলিবে।

চিচিম্বু বিশেষ উৎসাহ দেখাইল না। শুধু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিল গেলেই হয়। দিন স্থির হইল।

সেদিন তুড়ুম্বু চিচিম্বুদের ব্যারাকে গিয়া দেখে, চিচিম্বু নাই।

শুনিল, চিচিম্বু হুড়ুম্বুর সহিত টেলিভিশনে গিয়াছে।

পরদিন দেখা হইলেই মহা অপ্রস্তুত হইবার ভঙ্গী করিয়া চিচিম্বু তুড়ুম্বুকে বলিল, দেখ দেখি কি ভুল! একেবারে ভুলে ব'সে আছি সমুদ্রের কথা। আচ্ছা, তুমি আর একটা দিন ঠিক কর তুড়ু—

টেলিভিশনে গিয়া হুড়ুম্বু চিচিম্বুকে বলিয়াছিল, এই সময় রামগিরির ঘা সিনারি! উঃ, যাবে চিম্বু?

চিচিম্বু যেন সানন্দে বলিল, গেলে হয়—

দিন স্থির হইল।

সেদিন ব্যারাকে গিয়া হুড়ুম্বু দেখিল, চিচিম্বু হাওয়া।

তুড়ুম্বুর অবস্থা শোচনীয়। সে ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছে যে, চিচিম্বু-চিড়িয়া তাহাকে ধরা দিবে না। অথচ ছুটাইতেছে নিরন্তর। হাসপাতালশায়ী চিচিম্বুর খরচ যোগাইতে প্রতি মাসেই তাহার পনেরো আনা বেতন অদৃশ্য হইতেছে। চাকরির পরোয়া না করিয়া হুড়ুম্বুও ক্রমাগত কিংকং রোগের সার্টিফিকেট দিয়া তাহার হাসপাতালে কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। ইতিমধ্যেই কিংকং রোগ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে। কেহ কেহ কমিশন বসাইবার কথাও বলিতেছে। চিচিম্বু কিন্তু তোফা আরামে আছে। বাঁশীর শব্দে জাগিয়া তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে কলে ছুটিতে হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভূস্বামী শ্রেণীর মত যখন খুশি শয্যা ত্যাগ করে। তাহার পর উপঢৌকনের চর্ব্য-চোষ্যে প্রাতরাশ সারিয়া কাব্যকাহিনীর কথা-সাহিত্য পাঠ করে। সেগুলি সাম্প্রতিক কালের নয়। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পোকায়-কাটা পুরানো বই। প্রতিক্রিয়ার আমলের। এ সব এখন আর ছাপা হয় না, বয়স বাড়িয়া উহা ক্লাসিকাল সাহিত্যের মর্যাদা পাইয়া সাধারণের অপাঠ্য হইয়াছে বলিয়া নহে। পড়িতে পড়িতে চিচিম্বু তাহা অনুমান করিতে পারে। কি করিয়া চুটাইয়া সুখ ভোগ করিতে হয়, সে যুগের মানুষই তাহা জানিত। সেসব সোনার দিনের কাহিনী পাঠ করিয়া পাছে লোকের চোখ খুলিয়া যায়, বর্তমানে এই পীড়নমুক্ত হইবার জন্য তাহারা দাপাদাপি শুরু করে, এই ভয়েই এই সব মহৎ সাহিত্যকে ক্লাসিকাল সাহিত্যের পর্যায়ে উঠাইয়া লাইব্রেরির র‍্যাকে রাখিয়া পোকায় কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া নিত্য জোয়াল ঠেলিতে হইবে না, অথচ মন্ত্রবলে সকল ইচ্ছা পূরণ করা চলিবে। শুধু মন্ত্রের সাধনায় সফল হওয়া চাই।

এমন একটা চমৎকার সুব্যবস্থা ছিল যে সময়ে, তাহাকেই কিনা মূর্খ পূর্বপুরুষেরা খোঁচাইয়া পিটাইয়া শেষ করিল!

তুড়ুম্বু চিন্তার শেষে হাই তুলিয়া মনে মনে বলিল, হ্যাঁ, বেশ তোফাই আছে চিচিম্বু—

অনেক ঘাই খাইয়া তুড়ুম্বুর মনে তখন নির্বেদ আসিয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের তুরীয় অবস্থায় সে ব্যোম হইয়া বসিয়া আছে। এবার তাহার সন্দেহ হইতেছে, হয়তো চিচিম্বু হুড়ুম্বুকেই—

সহসা নিশুম্ব হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।—খবর শুনেছ?

কি?—সাগ্রহে তুড়ুম্বু জিজ্ঞাসা করিল।

চিচিম্বু আর ফ্যাক্টরির ডাইরেক্টর-জেনারেল---

সত্যি?

বাজারে জোর গুজব। চিচিম্বু কাল আপিসে আসে নি। আজও না। হাসপাতালেও নেই।

তুড়ুম্বুর মনে পড়িল, ইদানীং চিচিম্বুর কাজে মনে বসিতেছিল। এখন সে তাহার কারণ বুঝিতে পারিল। ডাইরেক্টর-জেনারেলের সঙ্গে বেতারে আলাপ চালাইবার দরকার ছিল।

এবার তুড়ুম্বুর হাসিবার পালা। যাক, হুড়ুম্বুও তাহা হইলে মরিয়াছে। যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নহে।

তুড়ুম্বুর তখন স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। ঊর্ণনাভের শাবকাকীর্ণ ডিম্বস্থলীর মত তাহার মস্তকে মহৎ মহৎ ভাব কিলবিল করিতেছে।

চঞ্চল হইয়া সে কাগজ-কলম টানিয়া লইল। হঠাৎ বুঝি 'মা নিষাদ' ফ্ল্যাশ আসিয়াছে।

এবার ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ডাকিল হুড়ুম্বু, ভাই রে তুড়ুম্বু, আয়, দুজনে গলা জড়াজড়ি ক'রে কাঁদি।—বলিয়া সে সত্যই কোঁৎ টানিতে লাগিল।

তুড়ুম্বুকে কলম রাখিতে হইল।—কেন, ডাইরেক্টর-জেনারেল ছোঁ মারিয়াছে বলিয়া নাকি?

আর ডাইরেক্টর-জেনারেল! ওর সাহায্যে ভাব ক'রে এখন সে মহানায়কের ছেলের দিকে ছুটেছে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার আরও সংক্ষেপে করুণানিধানের কবি-কর্মের এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন, "করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।"

করুণানিধানের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ 'শতনরী'র সম্পাদক কবি কালিদাস রায় লিখিয়াছেন, "তিনি সমগ্র সৃষ্টিকেই দেখিয়াছেন—স্বপ্নজালের চিকের মধ্য দিয়া। এই দৃষ্টির ফলে সমগ্র সৃষ্টিই কবির কাব্যে অভিনব রহস্যময় রূপ লাভ করিয়াছে। সৃষ্টির এই স্বপ্ন-রহস্যময় রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। করুণানিধান এই রূপ-মুগ্ধতার ধ্যানযোগী।... কবির কাব্যে ধ্বনির সহিত রূপের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে।"

কবি করুণানিধানের জীবনী বৈচিত্র্যহীন, বিফল প্রয়াস ও একটানা আশাভঙ্গের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু এই বিফলতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তিনি অমৃতরসের ও অনাবিল শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন; বাস্তব-জীবনের অভাব তিনি স্বপ্নজীবনের সম্পদ দিয়া ভরিয়া তুলিয়াছেন, এইখানে রোগ শোক জরা দারিদ্র্য তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার শিশুসুলভ সন্তোষ এবং উদার প্রসন্নতা বঙ্গকবি-কুলের বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে; তাঁহার কবি-জীবন বাংলা দেশের বঞ্চিত লাঞ্ছিত বাণীসাধকদের সান্ত্বনা-স্থল। তাই তাঁহার জীবনী যতই সংক্ষিপ্ত হউক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নদীয়া-শান্তিপুরের যে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে কবির জন্ম তাঁহাদের আদি নিবাস হুগলির গুপ্তিপাড়ায়। পিতামহ চন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাস হইতে পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন হইতেই এই পরিবারের শান্তিপুরে বাস। চন্দ্রনাথ স্থানীয় মিশনরি সাহেবদের কাছে যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পূর্বে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় যান এবং তাঁহার ইংরেজী বিদ্যার জোরে বিলাতী সওদাগরী আপিসে মাসিক এক শত টাকা বেতনে



চাকরিতে বহাল হন। এই চাকুরির উপার্জন হইতেই চন্দ্রনাথ কলিকাতায় ডাফ স্ট্রীটে ও আহিরিটোলা স্ট্রীটে দুইখানি বাড়ি নির্মাণ করেন। বর্ধিষ্ণু চন্দ্রনাথ স্বজনপ্রতিপালক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

কবির পিতা নৃসিংহচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়াই বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পাস করিতে পারেন নাই। বি. এ. ফেল নৃসিংহচন্দ্র অতঃপর শিক্ষকতা করিয়া জীবনাতিপাত করেন। প্রথমে বরিষা (২৪-পরগণা) বে-সরকারী স্কুলে এবং পরে দুমকা পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে

গবর্মেণ্ট স্কুলে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হন। শান্তিপুরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি রামনাথ তর্করত্নের সহোদরা নিস্তারিণী দেবীর সহিত নৃসিংহচন্দ্রের বিবাহ হয়। ইঁহাদের একমাত্র সন্তান করুণানিধান ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ (১৮৭৭, ১৯ নবেম্বর) সোমবার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে নানা বিপর্যয়ে পিতামহ চন্দ্রনাথের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে, কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় ও তিনি শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। নৃসিংহচন্দ্র চাকুরি ব্যপদেশে বাহিরে বাহিরে থাকিতেন বলিয়া শান্তিপুরেই কবির শিক্ষারম্ভ হয়। এগারো বৎসর বয়সে উপনয়নের পর নৃসিংহচন্দ্র পুত্রকে বি. এন. রেলওয়ের আদরা স্টেশনের সন্নিকটে গোবিন্দপুরে লইয়া যান। পঞ্চকোট রাজস্কুলের তদানীন্তন হীন শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য নৃসিংহচন্দ্র গবর্মেণ্ট কর্তৃক ইহার কিছু দিনের মধ্যেই প্রেরিত হইলে করুণানিধান সেই স্কুলেই ভর্তি হন। নৃসিংহচন্দ্র সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে থাকিত, তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এই বই ও পত্রিকাগুলি বালক করুণানিধানের অবসর-বিনোদনের সঙ্গী ছিল। পঞ্চকোটের আশেপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমারোহ, পাহাড়ের পরে পাহাড়, শাল-পলাশবন এবং স্বচ্ছতোয়া গিরি-নির্ঝরিণীর অবিরাম প্রবাহ; রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মুগ্ধ বালকের মনে এগুলি অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিত। কাব্য ও প্রকৃতির এই পরিবেশের প্রভাবে কিশোর-চিত্তে কাব্যের উন্মেষ এবং একাদশবর্ষীয় কবির পাহাড় সম্বন্ধীয় প্রথম কবিতা রচনা। ১২৯৭ সালে, কবির তেরো বৎসর বয়সে, পিতামহ চন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পিতার শ্রাদ্ধে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া নৃসিংহচন্দ্র তাঁহাকে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া কার্যস্থলে ফিরিয়া যান। এই শিক্ষালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় করুণানিধানের পিতৃবিয়োগ হয়। পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন, নিস্তারিণী দেবীর এই বাসনা ছিল। তিনি স্বামীর আত্মীয়দের কৌশলে

সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া তখন নিঃস্ব, তথাপি পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে করুণানিধান শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করেন। মায়ের চেষ্টায় তিনি কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশ জয় করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। স্বামীজীর আদর্শমুগ্ধ যুবক কবি করুণানিধান সেই সংবর্ধনা-সভায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই কবিতার গোড়ার এই পংক্তি দুইটি মাত্র কবির স্মরণে আছে—

"এস এস এস বিবেকানন্দ,
ভারতের ধ্রুব পূর্ণ চন্দ।"

'সময়' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বেই ছাপার অক্ষরে কবির কবিতা-প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার যত দুর স্মরণে আছে, কলিকাতা হরিতকীবাগান শাস্ত্রপ্রচার কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা "সিন্ধুতটে" (?) বাহির হয়। তাহার দুইটি পংক্তি এইরূপ—

"পূর্ণ জোয়ার জলের উলটি পালটি
দিগ্‌দিগন্তে শারদ-জ্যোৎস্না ঢালা।"

১৩০৭ সালে শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত 'লহরী' পত্রিকাতেও ইহারই অব্যবহিত পরে তাঁহার "বর্ষায় তন্তুবায়" কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

কাব্যসাধনা ও কলেজের বিদ্যাভ্যাস সমান নিষ্ঠার সহিত করিবার মত উৎসাহ করুণানিধানের ছিল না। সুতরাং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া তিনি অকৃতকার্য হন। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা—কাজেই কলেজ পরিবর্তন করিয়া তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পাস করিতে বাধ্য হন। এদিকে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে

সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'ঝরা ফুলে'র আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশংসাসূচক আলোচনা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন। করুণানিধানের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি হাওড়া গবর্মেণ্ট স্কুলে বদলি হন। এখানে নিয়মিত বেতন উত্তরপাড়ার সমান থাকিলেও টিউশনির আয় বাড়ে। হাওড়ায় থাকার সময় সতীর্থ সতীশচন্দ্র বাগচী ও সংস্কৃত কলেজেয় অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের চেষ্টায় তিনি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের কর্মচারীরূপে মাসিক এক শত টাকা বেতনে যোগদান করেন।

'শান্তিজল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার 'ধান-দূর্ব্বা,' কবিতার চয়ন 'শতনরী' ও 'রবীন্দ্র-আরতি' প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৫, চৈত্র) গুডফ্রাইডের দিন তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়—তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরীর মেয়াদ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ফলে পেনসনের পরিমাণ কমিয়া মাত্র ৮০ টাকায় দাঁড়ায়।

ইহার পর হইতেই কবি নিজের খেয়াল অনুযায়ী নানা স্থানে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও স্থির হইয়া বসবাস করিতে পারেন নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই তাঁহার শেষ বাণীসাধনা। পরে গীতার মর্মকথা 'গীতায়ন' লিখিয়াছেন, কবিতাচয়ন 'শতনরী'কে আবার ঢালিয়া সাজাইয়াছেন; কিন্তু নূতন কাব্যসৃষ্টি করেন নাই। প্রকৃতির—বিশেষ করিয়া পাহাড় ও সমুদ্রের আকর্ষণ তেমনই আছে; কিন্তু দেহ অপটু, ভ্রমণের আনন্দ হইতে তাই বঞ্চিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার বীডন স্ট্রীটে এক বন্ধুর স্নেহ-আশ্রয়ে সঙ্গীহীন কবি শান্ত সমাহিত চিত্তে পরপারের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সংবর্ধনা ও সম্মান

এই নিরহঙ্কার, নিভৃতে বাণীসাধনায় অনুরাগী, আত্মগোপন-প্রয়াসী কবি প্রকাশ্য সংবর্ধনা ও সম্মান যে বেশি পান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হাটের মাঝখানে বসিয়া হট্টগোল শুনিবার প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি তাঁহার ছিল না। তৎসত্ত্বেও অনুরাগী ভক্তজনের পাল্লায় তাঁহাকে একাধিক বার পড়িতে হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজ কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে হাজার টাকার সম্মান-দক্ষিণাসহ যে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জামসেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য সমিতি, কাশী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ও ই. আই. রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, বর্দ্ধমান সাহিত্য-পরিষৎ, সিঁথি বৈষ্ণব সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতি হইতেও নানা সময়ে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিয়া মানপত্রাদি দেওয়া হয়।

বিগত ২১ জানুয়ারি ৭ মাঘ ১৩৫৬ শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ৫ অগ্রহায়ণ কবির ৭৩ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এক হৃদয়গ্রাহী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আড়াই শত টাকার সম্মান-দক্ষিণা দিয়া কবিকে সংবর্ধিত করেন। বাংলা দেশের নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; কবি, কথাসাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের এমন সম্মেলন সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি তিরানব্বই-বর্ষীয় আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাসস্থান বাঁকুড়া হইতে আসিতে না পারায় স্থায়ী সহ-সভাপতিদের অন্যতম শ্রীসজনীকান্ত দাস সভার কার্য নির্বাহ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত উদ্বোধনী সঙ্গীতটি শ্রীসুকৃতি সেন ও তাঁহার সম্প্রদায় কর্তৃক গীত হয়—

রবীন্দ্র-উত্তর বঙ্গে অগ্রজ কবি তুমি ধন্য,
ভাষারে কর নি তুমি ভাষ্য, কাব্যে কর নি তুমি পণ্য,—
যা কিছু লেগেছে ভাল চক্ষে
তুমি কবি ছিলে তার পক্ষে,
অর্ণব পর্বত সর্পিল মেঠো পথ তরল তটিনী মহারণ্য—
বন্দনা-গানে তব রূপ নিল অভিনব, হে রূপরসিক, তুমি ধন্য।

দেখেছিলে একদিন প্রিয়াময় অখণ্ড অখিল,
যৌবন-গরবী গ্রীবা, কপোল-তলের ছোট তিল।
আজ তুমি দেখিতেছ ব্রহ্মময় নিখিল ভুবন
রূপ থেকে অরূপেতে স'রে গেছে অনুরাগী মন।
যুগলের উপাসক, মুখে সীতারাম রামসীতা
গীতশেষ অপরাহ্নে, কণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ রচে গীতা।
সরল শিশুর মত কোনখানে নাহি অভিমান—
ভালবাসা পেশা তব, তুমি ভক্ত, তুমি মহাপ্রাণ।
কি গৌরব! কি সৌরভ! কোথা সুবাসিত সে প্রান্তর?
আজ আছ দাঁড়াইয়া পুষ্পশেষ তুমি নাগেশ্বর।
নাহিক আতসবাজি—নিভিয়াছে সে তারার হার,—
মহাকুম্ভমেলা শেষে তুমি আছ যেন হরিদ্বার।

কবি কালিদাস রায়, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া সভায় কবিকে সংবর্ধিত করেন। তন্মধ্যে কালিদাস রায় ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার সম্পূর্ণ কবিতা দুইটি ও শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দীর্ঘ কবিতার দুইটি স্তবক এখানে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল—

১। ভাবঘোর স্বপ্নে ছিলে আজি তুমি সত্যের সন্ধানী,
ঊর্ধ্বপানে তুলিয়াছ ঝরা ফুলে ভরা যুক্তপাণি।
কল্পলক্ষ্মী ছিল তব হৃদয়ের পদ্মাসন 'পরে
আজি সেথা নারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে।
তব লীলাসঙ্গিনীরে আজি তব মনে পড়ে কবি,
মালঞ্চে যাহার সাথে তুলেছিলে মল্লিকা-মাধবী?
মনে পড়ে আজ কবি রাখালিয়া সেই বাঁশীটিরে?
ফেলিয়া এসেছ যারে জলবেণী রম্যা রেবা তীরে?
সে নিসর্গ সুন্দরীরে মনে পড়ে দিয়া হাতছানি
দেশ-দেশান্তরে কবি তোমারে যে নিয়ে গেল টানি,
পার হয়ে বহু নদী গিরি বন দূর—দূর পথে
দাঁড়ায়েছ আজি নীল উত্তরঙ্গ অর্ণব সৈকতে।

শিরে তব চমকিছে বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদ,
প্রত্যেক তরঙ্গ আনে অজানা সে দেশের সংবাদ।
পশ্চাতে ফিরিয়া চাও, দাঁড়াইয়া অনুজ তোমার,
যাচে তব অনাময়, হে অগ্রজ, লহ নমস্কার।

২। সেদিন ছিল যে স্বপ্ন আকুল, কত-না স্বপ্ন বেড়ায় ঘুরে,
স্বর্গ-মর্ত্য স্বপ্ন-খচিত, স্বপ্ন নিকটে, স্বপ্ন দূরে।
স্বপ্ন তো নাই, আজিকার দিন তীব্র তপ্ত রৌদ্র-ভরা,
জীবন এখন বেদনা-বিদ্ধ শ্রান্ত মানব, আর্ত ধরা।
সেদিনের সেই স্বপ্নের সুরে এত আনন্দ তাই তো পাই,
তাই তো মিলেছি এখানে সকলে, আমরা তোমাকে নিকটে চাই।
রবির কিরণ নোনা ও আতার সোনার গায়ে যা পিছলে পড়ে,
আকাশের মেঘে সে আলোক লেগে রামধনু রঙ সৃষ্টি করে।
দীপ্ত দুপরে তৃণের উপরে তমালকুঞ্জে জাগায় ছায়া।
সে আলো সন্ধ্যা প্রভাত বেলায় ধরায় ধূলায় বুলায় মায়া।
রবির দীপ্তি, সঞ্চিত থাকে শুক্লা রাতের চাঁদের বুকে,
জ্যোৎস্না-রূপে তা ঝ'রে পড়ে, মন উল্লসি ওঠে মধুর সুখে।
তাই তো তোমার কাণ্ড কবিতা স্নিগ্ধ-কোমল জ্যোৎস্না মাখা,
অমরী বালার কণ্ঠমালার ফুলের গন্ধ ধরিয়া-রাখা।
হে কবি, তোমার যূথী-মালঞ্চ গেল অজস্র ভরিয়া ফুলে,
ঝরা ফুলে গাঁথা মঞ্জুল হার পরালে কাহারে আপনা ভুলে।
দেবীর প্রসাদ পেলে তুমি, কবি, সার্থক হ'ল স্বপ্ন সাধ
বর্ষিত হ'ল তোমার শিরে যে ধান-দূর্বার আশীর্বাদ।
করুণা-কোমল তোমার হৃদয়, করুণা-স্নিগ্ধ তোমার প্রাণ,
কিশোর মনে কি সাড়া দিয়ে গেল, করুণানিধান, তোমার গান।
তোমারে আজিকে নিকটে পাইয়া হৃদয় আমার উঠেছে ভরি,
ছন্দ-দুলাল অগ্রজ কবি, অভিনন্দন তোমায় করি।

৩। স্বপ্নলোকের কুঞ্জকাননে ছন্দবিভল্ চন্দনাপাখী তুমি
বন্দনা দিতে আসিয়াছি পদতলে,
নাহি চন্দন, অভিনন্দিতে নিঃস্ব দীনের কুণ্ঠিত লাজে বাণী
লহ গো বন্ধু অর্ঘ্য অশ্রুজলে।

৮। **শতনরী** (কাব্যসঞ্চয়ন)। ভাদ্র ১৩৫৫ (ইং ১৯৪৮)। পৃ. ২৫৪ + ২
সম্পাদক—শ্রীকালিদাস রায়।

৯। **গীতায়ন** (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবলম্বনে)। জন্মাষ্টমী, ১৩৫৬ (ইং ১৯৪৯)। পৃ. ৪৮ + ৵০।

১০। সম্পাদিত মাসিকপত্র **'শান্তিপুর'**ঃ ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র-রূপে 'শান্তিপুর' নামে মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। করুণানিধান এক বৎসর এই পত্রের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন।

সংবাদ-সাহিত্য

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের উপর অকস্মাৎ পীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভারতবর্ষের ২৬ জানুয়ারির সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ-প্রতিষ্ঠার উৎসব-আনন্দকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই অত্যাচারের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আত্মীয়লাঞ্ছনের বেদনার উত্তেজনাবশত হয়তো স্বভাবতই তাহাতে অতিরঞ্জন আছে; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমরা যখন চক্রচিহ্নশোভিত পতাকা উড়াইয়া আতশবাজি ও আলোকমালার মধ্যে উৎসব-আনন্দে রত ছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের আপন জন দলে দলে পশ্চাতে সর্বস্ব ফেলিয়া রাখিয়া ভগ্নদেহে ও ভগ্নমনে পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বহরমপুর বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে পলাইয়া আসিয়া আমাদের উৎসব-দিনের সহকারশাখা ও মঙ্গল-কলসকে মিছা করিয়া দিয়াছে। অর্দ্ধেকে ত্যাগ করিবার যে বিধান পণ্ডিতদের পক্ষে খাটে, আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ সে বিধান মানিতে পারি না; অর্দ্ধ অঙ্গে আঘাত লাগিলে আমাদের অপরার্দ্ধ বেদনায় টনটন করিয়া উঠে। আমরা তখন হয়তো অন্যায় ভাবে হাত-পা ছুঁড়িয়া সেই বেদনা প্রকাশ করি। পশ্চিমবঙ্গে ইহার পর যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই এই বেদনার প্রকাশ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মতলববাজ পিশাচেরা যে গভীর মতলব লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ

নাই। ভারত-রাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ-রাষ্ট্র স্বতই শঙ্কিত হইয়াছেন। এ কথা নিঃসংশয়ে ঠিক যে, দুই-চারিটি গৃহ বা বস্তির উপর হামলা করিয়া দুই-চারি জনকে উচ্ছেদ করিলেই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। মীমাংসা করিতে পারেন উভয় রাষ্ট্রের কর্তারা। বার বার দেড় ছটাক জমি বা আড়াই কাঠা চরের জন্য বহু ব্যয়ে কমিশন না বসাইয়া সর্বাগ্রে সকল দিক বিচার ও আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন—পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শেষ পর্যন্ত নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারিবে কি না, তাহাদের আত্মমর্যাদা ও নাগরিক অধিকার স্পষ্টত অথবা ইঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ ঘটিবে কি না? যদি তাঁহারা বিবেচনা করেন থাকা সম্ভব নয়, তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্রের সম্মতিতে সম্পূর্ণভাবে প্রজাবদল হওয়া বিধেয়। এক পক্ষ চিরকালই মার অথবা চোখ রাঙানির ভয়ে শঙ্কিত বিপর্যস্ত ও ত্রস্ত থাকিবে, এবং অন্য পক্ষ সুখে ও শান্তিতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অধিকার ভোগ করিবে ইহা ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয় যতদিন পর্যন্ত এ-বঙ্গে ও-বঙ্গে নাড়ীর টান থাকিবে। স্থানত্যাগের দুঃখ অনেক; কিন্তু বাধ্য হইয়া স্থানত্যাগের চাইতে স্বেচ্ছায় স্থানত্যাগ নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার বসুর 'গান্ধীচরিত' পুস্তকের ২০৪-৮ পৃষ্ঠায় "সেনাপতি গান্ধী" প্রবন্ধে প্রদত্ত গান্ধীজীর মতামত বিশেষ ধীরতার সহিত বিবেচ্য। বাংলা দেশের এই সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যার সমাধান না হইলে দিল্লীর তখ্‌তে নিশ্চিন্তে বসিয়া শাসনকার্য পরিচালনা কখনই চলিবে না। ভারতবর্ষের শান্তির ইহাই গোড়ার কথা।

* * *

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যাও কম গুরুতর নয়। এই অসহায় ভাগ্যহতের দল মার খাইতে খাইতে কোণঠাসা হইয়া এবার অনেক স্থানেই উগ্রদংষ্ট্রা বাহির করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছেন। আঘাতে আঘাতে ইঁহারা শক্ত হইয়াছেন, সংখ্যার বৃদ্ধিতে ইঁহাদের সঙ্ঘশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসহায়ের আবেদন অনেক ক্ষেত্রে অবুঝের দাবিতে পরিণত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের সব সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে—ইঁহারা বহুপুরুষের ভিটা, অন্নসংস্থানের উপায়, সঞ্চিত সম্পত্তি, এক কথায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন,

স্বেচ্ছায় আনন্দ করিতে আসেন নাই। সুবিধাবাদী কেহ কেহ ে উপার্জনের অন্য উপায় ও স্থায়ী আশ্রয় সত্বেও গাছের খাইয়া তলার কুড়াইবার ফিকিরে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশই নিরাশ্রয় সর্বহারা। ইঁহাদিগকে অন্যের সম্পত্তিতে বা অধিকারে চড়াও হইতে বাধ্য না করিয়া রাষ্ট্র যদি পুনর্বসতির উপযুক্ত আয়োজন করেন, তাহা হইলে ভারত-রাষ্ট্রের ইঁহারাই একদিন সর্বাধিক শক্তিশাল অংশ হইয়া উঠিবেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় আমাদের যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা কাজে না লাগাইলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, দশ দিনের লঙ্গরখানা খুলিয়া বহির্দ্বারে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষকে বাঁচানো যায় না, তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হয় মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের লইয়া যদি আত্মশক্তি বর্ধিত করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সযত্নে ও সমাদরে আত্মীয় ও আত্মস্থ করিয়া লইতে হইবে। টাকা নাই—এই অজুহাত দেখাইয়া যখন কোনও ফল হইতেছে না, অভাবের মধ্যেই আত্মীয়-পোষণের সহৃদয়তা দেখাইবার বাধা কোথায়? যাহা অনিবার্য, তাহাকে বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভারত-রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ-রাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেকে এইটুকু সহৃদয়তা দেখাইয়া আহত ও রক্তাক্তদের বেদনার উপশম করিবার চেষ্টা না করিলে তাহা আত্মহত্যার নামান্তর হইবে,—যেমন করিয়াই হউক, ইহা নিবারণ করিতে হইবে।

প্রজাবদল ও পুনর্বসতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, ততদিন ভারতবর্ষে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠা-উৎসব আমরা যত জাঁকাইয়াই করি, তাহা ব্যর্থ ও নিষ্ফল। দিল্লী ঢাকা হইতে অনেক দূর হইলেও কলিকাতা সেই অজুহাতে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারে না।

বর্তমান সংখ্যায় "বন্দে মাতরম্‌" প্রবন্ধের (পৃষ্ঠা ৩৪০, পংক্তি ১০) "শঙ্খ-বাণী"র পরিবর্তে "সঙ্ঘ-বাণী" পড়িতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৬

নতুন ফসল

শীত

পঞ্চাশোর্ধে বনে যাব, দেখিতেছি হিসাব খতায়ে
মনের গহন বনে আজিও অসংখ্য জটিলতা—
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ আর হীন মাৎসর্যের ;
ভুলায়ে রেখেছে মোরে ভোগের সহস্র উপচার
দু হাতে সংগ্রহ করি জমায়েছি যাহা চারিধারে।
লোলুপ সঞ্চয় মম সঙ্গত ও অসঙ্গত পথে
প্রতীক্ষা করিয়া আছে প্রলুব্ধের মিটাতে পিপাসা।
নেড়ে-চেড়ে দেখিতেছি, দেখিতেছি এক এক ক'রে—
সব মিথ্যা, সব ফাঁকি ; বৈরাগ্যের পরশ-পাথর
কখন ছুঁইয়া গেছে, সব সোনা হয়ে গেছে মেকি,
আমি খ্যাপা কাঁদিতেছি সঞ্চয়ের সাগর-বেলায়।

পঞ্চাশোর্ধে বনে যাব—নহে ইহা এ যুগের বাণী,
নগর অরণ্য যবে—হিংস্র শ্বাপদের বিভীষিকা
নগরীর পথে পথে মানুষে করিছে আক্রমণ—
পদে পদে দিগ্‌ভ্রান্ত অসতর্ক সরল মানুষ।
এ অরণ্যে নাহি হায় ঋষিদের শান্ত তপোবন,
শুধু পাপ শুধু লোভ মোড়ে মোড়ে বাঁধিয়াছে বাসা,
উদার আকাশ নাই, অন্ধকারে ভয়ভীত মন,
না জানি কখন কারে গ্রাসিবে হিংসার অজগর !
নগর অরণ্য আজ—বনে ধূলিসাৎ বনস্পতি
কাঠের ব্যবসা চলে, কে রচিবে শান্তির আশ্রম !
পঞ্চাশোর্ধে মন তাই গৃহকোণে লুকাইয়া রহে,
মনের গহনে ডুবি সংসারের ক্লেদপঙ্ক হতে
দূরে থাকিবারে চায় ; এইবার সমাগত কাল

সহস্র প্রণাম করি জীবধাত্রী মোর জননীরে,
ভয় আমি নাহি পাই যাত্রা মোর যত হোক দূর।
আমারে নাও নি ছিঁড়ে, দিতেছ যে খসিয়া পড়িতে
তার লাগি কৃতজ্ঞতা আর কত জানাব দেবতা,
এস এস কর্ণধার, এই বার সে-খেয়াতরীতে
নিরুদ্বেগে যাব আমি দয়া ক'রে তুমি নেবে যথা ॥

* * *

এই মর্ত জীবনের লক্ষকোটি জটিলতা মাঝে
একটি মুক্তির পথ এতদিনে জানিয়াছি সার
তুমি সেথা থাক প্রভু, ভালবাসা যেথায় বিরাজে
প্রেম বিনা চরাচর রাত্রি দিবা ঘোর অন্ধকার।
ধরণীর মহাস্বার্থ-জটিলতা-জড়ত্বের কূপ
সেথা হতে একমাত্র প্রেমরজ্জু তোলে যে মানুষে,
যারা ওঠে তারা ছাড়া বাকি সব জঞ্জালের স্তূপ—
ধুলাই আশ্রয় দেয় ধোঁয়াগর্ভ জাপানী ফানুষে।
প্রেমের তুলনা শুধু জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ আকাশের চাঁদ—
তিমির গ্রাসিলে বিশ্বে চাঁদ হয় স্বয়ম্প্রকাশ,
কেহ তো পারে নি দিতে জ্যোৎস্না-পথে আজও কোন বাঁধ—
যেথা পশে চন্দ্রালোক সেথানেই আশা ও আশ্বাস।
প্রেম সে তো চিরজয়ী প্রেম আনে চির-জাগরণ
প্রেম নিত্য উধ্বর্গামী কখনো টানে নি কারে নীচে
একমাত্র বর্ম যাতে প্রতিহত হয়েছে মরণ
সাবিত্রীর প্রেম শুধু যেতে পারে মৃত্যু পিছে পিছে—
তবে মহামৃত্যু ছেদি নবজন্ম লভে সত্যবান।
বেহুলার ক্রোড়ে হেরি প্রাণ পায় মৃতের কঙ্কাল,
লক্ষ লক্ষ কবিকণ্ঠে যুগে যুগে ওঠে জয়গান,
কেহ তো পারে নি ছুঁতে আজও তবু প্রেমের নাগাল।
কত কৃষ্ণ রাধা এল, এল কত রামী চণ্ডীদাস,
কত দান্তে বিয়াত্রিচে, লয়লা-মজনুর আনাগোনা,

তবু কেহ পারে নাই পরশিতে প্রেমের আকাশ,
পায় নি পরশমণি কেহ কেহ পেল বটে সোনা ॥

* * *

গাঁথিতে ফুলের মালা ছুঁচে হ'ল আঙুল জখম
সাদা সাদা ফুলগুলি রক্তে ভিজে হয়ে গেল লাল,
ঠাকুর-পূজার মালা বরবাদ হ'ল একদম
দেখিতে দেখিতে সেই তিল থেকে হয়ে গেল তাল।
শাশুড়ী বকেন বউয়ে—এ তাহার সাধ ক'রে করা,
মুখভার ক'রে দেখি হুঁকা টানে বাহিরে শ্বশুর,
দেবরের ছুটাছুটি হাতে ল'য়ে ফুলের পসরা,
ননদ বাপান্ত করে বউদির হেরিয়া কসুর।
নয়নে ঝরিল জল মালা হাতে বধূ ঘরে বসি
লজ্জা আর দুঃখে ভাবে, ভাল হয় ম'রে যদি যাই।
এ হেন সময়ে স্বামী চুপি চুপি সেই ঘরে পশি
গলাটি বাড়ায়ে বলে, ধন্য হই মালা যদি পাই ॥

* * *

ভায়ে ভায়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল মা কাঁদে উঠানে,
দুই বউ গরজায় রহি রহি ঘোমটা-আড়ালে।
মাঝখানে বেড়া; ব'সে মা ভাবেন, সরাই দু টানে;
বাঁশের এ বেড়া কবে—বউ ভাবে, গাঁথিবে দেয়ালে ॥

* * *

মুক্তি যখন আসে মনে, হাজার লক্ষ পাকে
গোপা রাহুল রাজৈশ্বর্য জড়িয়ে যতই রাখে
বাঁধতে নারে রাজকুমারে
একে একে সবাই হারে
মারের শাসন এড়িয়ে সে তো বুদ্ধ হয়েই থাকে
মুক্তি যখন আসে মনে বল কে আর রাখে!

সে মুক্তি যে কখন্ আসে কেউ কি তাহা জানে,
রাজার প্রাসাদ জোলার কুড়ে কোথায় যে কোন্‌খানে!

শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৫৬

বুদ্ধ নিমাই রূপ সনাতন
কোথায় হবে ধ্যাননিমগন
কবীর মীরা হয় বিবাগী ঘর ছেড়ে কার টানে
সে মুক্তি যে কখন আসে কোথায় যে কোন্‌খানে।

ডাক শুনেছে যে জন তাহার চাই না গভীর বন
চাই না শ্মশান চাই না মশান হিমালয়ের কোণ,
দেবতা স্বয়ং আসেন নেমে
ঘর-বিবাগীর ঘরেই প্রেমে
চান না তিনি জপের তপের কঠিন আয়োজন
ডাক যে শোনে চাই না তাহার হিমালয়ের কোণ।

খবর দিয়ে আসে না সে হঠাৎ যে দেয় ডাক
অনেক কথার মাঝখানেতেই দেয় ক'রে নির্বাক
তার পরেতে প্রিয় প্রিয়ার
চলে গোপন কথা হিয়ার
আঁধারেতেই জমতে থাকে রসের মধুচাক
খবর বলার মাঝখানেতেই দেয় ক'রে নির্বাক।

ভাসার পালা শেষ যে তখন শুরু ডোবার পালা
কোন্‌ অতলে যায় তলিয়ে বুকের সকল জ্বালা!
মালা বদল হয় গোপনে
খবর জানে রসিক জনে
তারও পরে বাসর-ঘরে নেবে দীপের মালা
কোন্‌ গভীরের রসের নীরে জুড়ায় বুকের জ্বালা॥

*　　　*　　　*

ছন্দে গেঁথে গাইব তোমার গান
জড়ীভূত এ প্রস্তরে তুমিই দিলে প্রাণ,
সে প্রাণ রঙিন পুষ্পরূপে
শঙ্খ ঘণ্টা গন্ধ ধূপে

মহাকালের মন্দিরেতে পেল পূজার স্থান,
ছন্দে গেঁথে গেয়েছিলাম গান।

আপনি তুমি রইলে অন্তরালে
কোকিল যেমন লুকিয়ে থাকে সহকারের ডালে
তোমার সুরের ছোঁয়া লেগে
গাছের শাখা ওঠে জেগে
গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুলে তার প্রাণের সুধা ঢালে
আপনি তুমি রইলে অন্তরালে।

আঁচল আড়ে ঢেকে প্রদীপখানি
তিমির-ঘন অন্ধকারে ডাক দিয়েছ জানি
আলোর ভাষায় আভাস যে পাই
যতই চলি নাই তুমি নাই
থমকে থেমে সামনে দেখি আলোরই হাতছানি,
আঁচল ঢাকা তোমার প্রদীপখানি।

হে অজানা, জানতে এবার দাও
ঝাপসা হয়ে এল আমার সুমুখে পথটাও
কাছে এস দাও গো ধরা
বিদায় দেবে বসুন্ধরা
শিশুর মত টলছি আবার কক্ষে তুলে নাও,
হে অজানা, জানতে এবার দাও॥

* * *

ভালবাসার কাঙাল মোরা ভাল বাসার নই
একটু আদর পেলেই সবার গোলাম হয়ে রই।
মনের মিতা পাই যদি বা
মত্ত থাকি রাত্রি দিবা,
প্রাণের প্রীতি থাকলে পরে ছেঁড়া চাটাই সই,
ভালবাসার কাঙাল মোরা ভাল বাসার নই।

একটু ডেকো আদর ক'রে একটু সময় দিও,
দু হাত তুলে দিলে কিছু দু হাত তুলে নিও,
মিষ্টি ক'রে ক'য়ো কথা,
ভয় করি ভাই নীরবতা
সত্য ব'লো প্রিয় ব'লো ব'লো না অপ্রিয়,
একটু ডেকো আদর ক'রে একটু সময় দিও।

সারাজীবন সাঁতরে এলাম অথৈ পাথার জল,
গাছের তলায় বসতে দিও ছায়ায় সুশীতল,
দণ্ড দুয়েক ব'স কাছে
কে জানে তার পর কি আছে
হয়তো বুকে বল দেবে মোর একটু প্রেমের ছল,
সারাজীবন সাঁতরে এলাম অথৈ পাথার জল॥

* * *

মধ্যরাত্রে স্বপ্ন দেখে জাগিয়া হঠাৎ
কনিষ্ঠ কন্যাটি মোর কণ্ঠলগ্ন হ'ল
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "বাবা-কাছে চল" ;
"এই আমি"—বলিলাম ধরি তার হাত।
বোঝে না অবোধ মেয়ে বলে, "বাবা কই ?"
বুঝিলাম স্বপ্নে মোরে হারায়েছে খুকি
বাস্তবেরে মিথ্যা করি স্বপ্ন দিল উঁকি
বাক্যস্পর্শ সহ আমি অবাস্তব হই।
আবার ঘুমায়ে পড়ে খুকি ধীরে ধীরে
গলাটি জড়ায়ে মোর নিশ্চিন্ত আরামে
সস্নেহে রাখিয়া হাত তনয়ার শিরে
কবিতা ভাবিতে বসি ফ্রয়েডের নামে।
স্বপ্ন আর জাগরণ স্মৃতি ও বিস্মৃতি
কে জানিত তার মাঝে এ বিচিত্র লীলা

সম্পূর্ণ বাতিল হ'ল পুরাতন নীতি
বাহিরে তুলিল ঢেউ নদী অন্তঃশীলা ॥

* * *

বার বার ঠকিলেই জেতা যেত যদি,
ঠ'কে ঠ'কে মানুষের হ'ত যদি জ্ঞান,
এ পৃথিবী সুবিপুল, কাল নিরবধি,
সম্পূর্ণ নিঃশেষ হ'ত সব অকল্যাণ।
যেই ভুল এ জীবনে কৈনু বার বার,
যে লোভের ফাঁদে প'ড়ে পদে পদে ঠকি,
কে যেন ঘাড়েতে ধ'রে করায় আবার
ঠ'কে গিয়ে কিছুকাল করি বকাবকি।
সাবধান হয়ে করি মনে মনে ঠিক—
আর নয় আর নয় ও পথে গমন।
আবার অদৃষ্ট-দোষে এ ভ্রান্ত পথিক
গলাটি বাড়ায়ে দেয় যেখানে শমন।
অভিজ্ঞতা জ্ঞান দেয়—তাহা মিথ্যা কথা,
মানুষ পশুর মত আজো দৃষ্টিহীন
ঘটনা ঘটার পর তাহার বিজ্ঞতা—
মানুষে পশুতে শুধু এইটুকু ভিন্।
করিয়া ভাবে যে কিন্তু করে না ভাবিয়া
মানুষ তাহারে কয় সে মানুষ আমি
দেবত্বেও উঠি কভু পশুত্বে নাবিয়া
তুমি মোরে সুতরাং ক্ষমো অন্তর্যামী ॥

* * *

প্রেমের প্রকাশ এই জীবনে দেখনু বহুরূপে
অনেক ভূমিকায়,
অভিনয়ের শেষে ভাবি পালিয়ে চুপে চুপে
এড়িয়ে যাব দায়।

আবার আসে লোভীর কাছে নতুন পালার ডাক,
অতীত ভুলে গিয়ে
পরচুলোতে ঢাকতে থাকি দেহ্-মনের টাক,
রঙ-সবেদা দিয়ে
কায়দা ক'রে মুছে ফেলি পোড়ামুখের কালি,
বিপুল বীর দাপে
ঝাঁপিয়ে পড়ি মঞ্চোপরি কুড়াই করতালি—
বসুন্ধরা কাঁপে,
ঘণ্টা যেমন যাচ্ছে বেজে পড়ছে যবনিকা
মনের মুখের রঙ
খ'সে খ'সেই পড়তে থাকে ঘোর কেটে হয় ফিকা
নতুন নতুন ঢঙ
লাগিয়ে এখন কোনক্রমে শেষ করি যে পালা
মনে মনেই বলি—
আঁধার হয়ে এল রে তোর উজল রঙ্গশালা
উজাড় হ'ল থলি ॥

* * *

লক্ষজনের ফরমায়েসে জীবন-তরী বেয়ে
কোনো কূলেই ভিড়তে তুমি পারলে না তো নেয়ে,
না হয় গেছ আপনি ঠকি
কারেও খুশি করেছ কি
খুশির হাওয়া লাগিয়ে পালে গেছ কি গান গেয়ে
লক্ষজনের ফরমায়েসে জীবন-তরী বেয়ে।

ঘাটে ঘাটে বাঁধলে তরী থামলে বাঁকে বাঁকে
দেখলে চেয়ে আকাশে চাঁদ উঠল মেঘের ফাঁকে
দেখলে কাঁখে কলসী নিয়ে
কোন্ রূপসী জলকে গিয়ে
চপল চোখের হাতছানিতে কোন্ পথিকে ডাকে
ঘাটে ঘাটে বাঁধলে তরী থামলে বাঁকে বাঁকে।

লোভী, তুমি এগিয়ে এলে থামিয়ে হাতের দাঁড়
ঝাপসা হয়ে মিলায় পরপারের তরুসার
বাঁধলে আমার ক্ষণিক বাসা
চলল বিফল ভালবাসা
বিবাগীকে আগলে রাখে রঙিন শাড়ির পাড়
লোভী তুমি এগিয়ে এলে থামিয়ে হাতের দাঁড়।

আবার যখন কাটল নেশা দাঁড়টি নিলে হাতে
আরাম পেয়ে ঘুম যে তখন জড়ায় আঁখিপাতে
অবশ হ'ল হাতের পেশী,
মন বলে, যাক চাই না বেশি
দূর সুদূরের স্বপ্ন ভাঙে কাছের বেদনাতে
আবার যখন কাটল নেশা দাঁড়টি নিলে হাতে।

বাইলে তরী চক্রাকারে কেবল লোভে লোভে
আজকে বৃথা গুমরে কাঁদ অবোধ মনঃক্ষোভে
ভিড়বে নাকো খেয়াঘাটে
পৌঁছবে না ফসল হাটে
চেয়ে দেখ পশ্চিমে ওই সূর্য ডোবে ডোবে
বাইলে তরী চক্রাকারে কেবল লোভে লোভে॥

*　　*　　*

শীতের ফসল ফুরিয়ে এল, দখিন হাওয়া বনে
বুড়া গাছের কিশলয়েই কাঁপায় খনে খনে;
দূরের পাখি সাঁঝ-সকালে পত্রবিহীন শুকনো ডালে
সুরের জালে অকারণেই ফুলের স্বপন বোনে॥

গান্ধী ও শেলী

যুগে যুগে ক্ষণজন্মা মনীষীদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা তাঁদের জাতীয় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি, বিবিধ ঐতিহ্যিক বিকাশ, প্রবহমান জীবনধারার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। অপর পক্ষে, তাঁরা সমাজরক্ষার নামে, ধর্মের নামে, মানুষের বস্তুধর্মী উন্নতির নামে যে সকল কুরীতি ও বিকৃত অনুশাসন প্রচলিত থাকে, সেগুলির প্রবল বিরোধিতা করেন। মানুষের স্তূপীকৃত অধর্মের ফলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বহুর নিঃশব্দ প্রতিবাদ ও আকূতি মূর্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাঁরা সেই পারিপার্শ্বিকের তুচ্ছতা অতিক্রম ক'রে বালখিল্য-সমাজে বিরাট বিরাট চরিত্ররূপে দেখা দেন। এই সকল সত্য-দ্রষ্টা, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবান, বার বার পথভ্রষ্ট মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থাশীল এবং নবসমাজ-রচনায় যত্নচিত্ত, দৃঢ়, অনমনীয় আশাবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ একটা মূলগত ঐক্য দেখা যায়। স্থান, কাল ও ঘটনাচক্রের বিভেদ তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের আড়াল সৃষ্টি করে না। তাই সমুদ্রের শতসহস্র যোজন ব্যবধান অতিক্রম ক'রে শিল্পী টলস্টয়ের অন্তরের আহ্বান ওমানসাগরের তরঙ্গস্পর্শঘাতক্লিষ্ট সুদামাপুরীর এক বণিককুলসন্তান—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছিল।

গান্ধী ও টলস্টয় সমকালে জীবিত ছিলেন। গান্ধী টলস্টয়ের লেখা প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে অহিংস অসহযোগ সম্পর্কে পত্র-ব্যবহার করেছিলেন। ফলে তাঁর মনে টলস্টয়ের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছিল।

শেলী ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইংলণ্ড ইউরোপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। আর্থিক অসাম্যের বৈসাদৃশ্য সে যুগে এমনভাবে বিশ্ববাসীকে ভিন্ন ভিন্ন বিপক্ষদলে ভাগ ক'রে দেয় নি। লোভাতুর পৃথিবী তখন এমন সুনিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠার সঙ্গে এমন ব্যাপকভাবে হিংসার প্রয়োগ শেখে নি। শেলী পরাধীনতার জ্বালাও অনুভব করেন নি। তাঁর দেশে যুগে যুগে অহিংসার প্রচারও ঘটে নি। এককালে ইউরোপে রাজশক্তির অস্ত্রবলের উপরে নির্ভর ক'রে

ধর্মপ্রচারের নামে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া গৌরবজনক ব'লেই গণ্য হ'ত। এ সকল কারণ সত্ত্বেও শেলীর পক্ষে নিপীড়িতের পক্ষ সমর্থন করা অথবা অহিংসার প্রচারক হওয়া বিস্ময়কর। কূটনীতিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং ভাবে-ভোলা কবির দৃষ্টিভঙ্গীর এ সাম্য ততোধিক বিস্ময়কর। যীশুর আত্মাহুতির দৃষ্টান্ত শেলী ও গান্ধী উভয়ের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

শেলী ছিলেন রোমান্টিক কবিকুলের অন্যতম। তিনি কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক, স্বপ্নবিলাসী শিল্পী; কারও কারও মতে অপরিণতমনা এবং পৃথিবীর বাস্তব দুঃখ দৈন্য সমস্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াসী, পলায়নধর্মী। তাঁর রসবোধের উৎস ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু তিনি সেই যুগের সেই দেশের প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। যাজক, পুরোহিত, শাসক, নীতিবিদ, সকলের নির্যাতনমূলক অনুশাসনকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাকে তাঁর বিচারশীল মন মোহরূপে বর্জন করেছিল। তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মকেও স্বীকার ক'রে নেন নি। ধর্মের ও শক্তির ভেকধারী, যারা জনসাধারণের অন্ধ কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে মাহাত্ম্যের প্রসাদ ভোগ করে, তাদের লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন—

> "...Kings first leagued against the rights of men,
> And priests first traded with the name of God..."
> "Kings, priests, and statesmen blast the human flower,
> Even in its tender bud ; their influence darts
> Like subtle poison through the bloodless veins
> Of desolate society."

> "কোন্ আদিকাল হতে
> মানুষের অধিকার হরণ করেছে রাজা ;
> দেবতার নাম উপজীব্য করিয়াছে
> কদাচারী পুরোহিতকুল ;"
> "অকালে শুকায়ে গেছে মানব-কোরক।
> রাজনীতিবিদ, শাসক, যাজক
> তাদের শোণিত-শোষী বিষে
> জর্জরিত করিয়াছে পাণ্ডুর সমাজ।"

"O that the free would stamp the impious name
Of "King" into the dust ;
O that the wise from their bright minds would kindle
Such lamps within the dome of this dim world,
That the pale name of Priest might shrink and dwindle
Into the hell from which it first was hurled..."

"অশুচি এ রাজচক্রবর্তী নাম
মুক্তিপিয়াসীর দল দলিত মথিত করি
লুটাবে ধূলায় ;
এ ধরায়
সুধীজন জ্ঞানদীপ্ত চিত্তপটে
জ্বালাইবে হেন আলো
যার জ্যোতিশিখা হেরি
ভীত ম্লান পুরোহিতকুল
আপনি ফিরিয়া যাবে সে নরকপুরে
যেথা হতে জন্ম তার।"

এ ক্ষেত্রে শেলীর ও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। গান্ধী প্রায় সকল ধর্মের মূল বাণী ও বিধিনিষেধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি পরম যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তিনি যীশুর সত্যনিষ্ঠা, অহিংস ভাব এবং আত্মত্যাগের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের নামে পাশ্চাত্যজগতে যে প্রহসন চলছে, তার নিন্দা ক'রে গেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, "বর্তমানে ইউরোপ ঈশ্বরের বা খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব প্রচার না ক'রে শয়তানের অধর্ম প্রচার করছে। আজ ইউরোপ নামেমাত্র খ্রীষ্টান। বস্তুত সে ধনকুবেরের উপাসক।"

"It is my firm opinion that Europe to-day represents not the spirit *of God or Christianity* but the spirit of Satan," he said. On another occasion he said, "Europe is to-day only nominally Christian. In reality it is worshipping Mammon."

শেলীও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন :

' Indignantly I summed
The massacres and miseries which his (the Incarnate's) name
Had sanctioned in my country..."

"আমার এ মাতৃভূমি 'পরে
সে পরম পুরুষের পুণ্য নাম
কলঙ্কিত করি বহু প্রাণ হইয়াছে বলি ;
বহু দুঃখ নেমেছে ধরায়।
সেই পাপ ইতিহাস
আমার লেখনী আজি করিছে প্রকাশ।"

"Commerce has set the mark of selfishness,
The sight of its all-enslaving power,
Upon a shining ore, and called it gold."

"স্বার্থজাল করেছে বিস্তার
বিশ্বের বাণিজ্যনীতি।
তার স্বর্ণ-আভা
আচ্ছন্ন করিয়া ধরা
পরায়েছে দাসত্বের টীকা।"

অপর পক্ষে, গান্ধীর কাছে স্বধর্ম অত্যন্ত প্রিয় ছিল, গীতা তাঁর নিত্য-সহচর ও উপদেষ্টা ছিল। নিজেকে সনাতনী হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতেন। বারো বৎসর বয়সে যে অস্পৃশ্যতা-বিচার দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, পরিণতকালে তার এবং হিন্দুধর্মের অন্য কুপ্রথার সমালোচনা ক'রে প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন—

"আমি বিশ্বাস করি অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয় ; যদি তা হয়, তবে সে হিন্দুধর্ম আমার জন্য নয়। অস্পৃশ্যতাকে অনুমোদন ক'রে হিন্দুধর্ম মহাপাপ করেছে। আমাদের এই পাপদোষ ক্ষালন করতে হবে। আমার হিন্দু-মন এরূপ ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। যুক্তি এবং সত্য অভিজ্ঞতার বিরোধী বেদবাক্যও ত্যাজ্য।"

"I believe untouchability was no part of Hinduism and that, it it 'vas, such Hinduism was not for me. Hinduism has sinned in giving sanction to untouchability. We ought to purge ourselves of this pollution.... My Hindu soul rises up in revolt against such an abomination...even a Vedic text must be rejected if it is repugnant to reason and contrary to experience."

কিন্তু তাঁরা উভয়েই মানবতার ধর্মের জয়গান ক'রে গেছেন।

জীবের প্রতি জীবের প্রীতি ও সহানুভূতি, যা ন্যায়, যা সত্য, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অশেষ পীড়নসহন, এই ছিল তাঁদের মতে ধর্ম। এই প্রেমের ধর্মই মানুষকে তথা বিশ্বজগৎকে ধারণ ক'রে আছে—এই ছিল তাঁদের বাণী। গান্ধী বলেন, "যদিও প্রকৃতির মধ্যে বিকর্ষণশক্তি আছে, তবু আকর্ষণের জোরেই তার অস্তিত্ব রয়েছে। পারস্পরিক প্রেম প্রকৃতিকে উজ্জীবিত রেখেছে। আমরা সবাই প্রেমের বাঁধনে বাঁধা আছি।"

"Though there is repulsion enough in Nature, she lives by attraction. Mutual love enables Nature to persist....We are all bound by the tie of love."

শেলীও বলেন—

"All things are re-created, and the flame
Of consentaneous love inspires all life
The fertile bosom of the Earth gives suck
To myriads, who still grow beneath her care
Rewarding her with their pure perfectness :
The balmy breathings of the wind inhale
Her virtues, and diffuse them all abroad."
"One sound beneath, around, above,
Was moving ; 'twas the soul of love..."

"সর্বপ্রাণ করে নবজন্ম লাভ ;
প্রেমের প্রেরণা উজ্জীবিত করে সর্বজীবে।
শতলক্ষ প্রাণ
ধরণীর স্তনামৃত করি পান
হয় বিকশিত তাঁর স্নেহদৃষ্টিতলে
অপূর্ব মাধুরী রচে প্রতিদানছলে
তাঁর মধুবিন্দুভারে ভরি আপনারে।
নিখিল ভুবনময়
মধুগন্ধা বায়ু বয়।
প্রেমের পরম সত্তা
সে একক বাক্
রহিয়াছে উর্ধ্ব অধ ঘেরি
ব্যাপি চরাচর।"

তাঁদের মতে আমাদের ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত জীবনে অতি তুচ্ছ কাজে বা অতি মহতী পরীক্ষাকালে যখনই এই ধর্মের অনুস্যূত ছন্দ ব্যাহত হবে, তখনই আমরা অসুরশক্তির পথ প্রশস্ত ক'রে দেব এবং আমাদের ক্ষয় হবে। গান্ধী বলতেন, "সত্যই ঈশ্বর। অন্তরের অন্তস্তলে শান্ত সমাহিত অতিসূক্ষ্ম বিবেকের সুরই আমার কাছে ঈশ্বর-নির্দেশ। সংজ্ঞার অতীত এক পরমাশক্তি বিরাজমান আছে। আমি তা দেখতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি। এ সেই অদৃশ্য শক্তি, যা নিজেকে অনুভূতির গোচর করে, কিন্তু যা প্রমাণের অতীত—কারণ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু হতে তা পৃথক। সেই বিশ্ববিধি, যা সকল প্রাণময় সত্তাকে পালন করছে, তাই ঈশ্বর।"

To Gandhi truth was God, "the still small voice within" was his sole guide in life. He said, "There is an undefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itsel t and yet defies all proof, because it s so unlike all that I perceive through my senses...That law then, hich governs all life, is God."

ান্ধীর এই ঈশ্বরভক্তি লক্ষ্য ক'রে, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শেলী যে জাতীয় সন্তোষ প্রকাশ করতেন, তা অনুমান করা সহজ নয়। শেলী জলে, লে, আকাশে, বাতাসে, কোকিলের কূজনে, ফুলের সৌরভে, রৌদ্রের ালোকোচ্ছল কম্পনে—সব কিছুর মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্তার প্রকাশ েখে ব'লে উঠেছিলেন—

"Look on yonder earth
The golden harvests spring ; the unfailing sun
Sheds light and life ; the fruits. the flowers, the trees,
Arise in due succession ; all things speak
Peace, harmony and love."

"চেয়ে দেখ ধরাপানে
যেথা স্বর্ণশস্য অঙ্কুরিছে ;
চিরদীপ্যমান সূর্য
বিতরিছে মহাজ্যোতি, মহাপ্রাণ ;
পত্র, পুষ্প, ফল, বৃক্ষ লভিছে
বিকাশ। নিখিল পরাণ
শান্তি প্রীতি সুষমার গাহে জয়গান।"

এই শেলীর নাস্তিকতা সম্পর্কে গান্ধী সম্ভবত এই মন্তব্য করতেন, "অন্যের মনে ঈশ্বর যে স্থান অধিকার ক'রে আছেন, শেলীর মত নাস্তিকের মনে প্রেম সেই স্থান অধিকার ক'রে আছে।"

"For atheists like Shelley, love held the same place as God for others."

উভয়ের মধ্যে স্পষ্টতম লক্ষণীয় মিল রয়েছে প্রেমের, অহিংসার অপরাজেয় শক্তির উপর বিশ্বাসে, রাগদ্বেষবিষে সাময়িকভাবে জীর্ণ হিংসাচঞ্চল রক্তকলুষিতহস্ত মানুষের আত্মার অবশ্যম্ভাবী মুক্তির আশাবাদে, দুঃখের দহনে আত্মচিত্ত শুদ্ধি এবং পীড়নপ্রিয় শক্তিমদমত্ত অত্যাচারীর পরাভবের প্রতি অবিচল প্রত্যয়ে। গান্ধী বলেন, "এই অহিংসনীতি প্রয়োগ ক'রে যখন অগ্রসর হবে, তখন এ এক অপরিমেয় বেগ ও গতি লাভ করবে। প্রতি ব্যক্তির মধ্যে অহিংসার বিকাশ ঘটাবার যে অমিত সম্ভাবনা আছে, তাই আমার আশাবাদের ভিত্তিস্বরূপ।"

"......it will gather momentum and speed in an incalculable manner as you proceed. My optimism lies in the infinite possibilities of the individual to develop non-violence."

তাঁরা জানতেন, মানুষ শিবশক্তির বরপুত্র। আর মানতেন যে, মানুষের ধর্ম অহিংসা, পশুর ধর্ম হিংসা। যে সব ক্ষেত্রে মানুষ যে কোনও রকম সম্পদবলে (তা ধন, মান, জাতীয় শ্রেষ্ঠতা, আসুরিক শারীরশক্তি, যাই হোক না কেন) ভীরু সংস্কারাচ্ছন্ন অধিকতম মানুষদের রক্তচক্ষুর শাসনে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, সেই সব ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শাসনে পটু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই দুই জন্মবিদ্রোহী অসহযোগিতা করেছিলেন, ফলে শেলী অল্পবয়সের চপলতাপূর্ণ নাস্তিক্যবাদের জন্য শিক্ষায়তন হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন, এবং গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের কুশাসনের উচ্ছেদ কামনা করার জন্য অগণ্যবার কারাবরণ করেছিলেন। নিজ শক্তি ও সাধনা সম্বন্ধে অজ্ঞ জনগণকে তাঁরা ডাক দিয়েছিলেন সকল মূঢ়তার অন্ধকার নাশ ক'রে চিত্তে শুভ-বুদ্ধির ও জ্ঞানের আলো জ্বালাবার জন্যে। সকল অধীনতা থেকে মুক্তির চাবিকাঠি যে মানুষের আত্মপ্রত্যয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আত্ম-

প্রয়াসের মধ্যে নিহিত আছে—এ কথা তাঁরা বার বার জানিয়েছেন। বলেছেন, যদি একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভয় এবং দীনভাবে জীবন-ধারণের লোভ বর্জন ক'রে, মাথা তুলে, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে নির্ভীক চিত্তে অত্যাচারীর সম্মুখীন হতে পার, যদি বলতে পার—তোমার কোনও দণ্ডকে আমি ভয় করি না, আমার দুঃখসহনের অমিত শক্তি ও সংযত ধৈর্যের দ্বারা, আঘাত সহ্য করার কঠিন তপস্যার দ্বারা তোমার মনকে স্পর্শ করব, তোমার স্বৈরাচারকে লজ্জা দেব, তোমার সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলব, তা হ'লে শাসক, শোষক, ঘাতক সবার পরাভব ঘটবে। তাঁরা মানুষকে নীলকণ্ঠের মত বিষ ধারণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। মানুষকে নূতন এক অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছেন। গান্ধী বলেছেন, "অন্য কোনও তীক্ষ্ণতর অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না ক'রেও আমি অত্যাচারীর শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণতা হরণ করতে চাই। কোনও পশুশক্তি-সহায়ে তার বিরোধ না করার ফলে আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করতে চাই।"

"I seek entirely to blunt the edge of the tyrant's sword, not by putting up against it a sharper-edged weapon, but by disappointing his expectation that I would be offering physical resistance."

শেলী এই নৈতিক শক্তির মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন এই ব'লে—

"And if then the tyrants dare
Let them ride among you there
Slash and stab, and maim and hew
What they like, that let them do.
With folded arms and steady eyes,
And little fear and less surprise
Look upon them as they slay
Till their rage has died away.
Then they will return with shame
To the place from which they came,
And blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek."

"দুঃসাহসভরে যদি তারা হানা দিতে চায়
তব আঙিনায়; প্রবেশ করিতে দিও। যদি বারংবার

করে নিপীড়ন শাণিত ছুরিকাঘাতে, জর্জরিত করে
ক্ষতে, আঘাত করিতে দিও মিটাইয়া সাধ।
যুক্ত করে
মেলি দুটি সহাস নয়ান, না মানি বিস্ময়,
নাহি মানি ভয়, চেয়ে থেকো তাহাদের পানে
যারা ক্রোধমত্ত, হত্যারত। অবশেষে লজ্জাভরে
তারা ফিরে যাবে ঘরে; যেথা হতে এসেছিল।
লজ্জারক্ত আভা ঘেরিবে কপোলতল, উষ্ণ তাপ
প্রকাশ করিয়া দিবে রক্তঝরা পাপ।"

এই অহিংসা অক্ষমের আত্মসমর্পণ নয়। চম্পারণ, খেড়া, বারদৌলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর নেতৃত্বে অল্পসংখ্যক সত্যাগ্রহী শক্তিমান শাসনতন্ত্রের অন্যায় আইনের বিরোধ ক'রে জয়ী হয়ে এই আত্মবলের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিল। শেলীর কাব্যেও প্রমীথিয়ুস অমর রাজ্য থেকে জ্ঞানের আগুন এনে মানুষের উপকার করেছিল। তার এই নবপথরচনার সদাগ্রহ দেবরাজ বলীয়ান জিউসের মনঃপূত হয় নি। তিনি তাকে নানাবিধ শারীর ক্লেশ দিয়ে নির্যাতন ক'রে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রমীথিয়ুস অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেই সব যাতনা সহ্য ক'রে, প্রতিহিংসা গ্রহণ না ক'রে বিশ্বপ্রকৃতির সহানুভূতির উদ্রেক ক'রে, অহিংসার দ্বারা হিংসার পরিব্যাপ্তি রোধ ক'রে, প্রেমের জয় ঘটিয়েছিল। সে দেখিয়েছিল, যখন মানুষ শ্রেয়কে চায়, তখন সে দুঃখকে এড়ায় না, মৃত্যুকে ডরায় না এবং দুঃখকে বর্জন না ক'রে আত্মসাৎ ক'রে তার ক্ষয় ঘটায়।

তাঁরা শক্তির নেশায় মাতাল শাসক বা শত্রুর প্রতি হিংসা পোষণ করাকে আত্ম-অবমাননার প্রতিরূপ ব'লে গণ্য করতেন, কারণ হিংসা থেকে হিংস্রতর হিংসার জন্ম, পুষ্টি ও প্রভাববিস্তার হয়। আঘাতের পরিবর্তে আঘাত না পেলে, প্রীতির ছোঁয়া পেলে প্রতিপক্ষ বিমূঢ় হয়, দুর্বল হয়, অনুতপ্ত হয়। গান্ধীর ভাষায় "বহু দুষ্কর্মের নজির থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তাদের (শত্রুদের) ভালবাসতে হবে। তাদের 'পরে ঈশ্বরের অভিশাপ ডেকে এনো না।"

"You must be able to love them (enemies) in spite of their misdeeds ; you will refuse to call the curses of heaven upon them."

কবি প্রমীথিয়ুসকে দিয়ে বলিয়েছেন,

"............let not aught
Of that which may be evil, pass again
My lips, or those resembling me."

"যেন আমি কিংবা মোর সাথীজন
কভু নাহি করি উচ্চারণ
কোনও দুষ্ট অভিশাপ।"

অহিংস নৈতিকশক্তি ও প্রেমের পরশমণির প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠার জন্য তাঁরা বিশ্বসভায় নারীর মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। নারী সম্বন্ধে শেলীর মনোভাব যদিও গান্ধীর থেকে বিশেষ বিভেদাত্মক, তবু নারীর কল্যাণীমূর্তির কল্পনায় একটা সমর্থনের সুর শোনা যায়। নারী পুরুষের সমঅংশী না হ'লেও সহধর্মিণী—এ কথা উভয়ে বলেছেন। মানুষের নব অভ্যুদয়ে যে তাদের গভীর কোমল অনুভূতির, তাদের সর্বংসহা তপস্যার, তাদের আর্তের প্রতি দরদের—এক বিশেষ দান আছে, তা প্রমীথিয়ুসের উক্তির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

"Asia, thou light of life,
Shadow of beauty unbeheld ! and ye,
Fair sister nymphs who made long years of pain
Sweet to remember, through your love and care ;
And we will search with looks and words of love,
For hidden thoughts, each lovelier than the last..."

"হে এশিয়া, জীবনে পরমজ্যোতি
অলক্ষ্য সৌন্দর্যছায়া !
অয়ি সুধাক্ষরা
অপ্সরানিন্দিতরূপা
প্রিয় ভগ্নীগণ !
তোমাদের স্নেহে প্রেমে ভরি
দিলে করি
সুখস্মৃতি

কত দুখগীতি
বেদনায় ভরা
দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ দিনগুলি।
মোরা প্রেমময়ী দৃষ্টি মেলি,
প্রেমগাথা গাহি,
দিকে দিকে চাহি
ফিরিব সে গুপ্তধন খুঁজি
যে অমৃতবাণী
নবতর সুষমায় ভরা।"

শেলী বিশ্বাস করতেন যে, এই প্রেমের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে এক সর্বজ্বালাদুঃখহীন নব কল্পারম্ভ হবে। সে নূতন পরিবেশে

"Woman and man, in confidence and love,
Equal and free and pure, together trod
The mountain-paths of virtue......"

"নারী আর নর
পবিত্র সুন্দর
একান্ত স্বাধীন।
প্রেমে ও বিশ্বাসে
পরম আশ্বাসে
উচ্চপথ বাহি
সাম্যমন্ত্র গাহি
যাবে চলি ধর্মের পর্বতচূড়ে।"

গান্ধী মেয়েদের নিকট এই দাবি জানিয়েছেন যে, "অহিংসা মানে অমিত প্রেম অর্থাৎ দুঃখবরণের অসীম শক্তি। নারী অহিংসার প্রতিমূর্তি। আমি বিশ্বাস করি যে, অহিংসার মহত্তম পূর্ণপ্রকাশ ঘটানোর দায় মেয়েদের 'পরে ন্যস্ত আছে। যদি শক্তি বলতে পশুশক্তি বোঝায়, তবে নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। যদি শক্তি বলতে নৈতিক শক্তি বোঝায়, তবে নারী পুরুষের চেয়ে বহুগুণে শক্তিময়ী। তার কি অধিকতর স্বার্থত্যাগবোধ, সহনশীলতা এবং সাহস নেই?"

"Woman is the incarnation of ahimsa. Ahimsa means infinite love, which again means infinite capacity for suffering. I do believe that it is woman's mission to exhibit ahimsa at its best. If by strength is meant brute strength, then indeed woman is less brute than man. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior. Is she not more self-sacrificing, has she not greater powers of endurance, has she not greater courage ?"

ক্রমশ

"মুসাফির"

শেষ সফর

দ্বিপ্রহর অন্তে যেই খুলিনু রেডিও—
জনতার কোলাহল শুনিলাম কানে,
শুনিনু কথক এক ভঙ্গীতে স্বকীয়
ঘোষিতে প্যাটেল-জয় টাকেরে বাখানে।
প্যাটেল স্বয়ং কিন্তু বাখানে পুলিসে—
ঘুষ দিতে হয় না তো—বলিলেন তাই,
কর্তব্য করিয়া খালি খেতেছে গুলি সে
সুতরাং পুলিসেরে প্রেম কর ভাই।
প্যাটেলের আগমন এ কলিকাতায়
মোদ্দা কথা তার শুধু বুঝিনু এটুকু—
আরক্ষেরা রাখে দেশ সামান্য ভাতায়,
কেহ না ভাবিও তারা খায় ঢুকুঢুকু।
প্যাটেল চলিয়া গেল ব্যাটল জিতিয়া
পিঠ চাপড়ানি খেয়ে বাঙালীরা খুশি।
ঘোলা মন ধীরে ধীরে আসিলে থিতিয়া
আবার প্রবল হবে ঘুষ আর ঘুষি।

সিকিম-স্মৃতি

দূরের পাহাড় হাতছানি দেয়—মেঘের ফাঁকে রোদের ছিটে,
ঝাঁঝাল হাওয়া বইয়ে দিল কমলাফুলের গন্ধ মিঠে।
স্বপ্নে দেখা অলখ ভুবন দেখছি কি আজ সামনে আমার—
নীল পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চিত্রশালার খুলল দুয়ার!

'মকাই' ক্ষেতে ভুটিয়া-বউ আঁচল ভ'রে তুলছে দানা,
অর্কিড ফুল দুই বেণীতে—আপেল-রাঙা গাল দুখানা।
থাক্-কাটা ক্ষেত যাচ্ছে নেমে পাহাড়ের ওই ঢালু বেয়ে—
কোথায় মেশে সবুজ সোপান ভুট্টা-জনার ফসল ছেয়ে।

পথের পাথর কুড়িয়ে পেয়ে ভাবছে বালা, 'মাণিক না কি!'
আপন গলার সাতনরীতে নতুন ক'রে গাঁথবে তা কি?
ধাপে ধাপে নামছে ঝোরা 'মাথি'র ফটিক তুষার গ'লে,
কান্না-চাপা সুরের ঢেউয়ে পাহাড়-তলি ভরিয়ে তোলে।

পাহাড়-কোলে নারাঙ্গী-বন দূরের থেকে দেখায় ভুল,
ডালে ডালে সোনেলা ফল ফুটেছে ঠিক গাঁদার ফুল!

* * *

অনেক উঁচু 'নাথুলা' ওই—স্বপ্ন-ঘেরা পারুল-বাগ,—
সবুজ ঘাসে ঝরছে কেবল বন-গোলাপের রেশমী ফাগ;
ফুলের নেশায় মাতাল হাওয়া—পথিক গেলে পড়বে ঢুলে,
ঘুমের আরক পান ক'রে সে ঘুমিয়ে যাবে সকল ভুলে।

* * *

টিলায় ব'সে ওই দুনিয়া দেখছি মেঘের সীমায় হারা—
ছবির মত কে এঁকেছে নীচের পাহাড় ঝরণা-ধারা!
প্রজাপতির ছুটছি পিছে—সোনার বুটি ডানায় বোনা,—
জোড়ায় জোড়ায় উড়ছে কত—হায় রে, তাদের বৃথাই গোনা।

দূর জনমে ছিলাম বুঝি ঘর বেঁধে এই পাহাড়-বুকে—
সবুজ-ঝুঁটি বনের পাখি তাই কি চেয়ে আমার মুখে?
ঘুঙুর-বাঁধা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কি সেই পশম-বোঝা—
উঁচু-নীচু চড়াই পথে হাটের মুখে যেতাম সোজা?

* * *

আজো হঠাৎ চলতে পথে চমকে দূরে তাকিয়ে থাকি—
সামনে রোদে তুষার-চূড়া—সোনার হতে নেই তা বাকি!
কোথা থেকে বনের ফাঁকে আপনি দোলে ডালিয়া ফুল
ঝাঁক বেঁধে যায় রাণীচরা—ভুল তা সব-ই কেবল ভুল!

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

(আলোচনা)

"কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর"। মহাজন-বাক্য, না ফলিয়া উপায় নাই। কবিরা অমর না হইলে যখন তখন যেরূপে খুশি তাঁহাদের লইয়া টানা-হেঁচড়ার সাধ্য কার ছিল! আর কবিতা যে অমৃত, সে তো সুজনের সঙ্গ হইলেই বুঝিতে পারা যায়। যে কোন সমালোচকের পাল্লায় পড়িলেই আপনাকে ঠেলায় পড়িয়া মানিতেই হইবে—কবিতা অমৃত। স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত পদকল্পতরু সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি ভাষায়,—ইংরেজী সংস্কৃত হিন্দী ও বাংলায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি উপযুক্ত গুরুর নিকট গীত-বাদ্যও শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি চণ্ডীদাস-সমস্যা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এই সুরসিক ও সুপণ্ডিত মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের চণ্ডীদাস-সঙ্কলন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীদাস বিষয়ক আলোচনাও পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসকে কখনও তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবির অধিক মর্যাদা দেন নাই। তাঁহার লিখিত পদকল্পতরুর ভূমিকা দেখিলেই এ কথার প্রমাণ মিলিবে। সেদিন যাঁহারা চণ্ডীদাস-গোষ্ঠীকে এক কুঠরিতে পুরিয়া মুড়ি-মিছরির এক দর কষিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি "অশেষবিৎ" বলিয়াছিলেন। একটি উদ্ভট শ্লোকে আছে "অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ"। "শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের দীন চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রবল শক্তিশালী কবি চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পদাবলীর কবীন্দ্র

চণ্ডীদাস" এই তিন জন চণ্ডীদাসের কথা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন। (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ. ৯২) এতদিন পরে প্রবীণ অধ্যাপক বসু মহাশয়ের শুভাদৃষ্টে একজন গোপাল ঠাকুর জুটিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

পৌষ-সংখ্যা ১৩৫৬ 'শনিবারের চিঠি'তে একজন লেখক "দীন চণ্ডীদাসে পদাবলী" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনিও যে প্রবীণ, প্রবন্ধে সে পরিচয়ও দিয়াছেন। যৌবনের শোনা গানের কলি এখনও মনে আছে—এই কথা লিখিয়া বয়সের প্রবীণতা, এবং প্রবন্ধের মুন্সীয়ানায় লেখায় প্রবীণতা দুইটি দিকই সমান। লেখক লিখিতেছেন—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের মতে, চণ্ডীদাস নামে দুইজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন;—একজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী বড়ু-চণ্ডীদাস, অপর জন চৈতন্য-পরবর্তী দীন-চণ্ডীদাস। এই দুইজন ব্যতীত অপর কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পদ-সাহিত্যে সুবিজ্ঞ শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বিজ-চণ্ডীদাস নামে তৃতীয় একজন চণ্ডীদাসকে খাড়া করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দ্বিজ-চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প,—তিনি খাড়া হইয়া উঠিলেও, দীন-চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না। কাজেই দীন-চণ্ডীদাসকে পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আমরা অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি।"

লেখক অযথা আমাদের নামে অপবাদ দিয়াছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস অকৈতব খাড়া হইয়াই আছেন। আমরা তাঁহার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছি না। বহু দিন পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাস-পদাবলী সম্পাদন করিয়া দিয়াছি। তাহার পর হইতে আমাকে আর কেহ ডাকে না। সুতরাং চণ্ডীদাস-চিন্তাই ছাড়িয়া দিয়াছি। লেখক প্রবীণ অধ্যাপক বসু মহাশয়ের বাণীই আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। যে হেতু প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় অপর কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই হেতু অপর কোন চণ্ডীদাসের বাঁচিয়া থাকা বেয়াদবি। সেই হেতু দীন চণ্ডীদাসকে পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি

বলিয়া তিনি অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গগত সতীশচন্দ্র হইতে বর্তমান কালের অনেক অধ্যাপক ও সমালোচক দীন চণ্ডীদাসকে অতি নিম্নশ্রেণীর কবি বলিয়া সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে দীন চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠই বা হন কিরূপে এবং তাঁহাকে অবিসংবাদিতভাবেই বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় কেমনে? পদের সংখ্যা স্বল্প হইলেই কি জাতি যাইবে? পদাবলী-সাহিত্যে এমন অনেক কবি আছেন, যাঁহাদের পদের সংখ্যা সত্যই কম। তাই বলিয়া কি তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিতে হইবে? স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইতে হয়!

লেখক দীন চণ্ডীদাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম দিকের একটি কবিতা তুলিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক হরি।
সে কথা অনেক কহিব বিস্তার
যে লীলা যখন করি॥

লেখকের যদি কবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্রও কাণ্ডজ্ঞান থাকিত তাহা হইলেই বুঝিতেন যে, যে এই রকম কবিতা লেখে, তাহাকে আর যাহাই বলি, কবি বলা চলে না। লেখক উপরের কবিতাংশের ব্যাখ্যা করিয়া দিলে আমরা বুঝিবার সুযোগ পাইতাম, কবিতা কাহাকে বলে? কবিতার কাঠামো বলিয়া তো একটা বস্তু আছে। এই দীন চণ্ডীদাসের না ছিল ছন্দে জ্ঞান, না ছিল ভাবের গাঢ়তা, না ছিল ভাষার পারিপাট্য। কবিত্বের বিরেচক সেবন করিয়া দীন চণ্ডীদাস কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা সেই আবর্জনা ঘাঁটিতেছেন। প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় ছত্রিশ অক্ষরের করুণা দীন চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকটি কবিতা তুলিয়া দিলাম—অধ্যাপক মহাশয় এই সমস্ত পদের অর্থ বা টীকা করিতে পারেন নাই।

১

চর চর চর বহে অনিবার চরকি চরকি লোর।
ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে নাহি ডোর দিলে ওর॥

ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে ঢল ঢল করে অঙ্গ।
ঢারি পুন দিলে ঢারি আগর ঢারে ঢারিলে সঙ্গ॥
ঢোর পরিবশে ঢাকির ঢোরসে ঢাপল বিরহ কোর।
ঢোকল ঢাবলে ঢারির ঢাপনে ঢিবব ঢঙ্গ সুঢোর॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী ঢরল বিরহ সবে।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে॥

—দীন চণ্ডীদাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৩

প্রথম খণ্ডে ছত্রিশ অক্ষরের করুণায় এমন বহু কবিতা আছে। এত কি চতুরা এত কি মথুরা! লেখক কি পাতা উল্টাইয়া দেখেন নাই?

২

এক এক দেহ দেহের গণন এ দেহ আছয়ে বহু।
নব নব শত সহস্র পূরিত অনন্ত সমন্দ কহু॥
কোন অঙ্গ কোন করত সেবন সহস্র পুটকে ছটা।
ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাস বৈগ সে সব ঘটা॥
সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়।
এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে দেহে রসভার হয়॥
কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি রতির আর্ত্তিক কত।
কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত কোন সে মোক্ষক যত॥
চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু এ অঙ্গ কে রতি পায়।
চণ্ডীদাস কহে—কোন কোন জন কেহ সে খুঁজিয়া পায়॥

—ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭

এই কবিতা যাহার লেখা, সেই লোক কখনও "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" কিংবা "ধিক রহু জীবনে পরাধিনী যেহ", কিংবা "ওপারে ঠাকুর ঘর বৈসে গুণনিধি", কিংবা "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার" ইত্যাদি পদ লিখিতে পারেন? অন্তত দুই-তিন জন্ম সাধনার দরকার। বন্ধু অধ্যাপক মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের নামে যে সমস্ত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পদের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন, 'শনিবারের চিঠি'র লেখক সেগুলি পড়িয়া বন্ধু মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের ও রসজ্ঞতার পরিচয় লইবেন। আর পরিশিষ্ট হইতে সততার পরিচয় গ্রহণ করিবেন।

আমি বহু পরিশ্রমে কটক হইতে (যাতায়াতের অর্থ ব্যয় করিয়া) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর্তবল্লভ মহান্তীর নিকট হইতে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত যে পদগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমার অনুমতি না লইয়া আমার নাম না করিয়া সেই পদগুলি তিনি দীন চণ্ডীদাস ২য় খণ্ডে ছাপিয়া দিয়াছেন (২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ. ৭৪৯-৭৫৬)। এ দিকে আবার নিজ মন্তব্যে আমার যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা আছে।

লেখক মহাশয়—"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ঙ্করী বংশীধারী পরমেশ্বর" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। "হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতাতে যাঁহার অবতারত্ব সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত" তিনি বোধ হয় পরমেশ্বর নহেন। হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতায় নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। সেই তত্ত্বকে পরমেশ্বরে পরিণত করিতে পুরাণান্তরের প্রয়োজন ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। গীতায় বংশীধারীর কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ঙ্করী পরমেশ্বরের" কথা কি নাই ? "ভাগবতাদি পুরাণে অসুর ধ্বংস, আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে ধর্ম সংস্থাপন" এ কথার অর্থ কি ? বৈষ্ণব শাস্ত্র কাহাকে বলে ? অসুর ধ্বংস তাহা হইলে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য নহে ? কতখানি চন্দ্রাধিক্য ঘটিলে মানুষ এই সব প্রলাপ বকিতে পারেন !

রাধাকৃষ্ণ-লীলা কথা যে কত পুরাতন, দুই হাজার বৎসরের হাল সপ্তশতী গ্রন্থ এবং মহাবলীপুর বাদামীগুহা প্রভৃতির শিলাচিত্র হইতে লেখক তাহার সন্ধান পাইতেন। বাঙালীর সৃষ্ট কোন কাহিনী হইতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা কথার ভিত্তি প্রস্তুত হয় নাই।

লেখক রাগাত্মিকা সাধনাকে "যাবতীয় ভজন-সাধনের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়াছেন, আর এই ভজন-সাধনের যিনি ভজনীয়া ও সাধনীয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা খুশি বলিতে পারেন। তবে অগণিত নরনারীর উপাস্যা শ্রীরাধা সম্বন্ধে আরও একটু সংযতভাবে যুক্তিসহ কথা বলিলেই শোভন হইত।

প্রবাদ আছে—ভানুমতী একটি আঙুল দেখাইলে কালিদাস দুইটি

আঙুল দেখাইয়াছিলেন। ভানুমতী তাহার আপন মনোমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দীন চণ্ডীদাস মনের আনন্দে অজস্র লিখিয়াছিলেন। এখন তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতেছে। দীনের লেখায় "ব্যাসের কলম বাণী" অসহ। এই লেখককে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের ১ম ও ২য় খণ্ড দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতে অনুরোধ করি।

দীন চণ্ডীদাসের একখানি সম্পূর্ণপ্রায় পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিখানি কোথায় আছে জানি না। তবে ইহার অবিকল নকল বীরভূম-রামপুরহাটনিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়ের নিকট আছে। এই পুঁথিতে বহু পদ আছে। খণ্ডিত অংশে যে আরও পদ ছিল পদের ক্রম-সংখ্যাঙ্ক দেখিয়া তাহা জানা যায়। এই পুঁথিতে হাজার বারো শত পদ ছিল। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ বলিতে কিছু নাই। তৃতীয় শ্রেণীর পদের সংখ্যা শতখানেক হইবে কিনা সন্দেহ। লেখক ও প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় পুঁথিখানির প্রতিলিপিটি দেখিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রোয়াক

বাংলা ও বাঙালীর সত্যকার পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের অতীত কলকাতার রোয়াকের কাছে যেতে হবে। একশো বছর আগে কলকাতা সারা ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র ছিল—আজও আছে, কিন্তু তখন কলকাতার বাসিন্দারা অধিকাংশই বাঙালী ছিল; আজকের মত অবাঙালীদের বাস-ব্যবসাস্থলে পরিণত হয় নি। বাঙালীর জীবনে তখনও ক্ষয়রোগ ঢোকে নি, বাঙালীর মনের ঐশ্বর্য ও চিন্তার স্বকীয়তা অটুট ছিল। এ কথা না স্বীকার ক'রে উপায় নেই যে, সেই চিন্তা সংস্কৃতি জীবন-সাধনা—যার জোরে বাঙালী একদিন সারা ভারতের অগ্রণী হয়েছিল, সেই সব রোয়াকের উর্বর ক্ষেত্রেই প্রথম দানা বাঁধবার সুযোগ পায়। বাস্তবিক, রোয়াকে ব'সে বাঙালী সেদিন যে চিন্তা করে, উত্তরকালে সমগ্র ভারত সেই চিন্তাই করে। রোয়াকে ব'সে বাঙালী সাময়িক আনন্দ-উত্তেজনাকে

জীবনের একমাত্র নিত্যসত্যরূপে উপলব্ধি করে। তাই ক্রিয়াহীন ভাবপ্রবণতাই হ'ল বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এখনও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, ক্বচিৎ কারও আচমকা টানে হয়তো তাতে বাধা পড়েছে। কিন্তু যাক সে কথা, এখন রোয়াকের কথাই বলি।

যেমন ভক্তির প্রেরণায় বাংলার মহানগরীর বুকে হেথায় হোথায় মন্দিররাজি গ'ড়ে উঠেছে, আসল বৃন্দাবনের অনুকরণে নববৃন্দাবন সৃষ্ট হয়েছে, সেই রকম বাংলার উৎকৃষ্ট চিন্তা-স্বপ্ন-সংকল্প প্রকাশনের জন্য ঘরে ঘরে গলিতে গলিতে রোয়াক নির্মাণ হয়। এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, বাঙালীর প্রকৃত সত্তা রোয়াকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙালীর আসল চিন্তাধারা—রাজনীতিক গবেষণা—ক্রিয়াহীন তৎপরতা—রোয়াকের আড্ডায় সহজপ্রকাশ পায়। কুহেলি গঠনে, কথাসরিৎসাগর রচনায় বাঙালী যে জগতে নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার মূলে আছে রোয়াকের অনুপ্রেরণা। বাংলার যুবক ও বৃদ্ধ, কর্মী ও সাধক, সকাল সাঁঝে, কি বর্ষায় কি শীতে, রোয়াকের আড্ডায় ঘরবাড়ি ভুলে নিয়মিতভাবে যোগ দিয়েছে। এক দিকে বুড়োদের দাবা-পাশা, অন্য দিকে যুবক-প্রৌঢ়দের রাজনীতি-চণ্ডনীতি, আর্ট-নাট্যকলা আলোচনা ও সমালোচনা, কোণে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে-বসা তরুণদের প্রেমনীতি চর্চা এই রোয়াকের আড্ডায় পুরোদমে চলত। রোয়াকের শানে উন্মাদনা ফেটে পড়ত তাদের, আগুনের ঝিলিক দেখা যেত তাদের চোখে মুখে, কথার আলোড়নে পাড়া সরগরম হয়ে উঠত। আবার গাঁজা-গুলির আড্ডাও রোয়াকে বসত। বাগবাজারের রসগোল্লার মত বিখ্যাত বাগবাজারের গুলও এই রোয়াকেই প্রথম বেরোয়, যা আজ দেশের নেতারা একচেটে ক'রে দেশের লোককে গুলি খাওয়াচ্ছেন।

* * *

হায়, বাঙালীর অমূল্য সম্পদ রোয়াক, আজ তুমি কোথায়? আজ তুমি হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছ ইতিহাসের পাতায়। কতক তোমাকে গ্রাস করেছে নগর-উন্নয়ন-পরিকল্পনার বড় কর্তারা, কতক গ্রাস করেছে কলকাতার হঠাৎ-আঙুল-ফুলে-কলাগাছ অভিজাত-শ্রেণীর বড় বড়

নাগরিকেরা। তোমাকে গ্রাস ক'রে কলকাতা স্ফীত হতে চলেছে—ভাবের ভেন্টিলেশন রুদ্ধ ক'রে কারবার চলেছে তোমার অশরীরী আত্মাকে বিক্রি ক'রে। হিন্দুস্থানীর, উড়িয়া-আসার, মাদ্রাজীর পান-বিড়ি-সোডা লেমনেডের দোকান, রিফিউজীর চায়ের দোকান, ভূতপূর্ব রাজবন্দীর পাঁঠার মাংসের দোকান তোমাকে টুকরো টুকরো ক'রে পয়সা চিবুচ্ছে।

হায় রোয়াক, তোমার খোলা বাতাসে জাতির জনকের অহিংস চিন্তার প্রথম স্ফুরণ ধরে। তোমার মসৃণ কোলে ব'সে বাঙালী যুক্তিবাদের দ্বারা কর্মবাদ বাদ দিয়ে স্বাধীনতা-ক্লীবতার বীজ বপন করতে শেখে। তোমার আওতায় এসে কত বাঘা-যতীন সন্ত্রাসবাদ ভুলে গিয়ে আত্মগোপন করে, থিয়েটার করে, ফুটবল-ক্রিকেটের গল্প করে, রেস খেলে, স্বর্গত দীনেন রায়ের অমর ব্লেকের রোমহর্ষক কাহিনী পড়ে, আধুনিক দস্যু মোহনের চমৎকারিণী সঙ্গিনী রমার প্রেমে পড়ে, শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তর উদ্ধার করে, স্বাধীনতা লাভ সুসাধ্য করে তোমারই কৃপায়। হে রোয়াক, তুমি সত্যই ধন্য।

রোয়াক, তোমার অধুনালুপ্ত গৌরবের কথা ভাবতে ভাবতে মাথায় 'র-অ-ক' 'র-অ-ক' ধ্বনি শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম এক উদাত্ত বাণী। বাণী ব'লে চলেছে—জওহর, আজও তুমি নাবালক আছ। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তুমি কাশ্মীর উদ্ধার করছ, লামার তিব্বতে গিয়ে তুষারধবল ধূর্জটি দেখে ভারতের পুনরাবিষ্কারের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ, বিলেতে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পতীর দেশের বাড়িতে অতিথি হয়ে বসছ, আবার আমেরিকা গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করছ। আর ভারতের বারুদাগার বাংলাকে ভুলতে বসেছ। বাঙালীকে আজও তুমি ঠিক চিনলে না। বাঙালী আড্ডা ভালবাসে। আড্ডাই তার প্রাণ। আজ সে আড্ডা ভুলতে বসেছে। বাংলার আড্ডার কেন্দ্রস্থল কলকাতার সেই সব রোয়াকগুলি বিনষ্ট হতে বসেছে। তুমি শিগগির কলকাতার উনত্রিশটা ওয়ার্ডে*

* বস্তুত কলকাতায় ৩২টা ওয়ার্ড আছে, কিন্তু দু-তিনটি ওয়ার্ডে—যেমন ভবানীপুরে, রোয়াকের চেয়ে পার্কের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। সেখানে রোয়াক আড্ডার স্বতঃস্ফূর্তি নানা আগন্তুক কারণে ব্যাহত হয়।

একত্রিশ হাজার পঁয়ষট্টিটা রোয়াক তৈরি ক'রে দিতে বল। আর প্রতি রোয়াকে গ্যাসবাতি ফিট ক'রে দাও। বাঙালীর চোখে গ্যাসের নিবু নিবু সবুজ আলো বড় ভাল লাগে। আর রোয়াকে রোয়াকে সরকারী খরচায় দাতব্য চা-খানা খুলে দাও। বাংলায় আজ অনেক ব্যাঙের ছাতা—ক্লাব লাইব্রেরি সমিতি হয়েছে বটে, কিন্তু সেসব জায়গায় প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না। আবার পয়সা দিতে হয়, কিন্তু চা মেলে না। প্রাণটা সব সময় চায়ের জন্য চাঁ-চাঁ করে। এই সব রোয়াক আবার গ'ড়ে উঠলে বাংলার ছেলেরা ও মেয়েরা দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে—

হঠাৎ মনে হ'ল, মাথায় বড় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। চেয়ে দেখি, শ্রীমান বিজয় মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

বাবু, আপনার খুব জ্বর হয়েছিল, বড্ড ভুল বকছিলেন, তাই ডাক্তারবাবু আপনার মাথায় বরফ দিতে বলেছেন।

বললাম, কই, থার্মোমিটারটা দে তো।

বললে, বাবু, গা ঠাণ্ডা বরফ। জ্বর উঠছে না।

বুঝলাম, বাংলার দেশজ আদি অকৃত্রিম ম্যালেরিয়া যেমন হঠাৎ আমাকে ধরেছিল, সেই রকম হঠাৎ আবার ছেড়ে চ'লে গেছে। আবার আসবে কখন?

শ্রীবিষ্ণু

আমরা সন্ধান পাইয়াছি, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বেশ্বর দাস কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক-পত্রে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' সম্পূর্ণ করিবার জন্য ঐ প্রবন্ধগুলির নকল আবশ্যক। যদি কাহারও সংগ্রহে বা সন্ধানে 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' থাকে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—শ্রীসজনীকান্ত দাস, সম্পাদক, 'শনিবারের চিঠি', ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। ফোন—বড়বাজার ৬৫২০।

অন্যপূর্বা

চোদ্দ

রাত তখন কম হয় নি। পুত্রের জন্যে উদ্বিগ্ন মনের বোঝার তলায় মা অপেক্ষা করছিলেন তার প্রত্যাবর্তনের জন্যে। এমন বিলম্বটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। ট্রান্সমিশন ডিউটি থাকলে এমন দেরি তো হয়েই থাকে। কিন্তু কই, ডিউটি ছিল ব'লে দেবু বলে নি তো! অনেক বার ভেবেছিলেন, টেলিফোন করবেন রেডিও স্টেশনে। শেষ পর্যন্ত করেন নি। পাছে সেখান থেকে পাল্টা প্রশ্ন আসে, বা আসে এমন উত্তর যা শুধু দুশ্চিন্তায় ইন্ধন যোগাবে। মা তাই আপন উদ্বেগ আপন অন্তরে নিবদ্ধ রেখে নিশ্চল মুহূর্তগুলি গুনছিলেন অসহ্য অধৈর্যে।

দরজার কাছে যখন দেবেশের পদধ্বনি শোনা গেল, তখন মার মন থেকে দুশ্চিন্তা অপহৃত হ'ল। কিন্তু মনের কোথায় যেন র'য়ে গেল অস্পষ্ট একটু খেদ। সে শুধু দেরি হবার খবর দেয় নি ব'লে নয়। এসেও দেবেশ বিশেষ কিছু বললে না ব'লে। স্বভাবতই সে উদাসীন। এই ঔদাসীন্যকে অপরে অনেক ভুল বোঝে অবজ্ঞা ব'লে। কিন্তু মা জানেন তাঁর ছেলেকে। অমন কথা তাই তাঁর কদাচ মনে হয় না। কিন্তু আজ যেন দেবেশের ঔদাসীন্যকে তিনিও পারলেন না তেমন সহজভাবে নিতে। দেবেশ বেশি কথা বলে না এমনিতেই, তা নিয়ে আর যে যাই মনে করুক, মার মনে ক্ষোভ নেই। তার নৈঃশব্দ্যে তাই তিনি বিস্মিতও হন না, আহতও হন না। কিন্তু নৈঃশব্দ্যেরও আছে প্রকারভেদ। তার অর্থ ভাষার চেয়েও স্পষ্ট হতে পারে কখনও কখনও।

দেরি হ'লে দেবেশ নিজেই দুঃখপ্রকাশ করে, কারণ বিবৃত করে সবিস্তারে। মার জিজ্ঞাসাও করতে হয় না কখনও। আজ সে শুধু উপরে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জানিয়ে গেল যে, রাত্তিরে সে খাবে না। আর কিছু না। একবার জানতে পর্যন্ত চাইলে না মা খেয়েছেন কি না, অন্য কিছু জানানো তো দূরের কথা। দেবেশ উপরে নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। তার মন

ছিল মালতীর চিন্তার আচ্ছন্ন। মার চিন্তার আর স্থান ছিল না সেখানে।

মালতীর কাহিনীবর্ণনে একটি অসহায় আত্মসমর্পণের সুর ছিল যা দেবেশের হৃদয় স্পর্শ করেছিল গভীরভাবে। সেই স্পর্শে জাগ্রত হয়েছিল তার ভিতরকার সেণ্ট জর্জ। কিন্তু ড্রাগনটি কে? কোথায় সে? তাকে এত সহজে খুঁজে পাওয়া গেল না। দেবেশের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রইল শুধু দুঃখিনী মালতীর ছবি।

কিন্তু মালতীর দুঃখটা কি? নিঃসঙ্গতা? দুদিন আগেও দেবেশের সহজ সমাধান জানা ছিল এই সমস্যার। তার স্পষ্ট উত্তর ছিল অধ্যয়ন। সে নিজে ডুবে ছিল তার বইয়ের মধ্যে, তাইতে হয়েছিল তার নিজের নিঃসঙ্গতার সম্পূর্ণ নিরসন। আজ কিন্তু তার এই সহজ উত্তরটাকে কোনক্রমেই যথেষ্ট মনে হ'ল না। কেবলই মনে হতে থাকল যে, বই দিয়ে সবখানি ফাঁক বুঝি চিরকালের জন্যে ঢাকা যায় না। আর, যে বিধি তার নিজেরই জীবনে অপর্যাপ্ত ব'লে আজ পরিগণিত, সে বিধান সে অপরকে দেবে কোন্ ভরসায়? মালতীর অসহায়তা যেন দেবেশে সংক্রামিত হ'ল।

মা এতক্ষণ নীচে ব'সে ছিলেন। দেবেশ খাবে না শুনে তাঁর নিজের ক্ষুধাও ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছিল। ছেলের সঙ্গে তখনই উপরে আসেন নি, অভিমান ক'রে নয়, রাগ ক'রে তো নয়ই, আসেন নি শুধু দেবেশকে একা থাকতে দিতে। মা ছাড়া এমন ভাল ক'রে কেউ বুঝি তাকে বোঝেন নি কখনও। কখন দেবেশ কি চায়, কখন সে কিসে বিরক্ত বা বিব্রত হয়, সব কিছু মার জানা হয়ে যায়, দেবেশের, এমন কি —তাঁর নিজের, অজান্তে। পুত্রের ঔদাসীন্যের কারণ তাই তাঁর স্পষ্ট না জানা থাকলেও এ কথা বুঝতে তাঁর মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি যে, তার বর্তমান ঔদাসীন্যের সঙ্গে যুক্ত আছে একান্ত ব্যক্তিগত কোন চিন্তা। সে চিন্তার অংশ নিতে মার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। কিন্তু মা এ কথাও জানতেন যে, সংসারে অধিকাংশ জিনিসেরই অংশীকরণ অসম্ভব। অন্তত, অংশ করলেও মূল পরিমাণের কণাটুকুও হ্রাস পায় না।

সব বুঝেও মা পারলেন না আর চুপ ক'রে থাকতে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে উপরে এসে দেখলেন, দেবেশ বিছানায় শুয়ে আছে স্থির হয়ে। নিদ্রামগ্ন নয়, চিন্তামগ্ন। সে টেরও পায় নি মার আগমন। মা একবার চিন্তা করলেন, ঘরের আলোটা জ্বালবেন কি জ্বালবেন না—পাছে দেবেশের অস্বস্তির কারণ হয় তা। শেষে আলোটা না জ্বেলেই আর নীরব থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর এত দেরি হ'ল কেন রে আজ, দেবু?

দেবেশ কি বলবে ভেবে পেল না। এখন তার মনে হ'ল যে, মাকে একেবারে খবরই দেওয়া হয় নি। কখনও-নয়ের চাইতে বিলম্বে? এখন তা হ'লে বলবে কি? সব কথা?

দেবেশের মুখ দিয়ে কথা সরল না। মার কাছে বলতে তার লজ্জা নেই, কিন্তু, কিন্তু— মালতীর তো আপত্তি হতে পারে। তার মা তো আর মালতীরও মা নয়। আজ সন্ধ্যায় যা হয়েছে, সে তো তার একক অভিজ্ঞতা নয়। তার ইতিহাসের কপিরাইট তো তার একার নয়। কপিরাইটের কথায় মনে পড়ল, এ বিষয়ে আইনটা কি? যে কথা বলল আর যাকে তা বলা হ'ল, এই দুজনের মধ্যে কার স্বত্ব সেই কথার উপর? যে চিঠি লিখল আর যাকে চিঠি লেখা হ'ল, এর মধ্যে কে সেই চিঠির অধিকারী? যুক্তস্বত্ব? ভাল কথা। কিন্তু যদি আসে বিচ্ছেদ, যদি হয় পার্টিশন স্যুট? তবে? আইনের এই সমস্যাটা নিয়ে দেবেশ বিপদে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই মনে হ'ল যে, প্রশ্নটা আদৌ আইনের নয়। নীতির? তার উত্তর তো সহজ। উভয়ের সম্মতি না থাকলে কোনও কথা প্রকাশ করা চলবে না। কিন্তু মালতীর সম্মতি এখন সে পায় কোথা? এদিকে মা যে অপেক্ষা করছেন উত্তরের জন্যে!

পুত্রের নৈঃশব্দ্যে মা বিস্মিত হয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, খুব কাজ ছিল বুঝি আপিসে?

না তো।

ও, বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?

হ্যাঁ, মা।

দেবেশ গভীর অস্বস্তির সঙ্গে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিল যে, তার উত্তরগুলি উত্তর নয়। মার কাছ থেকে যে একটা কথা গোপন করতে হচ্ছে, সেই অব্যক্ত কথাটার অবহনীয় বোঝার ভারে দেবেশের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। অন্যায় সে কিছু করে নি। সব কথা বলতে তার নিজের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তবু, কার অদৃশ্য হস্ত যেন তার কণ্ঠরোধ ক'রে রেখেছে!

মা সাধারণত অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু আজ তাঁর কেন যেন সব কিছু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হচ্ছিল। এই যে দেবেশের দেরি, এই যে তার কথা বলতে অনীহা, প্রশ্ন করা সত্ত্বেও—এই সবগুলি সাধারণ নিয়ম থেকে এমনই ব্যতিক্রম যে, অজানা ভয়ে মায়েরও আপন রীতি থেকে ব্যতিক্রম করতে হ'ল। দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ ক'রে মা তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, একাই গিয়েছিলি বুঝি?

দেবেশ তখনই উত্তর দিতে পারল না। তার সাতাশ বছরের জীবনে এই বোধ হয় প্রথম তার মাকে মনে হ'ল আপন চিন্তাধারার অন্তরায় ব'লে, আপন প্রাইভেসির এলাকায় অনধিকারিণী ব'লে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতন্ত্র কারও হস্তক্ষেপ ব'লে। এর আগে মাকে স্বতন্ত্র ব'লেই মনে হয় নি কখনও। মা তো তার নিজেরই অংশ, সে নিজে তো তার মারই অংশ মাত্র।

কিন্তু আজ কে যেন দাঁড়াল দুয়ের মাঝখানে!

ঘরটা অন্ধকার ছিল। তবু দেবেশ দু হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল। অকারণ একটা অপরাধ-বোধ তাকে নিরুত্তর করে রেখেছিল। অথচ সেই নিরুত্তরতাই যে তার অপরাধ-বোধের কারণ, তাও তার জানতে বাকি ছিল না। জুগুপ্সার অপরাধ গোপন করতেই বুঝি দেবেশ আরও স'রে গিয়ে শয্যার অপর প্রান্তে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অন্ধকার ঘরে অপেক্ষমানা মায়ের সরল জিজ্ঞাসা অপর পক্ষের নৈঃশব্দ্যের অস্পষ্টতায় অসহায়ভাবে হাত পেতে রইল। আর অপেক্ষা করতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, দেবেশ কোনও বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কি না।

ক্রমবর্ধমান ক্লান্তিতে। মনে মনে অসংখ্যবার ক্ষমা চাইল মার কাছে। আর মালতীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয় আকস্মিক। আমাদের দুজনের বিচরণ দু দিন পূর্বেও ছিল একেবারে বিভিন্ন কক্ষপথে। হঠাৎ কেন মিলিত হলেম জানি নে, আবার হঠাৎ কবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব তাও জানি নে। কিন্তু এই শুরু ও শেষের মাঝের সময়টায়—সে যত সংক্ষিপ্তই হোক বা যত দীর্ঘই হোক---এমন কিছু যেন আমরা না করি যার জন্যে লজ্জিত হতে হবে, যার জন্যে গোপনতার শরণ নিতে হবে, যার জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে অসত্যের কাছে। তোমার আমার বন্ধুত্বে—হ্যাঁ, বন্ধুত্ব ছাড়া আর কি?—এমন কিছু যেন প্রবেশ করতে না পারে যা সত্যের বিরোধী। প্রেম—না, প্রেম নয়; বন্ধুত্ব—সে তো জীবনবহির্ভূত ন্যায়-অন্যায়-স্বাধীন একটা বস্তু নয়; সে জীবনেরই অংশ। জীবনে যা অন্যায় বা অসত্য, বন্ধুত্ব তাকে ন্যায় বা সত্যে রূপান্তরিত করতে পারে না, কখনই না। মালতী, এই নীতির বিরোধী আমি যেন কখনও কিছু না করি। মালতী, তুমি যেন আমায় তেমন কিছু করতে দিয়ো না। মালতী, কখনও না।

এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও দেবেশের অনিশ্চিত দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হ'ল না। মনে মনে সে ভর দিল মালতীর উপর। ভরসা না হ'লেও, অপরিসীম সান্ত্বনা লাভ করল মালতীর নামটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে।

মালতী, মালতী, মালতী!

পনেরো

মালতীর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি এসে থামল, তখনও তার একটু সময় লাগল নিজেকে এই কথাটা সম্যক উপলব্ধি করাতে যে এখানে তার নামতে হবে। নিদ্রাবিহারীর মত ঠিক ঠিক ভাড়া চুকিয়ে দিল, ফটক খুলে ঢুকল, তারপর ঠিক ফটক বন্ধ ক'রে নিজের ঘরের কাছে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। সবই ঠিক করেছে, কিন্তু যেন সজ্ঞানে নয়। স্বপ্নাবিষ্টের মত।

দোতলার আলো তখন নিবে গেছে। চাকররা শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

নিদ্রাবিহারিণী নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকল, পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়! জামাকাপড় কিছু ছাড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে জুতোটা খুলে সটান শুয়ে পড়ল সামনের শয্যায়। কাজটা শক্ত নয়। ঘরের যেখানে যা ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। কিছুমাত্র বদল হয় নি। জড়পদার্থের সুবিধাই এই। বদল হয়েছে শুধু মালতী। যে মালতী সেই সন্ধ্যায় ঘর থেকে দেবেশকে নিয়ে বেরিয়েছিল আর যে মালতী এখন ঘরে ফিরেছে, তাদের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এক আরের অপরিচিতা।

কিন্তু ঘরটাও যেন বদল হয়েছে। অন্তত মালতীর তাই মনে হ'ল। এক দিক থেকে সে স্বপ্নাবিষ্ট, কিন্তু অপর দিক থেকে তার সব কটা ইন্দ্রিয় যেন প্রখরভাবে জাগ্রত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে দৃষ্টির অন্তরালে অবহেলিত হয়েছে, অকস্মাৎ সে সব অকিঞ্চিৎকর জিনিসও যেন নবরূপ পরিগ্রহ ক'রে দৃষ্টি দাবি করল। শুধু দৃষ্টি জাগ্রত হয় নি। ঘ্রাণও। ঘরে শয্যার পাশে ফুলদানিতে আজ মালতী এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার আয়োজন করেছিল বিশেষ ক'রে দেবেশের আগমনের উপলক্ষ্যে। আকাঙ্ক্ষিত সে অতিথি এসেছিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল সরোজ। সে যেন উপদ্রব। তাই দেবেশের উপস্থিতিতে রজনীগন্ধার কথা একবারও মনে হয় নি মালতীর। এখন এই অন্ধকার ঘরে রজনীগন্ধাগুলি যেন কথা ক'য়ে উঠল, সুর ক'রে গেয়ে উঠল। ছোট ঘরখানি গানে গন্ধে ভ'রে উঠল।

কিন্তু শুধু রজনীগন্ধা নয়। তার গন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আরও তীব্র একটা গন্ধ। সেটাকে সনাক্ত করতে একটু সময় লাগল মালতীর। হ্যাঁ, সিগারেটই হবে। এখন তার মনে পড়ল যে, দেবেশ তার ঘরে ব'সে গোটা তিনেক সিগারেট খেয়েছিল। বাহির থেকে ভেসে আসা স্নিগ্ধ রাতের হাওয়া, তার সঙ্গে রজনীগন্ধার সুরভি আর পুড়ে-যাওয়া সিগারেটের গন্ধাবশেষ, সব কিছু মিলে মালতীকে আচ্ছন্ন করল। নিকোটিন আর রজনীগন্ধার সমন্বয়টা উৎকট ব'লে মনে হওয়াই

আর কোনও মানুষ যে কোনও দিন অনুরূপ আনন্দের কণামাত্র অনুভব করেছে এমন সম্ভাবনাই স্বীকার করবে না মালতী।

তা হ'লেও, কবির কথা কবির। মালতী বলবে তার নিজের কথা, নিজের ভাষায়। অমন নিরাভরণভাবে স্খলিতকবরীতে লজ্জা হয় দেবেশের সামনে দাঁড়াতে। কিন্তু তবু, কাজ নেই ধার-করা বেশে। মনের কথা আপন মনের মত ক'রে বলবে। আপন হৃদয়শতদল মেলে ধরবে। নেবার হ'লে সে নেবেই। কবিই তো বলেছেন, পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।

মালতী লিখল। লিখল,—। না, যা লিখল তা শুধু দেবেশকেই লেখা। খোলা চিঠি নয়।

প্রতিটি ছত্র লেখবার সময় মালতী যেন একটি একটি যোজন ক'রে দেবেশের কাছে এগিয়ে আসছিল। শেষ ছত্রে এসে হাত ঠেকল দেবেশের হাতে। আর অমনই সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশে রাখল রজনীগন্ধার গুচ্ছটি। চুপিচুপি নিদ্রা এসে জাগরণের স্বপ্নকে স্বপ্নের সত্যতা দান করল।

ঘুম ভাঙল ভোর না হতে। জনহীন পথে কোলাহল নেই। দূর আকাশে শুকতারাটি তখন বিদায় নেবার আগে করুণ চোখে চেয়ে ছিল ধরণীর দিকে। কঠোর সূর্য তখনও অন্ধকারের অবগুণ্ঠন হরণ ক'রে ধরণীকে করে নি লাঞ্ছিতা। মালতী চোখ মেলেই দেখল চিঠিটা। একবার ভাবল, খুলে পড়ে। পড়ল না। পাছে লজ্জায় ম'রে যায়, পাছে এখানে ওখানে বদল করবার লোভ সম্বরণ করতে না পারে।

শুধু কলমটা তুলে নিয়ে মালতী যোগ করল, দেবেশ, কাল রাতে তুমি পাশে ছিলে না ব'লে তোমাকে সহস্রবার অভিশাপ দিয়েছি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ধন্যবাদ দিয়েছি বিধাতাকে। তুমি থাকলে আমাদের উপর দিয়ে যে প্লাবন ব'য়ে যেত, তার জল স'রে গেলে তুমি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে না, আর আমাকে তো মরতেই হ'ত জলে ডুবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ।

মনে মনে বলল, ভগবান, এমন যেন না হয়। দেবু, এমন যেন না হয়।

ক্রমশ

"রঞ্জন"

অক্ষর-সঙ্গীত

কবি পঞ্চেন্দ্রিয় সাহায্যে গ্রাহ্য—রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভোগ্যগুলি ও মানসিক আবেগ-আবেশ বর্ণনা করিয়া পাঠকের হৃদয় অধিকার করেন। পাঠকের নিস্তরঙ্গ মনে যে ভাব বা অনুভূতি সৃষ্টি করেন, চিত্তের ওই প্রথমা বিক্রিয়াই ভাব।

"নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমা বিক্রিয়া।"

—অলঙ্কারশাস্ত্রে এই শ্লোকার্ধ নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনে যে ভাব (রূপজ মোহ, মিলনের আকুতি) উৎপন্ন হয় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবের অর্থ ব্যাপকভাবে লইতে হইবে। এই ভাবকেই 'রস' বলা হয়। "স্থায়ি-ভাবাঃ রসাঃ স্মৃত"—স্থায়ী ভাবকেই রস বলে। অস্থায়ী, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবগুলি স্থায়ী ভাবের পরিপুষ্টি সাধন করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র "রাত্রে ও প্রভাতে" নামক কবিতাটিতে গোড়ার দিকে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের কথা বলা হইয়াছে। এইটিই স্থায়ী ভাব, কিন্তু ওই কবিতারই শেষাংশে—

"এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।"

বসাইলে অলঙ্কারিকগণের মতে "রসাভাস"-দোষ ঘটে। এই যে উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রস, ইহা প্রকাশের পক্ষে অনুকূল অক্ষর নির্দিষ্ট আছে। র, ল, ত, থ, দ, ধ, ন, স, ঋ, ঌ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এইগুলি শ্রুতিমধুর বর্ণ। 'র' সকল রসের দীপন করে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার নাম "অগ্নি বর্ণ"। 'স' মধুরতম অক্ষর। গ্রিম সাহেবের মতে l, m, n, r—এই চারিটি স্বজাতীয় বর্ণ। শ্রুতিকটু বর্ণসমূহ এই বর্ণগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইলে অর্ধ-মধুরত্ব ঘটে। যেমন, 'খ' শ্রুতিকটু; ইহার

সহিত 'ঙ' যুক্ত করিলে "ঙ্ঘ" হয় এবং খ-এর কর্কশত্ব দূরীভূত হয়। খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ক্ষ, হ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ এবং ট, ড, ঢ—এইগুলি শ্রুতিকটু বর্ণ। এইগুলিকে অর্ধ-মধুর করিতে হয় তাহার নিজবর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া। যেমন—ঙ্খ, ঙ্ঘ, ঞ্ছ, ণ্ট, ণ্ড, ন্ধ। যথা—গুণ্ঠন।

এ পর্যন্ত গ, জ, ব বাদ দেওয়া হইয়াছে। মধুর বর্ণের সহিত শ্রুতিকটু বর্ণ যুক্ত করিলে তাহা অর্ধ-মধুরত্ব সম্পাদিত হয়। আর ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ—এইগুলির নাম "মহাঘোষ" বর্ণ। কারণ এই বর্ণগুলি ভাবকে পাঠকের মনে দৃঢ় করে। ইহাও প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সংযুক্ত বর্ণ রচনার অস্থি-স্বরূপ।" যেখানে বলপূর্বক কিছু বলিতে হয়, সেইখানে সংযুক্ত বর্ণ দরকার। যথা, মাইকেল লিখিয়াছেন,—

"যাদঃপতি রোধঃ যথা
চলোর্মি আঘাতে।"

অর্থাৎ সহজ করিয়া বলিলে হয়, "সাগরের তীর যথা তরঙ্গের ঘায়"; কিন্তু ইহাতে Onomato poea অর্থাৎ ভাষা ভাবের প্রতিধ্বনি স্বরূপ হইত না। সমুদ্র জিনিসটা কোমল বর্ণের দ্বারা বর্ণনা করিলে ভুল হইত।

দেখা গেল যে যুক্তাক্ষর কিরূপ রচনার পারিপাট্য সাধন করে। হিমাচলের বর্ণনা করিতে গেলে হিমাচলের গাম্ভীর্য এবং প্রস্তরের কার্কশ্য শ্রুতিকটু বর্ণের দ্বারাই প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যখন কোন ছোট নদী বহিয়া যায় তখন সে যেন বলে, "I babble over pebbles"। এখানে ট বা শ্রুতিকটু বর্ণের সমাবেশে নদীর গতি ব্যাহত হইত। l, m, n, r, (liquid বর্ণের) যে শক্তি আছে তদ্দ্বারাই সৌন্দর্য, প্রেম, শান্তভাব, মহিমময় ভাব, ভক্তিভাব প্রকাশ করিতে হয়। এই চারিটির মধ্যে 'ল' স্থিতিশীল। 'র' গতিশীল। এই 'ল'কে তন্ত্রে "পৃথ্বীবর্ণ" বলা হয়। স্থিতি ও গতি রসপ্রকাশের আত্মা।

এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে স্বরবর্ণগুলির অনুপ্রাস আবেশ (emotion) প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। যেমন—

"আষাঢ় আকাশে আঁধার ঘনায়ে আসে
মাতাল বাতাসে চাঁপার গন্ধ ভাসে।
আমি আজি নাই আমার প্রিয়ার পাশে।"

'আ'-কারের পুনোরুক্তির উদাহরণ। ঐ এবং ঔ মানুষের মনকে ঊর্ধ্বে তুলে। তখন—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা।"

আবার যেখানে মৃদু ভাবের বিকাশ,—

"আজিকার নিশি ভুল না
ফুলশাখে বাঁধ ঝুলনা।"

সেখানে 'উ' দেখা যায়। 'উ' আদর প্রকাশ করে, দরদ মেশায়। যেখানে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়, সেখানে এইগুলির মিশ্রণ চাই।

"আজি উন্মাদ মধু নিশি
ওগো চৈত্র নিশীথ শশী।"

এখানে যুক্তাক্ষর এবং 'উ'-কারের মিশ্রণ। গায়ত্রীতে 'ভ'এর পুনরুক্তি হইয়াছে কয়েক বার। কারণ 'ভ' সর্বোচ্চ বর্ণ (স্পর্শ বর্ণের মধ্যে)। গায়ত্রী সর্বোচ্চ বর্ণে নির্মিত।

ভাষাই ভাবের বাহন। অক্ষরের দ্বারাই শব্দগুলি নির্মিত হয়। যে রসে যুক্ত অক্ষরের আধিক্য নিষেধ, সেখানে যুক্তাক্ষর রসপ্রকাশের পক্ষে প্রতিকূল। যেমন—জল, নীর, সলিল, অপ্, অম্বু, বারি, উদক, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে শুধু 'অম্বু'তে যুক্তাক্ষর আছে। সুতরাং 'অম্বু' কিছুতেই কোমল রসে ব্যবহৃত হইবে না। কারণ যুক্ত অক্ষর বল-প্রকাশক। নীর, সলিল, বারি—যেটি সুবিধা হয় দিতে হইবে। তবে 'নীর' এবং 'বারি'তে 'র' থাকায় অতি সুমধুর ও 'সলিল'এ 'স' থাকায় সুমধুর। এখন হিসাব করিয়া যেটি বসাইলে যেখানে উপযুক্ত হয়, ভাবের সাহিত্যকে অর্থাৎ সহচরত্বকে আঘাত করে না, তাহাই লেখকের প্রয়োগ করা কর্তব্য।

তিনটি ভাব পাশাপাশি বসাইলে তাহাদের একাসনে বসিবার

যোগ্যতা বা আভিজাত্য আছে কি না দেখিতে হইবে। ইহারই নাম 'আসত্তি'। সাংখ্যদর্শনে এই আসত্তির কথা বিশেষ করিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই 'আসত্তি'ই সাহিত্য নির্মাণ করে। যেমন কেহ বাঁশী বাজাইতে থাকিলে পরবর্তী সুরটি শ্রোতার কর্ণ প্রতীক্ষা করে। এবং সেই সুরটি বাজাইতে না পারিলে সুরবিন্যাস ব্যাহত হয়। এইরূপ ভাবেরও সুর আছে। এই সুরের সহিত সুর মিলিত করিতে পারিলেই আভিজাত্যের সুর বা অন্য কোন সুর ঠিক বাজে। যেমন ভৈরবী রাগিণীতে কড়িমধ্যম সুর নিষিদ্ধ, তেমনই প্রীতিরস প্রকাশে শ্রুতিকটু বর্ণগুলিও নিষিদ্ধ।

কবিরা বাগ্-যোগবিৎ। দুইটি 'আইবুড়ো' শব্দের বিবাহ দিতে হইবে, যাহারা ইতিপূর্বে পাশাপাশি বসে নাই। মাইকেল লিখিয়াছেন, "শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন…।" রবীন্দ্রনাথ "প্রভাত তপন" লিখিয়া প্রভাতের সহিত তপনের বিবাহ দিয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন কবি এরূপ বিন্যাস করেন নাই। এই নূতনত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। ইহারই নাম বাগ্বিভূতি।

যে অক্ষরগুলি শ্রুতিকটু, সেই অক্ষরগুলি রুদ্ররসে, বীররসে, বীভৎস-রসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন হেমবাবু লিখিয়াছেন :—

"কূর্ম কমঠী কূট ঊর্মিতে লটপট"

—ইহা শ্রুতিকটু, তিনি যে রস প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহার পক্ষে অনুকূল। হেমবাবু আরও লিখিয়াছেন :—

"ঐ শশী ঐখানে এইখানে দুইজনে
কত দিন মনে মনে
কত আশা করেছি
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।"

সব বর্ণগুলিই লাগ্‌সই হইয়াছে।

কবি যখন লেখেন, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াই লেখেন। এই আত্ম-বিস্মৃতিক্ষণে রসের প্রতিকূল অক্ষর স্বত্বই বর্জিত হয়, এবং আত্মবিস্মৃত কবি যাহা কিছু লেখেন, তাহার মধ্যে একটা সুর থাকে। Lyric কবিতায় একটি মাত্র সুর আদ্যন্তমুখর থাকে।

আহত হইলে কবির প্রাণ কাঁদে। তখন সেই কাঁদনের গান দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট ও 'প্লুত'স্বরবিশিষ্ট হয়। যেমন বৈষ্ণব কবিতার স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথকে পড়িতে শুনিয়াছি—আকারগুলি টানিয়া টানিয়া।

"আ—কুল করিল মোর প্রা—ণ,"
"সই কেবা—শুনা—ইল শ্যা—ম না—ম,"

আবৃত্তির মুখে ছন্দটি রক্ষিত হইল।

এইবার 'ধ্বনি'র কথা। 'ধ্বনি' শব্দের অর্থ Sound (শব্দ)। আবৃত্তির জন্য রচিত কবিতায় এই 'ধ্বনি'রক্ষার কৌশল অবলম্বিত হয়। কোন ছত্রের প্রথমার্ধের ব্যবহৃত দুই-একটি অক্ষর দ্বিতীয়ার্ধে পুনরুক্ত করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথমার্ধে যে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ব্যবহৃত হয়, সেই বর্ণের কয়েকটি দ্বিতীয়ার্ধে দিতেই হইবে। প্রথমার্ধে যদি 'ধ' ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয়ার্ধে 'ধ'এর কোমল 'দ' ব্যবহৃত হইবে। প্রথমার্ধে 'ক' হইলে, দ্বিতীয়ার্ধে 'গ' থাকিবে। ইহার অন্তর্মিলও আছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচুর অন্তর্মিল ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—

"একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা"

যদিও পংক্তির শেষে মিল নাই, তবু অন্তর্মিলে ভরা। ছত্রের ভিতরে অনুপ্রাস দ্বিরুক্ত হইলেই একরূপ মিল হয়। "অর্ধমিল"ও দেখা যায়। প্রথমার্ধে যদি 'সনে' কথাটি থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে 'স' ব্যবহৃত হইবে। যেমন—

"সখি তব অশ্রুধারা"

প্রথমার্ধে 'স' আছে এবং পরে অশ্রুর 'অস্' মিলে "অর্ধমিল" হইল।

"ভালোবাসা তার গোলাপ শয়ন।"

এখানেও 'লো' এবং 'গোল'—অর্ধমিল।

এইবার কবিতার প্রাণবস্তু কি? প্রাণ—চিরবিরহের বেদনা।—

"বাঁশীর রাগিণী মূরছি রয়েছে মর্মর রূপ ধরি—
বঁধুর পরশে ঘুমায় হরষে মমতাজ সুন্দরী।
ভালোবাসা তার গোলাপ শয়ন,

কেশর-পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে ব'সে আছে শিয়রের কাছে যুগ-যুগান্ত ভরি।...

নীরবে ঝরিল মরণের হাসি বাসরের উপকূলে,
খ'সে প'ল তার ঘোম্‌টা-সরম চুমিয়া চুলের ফুলে।
লুটাল চরণে হীরার মুকুট,
খুলে দিল বালা প্রেম-সম্পুট—
দিগ্‌-বিজয়ীর বুকের রুধির ঝরিল চরণ-মূলে।"

কবিতাটি আগাগোড়াই এই বেদনাপ্লুত। বেদনাপ্লুত বলিয়াই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত করে। রবিবাবুর 'ডাকঘর' দেখিয়া চোখের জল রাখা যায় না। সীতাহরণের কথা শুনিয়া চোখে জল আসে। কিন্তু মনে এক অপূর্ব আনন্দও জাগে। আনন্দ বিতরণই কবিতার প্রাণ।—

"মরণের ছায়া-'চিকের' ওপারে লুটাইছে তব নীলাম্বরী,
হাত বাড়াইয়ে পাই নে নাগাল, পরশের আগে যাও গো সরি।
কথা ছিল এই, আগে যাবে যে-ই, করিয়ে পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
গেছ দুর ঠাঁই, খবর না পাই, একা-একা ওগো আছ কেমন?

তুমিও কি আজি আমারি মতন এমনি উতলা আথর চিতে,
বক্ষে চাপিয়া আগুনের ঝাঁপি ফুঁপিয়া উঠিছ আচম্বিতে?
জাগরণে নেই! হেরি স্বপনেই আনাগোনা কর লজ্জাবতি,
এ কি তব রীত! আমার সহিত এ কি লুকোচুরি, ব্যথার ব্যথী?"

কোন প্রাচীন ব্যক্তির মুখে আমি শুনিয়াছি, মানুষে ভূত দেখে কেন? কারণ অত্যন্ত শিশুকাল হইতে আমরা মা-ঠাকুরমায়ের মুখে ভূত দেখার গল্প শুনিয়া থাকি। ফলে ঐরূপ কোন স্থানে (শ্মশানে, ফাঁকা মাঠে) যখন আসিয়া পড়ি, তৎক্ষণাৎ ঐরূপ গল্পে শোনা কোন মানসমূর্তি দেখিবার আশঙ্কায় আমরা চিন্তান্বিত হইয়া পড়ি। ওই চিন্তার একাগ্রতার ফলে একটি মানসমূর্তি আমাদের চোখের সামনে প্রতীয়মান হয়। তৎদণ্ডে উহাকেই আমরা ভূত মনে করিয়া ভয় পাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা কিছুই নয়।

উহা আমার নিজের ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হইয়াছে। আমি একবার

হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যে পথ হারাইয়া ফেলি। বহু অন্বেষণেও যখন পথ খুঁজিয়া পাইলাম না, তখন মনে মনে কোনও ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আমার "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" প্রাণের ঐরূপ ঐকান্তিক ইচ্ছার বা চিন্তার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি একটি মানুষের মূর্তি দেখিতে পাইলাম, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া সেই অরণ্য হইতে বাহির হইয়া পড়ি। পরে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার আশায় নিকটে ডাকার পর আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, সেই মনুষ্যমূর্তিটি আমার মনঃকল্পিত, কিন্তু বাস্তবের ন্যায় প্রত্যক্ষ। কবিরাও ঠিক এইরূপেই ভাবের রূপ অর্থাৎ প্রতিমূর্তি দেখিতে পায়।

এই স্থলে জানা উচিত 'ক' যখন aspirated হয়, তখনই 'খ' হয়। 'ক'কে বলে 'স্বল্প-প্রাণ' বর্ণ। আর 'খ'কে বলে 'মহাপ্রাণ' বর্ণ। ক, চ, ট, ত, প স্বল্প-প্রাণ এবং খ, ছ, ঠ, থ, ফ মহাপ্রাণ বর্ণ। গ, জ, ড, দ, ব স্বল্প-ঘোষ বর্ণ। ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ মহা-ঘোষ বর্ণ (Loud)। এই মুখরতা (Loudness) এবং কোমলতা (Sweetness) যথারীতি সন্নিবিষ্ট হইলে (Permutation Combination) পাঠকের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"কভু সংকট ছায়া সঙ্কিল
বঙ্কিম দুরগম ;—" ('চিত্রা', "অন্তর্যামী")

এই 'ট' স্বল্প-প্রাণ হইলেও কিন্তু ট-বর্গের Loudness (মুখরতা) আছে। "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" গীতায় ইহার মানে অন্যরূপ হইলেও আমরা অক্ষরের সাধারণ অর্থ ই গ্রহণ করিতেছি। 'ক্ষ' ও 'হ' সর্বোচ্চ চীৎকার ঘোষণা করে।

অন্ধকারে ধ্বনি চক্ষুর কার্য করে। এই ধ্বনিকেই বৃহদারণ্যক 'জ্যোতি' বলিয়াছেন। ধ্বনিসামঞ্জস্যই আমাদের মনোভাবকে অন্যের বোধগম্য করে। ধ্বনি-হীনা কবিতা প্রাণহীনা। অক্ষর-বিন্যাসের বৈচিত্র্যবশতই কবিতা চিত্তাকর্ষক হয়। চণ্ডীর যে কোন শ্লোক ইহার সাক্ষ্য দেয়। অনুষ্টুভ ছন্দে ১৬টি অক্ষরে একটি পংক্তি এবং অপর ১৬টি অক্ষরে দ্বিতীয় পংক্তিটি গঠিত হয়। চারিটি পদের প্রত্যেক পদে ৮টি

করিয়া অক্ষর থাকে। প্রথম ৪টি অক্ষরের হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব কবির স্বেচ্ছাধীন। পঞ্চম বর্ণটি সর্বত্র লঘু হওয়া চাই। কারণ "সর্বত্র লঘু পঞ্চমঃ"।

চণ্ডীতে ১৬টি অক্ষরের লাইন আছে। আবার ১৬টির মধ্যে হসন্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে ৮টি। হসন্ত বর্ণ উচ্চারণ করিবার পর আমাদের নিশ্বাসের নিমেষমাত্র বিরতি হয়। সেই বিরতির নামই "স্বল্পযতি", অর্থাৎ জিহ্বার অল্প বিশ্রাম। এই বিশ্রাম দীর্ঘ হইলে তাহাকে "যতি" কহে। "জিহ্বার বিশ্রামস্থান যতি নাম ধরে"। প্রথম ৮টি অক্ষরের মধ্যে জিহ্বার বিশ্রাম নাই। তবে হসন্ত বর্ণ থাকায় একটু বিশ্রাম পাওয়া যায়। যুক্তাক্ষরে একটি হসন্ত বর্ণ আছে। ৮টি অক্ষরের পর অর্ধ বিশ্রাম। লাইনের শেষে পূর্ণ বিশ্রাম। এই যতি ঠিক হইলেই ছন্দ আপনা হইতেই ঠিক হয়। ছন্দের সাহায্যে ভাবটি সুপ্রকাশ হয়।

হংসবাহিনী বাণীকেই ছন্দোবাহিনী করেন কবিরাই। যে শব্দগুলিতে বাণী গঠিতা, ঐগুলি ছন্দের বিচিত্র নাগরদোলায় চড়াইলে গতিযুক্ত হয়, এবং শব্দের অর্থটিকেও উত্তমরূপে ব্যক্ত করে। ছন্দের দোলায় না চড়িলে সুর সুসংস্কৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শব্দই ভাবের বাহন।" যে শব্দটি আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করি, সেই শব্দটি ছন্দে ধৃত হইলে তাহাতে একটি অপূর্বত্ব উপলব্ধ হয়। মন ও অন্তঃকরণের দ্বিজত্ব লাভ হয় শব্দের দ্বারা। কোন স্থানে ওই স্থানের উপযুক্ত শব্দটি না বসাইতে পারিলে লেখা সুশোভিত বা সুবিন্যস্ত হয় না। এইরূপ হইলেই শব্দের সহিত সুরের মিলন ঘটে। সুরই গীতি-কবিতার প্রাণ।

নাগরদোলায় উঠা-নামার এই তালকেই ছন্দ কহে। ছন্দে ধৃত অক্ষরগুলির উচ্চারণকাল ব্যাপিয়া যে সময়টুকু লাগে, ঠিক তাহার পরেই জিহ্বাকে একটু বিশ্রাম দিতে হয়। এইখানে অনুচ্চারিত ধ্বনি থাকে। পয়ার ছন্দে প্রথম ছত্রে ১৪টি অক্ষর থাকে এবং ছত্রটির প্রথমার্ধে ৮ম অক্ষরের পরেই 'অর্ধ-যতি' (অর্থাৎ একটু থামা) দরকার হয়। এই আটটি অক্ষরের মধ্যে জিহ্বার বিশ্রাম-স্থান থাকিবে না। এই যে অক্ষর উচ্চারণে বিরতি, এই কৌশলেই ছন্দ নির্মিত হয়।

লিখিলাম। কারণ, না লিখিলে ভয়ানক চটিয়া যান।

লিখিলাম।—

স্বর্ণাধারটি জাহাজের পাটাতনের উপর রক্ষিত হইল। উন্মুক্ত পেটিকাদ্বয়ের মধ্যে হইতে অর্হৎ সারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লান চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আনন্দাশ্রুতে উভয়ের নয়ন ভরিয়া গেল।

সারিপুত্র বলিলেন, মোগ্‌গল্লান ভাই, আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। কতদিন—কতদিন পরে আমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম! প্রত্যাবর্তন করিয়া কি দেখিতেছি? আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য ভারতের রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, যুবক বৃদ্ধ সকলে সমবেত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধে আজি আর কোন বিরোধ দেখিতেছি না। সকলেই আজ ভগবান বুদ্ধের সেবক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

অর্হৎ মোগ্‌গল্লান বলিলেন, শুধু ভারতবাসী নহে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, সিংহল, তিব্বত সমস্ত পৃথিবী আজ আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। জয়! ভগবান বুদ্ধের জয়!

উভয়ে তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মোগ্‌গল্লান পুনরায় বলিলেন, অবশ্য আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর সময় লাগিয়াছে। এতদিনে হিংসার উপর অহিংসার জয় সুনিশ্চিত হইল। মানবের দুঃখমুক্তির আর তবে বিলম্ব নাই।

আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন!—সারিপুত্র মুগ্ধকণ্ঠে আর একবার বলিলেন।

জাহাজের দিকে কাহারা অগ্রসর হইতেছেন। সারিপুত্র বলিলেন, মোগ্‌গল্লান ভাই, তুমি ইদ্ধি-শক্তিতে অদ্বিতীয়। দেখ, কাহারা আসিতেছেন?

মোগ্‌গল্লান পরিচয় বর্ণনা করিলেন।

স্বর্ণাধার সহ উভয়ে শূন্যে উত্থিত হইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়-গর্জনের ন্যায় শব্দ হইল—

গুড়ুম !

পেটিকাদ্বয় কম্পিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধ তথাগতের প্রধান শিষ্যদ্বয় ভীত-চকিত হইয়া উঠিলেন। উভয়ে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও কি ? প্রলয় ? মেঘগর্জন ?

মুহূর্তমধ্যে আবার সেই বিধ্বংসী শব্দ।—গুড়ুম !

গুড়ুম ! গুড়ুম ! গুড়ুম !—উনিশ বার।

মোগ্‌গল্লান কালবিলম্ব না করিয়া সারিপুত্রের হাত ধরিয়া পেটিকা ত্যাগ করিয়া শূন্যে বহির্গত হইলেন। অন্তরীক্ষ্যে অবস্থান করিয়া দম লইতে লইতে বলিলেন, আমি জানি। ব্রাহ্মণদের আক্রোশ এখনও দূর হয় নাই। সেবারে আমাকে মুগুরের আঘাতে মারিয়াছিল। এবার একটা সাংঘাতিক আয়োজন করিয়াছে।

সারিপুত্র বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি বুঝিয়াছি।—মোগ্‌গল্লান তাড়াতাড়ি বলিলেন, আমাদের হত্যা করিতে চায়। ওই দেখ, দেখ।

সারিপুত্র দেখিলেন, বহু লোক সারিবন্দি দাঁড়াইয়া এক প্রকারের লৌহনির্মিত অস্ত্র স্বর্ণাধারের দিকে উদ্যত করিয়া নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

সৈন্য !—মোগ্‌গল্লান বলিলেন, আমাদের কালেও ছিল ; কিন্তু ওই ধরনের অস্ত্র ছিল না।

সারিপুত্র বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, আমাদের মত দুইজন অহিংস বৌদ্ধকে হত্যা করিতে এত আয়োজন কেন ইহারা করিল ?

মোগ্‌গল্লান কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

অস্ত্রধারী সৈন্যদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে আর একদল সৈন্য বাদ্যভাণ্ড-সহকারে সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

সারিপুত্র কিছুক্ষণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'অধিনায়ক জয় হে' বলিতেছে যে ! আমাদেরই তো জয় দিতেছে ! তবে ? কিন্তু ও কি ? আবার লইয়া চলিল কোথায় ?

দেখা যাউক।—মোগ্‌গল্লান বলিলেন, বিষয়টা পরিষ্কার অনুধাবন না করিয়া পেটিকায় পুনঃপ্রবেশ করা সঙ্গত হইবে না।

তিনিও যেন পরম পক্ষী-দম্পতীর নাচ দেখছিলেন রিপ্লে সাহেবের সঙ্গে ব'সে ব'সে। পুরুষ পাখিটির সমস্ত গা কালো মখমলে মোড়া, মাথার উপর ছোট ত্রিভুজাকৃতি রৌপ্য-ধবল তিলক একটি। সেই তিলকের পিছন থেকে সরু সরু লম্বা তারের মত কয়েকটা চুল চ'লে গেছে পিঠের দিকে। প্রত্যেকটি চুলের আগায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে তৈরি থুপনি ঝুলছে। বুকের উপর ছোট্ট একটি ঢাল বাঁধা আছে যেন। সূর্যালোকে তার থেকে কখনও সবুজ, কখনও তাম্রাভ রঙ ছিটকে পড়ছে। দুলে দুলে নাচছে,—ঠিক যেন মানুষ। তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন কবি। অনেক কাজ আছে তাঁর, তবু ব'সে রইলেন। অমরেশবাবুর পাখিগুলোর তদারক করতে হবে, ডানার কাছে যেতে হবে একবার, মন্দাকিনীর চিঠির জবাব দিতে হবে। বিয়ে-বাড়িতে কি কি আয়োজন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি রকম যে নাকাল হতে হচ্ছে, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন মন্দাকিনী। আনন্দ-নাড়ুর জন্য নারকেলই পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে অগ্নিমূল্য দিয়ে নাকি যোগাড় হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সব নূতন কাপড় এসেছে তার পাড়গুলো মোটেই ভাল নয়, খোকনের জামার ছিট মোটেই পছন্দ হয় নি অথচ দাম নিয়েছে একটি গাদা, কন্যাপক্ষ নমস্কারী নিয়ে নানা বায়নাক্কা তুলেছে নাকি—এই রকম বহু খবর দিয়েছেন মন্দাকিনী। আনন্দবাবু এবং সুন্দরীর সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সে কথাও বার বার জানিয়েছেন। উভয়ের সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণও চেয়েছেন অবিলম্বে। সুন্দরীকে রোজ চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার গোবরের যে পাতলা ভাবটা ছিল সেটা গেছে কি না, মৈথিল ঠাকুরটা রান্নাবান্না কেমন করছে, আনন্দবাবুর সর্দি-টর্দি আর হয়েছে কি না—এমনই নানা প্রশ্ন করেছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীকে একটা উত্তর দিতে হবে, আজই দেওয়া উচিত, মনে হচ্ছিল কবির। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেই ভাল লাগছিল। দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, গাছে ফুলও ধরেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় খানিকটা সবুজ, খানিকটা হলদে, সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের

উপর, এবং সমস্তটার উপর ফুটে উঠেছে পরম পাখির স্বপ্নটা। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বুলবুলির সাড়া পাওয়া গেল। বাগানে ঝোপের মধ্যে টুর টুর টুরু টুরু কুডুক কুডু শব্দ পেয়েই কবি বুঝলেন, বুলবুলি এসেছে। কদিন থেকেই আসছে ওরা ওই ঝোপটায়। ওদের নিয়ে কবিতা লেখবারও চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা কিন্তু শেষ হয় নি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খাতাটা তুলে নিলেন।

ওরে, তোরা চুপ কর্
খোকা বুঝি হেসেছে
বাতাসেতে ফুট তুলে
কার সুর ভেসেছে
ও মা, না তো, আতাবনে
বুলবুলি এসেছে
টুরু টুরু টুরকি টুরু টুরু টুরকি
আতাবন রাতারাতি হ'ল মধুপুর কি !

পছন্দ হয় নি। কেটে দিয়ে আর একটা শুরু করেছিলেন ভিন্ন ছন্দে।

ওই শোন্ ওই শোন্
টুরু টুরু টর
বুলবুলি এসেছে রে
ওরে চুপ কর্

ফোটে যেন খই
কই কই কই
ওই যে বসল উড়ে
বেড়াটার 'পর।
সারা মন ওঠে নেচে
শুনে গান তোর

ভুলে যাই দুষ্টু রে
তুই ধান-চোর
ওরে চঞ্চল
বল্ বল্ বল্
কোন্ ঝোপটির মাঝে
বেঁধেছিস ঘর !

এটাও পছন্দ হয় নি, এটাও কেটে দিয়েছেন। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে আবার তিনি চাইলেন বাইরের দিকে। ওই যে বেরিয়েছে বুলবুলি দুটো। আমের ডালে উড়ে বসল। বাঃ, চমৎকার জায়গাটি বেছে নিয়েছে তো ! উপরে-নীচে আশে-পাশে গোছা গোছা আমের মুকুল দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণিকার পুষ্পের স্বর্ণকান্তি, রোদও এসে পড়েছে এক ফালি, চমৎকার লাগছে দেখতে। পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল বুলবুলিরা। বসল গিয়ে ভাঙা কার্নিসটার ধারে। শ্যাওলা-পড়া বিশ্রী জায়গাটা। কিন্তু ওখানেও ওদের উৎসাহ উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। একজন আবার ফুড়ুৎ ক'রে আর একটু উপরে উঠে বসল ল্যাজটি ঘুরিয়ে। ল্যাজের তলার টুকটুকে লাল অংশটুকু দেখা গেল ক্ষণিকের জন্য, তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসল আবার। উড়ে গেল। উড়তে উড়তেও যেন লাফাচ্ছে। হঠাৎ যেন নূতন দৃষ্টি খুলে গেল কবির। ওদের তুলনায় নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। তাঁর যে এই জানলার ধারটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, মনোমত পরিবেশকে আঁকড়ে থাকবার এই যে লুব্ধ প্রবৃত্তি, এটা—এই স্থাণুতাটা যেন মৃত্যুরই নামান্তর মনে হ'ল তাঁর। প্রাণের ধর্ম গতি। সে চলবে, থামবে না। মনে হওয়ামাত্রই উঠে পড়লেন তিনি। ডানার কাছে যেতে হবে। ডানার কাছ থেকে ফিরে এসেই চিঠি লিখতে হবে মন্দাকিনীকে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড়টা ছেড়েই হঠাৎ কিন্তু আবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর মনে হ'ল, বুলবুলির কাছে ঋণ-স্বীকার না করলে অধর্ম হবে সেটা। চোখ বুজে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

আমার মনের ভুলগুলি
শুধরে দিলে বুলবুলি।
আটকে থাকা নয় কিছু
চললে পরেই হয় কিছু
হয় উঁচু বা নয় নীচু
কোথাও গিয়ে ঠেক্ না রে—
ছাড়তে হবে ঘুলঘুলি
শিখিয়ে দিলে বুলবুলি
পায়ের দড়ি পাকাস কে
পথের দিকে তাকাস কে
চাইতে হবে আকাশকে
ডানা মেলেই দেখ্ না রে।

কবিতাটা লিখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আবার। কবিতাটা কোটের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আলোয়ানটা টেনে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। পথে যেতে যেতে আর একটা অদ্ভুত কথাও মনে হ'ল। মনে হ'ল, যে সুষমা ডানার অঙ্গে নেমেছে, তাও হয়তো পাখির মতই একটা কিছু, একটু পরেই উড়ে যাবে। উড়ে গিয়ে বসবে হয়তো কোন কার্নিসের উপর, তারপরে উড়ে যাবে হয়তো আকাশে, নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় লোকে গিয়ে বসবে হয়তো ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার…। কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়তে লাগল তাঁর মন।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'ল মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে। মল্লিকের চেহারাটা কেমন যেন মনে হ'ল। মুখ শুষ্ক, চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্বাভাবিক নয়। কবিকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, ওঁদের কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন আপনি?

না, পাই নি তো। অমরবাবু গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন বলেছিলেন দোয়েল পাখির বিষয়ে। আপনি পেয়েছেন নাকি কিছু?

আমি পেয়েছি। কাণ্ড দেখুন।

মল্লিক মশাই পকেট থেকে একটি রেজিস্ট্রি-করা খাম বার ক'রে দিলেন। কবি খাম থেকে চিঠি বার ক'রে দেখলেন, রত্নপ্রভার চিঠি। গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরে রত্নপ্রভা লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আনন্দমোহনবাবুকে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া আপিস-ঘরের চাবিটি দিয়া দিবেন। আমরা তাঁহাকেই হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার ছয় মাসের বেতন অদ্য মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। টাকাটি পাইলে আনন্দমোহনবাবুকেই একটা রসিদ দিয়া দিবেন। নমস্কার। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। বেশ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। চিঠিটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা চুলকে বললেন, আমি তো কিচ্ছু জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো?

যদিও ব্যাপারটা কি এবং কেন তাঁকে তাড়ানো হ'ল মল্লিক মশাই সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন, তবু তিনি বললেন, কি জানি! খেয়াল আর কি! স্ত্রীবুদ্ধিও বলতে পারেন। যাক, ভালই হ'ল, আমি বাঁচলুম। এ বয়সে ওসব ঝামেলা আর পোষায়ও না। আপনি তা হ'লে কবে সব বুঝে নিচ্ছেন বলুন?

আমি! আমি তো কোনও চিঠি পাই নি। তা ছাড়া আমিই কি পারব ওসব?

সে আপনি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। আমাকে খালাস ক'রে দিন। আমি কালই আপনাকে চাবি-টাবি দিয়ে দেব। এখন চলি।

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মল্লিক মশাই হনহন ক'রে চ'লে গেলেন এবং দেখতে দেখতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। নিজেকে অকস্মাৎ একটা নূতন

আবেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্কার ক'রে কৌতুকও জাগল একটু মনে। তিনি হবেন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার! অদ্ভুত কাণ্ড!

কবি ডানার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলেন, ডানা তখন স্নান সেরে চুল শুকুচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ ক'রে। কবি দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, আলোকের শিখর থেকে অন্ধকারের একটা প্রপাত নামছে যেন! ডানা তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল, সম্বৃত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কবি এগিয়ে এসে হেসে বললেন, বাঃ, চমৎকার!

কি চমৎকার?

তোমার চুলের শোভা। অনেকদিন এমন শোভা দেখি নি।

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ঘরে ঢুকে গেল। একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল একটু পরে।

মিসেস সেনগুপ্ত একটা চিঠি লিখেছেন, প'ড়ে দেখুন।

কবি দেখলেন, এটিও রেজিস্ট্রি চিঠি। খুলে পড়লেন—

সুচরিতাসু,

বিশেষ প্রয়োজনে এই পত্র লিখিতেছি। স্থির করিয়াছি, মল্লিক মহাশয়কে হরিপুরার ম্যানেজারি-পদ হইতে অব্যাহতি দিব। আনন্দবাবু যদি এই কার্যের ভার লইতে সম্মত হন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। তাঁহাকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কর্মচারীরাই সমস্ত করিবে। তিনি কেবল একটু নজর রাখিবেন। তাঁহার মত একজন সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ বিদ্বান লোক যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। তাঁহাকে বেতন হিসাবে কিছু দিবার স্পর্ধা আমাদের নাই, প্রণামীস্বরূপ যদি কিছু গ্রহণ করেন আমরা কৃতার্থ হইব। তুমি ভাই আমার হইয়া একটু অনুরোধ করিও। তিনি যদি বরাবর কাজ করিতে রাজি না-ও হন, তাহা হইলে আমরা যত দিন না ফিরি তত দিন অন্তত যেন কাজটা চালাইয়া দেন, কারণ আমরা মল্লিক মহাশয়কে জবাব দিয়াছি। তিনি অবিলম্বে যেন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি এবং হিসাবপত্র বুঝিয়া লন।

আর বেশি কিছু লিখিবার নাই। উনি তোমাকে যে সব কাজ দিয়া আসিয়াছেন, সেগুলি ভালভাবে করিও। টাকার প্রয়োজন হইলে সদর-নায়েব জগৎবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইবে। তাঁহাকে এই মর্মে লিখিত উপদেশ দিয়া আসিয়াছি। টাকা লইয়া তাঁহাকে একটা রসিদ দিয়া দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা লও। আনন্দবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবে। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

চিঠিটা প'ড়ে কবি বললেন, এ মহা মুশকিল হ'ল দেখছি।

মুশকিল আর কি!—মুচকি হেসে ডানা বললে, একটু-আধটু দেখা-শোনা করবেন।

কিন্তু তাও কি পারব? আমি কবি, বৈষয়িক তো নই।

খুব পারবেন।

তুমি বলছ পারব?

না পারবার কি আছে এতে?—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু যেন ধমকের সুরেই বললে ডানা।

বেশ। তা হ'লে তাই হোক। চেষ্টা করা যাক। তোমার চাকরটা আছে কি?

না। কেন?

একটু চা খেতুম।

আমিই ক'রে দিচ্ছি।

একটা খাতা দিয়ে যাও। কবিতা লিখি ততক্ষণ একটা।

একটা খাতা দিয়ে ডানা ভিতরের দিকে চ'লে গেল। স্টোভে তেল ছিল না। উনুন ধরাতে হ'ল। খানিকক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে ডানা দেখলে, কবি কবিতা লেখা শেষ করেছেন।

নিন।

কবিতাটা আগে শোন।

পড়ুন। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

যাক। তুমি পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব'স ভাল ক'রে।

ডানা বসতেই কবি শুরু করলেন—

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেন কালিন্দী-তরঙ্গ-দলে তোলে শিহরণ,
আলোকের শুভ্র বৃন্তে ফুটিল কি তমস্কান্তি কৃষ্ণ শতদল,
প্রত্যক্ষ জীবন আর পরোক্ষ মরণ—
কাজল নয়ন মাঝে হাসি অশ্রু করে টলমল,
শিব-সুন্দরের বক্ষে নৃত্যপরা কালীর চরণ,
ময়ূর-মানস-পটে নবোদিত মেঘের বরণ,
অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল
কবিচিত্ত করিল হরণ।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

আসন্ন-নগ্নতা-ভীতা অসম্বৃতা কৃষ্ণা যেন কৌরব-অঙ্গনে,
শুক-কলরব-মুগ্ধা মধুমত্তা মাতঙ্গিনী বল্লকী-মোদিতা
সহসা চকিতা যেন দৈত্য-আগমনে;
অস্তলোকে ধ্যানমগ্না ওজস্বিনী আঁধার কবিতা
সংযম-প্রস্তর ভেদি, সমুচ্ছ্রিতা শত প্রস্রবণে
খুঁজিল প্রকাশ যেন শব্দহীন বিরাট গর্জনে,
বিমুগ্ধা বিমূঢ়া ক্ষুব্ধা অকুণ্ঠিতা মত্তা প্রলোভিতা
কে ছুটেছে আত্ম-বিসর্জনে।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

বুঝতে পারলাম না ভাল।—মুচকি হেসে ডানা বললে, বড় কটমট হয়েছে। বিষয়টা কি?

কবি হেসে উত্তর দিলেন, অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল! তুমি সংস্কৃতের ছাত্রী, তোমার কানেও কটমট লাগল?

লাল হয়ে উঠল ডানার কানের পাশটা। সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ভান করছিল না-বুঝতে পারার।

কি যে বাড়াবাড়ি করেন আপনি! লোকে শুনলে কি বলবে!

এ ধরনের কথা ডানার মুখে কবি ইতিপূর্বে শোনেন নি। শুনে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, বাড়াবাড়ি তোমার মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, কিছু হ'ল না। লোকের কথা ভেবে ভয় পাবার দরকার নেই। এখনই আমি যে লোকে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এমন কি তুমিও—মানে, তোমার স্থূল দেহটাও—ছিল না সেখানে।

ডানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। কবি চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমাকে কবিতা আর দেখাব না।

না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এমনই বলছিলাম।—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে ডানা।

আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে দু-একটা কবিতা লেখেনই, তাতে মনে করবার কি আছে! কিন্তু সখী বলেছেন কেন, বুঝলাম না।

কবি হেসে ফেললেন।

তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়ে হতে, তা হ'লেও তোমার এলোচুল নিয়ে কবিতা লেখবার সময় তোমাকে সখী সম্বোধন করতুম। কাব্যলোকে বয়সের হিসাবটা সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে হয় না। স্থূল বস্তুজগতের কোন মাপকাঠিরই দাম নেই সেখানে। কাব্য-বৃন্দাবনে সবাই সখী। অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম তার সবটা মনে নেই, প্রথম চার লাইন হচ্ছে—

সন্ধ্যার মেঘে যে স্বর্ণ লাগে
স্যাকরা তাহার বোঝে না মর্ম

কুসুমে কুসুমে যে বর্ণ জাগে
রঙ-রেজ তার জানে না ধর্ম।

একটু আগে বুলবুলিকে দেখে যে কারণে কবিতা লিখছিলাম, তোমার কালো চুলের রাশি দেখেও ঠিক সেই কারণেই কবিতা লিখেছি। বুলবুলিও নয়, কালো চুলের রাশিও নয়, ওদের অবলম্বন ক'রে মনের ভিতর কে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। ওগুলো বৃন্ত, সেই বৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে কি একটা যেন। কবির লক্ষ্য বৃন্তও নয়, ফুলও নয়, সেই কি-যেন-কি-টা।

এ কথা শুনে ডানার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এতে তার আত্মসম্মান একটু আহত হ'ল যেন। সে যে কবির কবিতার বিষয় হতে পেরেছে, এতে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভিতরে ভিতরে সে খুশি হয়েছিল বইকি। তাকে নয়, তাকে অবলম্বন ক'রে যা কবি-মানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাই কবিতার হেতু—এ কথা শুনে একটু মর্মাহতই হয়ে গেল সে। মৃদু হেসে বললে, তাই নাকি ?

নিশ্চয়। আর একটা কথাও শুনে রাখ। যে কবিতা লেখে, সে আমার এই দেহটা নয়। সেও যেন কি-একটা-কি মাঝে মাঝে ভর করে এসে আমার উপর।

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ডানার গ্রীবাভঙ্গীতে যে অপরূপ শ্রী ফুটেছে তা শুধু রক্তমাংসের সমন্বয় নয়, তা যেন কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, আর কোনও শিল্পীর নবতর সৃষ্টিতে মূর্ত হবার আশায় অপেক্ষা করছে।

২১

বসন্ত শেষ হচ্ছে।

নিজের বাপের বাড়িতে রত্নপ্রভা স্বামীর ঘরে ঢুকে একটা বই খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু রকম পাখির বহু রকম ঠোঁটের ছবি। চওড়া, সরু, লম্বা, ছোট, উপরের দিকে বাঁকানো, নীচের দিকে বাঁকানো, চামচের মত, ছাঁকনির মত··· বইটা নূতন

এসেছে। বেশ মোটা বই। পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগলেন রত্নপ্রভা। কত ছবি, কত লেখা…। খানিকক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল, গহন অরণ্য। গ্রন্থটা নয়, তাঁর স্বামী। বিশাল বিরাট অরণ্য। প্রতি পদক্ষেপেই নূতন কিছু চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয়ে গা ছমছম করে। আবার পরিচিত শব্দ শুনে, প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ভয় কেটে যায়। কত রকমের গাছপালা পশু পাখি, কত ধরনের শব্দ গন্ধ রূপ রস, আর এই সমস্তটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, কখনও গাম্ভীর্যে অটল, কখনও শিশুর মত সজীব। অজানাটা যদিও জানা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিঃশেষ হতে চাইছে না ; মনে হচ্ছে, যেন কত কি আছে আরও। সহসা রত্নপ্রভার সমস্ত চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল। অরণ্যটা যে তাঁর একার, আর কারও নয়—এই অনুভূতি আনন্দিত ক'রে তুলল তাঁর সমস্ত সত্তাকে। একটা নবীন উৎসাহ জাগল তাঁর মনে, হোক জটিল, হোক দুর্গম, তবু সমস্তটা আয়ত্ত করতে হবে তাঁকে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে তা করবার জন্যে।

পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে দোয়েল পাখির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন একটা। আনন্দবাবুকে ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু লেখবার সময় ক'রে উঠতে পারেন নি এতদিন। দোয়েলরা নিশ্চয়ই ডাকতে শুরু করেছে খুব সেখানে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। তারপর নিজের ডায়েরি খুলে দেখলেন। দোয়েলের গান তো তিনি শুনেই এসেছেন—প্রথম গান শুনেছিলেন ১০ই ফাল্গুন, এতদিনে ধুম লেগে গেছে নিশ্চয়। তন্ময় হয়ে লিখতে লাগলেন আবার। পাশে চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

কবি কবিতা লিখছিলেন নিজের ঘরটিতে ব'সে। গঙ্গা এবং শান্তনুর পৌরাণিক গল্পটা উদ্দীপ্ত করেছিল তাঁর কল্পনাকে। তাঁর মনে হচ্ছিল, গঙ্গাই বুঝি বসন্তের বেশে এসেছিল পৃথিবী-শান্তনুর কাছে। এইবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।

ফুটিছে ঝরিছে ফুল অরণ্যে উদ্যানে ;
গঙ্গা-বাসন্তিকা যেন আপন সন্তানে

ভাসাইছে কাল-স্রোতে লীলায় কৌতুকে।
পৃথিবী-শান্তনু চেয়ে ছিল শুষ্ক মুখে
নিষ্ঠুরা প্রেয়সী পানে।
"আর নয়—না—না—"
সহসা ধ্বনিল যেন শান্তনুর মানা
আতঙ্কিত কম্পকণ্ঠে—"ক্ষান্ত দাও প্রিয়া।"
"চলিলাম আমি তবে" সুমিষ্ট হাসিয়া
কহিলেন সুরধুনী।
মর্ত্ত্য-পাশ হতে
চ'লে যায় বাসন্তিকা, জাগে নদী-স্রোতে
কল্লোল-ক্রন্দন মৃদু ; থাকিয়া থাকিয়া
আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার করিছে পাপিয়া।
শিশু ভীষ্ম প'ড়ে আছে মাতৃহারা হায়
শিশু গ্রীষ্ম জাগিতেছে দিগন্ত-সীমায়।

রূপচাঁদ নদীতীরে একা নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি যাওয়াতে তিনি নিজে যেন ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হন নি। সীমাহীন সমুদ্রে পথহারা হয়ে কলম্বাস হাল ছাড়েন নি, রূপচাঁদও ছাড়েন নি। তিনিও আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন বাতাসের গতি। যদিও আশ্বস্ত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে যাবেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি।

বকুলবালাও স্বপ্ন দেখছিলেন। চণ্ডীর বন্ধুটি হলদে পাখির বাচ্চা যোগাড় ক'রে দেবে বলেছে। মার্বেল খেলার জন্য ভাল একটা 'চ্যাম্পিয়ন' মার্বেলও এনে দেবে বলেছে চণ্ডী। চণ্ডীর বন্ধু সত্যিই যদি হলদে পাখির বাচ্চা এনে দেয়, কি মজাই যে হবে! এবার আর ছাতু খাওয়াবেন না তিনি। ফড়িং ধরবার ব্যবস্থা করাতে হবে। চণ্ডী ঠিকই বলেছে, বাচ্চা-বেলা থেকে না পুষলে পোষ মানে না পাখি।

পাখিদের বাসা বানাবার জন্যে অমরবাবু গাছে গাছে যে সব বাক্স টাঙিয়ে দিয়েছেন, তার একটাতেও কোনও হলদে পাখি বাসা বাঁধতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে। বিনয় সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে এসেছিল। তার মাথার দিকে চেয়ে মন্দাকিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। ভগ্নী নন্দরাণীকে ডেকে বলছিলেন, ওলো নন্দ, বিমুর চুলের বাহার দেখে যা একবার। বিয়ের নামেই এই, বিয়ে হয়ে গেলে না জানি কি করবে ছেলে!

স্নেহে গ'লে পড়ছিলেন তিনি যেন। যে বিমুকে তিনি এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন, তাকে ঘিরেই রঙিন হয়ে উঠছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁদের বাড়ির পাশের সজনেগাছটায় একটা দোয়েলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না মন্দাকিনীর।

সন্ন্যাসী একা ব'সে ছিলেন নদীর পরপারে বালুস্তূপের উপর। তিনি সহসা যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করছিলেন। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা কাঁটার মত খচখচ করছিল তাঁর মনের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে ডানার সঙ্গে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন, তার প্রকৃত মর্ম ডানা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, যদি তাঁর অতি-সরল অভিমতকে ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে থাকে, তা হ'লে হয়তো সে তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই পোষণ করছে। এই চিন্তাটা পীড়িত করছিল তাঁর মনকে। কিন্তু এখনই একটু আগে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, কে তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করছে—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেকে তিনি চেনেন নি এখনও। তিনি যে কি এবং কে, তার নির্ভুল প্রমাণ তো তাঁর নিজের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। অপরের সমর্থন বা প্রতিবাদে তার মূল্য তো এতটুকু পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং ডানা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছে বা ভাবে নি—এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। ওই শস্যক্ষেত্র কিছুদিন আগে সবুজ ছিল, এখন স্বর্ণকান্তি।

কিছুদিন পরেই আবার রিক্তাভরণ হবে। কোনও অবস্থাতেই তো সে সঙ্কুচিত নয়, তার এই পরিবর্তন কার মনে কি ভাবোদ্রেক করছে তা জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহও নেই ওর। নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন যেন, কারও স্তুতিনিন্দায় বিচলিত হবার ওর প্রয়োজনই নেই। খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থেকে তারপর শস্যক্ষেত্রকে প্রণাম করলেন তিনি। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে ভারি তৃপ্তি হ'ল তাঁর।

ডানাও খুঁজছিল।

সে যথারীতি কর্তব্যকর্ম ক'রে যাচ্ছিল সব। পাখিগুলির তদারক করছিল, দেখে বেড়াচ্ছিল কোনও পাখি কোথাও বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছে কি না, অমরবাবু যে সব বই রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি প'ড়ে 'পাখিদের পালক' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধও লেখবার আয়োজন করছিল, কবির কবিতা শুনছিল, রূপচাঁদবাবুকে এড়িয়ে চলছিল, সন্ন্যাসীর গতিবিধি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল দূর থেকে। কিন্তু আসলে সে খুঁজছিল নিজেকে। খুঁজছিল নিজের সেই বিশেষ আকাশটিকে, যেখানে পক্ষ বিস্তার ক'রে সত্যিই আনন্দ পাবে সে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

"বনফুল"

খণ্ডজ্ঞান

নিয়মের বন্ধনে হৃদয়ের স্পন্দনে
ছন্দিল যেই জন, কোনো অনিয়ম
নাই তাঁর জগতে প্রকাশ্যে স্বগতে
হউক তা হাত-বোমা অ্যাটমিক বম।
সকলি নিয়ম বাঁধা জ্যামিতির মত ফাঁদা
কার পরে কি ঘটিবে সবই আছে ঠিক—
নিয়ে পরিমিত জ্ঞান মোরা মনে করি ধ্যান,
বিধাতা স্বয়ং বুঝি ভুলেছেন দিক।

ধূম্রজাল

সেদিন বোধ হয় শনিবার। সন্ধ্যা হতে তখনও খানিকটা দেরি আছে। শিয়ালদহ স্টেশনে আপ ট্রেনখানায় কি ভিড়! দৈনিক ও খুচরা যাত্রী ছাড়া সাপ্তাহিক খদ্দেরও নিতান্ত মন্দ জোটে নি। ষাট জনের নির্দিষ্ট কামরায় প্রায় দেড়শো জন আশ্রয় নিয়েছে। তখনও আরোহণপর্ব শেষ হয় নি, এমন সময় ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। চলন্ত গাড়ির দরজা ঠেলে একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। যৌথ প্রতিবাদ উঠেই যার যার ঠোঁটেই মিলিয়ে গেল। চেহারা বটে—হাজার লোকের মধ্যে দেখলেও নজরে এঁটে বসে। মাথায় গান্ধী-টুপি, খদ্দরের পাঞ্জাবির ওপর একখানা খদ্দরের চাদর। শ্রী সৌষ্ঠব রুচি—সমস্তই বনেদী। খবরের কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা বাণ্ডিল বাঙ্কে রাখতে না রাখতেই তাঁর একটু বসবার জায়গা আপনা থেকেই মিলে গেল; অথচ তাঁর বহু পূর্ববর্তী আরোহীদের অনেকেই তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

বেশ উত্তেজনার সময় তখন। ডাইরেক্‌ট অ্যাক্‌শন থেকে আরম্ভ ক'রে গান্ধীহত্যা পর্যন্ত ইতিহাসের জমকালো একটা অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের কুরুক্ষেত্রের চিতার ধোঁয়া তখনও মেলায় নি। পূর্ব-পাকিস্থান ও পশ্চিম-বঙ্গের উত্তাপের পারাও রীতিমত ঊর্ধ্বগামী। গাড়ির চাকার ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদের রসনাগুলি বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মহাত্মাজীর হত্যা সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল। আগন্তুক ভদ্রলোকটি রুমালে মুখ মুছে একটু হাসলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে অনেকের মুখের কথা জিভের ডগায় এসে জ'মে গেল। দুঃসাহসী একজন তবুও মন্তব্য করলে, দেখবেন, এইবার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে। অনেক রথী মহারথী এবার ধরা পড়বেন।

এবার কলকাতায় এসে একটা নতুন জিনিস দেখলাম। এক জায়গায় সরস্বতী-পূজোর প্যাণ্ডেলের গেটের ওপর কটি কথা লেখা আছে—হা রাম, হা রাম! বাংলা দেশ যতই নেমে যাক, তার বৈশিষ্ট্যের ট্র্যাডিশান কিন্তু ঠিক আছে।

কতকটা অর্ধস্বগত-গোছের উক্তি, উচ্ছ্বাসবর্জিত অথচ আবেগের গাম্ভীর্যে ভরা। সকলের চেয়ে আশ্চর্য তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী। মাইক্রোফোনের যুগে সবাই ডিমোস্থিনিস হ'লেও, সোনা আর পেতলের ভেদ যাবে কোথায় ?

কথাবার্তা প্রায় থেমে গেছে। যে যার জ্ঞানগরিমার চরম সীমায় এসে আর পা বাড়াতে সাহস করছে না।

আবার সেই কণ্ঠস্বর। এবার শুধু উক্তি নয়—জিজ্ঞাসা।

আচ্ছা, বলতে পারেন, এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী কে ?

আকস্মিক প্রশ্নে সবাই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। করুণা-মাখানো হাসির সঙ্গে উত্তর পূরণ করলেন তিনিই।

বাপ-ছেলের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। তবুও তাদের ভুল হয়। বড় বড় দেশনেতা, দেশসেবক, সাধু, মহাত্মাকে বেশির ভাগ লোকে চেনে শুধু প্রচারের ভেতর দিয়ে। নইলে তাঁদের সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় লক্ষ লোক পিছু একজনেরও থাকে কি না সন্দেহ। এই প্রচারের কলকাঠি যারা নাড়াচাড়া করে, তা স্বপক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, তারাই এই সমস্ত পরিণামের জন্যে দায়ী।

আপাতত পূর্ণচ্ছেদ টেনে, আবার তিনি রুমাল বের ক'রে মুখ মুছলেন। চলন্ত গাড়ির চাকার অবিরাম শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে এই ভদ্রলোক ? উচ্চস্তরের কোন কংগ্রেসকর্মী, না, ছদ্মবেশী প্রদেশপাল ? নয়তো বর্ণচোরা কোন বিজ্‌নেস ম্যাগ্‌নেট ? কিছুই বলা যায় না।

আপনি কোথায় যাবেন স্যার্‌ ?

ছোট্ট একটা স্টেশনের নাম করলেন তিনি।

ওখানে আপনার কি দরকার স্যার্‌ ?—নিতান্ত ছেলেমানুষি প্রশ্ন।

উঁচু দরের এক টুকরা হাসির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটু জবাব এল, সব জায়গাতেই আমাদের যেতে হয়। বড় বড় শহর থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট ছোট পাড়াগাঁ পর্যন্ত। চমৎকার ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর।

মেঘমন্দ্র স্বরের পুনরাবৃত্তি আবার শোনা গেল।

আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। পরশুদিনকার ঘটনা। প্রায় দু হাজার লোকের মীটিং। তিন-চার জন বক্তা পর পর যা ব'লে

গেলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই, ভারতীয় ইউনিয়নে সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তার একান্ত অভাব। সমস্ত জনতার রক্তে তখন আগুন ধরতে শুরু করেছে। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, বক্তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—এসব খবর তাঁরা কোথায় পেয়েছেন? উৎকটগোছের একটা উত্তেজনার মধ্যে পাল্টা প্রশ্ন এল—আপনি কি বলতে চান?

ভারতীয় ইউনিয়নের অনেক জায়গায় আমার গতিবিধি আছে। কিন্তু যে সত্য আপনারা প্রচার করছেন, তার সঙ্গে আমার কোনখানেই সাক্ষাৎ হয় নি। আপনারা বোধ হয় ঘরে ব'সেই এই সব আবিষ্কার করেছেন?

আমাদের মীটিঙে আপনাকে কে ডেকেছে? কে আপনাকে কথা বলতে হুকুম দিয়েছে?

চেয়ে দেখি, ছোট্ট একটা দল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সমস্ত লোকের কানে যায়, এই রকম গলায় বললাম—আমি নিজেই এসেছি, আর মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে কথা বলতে দাঁড়িয়েছি। কেন জানি না, প্রতিপক্ষ যেন একটু দ'মে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আমার মতের পোষকতা করলেন একটি প্রবীণ-গোছের ভদ্রলোক।

কর্তা ঠিক বলেছেন। কেন তোমরা মিছিমিছি লোক ক্ষেপাচ্ছ? মাসের মধ্যে পনেরো দিন আমাকে ওই দেশে থাকতে হয়, ওখানকার খবর আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই।

একগাড়ি লোক যেন পাথর হয়ে গেছে। কে এই অজানা শহীদ? অন্ধকার রাতে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎবিকাশের মত অবিরাম বক্তৃতার ভেতর দিয়ে ট্রেনখানা তখন অনেক দূর চ'লে এসেছে। এমন সময় তাঁর গন্তব্যস্থানের উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, অমুক স্টেশনে গাড়িটা কখন পৌঁছুচ্ছে বলতে পারেন?

এতক্ষণে যেন ভাবের গুমোট একটু হালকা হ'ল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অনেকেই।

তা প্রায় পৌণে আটটা হবে।

বলেন কি? ওঃ, তা হ'লে দেখছি বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

একটু একটু ক'রে সহজ হয়ে উঠছে সবাই, স্থান কাল পাত্রের গণ্ডির মধ্যেই তা হ'লে বাস করেন ইনি।

আজই বুঝি ফিরতে হবে আপনাকে? আচ্ছা, দাঁড়ান। পকেট হাতড়ে টাইম-টেব্‌ল বের করলেন একজন।

আজ্ঞে না, তার জন্যে নয়। হাজারখানেকের ওপর লোক আমার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে।

চতুর্ভুজ ভগবান আবার বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করলেন।

অল্পবয়সী একটি যুবক বোধ হয় বয়সের দোষেই ব'লে ফেললে, হাজারের ওপর লোক ওই জায়গায়? আমাকে সঙ্গে নেবেন স্যার্?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনাদের জন্যেই তো আসা।

ইতিমধ্যে গাড়ি তাঁর গন্তব্যস্থানে এসে পড়ল।

এই যে, এসে গেছে।—স্মরণ করিয়ে দিলে দু-একজন।

তাই নাকি? আচ্ছা, ধন্যবাদ।—যথারীতি নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লেন তিনি।

ট্রেন তখন আবার সচল হয়ে উঠেছে।

কৌতূহলী ছেলেটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কি ব্যাপার স্যার্?

গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন তিনি, বিশেষ কিছু নয়। সরস্বতী-পূজোর বারোয়ারী উপলক্ষ্যে এখানে আজ শ্রীরূপ অপেরার যাত্রা আছে। আমার মেন্ পার্ট রয়েছে কিনা, তাই একটু তাড়াতাড়ি করছিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে তাঁর মুখখানা ভাল দেখা গেল না।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

দাবি

বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব'লেই যদি
হুঁকোর দাবি কর,
শিশুর দুধেও ভাগ বসাবে
এটা কেমনতর?

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

ক্রিমিনাল

ক্রিমিনাল, তুমি চিরজীবী হও, ঈশ্বর-ইচ্ছায়
ক্রাইম করার বাসনা তোমার দিন দিন বেড়ে যাক্ ;
সকল দেশের সকল কালের রাজারা তোমারে চায়,
মুখে বলে—তুমি মরো, মনে মনে বলে—আহা, বেঁচে থাক্ ।

রাজা যে শাসক—ক্রাইম না হ'লে কে কার শাসন করে ?
ক্রাইমকারীর সঙ্গে রাজার যোগ আছে পাকাপাকি ;
বিরোধ যা তাহা মুখে মুখে, মিল আছে ঠিক অন্তরে,
বজ্র-আঁটুনি আইনের ফাঁকে ফস্কা গেরোর ফাঁকি ।

মামলা না হ'লে আমলা-দলের বাঁ হাত বেকার থাকে,
বটতলাচারী বি-এল্ বাবুর জোটে না পেটের ভাত ;
হাকিম পুলিস উজির নাজির—কে কার তক্কা রাখে,
ঘুষের টাকায় কেমন ক'রে বা বাড়ি ওঠে রাতারাত ?

চোরের ঘরণী, দস্যুর দাসী লক্ষ্মী—কে না তা জানে,
লক্ষ্মী তোমার সহায় যখন, দুনিয়ায় কারে ভয় ;
টাকা ঢালো দেখি দু হাতে কেমন তোমারে লোকে না মানে,
আজ যে তোমারে নিন্দে, কাল সে গাহিবে তোমার জয় ।

ধাপ্পাবাজির ধাক্কাতে ঘুরে চলেছে কালের রথ,
সত্যের নয়, ধর্মের নয়, ক্রাইমের যুগ এটা ;
তোমার পথই বিশ্ববাসীর আজিকে বাঁচার পথ,
মোরালিটি ছিল মানব-সমাজে—অতীত কাহিনী সেটা ।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

বঙ্গায়ন

পণ্ডিত ত্যজিল অর্ধ—ত্যক্তার্ধ যখন
খোঁচা খেয়ে ঘাড়ে চাপে, হায় রে তখন
জলে ভাসে পণ্ডিতের খণ্ডিত নয়ন ।
—এখানে হইল ইতি নববঙ্গায়ন ।

সনেট-পঞ্চক

অলক্ষ্যে পাতার বুকে ধ্বনির মর্মর ;
যেতে যেতে নীলপাখি ডালে ব'সে যায় ;
ইঁদারার জলে মেঘ ছায়া কি বিছায় ?
সাদা গোলাপের তনু নিদাঘে কাতর।
সোনার মুকুট-পরা, মনের ভিতর
রাজার কুমার ছিল। গেল সে কোথায় ?
কাষায় বসনে প্রেম তিতিক্ষা বিলায় !
—নিরজনে ভাবি ব'সে তৃণভূমি 'পর।

তবু আমি রেখে যাব প্রেমের লিখন
বিরাগীর লাগি নয়—রাজার কুমার
কোনদিন এইখানে যেতে লবে তুলে,
অদেখা কুমারী বাণী, লিপিটি চিকন
কানে কানে ব'লে দেবে সাধনা আমার ;
যদিও জীবনে আজো রয়েছে সে ভুলে ॥

দুই

হে সন্ন্যাসী, ছাড় পথ। নগর-বিলাস
কখনো কখনো মনে জাগায় নিরাশা ;
কখনো নিবৃত্তি মার্গে সাফল্যের আশা
তোমার বিভূতি ভস্মে আনে অভিলাষ।
দূরে যদি চ'লে আসি, জাগে মধুমাস ;
ইন্দ্রনীল-ঝরা ওই আকাশের ভাষা
ব'লে দেয় : সব মিথ্যা, সত্য ভালবাসা।
সার্থক জীবন-বেদ যৌবনে প্রকাশ।

তাই বলি, ত্যাগমূর্তি হে সন্ন্যাসী তুমি,
ম্লান আঁখি, ছাড় পথ ; বাড়ায়ো না হাত ;
চেও না আমার কাছে ভিক্ষা মাধুকরী।
আমি উষা, নিশাশেষে গেছে, গেছে চুমি
অনিরুদ্ধ সে আমার। রঙের প্রভাত

তিন

শুভ্রহস্তে পরায়ো না শঙ্খের বলয় ;
কাঞ্চন তনুর সজ্জা নহে তো গৈরিক ;
হরিতকী নহে, নহে প্রেমের প্রতীক ;
আমার প্রেমের ভূষা দীপ্ত রত্নময় ।
এ প্রেমে গোলাপে দেখ, রঙের বিজয় ;
পত্রে পত্রে যৌবনের সবুজ সৈনিক ;
অভিসারী বায়ু বহে দুরন্ত-নির্ভীক ;
এ প্রেম ভোলায় যত তুচ্ছ অপচয় ।

প্রাণ শুধু প্রাণধর্মী—এস বনালয়ে,
নিবিড় আঁধার কুঞ্জে বাসক-শয়ন ;
চুম্বনের ভারে ওষ্ঠ—দ্রাক্ষা নিপীড়িত ;
শোণিতে শোণিত যাক গূঢ়বাণী ক'য়ে ।
দুই দেহ এক হ'লে এক হয় মন,
জীবন-মরণ কাঁদে চুম্বন-ব্যথিত ॥

চার

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীরে দিয়েছিল যা-ই,
আমারে তা দাও, দাও ।—হৃদয়-বৈভব
সমগ্র উজাড়ি হাতে করি অনুভব ;
সমগ্র তোমারে আমি পাই, যেন পাই ।
চাতকী যেমন চায় পূর্ণচন্দ্রটাই,
অণুপরমাণুকণা শেষবিন্দু তব
আমি দেহমন মাঝে নিঙাড়ি যে লব ।
অমরত্ব মর-প্রেমে—দাও মোরে তাই ।

ভীরু কিশোরীর লজ্জা এই ফেলিলাম,
প্রগল্‌ভা নায়িকা আমি ; রাহুর মতন
বুভুক্ষু পিপাসা ল'য়ে জ্বলি দিবাযামী,
মানসের কূলে যদি আজিকে এলাম

অতৃপ্ত বাসনা-তীরে কেন দেহমন ?
তুমি কেন কাঁদ দূরে, কেন কাঁদি আমি ?

পাঁচ

ক্ষীণরশ্মি ওগো চন্দ্র, বিদায়, বিদায়।
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর দেখ, গগনে আমার,
নিষ্প্রভ কিরণজাল ক'রো না বিস্তার,
সূর্যের উদয়ে জানি চন্দ্র ডুবে যায়।
হৃদয় ভাঙিছে তবু বিদায়-বেলায়,
সময় হয়েছে যদি গৈরিক ছাড়ার
তৃতীয়ার চন্দ্র, বাহু বাড়ায়ো না আর ;
হীনপ্রভ মৃত চন্দ্র তপন-প্রভায়।

আজি মিলনের তিথি ফুলে ফুলে মম ;
জীবন-যমুনা আজি বাঁশীতে জোয়ার ;
মালঞ্চ শিহরে বন্ধু, অজানার ডাকে ;
বসন্ত রূপেতে দ্বারে আসে প্রিয়তম ;
কাষায় বসন দূরে করি পরিহার
অভিসারী দেহমন খুঁজে পেল কাকে ?

শ্রীমতী বাণী রায়

সংবাদ-সাহিত্য

"সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন," "দে কোন অঙ্গে পচ ধরিলে সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলাই যুক্তিযু "ইহা ছাড়া পথ নাই"—তিন বৎসর হইল ভারত-বিভা অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকলে এবং পূর্ববঙ্গেরও অনে অবিরত এই পণ্ডিতী মত আওড়াইয়া শেষ পর্যন্ত ভারত-বিভাগ স করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল এই যে, বিভাগের ফলে যাহারা পাকিস্তানের প্রজা হিসাবে রহিয়া গে তাহাদের জন্য এপারে আমাদের দরদ থাকিলেও দায়িত্ব আর রহিল

একমাত্র মহাত্মা গান্ধী এই বিভাগ সমর্থন করেন নাই এবং শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা সমগ্র বঙ্গদেশকে ভারত-পাকিস্তাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েক জনের ক্ষীণ প্রতিবাদ প্রবল বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। বিচক্ষণ কূটকৌশলী ইংরেজ র‍্যাডক্লিফ নির্মম নির্দয় ও যুক্তিহীন ছুরিকা প্রয়োগে বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরাও মহানন্দে এই পারে প্রতিগৃহচূড়ে চক্রশোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াইয়া স্বাধীনতা-উৎসব করিলাম—সাময়িকভাবে জৈবিক স্বার্থবুদ্ধির এনাসথেসিয়া প্রয়োগে মুহ্যমান আমরা অনুভবই করিতে পারিলাম না যে, খণ্ডিত অংশের সঙ্গে আমাদের নাড়ী ও শিরা-উপশিরার যোগ অব্যাহত আছে, ও-অঙ্গের আঘাত এ-অঙ্গেও সমান যন্ত্রণাদায়ক। পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগত রাষ্ট্র পাকিস্তান কি কারণে যে ধর্মকে ভুলিয়া পূরা আড়াই বৎসর কাল আমাদের সেই মোহগ্রস্ত অবশ অবস্থা বজায় রাখিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহারা যেদিন হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া মূর্হাহত ধর্মবুদ্ধি ফিরিয়া পাইলেন, সেই দিন বাঘেরহাটের ধর্মথাবা বনগাঁয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল ; নাড়ী এবং শিরা উপশিরায় টান ধরাতে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ করিতে করিতে স্বীকার করিলাম, র‍্যাডক্লিফ-অস্ত্রপ্রয়োগে দেশের মাটি বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঙালী জাতির বিচ্ছেদ ঘটে নাই, বাঙালী-মনের জরাসন্ধ-বধ হয় নাই।

সুতরাং আমরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। মাটিকে জোড়া দিবার অধিকার আমাদের নাই, তাহা গুরুতর আন্তঃরাষ্ট্রিক বিচারের অধীন ; কিন্তু মানুষকে বুকে টানিয়া লইতে বাধা নাই। বিশেষ করিয়া নিজের অর্ধচ্ছিন্ন হাত পা মাথাকে প্রলেপ দিয়া জোড়া লাগাইবার চেষ্টা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি। স্থানসঙ্কুলান হইবে কি না, আহার জুটিবে কি না—এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের রাষ্ট্র-নেতারা করিবেন। আমাদিগকে অবিলম্বে ধর্মের কবল হইতে মর্মের লোকেদের বাঁচাইতে হইবে। ধর্মান্তর ও ধর্ষণ আমাদের পুনর্মিলনের পথে অন্তরায় হইতে পারে না—এই মহাসত্য আমরা যখন সর্ববাদিসম্মতভাবে মানিয়া লইয়াছি, তখন আর আমাদের ভয় কি ?

* * *

মাভৈঃ বাঙালী, সারা ভারতবর্ষ আমাদের সহায় হইতে চলিয়াছে, কেন্দ্র এই উৎকেন্দ্রিক দেশকে বরাভয় দিতেছে। ভারতের উপপ্রধান-মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল শেষবার কলিকাতায় আসিয়া আর বাঙালীর কাঁদুনে স্বভাব লইয়া কৌতুক করেন নাই, মনস্বী গোখেলের মত তাহার বুদ্ধিগত আত্মাভিমানকে একটু চুমরাইয়াই গিয়াছেন। নোয়াখালিতে বাঙালী জাতির যে মহাবিপদের আভাস মাত্র পাইয়া মহামানব মহাত্মা গান্ধী সর্বকর্ম ও সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গের সেই বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুটিয়া গিয়া ভীত চকিত সন্ত্রস্ত আর্ত বাঙালীকে কোল দিয়াই আশ্বস্ত করেন নাই—ভাবী সমস্যার গুরুত্ব তাঁহাকে এমনই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি বাঙালীকে নির্ভয় নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত করিবার জন্য জীবনের শেষ ভাগ বাঙালী জাতির কল্যাণেই নিয়োজিত করিবেন—প্রকাশ্যে এমন সঙ্কল্পও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু তাঁহার সঙ্কল্প খণ্ডিত করিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও তাঁহার নির্ভীক শিষ্যসম্প্রদায় নোয়াখালির সেই শ্মশানপ্রান্তে অভয়ের 'ধুনি' জ্বালাইয়া প্রহরযাপন করিতেছেন। ঋষি গান্ধীজী দৃষ্ট সেই ভয়াবহ সমস্যা এইবার সমগ্র পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা দিতেই গান্ধীজীর মানসপুত্র পণ্ডিত জওহরলাল—স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ জওহরলাল ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং বেদনাহত চিত্তে ব্যথিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, মাভৈঃ বাঙালী, তোমার এই মহাসঙ্কটে সারা ভারতবর্ষ তোমার পিছনে আছে; আমি সমগ্র ভারতের আশ্বাস লইয়া বলিতেছি যে, বাঙালীর বিপন্মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার হৃদয়-মন এখানেই পড়িয়া থাকিবে, আমাদের শাসন-পরিষদের স্বস্তি থাকিবে না। গত ২৫ ফাল্গুন(৯ মার্চ)এর 'যুগান্তর' পত্রিকায় কোনও অজ্ঞাতনামা লেখক সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই এক অপূর্ব রূপকের বর্ণনা দিয়াছেন "পণ্ডিতজীর সঙ্গে বনগাঁয়ে" নিবন্ধে। লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা সন্তানহারা বঙ্গভূমি ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া হাহাকার করিতেছে, পণ্ডিতজীর মূর্তি ধরিয়া ভারতবর্ষ আসিয়াছে তাহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিতে, আশ্রয় দিতে। এই ঐতিহাসিক অথচ মহাকাব্যিক বর্ণনা সম্পূর্ণ উদ্ধারের যোগ্য—

"পণ্ডিত নেহেরু একা এসে দাঁড়ালেন একটা কুটিরের সামনে। এই পুনর্বাসন কেন্দ্র। তিন দিকে বেড়া নেই, আধখেচড়া খড়ের ছাউনি। মাটিতে কাঁথায় ঢাকা একটি বালিকা জ্বরে ধুঁকছে। কোন প্রকারে এক টুকরা কাপড় জড়ানো গায়ে বর্ষীয়সী একটি মহিলা ঘরনিকানো হাতে হঠাৎ সামনে তাকাল। বিজন মাঠ, অপরিচিত নূতন দেশ, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, আর সেই স্ত্রীলোকটির মনের পশ্চাতে—অত্যাচার, গৃহত্যাগ আর পুত্র হারানোর দগ্‌দগে স্মৃতি। দেখল, গৌরবর্ণ সমুন্নতদেহ একটি মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট্ট একখানা ছড়ি, বিশ্ববিজয়ী দৃপ্তভঙ্গী মুখে, বুকে দুটি লাল ফুল গাঁথা। পাশে নিঃশব্দ একটি তরুণী।

"আমরা সাংবাদিকের দলের প্রথম দুই-একজন তখনও খানিকটা পেছনে। কিছুটা দূ'র থেকে দেখলাম, স্ত্রীলোকটি হঠাৎ পণ্ডিতজীর দুটি পা জড়িয়ে ধরল। আর তার সে কি আকুল ক্রন্দন! পণ্ডিতজীর সমস্ত গতি, সমস্ত দৃপ্ততা নিথর হয়ে গেল। আস্তে ছাড়িয়ে নিলেন দুটি পা। হিন্দী দুই-একটি কথা যা জিজ্ঞেস করলেন, তার কি অর্থ সেই মোল্লাহাটি-থেকে-পালিয়ে-আসা গাঁয়ের চাষী-ঘরের মেয়ে বোঝে? আঁচল ভিজিয়ে চোখ মুছল আর হাউ হাউ ক'রে আরও জোরে কেঁদে উঠল। তার কান্নার মধ্যে শুধু একটি কথা বোঝা গেল, মেয়েটিকে ডেকে বলছে,—ওরে ওঠ্ রে, দেখ্ কে এসেছে। পণ্ডিত নেহেরু এক মুহূর্তের জন্যে স'রে গেলেন পাশে, তারপর সেই ক্ষণে দেখলাম, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর চোখে জল! ত্রস্ত হাতে চোখ মুছে পাশ থেকে যখন স'রে এলেন, তখন তাঁর গম্ভীর মুখে একটা কালো ছায়া নেমে'ছে। আবার দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ালেন অন্য কুটিরের সামনে। নির্জন সেই নূতন বসতির সব মেয়েরা চোখের জল ফেলতে শুরু করল। পুরুষেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, শূন্য দৃষ্টি। মুহূর্তে পাড়াটার আবহাওয়া পাল্টে গেল। পেছনে ঘরে এসেছিলাম, সেই প্রথম স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, বাবু, এইটি বুঝি রাজার মেয়ে? শ্রীমতী ইন্দিরাকে দেখাল। তখন তাকে কে প্রজাতন্ত্র শোনাবে? বললাম, হ্যাঁ। তারা সবাই বুঝেছিল, এ একজন মস্ত ক্ষমতাসম্পন্ন

কেউ হবে। তাদের বাঁচাবার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু কেউ পণ্ডিতজীর পরিচয় কল্পনায়ও আনতে পারে নি। পণ্ডিতজী দেখলেন, তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ঘরবাঁধার কোন পরিকল্পনা নেই, উৎসাহ দেবার লোক নেই। সরকারী কর্মচারীকে ডেকে বললেন সে কথা। আর তাদের ব'লে এলেন, তোমরা যে কষ্ট পেয়েছ আর যে কষ্টে আছ, আমি তা দেখলাম। আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যাতে ভারতের সাহসী শক্তিশালী নাগরিক হয়ে উঠতে পার তাই যেন হয়। আমার যতটুকু ক্ষমতা তাতে আমি সেই চেষ্টাই করব।

"অবশেষে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। জওহরলাল বললেন, এ দেশের লোকেরা যদি বুদ্ধি না হারায়, যদি শান্ত থাকে আর সাহস নিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে সব সমস্যারই জয় হবে।"

* * *

আর সত্যই ভয় নাই। সমগ্র ভারত হইতে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন বাঙালীর মন, অভিমানে নৈরাশ্যে ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ বাঙালীর মন এবার ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিবে তাহার লক্ষণ দেখিতেছি; বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ছিন্নভিন্ন গৃহহীন সহায়সম্পদহীন বাঙালীর আশ্রয়দাতার ভূমিকায় পুরাতন বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া একপ্রাণতা অনুভব করিবে, বাঙালীকে নিশ্চিন্ত করিয়া বিচলিত ভারতবর্ষের ভারকেন্দ্র পুনঃসংস্থাপনের কাজে সমগ্র ভারতবর্ষই আগ্রহশীল হইবে, হয়তো তাহার সম্মানরক্ষার্থ ভারতবর্ষ মহাযুদ্ধের দায়িত্ব ও সঙ্কট মাথা পাতিয়া লইবে।

কিন্তু এ সকলই সময়সাপেক্ষ। হাজার হাজার বৎসরের জাতিগত ও পৈতৃক অধিকার এবং প্রকৃতিদত্ত নিশ্চিন্ত ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন মন্ত্রবলে একদিনে সম্ভব নয়। ইহার জন্য অধীর হইলে চলিবে না, অপরিসীম ধৈর্যের সহিত নিদারুণ কায়িক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, চঞ্চলতাপ্রসূত সামান্য মাত্র অবিবেচনা আমাদের চরম সর্বনাশ সাধন করিতে পারে—এ কথা

আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখিয়া দুঃখের দিনগুলি যাপন করিতে হইবে। মহাভারতকারের চিরন্তন উপদেশ—গৃহচ্যুত ও স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত সজননী পাণ্ডবদের করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া মহান বেদব্যাসের বীরোচিত ও ধীরোচিত নির্দেশ হইতে প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে চিত্তের স্থৈর্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ বাঙালীর। ভারতীয় নাবিকদের সহায়তায় এই শতছিদ্র তরণীকে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে সামান্য যাত্রীরও চঞ্চল ও অধীর হইলে চলিবে না। নিতান্ত অবোধ চিন্তালেশহীনতার যে কি ভয়াবহ পরিণাম, অভ্যাসে-সুড়সুড়-করা একটি হাতের নিক্ষিপ্ত বোমা সামলাইতে রাষ্ট্রের যে কত শক্তি ও অর্থ ব্যয় হয়, কত অচিন্তিতপূর্ব বিপর্যয় তাহার দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। দেখিতেছি, উদ্দেশ্যহীন চ্যাংড়ামি জাতিকে উৎসন্নের পথেও লইয়া যায়। স্মরণ হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধশেষে গৃহপ্রত্যাগত মদমত্ত যদুবংশীয় চ্যাংড়াদের কথা, তাহাদের সামান্য কৌতুকখেলা গোটা যদুবংশকে কেমন করিয়া ধ্বংস করিল সে কাহিনী আমরা জানি। ইহাও জানি, তাহার পিছনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত ছিল।

আমরা এ যুগে ততটা বিশ্বাসী নই. অকারণ ধ্বংসের মধ্যে ভগবানের মনোহর লীলা দেখিতে পাই না, সর্বদা আমাদিগকে আত্মরক্ষায় ও স্বজনরক্ষায় চেষ্টিত থাকিতে হয়। সামান্যতম প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য, এমন কি নিরাপদে রাখিবার জন্য, আমাদের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারকে অহোরাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিতে হয়। বাংলা দেশের বর্তমান কর্ণধার অতিশয় সক্ষম হাতে বিস্ময়কর সুবিবেচনার সঙ্গে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সঙ্কট-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আমাদিগকে নিরাপদ বন্দরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন; আমরা যদি ধীর স্থির থাকিয়া এই দুর্যোগে তাঁহাকে সাহায্য না করি, তাহা হইলে তাঁহার এবং কেন্দ্রীয় নাবিকদের সকল সাবধানতা সত্ত্বেও আমাদের ভরা ডুবি হইবে। সেই সমূহ সর্বনাশ হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করুক—ইহাই প্রার্থনা।

—

ধর্মের গোঁড়ামি বিবেককে টুঁটি টিপিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেও মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, বিবেক তাহাকে পরিত্যাগ করে

না। ধর্মসাপেক্ষ পাকিস্তান রাষ্ট্র বর্তমান কাফের-ধ্বংস জেহাদকে প্রাণ খুলিয়া গৌরবের খাতে যে জমা করিতে পারিতেছেন না, তাহার প্রমাণ ইহাকে এখনও ভারতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই চালাইতে চাহিতেছেন। তজ্জন্য হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব, কলিকাতায় সর্দার বল্লভভাইয়ের বক্তৃতা, বহরমপুরের ঘটনা ও কলিকাতার হাঙ্গামা লইয়া অবিরত টানাটানি চলিতেছে। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি গোড়ায় বল্লভভাইকে বাদ দিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, পরে তাহা সংশোধন করিয়াছেন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের নুরুল আমিন সাহেব পশ্চিম-বাংলার দায়িত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য গৌরব তাঁহারা ঘরোয়া ভাবেই করিয়াছেন, বহিঃপৃথিবীর দর্শক ও শ্রোতাদের সম্মুখে লৌহযবনিকা সার্থকভাবেই প্রলম্বিত হইয়াছে। এ বিষয়ে গুলিস্তাঁর ভূমিকা এবং জালালুদ্দীন রুমির কাব্য হইতে তাঁহারা এই নির্দেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন—

> What of the traceless can the tongueless tell ?
> No voices from the slain return.

এবং

> Place a padlock on your throat and hide the key.

কণ্ঠে তালা লাগাইয়া চাবিকাঠিটি তাঁহারা শুধু লুকাইয়া রাখেন নাই—এখন আর খুঁজিয়াও পাইতেছেন না। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার একজন অভারতীয় সংবাদদাতা উইল্‌ফ্রেড ল্যাজারাস সম্প্রতি (১৪ মার্চ) সেই তালার একটি চাবিকাঠি তৈয়ারি করিয়া পাকিস্তানের রুদ্ধকণ্ঠ কতকটা মুক্ত করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা সবিস্ময়ে জানিতে পারিতেছি যে, জেহাদের উৎস সেই বাগেরহাট; হিন্দু মহাসভা নয়, বল্লভভাই নয়, বহরমপুর নয়, কলিকাতা নয়। সূত্রপাত ১৯৫০-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নয়—ইহা আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪৯-এর ২১ ডিসেম্বর তারিখে। সংবাদদাতার বিবৃতি এইরূপ—

"খুলনা জেলায় উপদ্রব আরম্ভ হয় বাগেরহাট মহকুমায়। ছয়টি গ্রামে উপদ্রব গুরুতর আকার ধারণ করে। এই ছয়টির মধ্যে আবার তিনটি গ্রামের বিষম ক্ষতি হয়।

"কালশিরা গ্রামের ক্ষতিই সর্বাধিক। এই গ্রামের ৪৩০টি বাড়ির

মধ্যে এখন মাত্র তিনটি খ'ড়ো আছে। আর সবই পুড়িয়া গিয়াছে পাশের গ্রামগুলিতেও আগুন দেওয়া হইয়াছিল এবং লুঠতরাজ চলিয়াছিল—তবে একটু কম মাত্রায়। ধর্মান্তরিত করা এবং মন্দির কলুষিত করার সংবাদও সমর্থিত হইয়াছে।

"বাগেরহাট মহকুমায় ২১শে ডিসেম্বর যে বড় রকমের দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তাহার পূর্ববর্তী ঘটনাপরম্পরা এইরূপ :—

"কম্যুনিস্ট কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণিত কতকগুলি লোককে ধরিবার জন্য ঝালডাঙ্গায় পুলিসের বড় একটি দল পাঠানো হয়। এই সঙ্গে ঝালডাঙ্গা হইতে তিন মাইল দূরে কালশিরা গ্রামেও চারজন পুলিস পাঠানো হয়। ঝালডাঙ্গা গ্রামের কম্যুনিস্টরা পুলিস আসার সম্ভাবনা আছে বুঝিতে পারিয়া কালশিরা গ্রামে আশ্রয় নেয়। কম্যুনিস্টরা লুকাইয়া আছে সন্দেহ করিয়া যে চারজন পুলিস কালশিরায় গিয়াছিল, তাহারা একটি বাড়িতে হানা দেয়।

"বাড়ির লোকে বলে, পুলিস যাহাদের খোঁজ করিতেছে তাহারা এখানে নাই। বাড়ির মেয়েরা পুলিসের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সোরগোল তোলে। কম্যুনিস্ট বলিয়া বর্ণিত নয়জন ইহাতে আগাইয়া আসে এবং পুলিসের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। একজন সশস্ত্র পুলিস কন্‌স্টেব্‌লকে ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়। দুইজন কন্‌স্টেব্‌ল গুরুতর আহত হয়। সেই সময় একজন আনসার আসিয়া পড়ায় তাহারা রক্ষা পায়। দুই দিন পরে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে একদল পুলিস এই বাড়ি এবং গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে হানা দেয়। গ্রামবাসীদের উপর পুলিসের এই অত্যাচার হইতে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। বহু লোক এই দলে যোগ দিয়া গ্রামের বাড়িগুলিতে ব্যাপক লুঠতরাজ শুরু করিয়া দেয়। অনতিবিলম্বে গোলযোগ নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে।

"খুব সংযত যেসব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে, কয়েকদিন ধরিয়া এই গ্রামগুলিতে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলিতে থাকে এবং সমগ্র বাগেরহাট মহকুমার অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠে।

"গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করে

এবং যথাসর্বস্ব ফেলিয়া সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়া পড়ে। স্থানীয় পুলিস ও আনসার বাহিনী মিলিয়া গ্রামগুলির চতুর্দিকে যে লৌহ বেষ্টনী রচনা করিয়াছিল, তাহার ফলে অবশিষ্ট লোক পলাইতে পারে নাই।

"সরকার এই সকল ঘটনার সংবাদ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিলেও আশ্রয়প্রার্থীদের মুখে মুখে কলিকাতায় সংবাদ পৌঁছায়। ভারতীয় সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করেন। ঘটনার পর তখন প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে।

"আজও অর্থাৎ ঘটনার আড়াই মাস পরেও এই অঞ্চলে যাওয়া কঠিন। বিপদে পড়িবার আশঙ্কা না লইয়া এখানে যাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গ সরকার আমাকে বাগেরহাট এবং বরিশালের উপদ্রুত অঞ্চলে যাইবার অনুমতি দেন নাই।"

এই অভারতীয় সংবাদদাতার বিবৃতির সঙ্গে এই ঘটনারই পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ-প্রদত্ত বিবৃতি মিলাইয়া আমাদের ভল্টেয়ারের এই উক্তিটিই মনে পড়িতেছে—

You have observed more than once that the fanaticism to which men are so much inclined has always served not only to render them more brutalised, but more wicked. Pure religion and undefiled softens the manners by enlightening the mind, while superstition, by making it blind inspires every kind of madness.

বর্তমান সঙ্কটে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ে অতিশয় সতর্ক থাকিতে হইবে—গুজব এবং হুমকির কবলে আমরা যেন কদাচ না পড়ি। লৌহযবনিকা ভেদ করিয়া যে সকল সংবাদ চুয়াইয়া আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিতেছে, তাহার নৃশংসতা ও বীভৎসতা বিচার করিলে যে-কোনও মনুষ্যবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করিবে, গুজবের অবকাশ আর নাই। সুতরাং আমরা বৃথা তাহা রটাইবার চেষ্টায় নিজেরাই বা উত্তেজিত হই কেন, অপরকেই বা উত্তেজিত করি কেন? যে শক্তি-সংহতি এখন একান্ত প্রয়োজন, গুজবের ফলে তাহা নষ্ট হয়—এ কথা আমরা যেন স্মরণ করি। হুমকি ভারতের পক্ষ হইতে মাত্র একজন দিতে পারেন, তিনি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল। এই সঙ্কটের

মধ্যেও তিনি অতিশয় ধীর স্থির চিত্তে ভারতের পক্ষে চরম কথা বলিয়া দিয়াছেন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :—

"কাশ্মীরে যাহা ঘটিয়াছে এবং পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমার নিকট একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া মনে হইতেছে এবং আমরা এই ব্যাপারগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। আমরা এই দেশে শান্তি দেখিতে চাই—পাকিস্থানেরও সঙ্গে শান্তি চাই, এবং আমি বার বার এই শান্তির প্রস্তাবও করিয়াছি। কিন্তু গোলমাল ও বিরোধের দৃঢ়মূলীভূত কারণসমূহ বর্তমান থাকিতে কোনও প্রকার বাহ্যিক ব্যবস্থার দ্বারা শান্তি ও শুভেচ্ছা আসিতে পারে না। আজ বাংলার সমস্যা-সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে, কারণ, এই সমস্যারই দ্বারা অন্যান্য সমস্যা আজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শান্তি রক্ষার যে সকল প্রস্তাব আমরা করিয়াছি তাহাতে যদি সম্মতি না পাওয়া যায়, তবে আমাদের হয়তো অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।"

ইহাই আমাদের কথা এবং শেষ কথা। এই কথাকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পণ্ডিতজী এবং তাঁহার শাসন-পরিষৎ নিশ্চয়ই করিতেছেন। আমরা বিখ্যাত বাগ্মী ডেমস্থিনিসের একটি বচন তাঁহার অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। বচনটি এই —

For words and threats if they are not accompanied by action, cannot but appear vain and contemptible.

—

অকালে পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা-অধিকারের অধিকর্তা এইচ. এম. ও ডি. এম.এর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ২৮ জানুয়ারি তারিখে। তাঁহারা পৌষের 'শনিবারের চিঠি'তে "সংবাদ-সাহিত্যে" প্রকাশিত শিক্ষাবিভাগ সম্পর্কীয় মন্তব্যের মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিয়াছেন। এই জবাব একটি ইস্তাহারের আকারে ৩১ জানুয়ারি তারিখের যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের ইতিহাসে এই অকাল-জাগরণ ও জবাব-তৎপরতা বিস্ময়কর। ত্রেতায় মহাবীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ-বিপর্যয় আমাদের

স্মরণে আছে বলিয়া আমরা আশঙ্কান্বিত হইতেছি। যাঁহাদের সচরাচর এক যুগে অর্থাৎ একশ চুয়াল্লিশ মাসে বৎসর হয়, একটি জরুরি পত্রের সাধারণ ভদ্রতাসূচক প্রাপ্তি সংবাদ দিতে যাঁহারা পুরা নয় মাস সময় লইয়া থাকেন এবং যাঁহারা সময়ে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত একটা সামান্য বিজ্ঞাপন দিতে পারেন না বলিয়া অসহায় পুস্তক-প্রকাশকদিগকে মাত্র তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী "ছবির বই" লিখিয়া ও ছাপাইয়া দাখিল করিতে বাধ্য করা হয়, তাঁহাদের টনক যে এত সহজে নড়িবে—ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই বলিয়া যথাসময়ে সরকারী ইস্তাহারটি আমাদের নজরে পড়ে নাই। একজন সহৃদয় বন্ধু প্রায় মাসাধিক কাল পরে ইহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ইস্তাহার আমাদের অভিযোগের জবাব নয়, "ধান ভানতে শিবের গীতে"র একটি অনুপম নমুনামাত্র। আমাদের অভিযোগের মোদ্দা কথা ছিল তিনটি—(১) জনশিক্ষা-অধিকারে অধিক সংখ্যক সচিব নিয়োগে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে অথচ কাজ কিছুই বাড়ে নাই, বরং দেশবিভাগের ফলে অনেক কমিয়াছে। (২) অ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটীর রিপোর্টকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া শিক্ষা-অধিকার কমিটীর কার্যকলাপকে প্রহসনের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং (৩) বেসিক এডুকেশনের নামে পুরাতন পদ্ধতিই চালু রাখিয়া শিক্ষা-অধিকার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। জবাবে শিক্ষা-অধিকার ঝোপেঝাড়ে লাঠি চালাইয়াছেন অনেক, কিন্তু আসল অভিযোগগুলির সম্পর্কে কোনও সদুত্তর তাহার মধ্যে নাই।

দেশবিভাগের পূর্বে বড় মেজো হিসাবে সেক্রেটারি ছিল দুইজন, কচিৎ কখনও সাময়িক প্রয়োজনে একজন সেজো আসিয়া জুটিতেন; কিন্তু বর্তমানে ইঁহারা বড় মেজো সেজো ছাড়া অন্যান্য নানা বিচিত্র নামে মাত্র সাতজনে দাঁড়াইয়াছেন। যে কেহ সরকারী দপ্তরে খোঁজ করিলে তাঁহাদের নাম ও বেতনের পরিমাণ ও কাজের গুরুত্বের খবর পাইবেন। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, আমাদের পূর্ব অভিযোগের প্রমাণ তাঁহারা পাইবেন।

অ্যাডাল্ট এডুকেশন কামটী সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১২৫ রাসবিহারী আভেনিউ- (কলিকাতা ২৯)-এ বাস করেন এবং তাঁহার টেলিফোন নম্বর পার্ক ২০৪৩। চার দিন পূর্বেও তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়াছি যে, শিক্ষা-অধিকার তাঁহাদের রিপোর্ট ছাপিতেছেন, ইহা সত্য নয়। তিনি স্বয়ং নিজের খরচে তাহা ছাপাইবার জন্য ছাপাখানায় দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জনশিক্ষা-অধিকারের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা প্রচারিত হইলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচার বিভাগ তাহা মুদ্রণযোগ্য বিবেচনা করিবেন না।

বেসিক এডুকেশন সম্পর্কে শিক্ষা-অধিকারের বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন বাংলা দেশের নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদেরা—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেন, অধ্যক্ষ সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু এবং প্রখ্যাতনামা আরও সতেরো জন। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত একটি সম্মিলিত বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

Besides, although the Government claim that the syllabus is a syllabus for Basic Education, those who are actively connected with Gandhian system of Basic Education have condemned it as the caricature of basic education.

আমরাও এতটা রূঢ় হইতে পারি নাই।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছু বলিবার আছে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা মুলতুবি রাখিতে হইতেছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী যে কচি 'কিশলয়' শিক্ষা-অধিকারের উর্বর ক্ষেত্রে উদ্গত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় না দিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে মহামান্য শিক্ষা-অধিকার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোনও পাঠ্য পুস্তকই বরাদ্দ করেন নাই, শিক্ষার্থীদের সরল শিশুমনে কোনও পুঁথির ভার এই সহৃদয় শিশুপালেরা বরদাস্ত করিবেন না। যদি ছবির বই-এর

প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের সরল শিশুমনে অক্ষর ও বর্ণের দাগ পড়ে, তাহা হইলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন। ইহার পরেই এই প্রায়-নিরক্ষরদের হাতে শিক্ষা-অধিকারের অধিকারীর দল একগুচ্ছ 'কিশলয়' গুঁজিয়া দিয়াছেন, সেগুলি কত কচি এখান ওখান হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়াই তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি—

পৃ. ৯। রেণু ভিন্ন বীজ থাকিতে পারে না।

পৃ. ১৩। পুরুষ পায়রাগুলি কেমন 'বকম বকম' শব্দ করিয়া গলা ফুলাইয়া স্ত্রীদের চারিদিকে নাচিয়া বেড়ায় তাহা তোমরা দেখ নাই কি?

[পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এখানে অধিকারীর কৌশলে কি শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন।]

পৃ. ১৭। গোলক ধাঁধাঁর মতো

পৃ. ২১। শ্রীমধুসূদন

পৃ. ২৭। ইংল্যাণ্ড। কয়েকটি ছেলেমেয়ে স্লেজ-গাড়ি লইয়া লেখা করিতেছে।·· ঐ খেলাকে বলে 'শি' খেলা।

পৃ. ৫৩। মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন।

পৃ. ৫৮। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়।

পৃ. ৭২। লালুর তাকে নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে।

আরও অনেক আছে, কিন্তু আর দৃষ্টান্ত দিয়া কি হইবে? যাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার উপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি ছাপিতে লজ্জা অনুভব করেন না, তাঁহাদিগকে লজ্জা দিবে কে? এই 'কিশলয়ে'র শেষাংশ হইতেছে পাটীগণিত। এই পাটীগণিত পড়িয়া বুঝিতে পারি, এত বড় শুভঙ্কর আমরা নই। আমরা কচি কিশলয়দের অভিভাবক ধাড়ীদের বিপদের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীর এই 'কিশলয়'খানি মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের ইজারা মহল—মনোপলি। ইহা সংগ্রহ করাও যার-তার কাজ নয়, অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া আমরা এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠকেরা স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। পাছে তাঁহারা আমাদের উক্তি বিদ্বেষদুষ্ট মনে করেন, এই

কারণে ২৫ ফাগুনের 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় হইতে তাঁহাদের মতামত আমাদের সাফাইস্বরূপ দাখিল করিতেছি।—

"'কিশলয়'—তৃতীয় শ্রেণীর সুকোমলমতি-বালক-বালিকাগণের উপযোগী (?) সাহিত্য ও গণিতের অপূর্ব জগাখিচুড়ী। ইহা অপেক্ষা সর্বতোভাবে অনুপযোগী কঠিন ও নীরস পুস্তক ইতঃপূর্বে আর কখনও তৃতীয় শ্রেণীর বালক-বালিকাগণের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।"

শিক্ষা-অধিকারের বিচারে নির্বাচনের জন্য মুদ্রিত পুস্তক দাখিলের যে সর্বনাশা রীতি লইয়া 'যুগান্তর'-সম্পাদক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা পরে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। মোটের উপর বিষহীন শিক্ষা-অধিকারের কুলোপানা চক্র দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি, সেই কথাই জ্ঞাপন করিলাম।

—

যে বাঙালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একদা আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না"—'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' লিখিয়া, শেষ করিয়া এবং প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় কবির সেই আক্ষেপ ঘুচাইয়াছেন। তিনি এক সুমহৎ কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার বিশ্বাস তাহা পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছেন, বস্তুত তিনি একক সাধনায় এই সুবিপুল কর্ম সম্পাদন করিয়া এই ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল জাতির বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছেন। শুধু এই মহৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়, তাঁহার সুপ্রমাণিত বক্তব্যের দ্বারাও তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি-দূষণ দোষ ক্ষালন করিয়াছেন। তাঁহার "নিবেদনে" তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, "বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটীরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। পরিণত যৌবনেও বার বার বাংলার ও ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য

প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছি—নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে; আজও তাহার বিরাম নাই। যত দেখিয়াছি, যত নিকটে গিয়াছি, তত সেই ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—ভালবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে, দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে। আমার বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নয়; সে দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে—মৃতের কঙ্কালকে নয়।"

এই প্রাণবান জীবন্ত ইতিহাসের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই পুস্তক বাঙালীমাত্রকেই নিত্যসঙ্গী করিতে হইবে। পুস্তকের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ যে ছাড়পত্র দিয়াছেন, তাহার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন—"বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য-পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ নির্দেশ করিবে।"

আমরা ডক্টর নীহাররঞ্জনের আজীবন সাধনার সিদ্ধির এই প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্টে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বাঙালীর এই ইতিহাস বাঙালীর দ্বারা রচিত হওয়াতে বাঙালীর মান রক্ষা হইয়াছে। সমগ্র বাঙালী জাতির তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। সচিত্র ও স-মানচিত্র এই প্রায় হাজার পৃষ্ঠার ইতিহাসটি বাঙালীর ঘরে ঘরে রক্ষিত ও পঠিত হইলে তবেই ইহার সার্থকতা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

ছাব্বিশে জানুয়ারি

শনিবারের চিঠি'র গত কার্তিক সংখ্যায় "দোস্‌রা অক্‌টোবর" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার মোদ্দা কথাটা ছিল, বর্তমান অবস্থায় শুধু গান্ধীজীর জন্মদিন কি মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে একদিন স্তুতি-উচ্ছ্বাস, উৎসব-সমারোহ করিলে কিছু হইবে না, গান্ধীজীর শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বুঝিতে হইবে এবং তাহার সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরও বলিতে চাহিয়াছিলাম, এইরূপ অনুশীলনের পথে বর্তমান অবস্থায় কতকগুলি মৌলিক এবং কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বাধা আছে। স্বাধীনতা-লাভের পর সেইজন্য কতকগুলি বিষয়ে আমাদের মৌলিক পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে, আর গান্ধীজীর মূল দৃষ্টিভঙ্গীকে সেইরূপে পুনর্বিচার করিয়া আনুষ্ঠানিক বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি দিয়া ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

ইহা ছিল রাজনীতির তত্ত্বের কথা, তথ্যের কথা নহে। কিন্তু জীবন্ত রাজনীতিতে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সীমারেখা টানা খুবই দুরূহ। প্রথমত, জীবন্ত রাজনীতি ঠিক কোনও কেতাবী তত্ত্বের সুসংবদ্ধ প্যাটার্ন অনুসারে চলে না, দেশের ও কালের অবস্থা অনুসারে তাহা গড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়ত, যে রাজনৈতিক তত্ত্ব তথ্যের সংস্পর্শ হইতে বর্জিত তাহা কাজের বেলায় উপকারে আসে না। তত্ত্ব ও তথ্যের এই পরস্পর-নির্ভরতা সম্বন্ধে এ যুগের অন্যতম মহামনীষী লেনিন সেইজন্য দুইটি অমূল্য কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কথা ছিল, যে দল বিপ্লবের নেতৃত্ব করিবে তাহাদের রাজনৈতিক তত্ত্ব সবচেয়ে অগ্রগামী হওয়া দরকার—তাহা না হইলে তাহাদের পক্ষে নেতৃত্ব সম্ভব নয়। (The role of vanguard can be fulfilled only by a party that is guided by the most advanced theory)। কিন্তু এই থিয়োরি কি? ইহা কি মাটির স্পর্শ-বিহীন হাওয়ায় ভাসিয়া-বেড়ানো কল্পনার বস্তু? শুধু ভাবগত আদর্শ-বিলাস? লেনিন এই রকম অবাস্তব বিপ্লব-বিলাসের কঠিনতম নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, বিপ্লবের থিয়োরি সত্যকার বৈপ্লবিক রূপ তখনই পরিগ্রহ করে, যখন তাহা

বাস্তবের সহিত সংযুক্ত হয়—অতীত ও বর্তমান অবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া সেই অতীত ও বর্তমান অবস্থার মধ্য হইতেই নূতন ভবিষ্যৎ রচনার চেষ্টা করে। সুতরাং পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়া প্রকৃত বৈপ্লবিক থিয়োরি হয় না, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হইতেই ভবিষ্যতের থিয়োরি জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা ইতিহাসের শিক্ষায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের একেবারে গোড়ার কথা ইহাই। সেইজন্যই লেনিন বলিয়াছিলেন, Revolutionary theory is not a dogma ; it undergoes formulation only when brought into close contact with the practice of the really mass and really revolutionary movement (*Left-wing Communism : An Infantile Disorder*).

সুতরাং আজ যদি সত্যকারের রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা আলোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে তথ্য বাদ দিয়া তাহার আলোচনা চলে না। পূর্বের প্রবন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তথ্যের উল্লেখ কিছু কিছু মাত্র করিয়াছিলাম। বিশেষত, গান্ধীজীর শিক্ষার কোন্ কোন্ দিকে এখন মৌলিক পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে, বিশেষ করিয়া সেই দিকটাই তাহাতে আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পক্ষে সে আলোচনা সম্পূর্ণ নহে। ভারতবর্ষ যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন, তাহাতে আরও ব্যাপকভাবে তথ্য আলোচনা করিয়া আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজন অনুসারে একটি নূতন সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহা এক দিকে যেমন বাস্তব হইতে উদ্ভূত অন্য দিকে তেমনই সকলের চেয়ে অগ্রগামী। সুতরাং এই প্রবন্ধে সেই ব্যাপক পটভূমিকার কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব।

২

এই আলোচনার প্রথমেই ভারতবর্ষের সংকটের স্বরূপটা ভাল করিয়া বোঝা দরকার। এত দিন আমরা পরাধীন ছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব কোনও রাজনীতি ছিল না, এমন কি আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থাতেও দেশের লোকের কোনও দায়িত্ব ছিল না। শাসন করিয়া আসিয়াছেন ইংরেজ সরকার, আমাদের চোখে যেটা খারাপ লাগে নাই সেখানে আমরা চুপচাপ থাকিয়া গিয়াছি,

যেখানে খারাপ লাগিয়াছে সেখানে চীৎকার করিয়াছি, প্রতিবাদ করিয়াছি, আন্দোলন করিয়াছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিল, অমনই ভারতবর্ষও যুদ্ধ ঘোষণা করিল, জনসাধারণের মতামতের কোনও অপেক্ষা রহিল না। বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র আসিল, লড়াই চলিতে লাগিল, আমরা প্রতিবাদ করিলাম, আন্দোলন করিলাম, জেলে গেলাম—এই পর্যন্ত। দেশের লোকের অবস্থা খারাপ হইতেছে, আমরা গ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য চীৎকার করিতেছি, প্রতিবাদ করিতেছি, অ্যাসেম্‌ব্লি-কাউন্‌সিলে হৈ-চৈ করিতেছি, যেখানে আমাদের প্রতিবাদ প্রবল হইতেছে সেখানে কিছু ফল ফলিতেছে, অন্য জায়গায় চিরাচরিত জগদ্দল পাথরের মত শাসনতন্ত্র গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে। সুতরাং আমাদের কাজটা ছিল প্রতিবাদ, কাজ করানোর দায়িত্ব আমাদের ছিল না। অবশ্য যত দিন যাইতেছিল, ইংরেজসাম্রাজ্যের বুনিয়াদ যতই শিথিল হইতেছিল ততই দায়িত্ব আমাদের উপর পড়িতেছিল। বহু দিন আগে জেলা-বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বেড়াজাল-কণ্টকিত সীমাবদ্ধ দায়িত্ব আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে প্রাদেশিক শাসনভার ভারত-শাসন-আইনের বিধিনিষেধের সীমা-চিহ্নিত হইয়া আমাদের হাতে আসিল। ক্রমে ইহা প্রসারিত হইতে হইতে সব জায়গাতেই দায়িত্ব আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের কর্মসূচীটা এখন বদলাইয়া গিয়াছে। আগে ছিল প্রতিবাদ, সেখানে এখন বাদ আসিয়া পড়িয়াছে; আগে যেখানে আমরা anti-thesis রচনা করিতাম, এখন সেখানে প্রথম thesis রচনা করা এবং শেষ পর্যন্ত synthesis স্থাপনা করার দায়িত্বই আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথমত, আমাদের মনের কাঠামোটা ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। ইহার জন্য যে নানা রকম অসুবিধা হয় নাই এবং হইতেছে না তাহা নহে। কিন্তু সে কথার আলোচনা পরে করিব। প্রথমে দেখা যাক, এইভাবে ইতিহাসের গতির অনিবার্য নিয়মে আমরা যখন ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট লাল-কেল্লায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়াইলাম, তখন কি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমরা রাষ্ট্রভার গ্রহণ করিলাম। দ্বিতীয়

আলোচ্য বিষয় হইল, এই দুই-আড়াই বছরে দেশে এবং বিদেশে কি কি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হইল, ইতিহাসের গতি যেভাবে চলিতেছে দেখিতেছি, তাহাতে দূরভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্তত নিকটভবিষ্যতে আরও কি কি ঘটনার উদ্ভব হইতে পারে। সব শেষে আলোচ্য বিষয় হইল, এই সব ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কি করিয়াছি, কি করি নাই, কি করা উচিত ছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি কর্মসূচী গ্রহণ করিব।

৩

ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে উৎসব হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্টের তুলনা করিলে যে তফাতটা সব চেয়ে চোখে পড়ে সেটা হইল এই যে, সেবার পনেরোই আগস্ট দেশময় যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গিয়াছিল এবার তাহার শতাংশের একাংশও নাই। কোথাও কোন উৎসাহ দেখিতে পাইতেছি না, জনসাধারণের চিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত বানডাকা আনন্দপ্রবাহ নাই, গৃহে গৃহে দীপমালা নাই, গ্রামে গ্রামে উৎসবের কলরব নাই। এমন কি, কয়েকটি বামপন্থী দল উৎসবের প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন। তথাকথিত বামপন্থীদের দোষ দিয়া লাভ নাই। তাঁহারা যদি বুঝিতেন, দেশের লোকের মনে দারুণ উৎসাহ আছে, তাহা হইলে সেই প্রবল জনমতের সামনে তাঁহারা প্রতিবাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও তুলিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু জনসাধারণ নিরুৎসাহ। সকলেই যে কিছু বিক্ষুব্ধ তাহা নহে, কিন্তু যাহাদের চিত্তে বিক্ষোভ নাই তাহারাও যে কোনও উৎসাহ বোধ করিতেছে তাহা নহে। অথচ পনেরোই আগস্ট তারিখে তাহা ছিল না। সেদিন উৎসবের আনন্দের মধ্যে কোনও মেকি ছিল না। বহু শতাব্দীর পর স্বাধীনতা লাভ করিলাম, দেশময় একটা নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। দেশময় লোকে আশা করিতেছিল, এইবার আমাদের দুঃখকষ্টের অবসান হইবে, আর্থিক দুর্দশা কমিবে, জীবনযাত্রার উন্নতি হইবে, দেশের লোক একটু আনন্দে চলাফেরা করিতে পারিবে, এতদিনকার বেদনা-লাঞ্ছনা ঘুচিয়া গিয়া নূতন দিনের উদয় হইবে—দেশময় এই আশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পক্ষান্তরে যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম, তখন দেশের বাস্তব অবস্থা কি ছিল? বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামগুলি ভাঙিতেছে, মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙিতেছে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মলিন হইতে মলিনতর হইতেছে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত আমাদের উপর পড়িল। দেশময় আর একটা ঝড় বহিয়া গেল। যা কিছু আর্থিক বরাদ্দ, সবই যুদ্ধের খাতে খরচ হইতে লাগিল, ফলে দেশের উন্নতির জন্য যেটুকু টাকাও ইতিপূর্বে খরচ হইত তাহাও অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া গেল। মুদ্রামূল্যের স্ফীতি হইতে লাগিল, জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে লাগিল, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিতে লাগিল। বাংলা দেশ তো নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ঝড়ে ছারখার হইয়া গেল, গ্রামগুলি ধ্বংস হইল, লোকে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিতে লাগিল, সমস্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাই ভয়ানক রকম নাড়া খাইয়া পড়োপড়ো হইয়া কোনও রকমে দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। সুতরাং মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, আমাদের দেশে যে ক্ষয় বহুপূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই ক্ষয়ের পরিমাণ ও গতি এমনই বাড়িয়া গেল যে, আমরা একেবারে মৌলিক সংকটের সম্মুখীন হইতে চলিলাম। ফাটল অনেক দিনই ধরিয়াছিল, ভাঙন অনেক দিনই শুরু হইয়াছিল—কিন্তু সে ফাটল এতদিন বুনিয়াদ অবধি চিড় ধরায় নাই, সে ভাঙন একেবারে মূল পর্যন্ত নাড়া দেয় নাই। উপরে ছাদ ফাটিতেছিল, দেওয়াল পড়িতেছিল, কিন্তু পড়োপড়ো হইয়াও কাঠামোটা কোনরকমে খাড়া ছিল। এইবার একেবারে বুনিয়াদে চিড় ধরিল, কাঠামো বজায় থাকে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ প্রবন্ধ নয়। তবুও সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রথমে এক পর্ব শেষ হইয়া যে আর একটি নূতন পর্বের শুরু হইয়াছিল, সেই পর্বের পূর্ণ সমাপ্তি এতদিনে ঘটিল। যখন ইংরেজ-সাম্রাজ্য এ দেশে স্থাপিত হইল, তখন ইংরেজ তাহার নবলব্ধ যন্ত্রশক্তির জোরে মধ্যযুগীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিতেছে, ধনতান্ত্রিক যুগের ভিত্তি স্বদেশের সীমানা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার আগে

মজিতেছে,—সব দিক দিয়া ধ্বংসের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অন্য দিকে পূর্বে আমাদের দেশে বড়লোকশ্রেণী ছিল না তা নয়, কিন্তু সমাজের ভঙ্গীটা ধনতান্ত্রিক হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে এখন হাজারজন লক্ষপতির বদলে পঞ্চাশজন কোটিপতির আবির্ভাব হইয়াছে, সমাজের ভঙ্গীটাও বদলাইয়া ধনতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে।

এই সব কথা বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কিন্তু এই সব লক্ষণ উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এত দিন পর্যন্ত সময়ে সময়ে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আসলে মৌলিক সমস্যা হইতে বিচ্যুত না হইলেও মোট কাঠামোটা বজায় রাখিয়াও তাহারই মধ্যে জোড়াতাড়া মেরামত করিয়া আমরা সামলাইয়া আসিতেছিলাম। এখন সমস্যাটা এত গভীর ও বৃহৎ হইয়া গিয়াছে যে, মোট কাঠামোটাই বদলাইতে হইবে, টুকটাক্ মেরামতে আর কাজ চলিবে না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সকলেই অনুভব করিতেছিলেন, চাষীর অবস্থা ও চাষের অবস্থা বিশেষ ভাল হইতেছে না। কিন্তু কি প্রতিকার হইল? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় চাষীদের অধিকার সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা না করিয়াই জমিদারদের হাতে সমস্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, এবং আশা করা গিয়াছিল যে জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থেই চাষ ও চাষীদের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু যখন জমির চাহিদা বাড়ায় জমিদারেরা বিনা চেষ্টাতেই লাভ পাইতে লাগিলেন এবং চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-রচয়িতাদের আশা পূর্ণ হইল না, তখন প্রতিকারস্বরূপ সমস্ত অধিকার প্রজাদের দেওয়ার কথা উঠিল—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ তাহারই ফল। কিন্তু তাহাতে ফল কি ফলিল? অধিকার পাইবা মাত্রই চাষীরা ছোট ছোট জমিদার হইয়া পড়িলেন, আসল চাষের দায়িত্ব পড়িল বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের উপর। সমস্যার প্রকৃত সমাধান তখন হয় নাই। কিন্তু তাহাই তখন যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, অধিকারে রক্ষাকবচে আমাদের মৌলিক রোগের প্রতিকার হয় নাই, এখন রোগ এমনই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়াছে যে আর রক্ষাকবচ মাদুলী ও টোটকায় তাহার প্রতিকার হইবার নহে। প্রত্যেক দিকেই এই কথা। সুতরাং এখন আমাদের সমস্যা দাঁড়াইয়াছে যে, যদি দেশের

নিদারুণ দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হয় তাহা হইলে জোড়াতাল দিয়া আর চলিবে না—একেবারে মৌলিক প্রতিবিধান করিতে হইবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। গোটাকয়েক চাকরির ব্যবস্থা করিয়া আর মধ্যবিত্ত সমাজকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। কিছু কুইনিন বিলাইয়া আর কিছু সার দিয়া চাষ ও চাষীর নূতন চেহারা সৃষ্টি করা যাইবে না। কুইনিন যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ হউক, সার প্রচুর পরিমাণে বিলি করা হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বক্তব্য হইল, এই সব প্রচেষ্টা রোগের আংশিক ঔষধ হইলেও মৌলিক প্রতিষেধক নয়। ইহাতে মুমূর্ষু প্রাণশক্তিকে টানিয়া টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা হইতে পারে মাত্র, কিন্তু কেবল ইহাতেই নূতন প্রাণশক্তির, নূতন জীবনের সৃষ্টি হইবে না।

সেইজন্য এখন আর জীর্ণ শীর্ণ কাঠামোটাকে রঙচঙ করিয়া জোড়াতালি দিয়া নূতন দেশ সৃষ্টি করা যাইবে না, এবং নূতন দেশের সৃষ্টি না হইলেও দেশময় দুঃখ-দারিদ্র্য কষ্ট-লাঞ্ছনার অবসান হইবে না। এই দিক দিয়া আমাদের সব প্রথমেই একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে আশা-ভরসা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই মনে করিয়াছে, এইবার বুঝি দুঃখের দিনের অবসান ঘটিবে। যদি এই উদ্বেল আশা-আকাঙ্ক্ষা দেশের নেতারা পূরণ করিতে না পারেন তাহা হইলে যে বিরাট আশাভঙ্গ হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিলেও শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। আর এই আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার চেহারা যে আমরা দেখিতে শুরু করি নাই তাহা নহে। অথচ যে সময়টিতে এই আশা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়টিতেই আমাদের সংকট সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক হইয়া দেখা দিয়াছিল, ঠিক সেই সংকটের মুহূর্তেই আমরা দেশের কার্যভার তুলিয়া লইলাম। সেই সংকট একদিনে মোচন হইবার নহে; অথচ তাহা না হইলেও এই উদ্বেলিত আশা সফল হইতে পারে না। এইখানেই প্রথম সমস্যা দেখা দিল, এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের যাত্রা শুরু হইল।

৩

কিন্তু সমস্যার শেষ এইখানেই নহে। তাহার পর আরও ঘটনা ঘটিয়াছে। যদি বুঝিতাম, আমাদের দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানোই আমাদের একমাত্র সমস্যা,—তা ছাড়া দেশে অন্য কোনও গোলমাল নাই, অশান্তি নাই, আন্তর্জাতিক কোনও সমস্যা নাই, আমরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে একাগ্র মনে দেশের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়াছি, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল সংস্কার করিতে লাগিয়াছি, তাহা হইলেও কাজ অনেক সহজ হইত। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ আসে নাই। যে গভীর ও মৌলিক সংকটের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম, স্বাধীনতা লাভের পর সেই সমস্যার উপর আরও নানা সমস্যা জুটিয়া আসল সমস্যার সমাধান বিলম্বিত করিয়া দিতেছে, ফলে আশাভঙ্গ ও অশান্তির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে।

প্রথমে অর্থনৈতিক দিক্‌টার উল্লেখ করি। গত মহাযুদ্ধের পর জগতে যে অর্থনৈতিক গোলমাল হইয়াছিল, তাহারই ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তোড়জোড় শুরু না হওয়া পর্যন্ত সে মন্দার চিহ্ন সম্পূর্ণ কাটে নাই। হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার পর যে গোলমাল শুরু হইয়াছিল তাহার জের মিটিল ১৯৩৭।৩৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে। এবারকার মহাযুদ্ধেও অর্থনৈতিক গোলমাল আগের চেয়ে কম হয় নাই, বরং বেশি হইয়াছে। এ পর্যন্ত যে সব দেশ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই সে নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। যে সব দেশ আগে মূলধন দেশবিদেশে লগ্নী করিয়া মহাজনের ব্যবসা করিত, তাহারাই এখন অন্য দেশ হইতে মূলধন ধার করিতেছে; যে সব দেশ আগে বরাবর বৈদেশিক মূলধন ধার করিয়া চালাইয়া আসিয়াছে, যুদ্ধের ফলে এখন তাহারাও অনেকে মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কণ্ট্রোল-কণ্টকিত; স্বাভাবিক পথে চলিতেছে না। জিনিসের অভাব, মূলধনের অভাব, উৎপাদন-ব্যবস্থার ত্রুটি—এ সমস্ত মিলিয়া আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য নানা গোলমালের মধ্যে পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চেহারা ও গতিও বদলাইয়া গিয়াছে। যেমন, পূর্বে আমাদের ব্যবসা ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি, এখন আর ততটা নাই। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে হইতেছে,—স্টার্লিং এলাকা, ডলার এলাকা ও আরও নানা রকম বাধানিষেধ না থাকিলে আরও হইত। এই সমস্ত অদল বদলের ফলাফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যত দিন যাইবে আরও বেশি ফলিবে। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রাস্ফীতি দেখা গেল, কিছুদিন তাই লইয়াই ভারত-সরকারকে শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। সেটা হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে শুরু হইল আর্থিক অনটন। ভারত-সরকারের বাজেটে নিদারুণ অর্থসংকট দেখা দিল—ফলে বিভিন্ন জায়গায় যে সব উন্নতিমূলক কাজের কথা ছিল তাহা কমাইতে হইল, প্রাদেশিক সরকারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ হইল। সেই ধাক্কা কাটিতে না কাটিতে আসিল ডি-ভ্যালুয়েশন। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়িয়া আমরা টাকার মূল্য কমাইতে বাধ্য হইলাম। তাহার ফলে লাগিল পাকিস্তানের সঙ্গে গণ্ডগোল,—বিশেষত পাটের ব্যাপার লইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। অন্য দিকে আমেরিকা ও ডলার এলাকার সহিত আমাদের কাজকর্ম আরও কমাইতে আমরা বাধ্য হইলাম। এই সব কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সব ধাক্কা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। যত দিন যাইবে ততই একটার পর একটা ধাক্কা নূতন করিয়া দেখা দিবে। ভারতবর্ষে মন্দার চিহ্ন খুব দৃঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা চলিতেছে না, ভারত-সরকার বাজারে যথেষ্ট ঋণ পাইতেছেন না, নূতন লগ্নী নাই। শিল্পপতিদের দোষেই হোক, আর যে কোনও কারণেই হোক এই ঘটনাগুলি ঘটিতেছে এবং যতক্ষণ এই সব ঘটনা ঘটিতে থাকিবে ততক্ষণ আর্থিক সংকট কমিবে না, বরং বাড়িবেই। ইহার উপর আন্তর্জাতিক গোলমাল তো আছেই। জগতের সমৃদ্ধি এখন বলিতে গেলে আমেরিকায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে,—এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এখন

ইংলণ্ডেরও আর নাই। আর সমৃদ্ধির এই রকম কেন্দ্রীভবনের বিপদই হইল এই যে, তাহাতে জগতে বাণিজ্য ও অর্থের লেনদেন চলিতে পারে না। তখন এক পক্ষে সবই পাওনা, অপর পক্ষে সবই দেনা। গত মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানিতে ছোট আকারে এই সমস্যাই দেখা দিয়াছিল। তখন জার্মানির ব্যবসা নাই, বাণিজ্য নাই, অথচ তাহাকে বহু টাকা খেসারত দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার কোনও সুরাহা হইল না। বিজেতারা শেষকালে জার্মানিকে রোজ রোজ নূতন নূতন ঋণ দিতে লাগিলেন, আবার সেই ঋণই খেসারতস্বরূপে আদায় করিতে লাগিলেন। দাবি মিটাইবার ব্যবস্থা দাবিদারদেরই করিতে হইল। এইজন্যই তখন বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ কেন্‌স্ বলিয়াছিলেন, এভাবে খেসারত আদায় অচল। এখন সেই অবস্থারই চেহারা বদল হইয়া আরও বৃহত্তর আকারে দেখা দিয়াছে। সেইজন্যই যদি জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ নৈতিক কারবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হয়, তাহা হইলে এ রকম একতরফা কারবার বেশি দিন চলিতে পারে না, চলিলে সঙ্কট অনিবার্য। যদিও মার্শাল-সাহায্য-পরিকল্পনা এবং আরও কিছু রকমফের করিয়া আমেরিকা কিছু কিছু সাহায্য দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তবু তাহা যথেষ্টও নহে এবং একেবারে গোড়ায় পৌঁছিতেছে না। অর্থাৎ সংকটের যে সমস্ত মূল কারণ আছে, তাহা দূর হইতেছে না।

সুতরাং আমাদের যখন বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে তখন মনে রাখিতে হইবে, আমরা যে শুধু খুব সংকট সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহাই নহে, এই সংকট দিনে দিনে আরও গভীর হইবে। তাহার অর্থ নৈতিক দিক্‌টা উপরে উল্লেখ করিলাম। এখন অন্যান্য দিকের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। রাজনৈতিক দিকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখিতেছি, এত বড় একটা মহাযুদ্ধের পর যে পরিপূর্ণ শান্তির আবহাওয়া থাকা উচিত ছিল তাহা নাই। এমন কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামার দূরাগত ধ্বনি শোনা যাইতেছে বলিলেও খুব অত্যুক্তি হইবে না। এক দিকে ইংলণ্ড ও

আমেরিকা, অন্য দিকে রুশিয়া—জগৎ মোটামুটি এই দুই দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আর শুধু ভাগ হইয়া যাওয়া নহে, এই দুই দলের মধ্যে বাহিরে যতই শান্তি প্রীতি থাক্, সত্যকারের যে মনের মিল আছে তাহা নহে। বরং বিপরীত। প্রত্যেক দলই আণবিক বোমা ও উদজান বোমা তৈয়ারির উৎসাহে মাতিয়া গিয়াছেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও যে কোনরূপ মিলমিশের লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা নহে। রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে দেখি, কি পশ্চিম জার্মানি, কি চীন, কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কম্যুনিস্ট পার্টিদের সাহায্য করিয়া সেখানে শুধু সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। সেখানে তাহার উদ্দেশ্য এমন কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সরকার সোভিয়েট রুশিয়ার মতে চলিবে। এইখানে একটি বড় কথা উঠিয়া পড়িবে। মার্ক্স বলিয়াছিলেন, সারা জগৎময় বিপ্লব হওয়ার প্রয়োজন আছে, তবে তাহার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। লেনিন বলিলেন, মার্ক্সের পর ধনতন্ত্রের আরও বিকাশ হইয়াছে, এখন সে তাহার শেষ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জাল এখন জগৎজোড়া। সুতরাং সেই জাল যে কোনও জায়গায় ছিঁড়িতে পারিলেই ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত হানা হইবে। স্টালিনের কথায়, The front of capital will be pierced where the chain of imperialism is weakest, for the proletarian revolution is the result of the breaking of the chain of world imperialist front at its weakest link ; and it may turn out that the country which has started the revolution, which has made a breach in the front of capital, is less developed in a capitalist sense than other, more developed, countries, which have, however, remained within the framework of capitalism.[১] এ কথা স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও স্বীকার

১ এই উদ্ধৃতিগুলি Stalin : *Leninism*, Moscow English Edition, 1943 হইতে গৃহীত।

করিতে হয় যে, একসঙ্গে সারা জগতে বিপ্লব না হইলে বিপ্লব হইবে না, এমন কিছু কথা নাই। আলাদা এক-একটি দেশে বিপ্লব হইতে পারে। স্টালিন সে কথাও বলিয়াছেন।[২] কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সারা জগতে এক সঙ্গে বিপ্লব না হইলেও একটা দেশে আলাদা বিপ্লব হইতে পারে মানিয়া লইলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে সব দেশে পূর্বেই বিপ্লব হইয়াছে, সে সব দেশের কর্তব্য কি? এ সম্বন্ধে স্টালিন বলিতেছেন, এক-আধটা দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে সাম্যবাদের চূড়ান্ত জয় হইবে না। সেজন্য অন্তত গোটা কয়েক দেশে বিপ্লব হওয়ার প্রয়োজন। আর সেইজন্য যে সব দেশে বিপ্লব হইয়াছে, তাহার কাজই হইবে অন্যান্য দেশে বিপ্লব ঘটাইতে সাহায্য করা। (For this the victory of the revolution in at least several countries is needed. Therefore, the development and support of revolution in other countries is an essential task of the victorious revolution. Therefore, the revolution in the victorious country must regard itself not as a self-sufficient entity but as an aid, as a means of hastening the victory of the proletariat in other countries.)

এসব কথার যুক্তি সহজেই বোঝা যায়। কার্যক্ষেত্রেও এই নীতির পরিচয় আমরা সর্বত্র পাইতেছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা খুব বড় প্রশ্নও আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধরা গেল, ইতিহাসের বিবর্তনে আমরা এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছি, যেখানে আমাদের দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটিল। আমাদের দেশের প্রয়োজনমত আমরা সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলাম। কিন্তু তাহার পর কি

২। ষ্টালিনের মত এই: Formerly, the victory of the revolution in one country was considered impossible, on the assumption that it would require the combined action of the proletariats of all or at least of a majorty of the advanced countries to achieve victory over the bourgeoisie. Now this point of view no longer accords with the facts.—*Leninism*, p. 27

হইবে ? আমরা না হয় সোভিয়েট-রুশিয়ার সহিত বন্ধুভাব রাখিলাম তাহাও বোঝা গেল। কিন্তু সোভিয়েট-পররাষ্ট্রনীতিতে তাহাই কি যথেষ্ট বিবেচিত হইবে ? বর্তমান জগতে যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় না সাধারণ বন্ধুভাব সোভিয়েট-দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট। তাহার দাবি আরও বেশি। তাহার দাবি হইল এই যে, শুধু সোভিয়েট-রুশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিলে যথেষ্ট হইবে না, কমিন্‌ফর্মের নির্দেশ সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া সেই অনুসারে চলিতে হইবে। কমিন্‌ফর্মের হুকুম তামিল না করিতে পারিলে দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবই হোক বা সোভিয়েট-রুশিয়ার সঙ্গে বন্ধুভাবই থাক্, সে সবই ভুয়া, তাহাতে কিছুই যায়-আসে না। যুগোস্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা খুব ভাল-ভাবে জানি না। সেখানে সাম্যবাদী সরকারের চেহারা কি রকম, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এ দেশে বেশি পৌঁছায় নাই। কিন্তু সেখানে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জগতে ইহা স্বীকৃত। তবু আজ তাহার সহিত সোভিয়েট-রুশিয়ার বিরোধের কারণ ইহাই যে, যুগোস্লাভিয়া নিজের দেশের প্রয়োজনে যে বিপ্লব করিয়াছে, নিজের দেশের অবস্থা অনুসারেই তাহার বিকাশ করিতে চায়, নিজেদের ইতিহাসের বিবর্তনে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিবার বদলে কমিন্‌ফর্মের হুকুমনামায় সে দাসখত লিখিয়া দিতে চায় না। যদি সে একা দাঁড়াইয়া নিজের দেশের প্রয়োজন অনুসারে স্বদেশে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সাম্যবাদের দিক দিয়া কোনও ক্ষতি হইল—এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্তমান জগতে এইভাবে একা দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব কি না! মানিয়া লইলাম এইভাবে একা দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব নয়, মানিয়া লইলাম তাহার জন্য সোভিয়েট-রুশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কি করিয়া বলিব যে, আমার দেশের আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি ব্যাপারেও আমার স্বাধীনতা থাকিবে না, সেখানেও কমিন্‌ফর্মের নির্দেশমত চলিতে হইবে। তাহা হইলে আমার দেশের স্বাধীনতা রহিল কোথায়, আর লণ্ডন ও মস্কোর পার্থক্যই বা রহিল কোথায় ?

এ প্রশ্ন খুব বড় প্রশ্ন, এ প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতেছি, কমিন্‌ফর্মের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবির নীতিই সোভিয়েট-রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি, এবং সেই লক্ষ্য মনে রাখিয়াই সর্বত্র তাহার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইতেছে। এই গেল এক দিক। অপর দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহাদের সুপরিচিত পদ্ধতিতে রুশিয়ার অগ্রগতি ঠেকাইবার প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করিয়াছে। ওদিকে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি, এদিকে পয়েণ্ট ফোর প্রোগ্রাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্রসম্ভার প্রেরণ, এই সমস্ত চেষ্টা খুব প্রবল আকারে শুরু হইয়া গিয়াছে। যত দিন যাইবে, এই দ্বন্দ্ব কমিবে না, বরং বড়িয়াই চলিবে—এ কথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

ইহা তো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা। আরও ঘরের কাছে আসিলে দেখা যাইবে, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে নানা কারণে পাকিস্তানের সহিত আমাদের সদ্ভাব হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ভারত বিভাগ হইলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যাইবে, নিজের নিজের রাষ্ট্র লইয়া উভয়েই সন্তুষ্ট থাকিবে, নিজের নিজের রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিবে, দেশের লোকের উন্নতির চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই আশা সফল হয় নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহা সফল না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল এবং থাকিবে। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমাদের বিব্রত হইতে হইয়াছে। এক দিকে কাশ্মীরের যুদ্ধ, অন্য দিকে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে দলে দলে বাস্তুহারার আগমন, পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুদের উপর অত্যাচার, তাহার ফলে এখানে উত্তেজনা ও অরাজকতা, পাকিস্তানের আলাদা মুদ্রামূল্যের ফলে সাধারণ লেনদেন ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ ইত্যাদি ঘটনা পর পর ঘটিয়াই চলিয়াছে। সমস্যা ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে এবং একটা কিছু সমাধান না হইলে গভীর সংকট দেখা দিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৪

সমস্যাটা তো বুঝিলাম। এখন প্রশ্ন হইতেছে: সমাধান কি? আমাদের এখন কর্তব্য কি?

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষত দেখিতেছি, সংকট যতই গভীর হইতেছে ততই স্থির লক্ষ্য, চিত্তের স্থৈর্য, সংকল্পের একাগ্রতা ও কর্মের উদ্যমের বদলে লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা, চিত্তের বিক্ষোভ ও অসংযম, সংকল্পের অস্থিরতা ও স্থির কর্মের অভাব দ্রুত বাড়িতেছে। ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। এই রকম সংকটে দিশাহারা হওয়া লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনা লোকের মনে চাঞ্চল্য জাগাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নহে। কিন্তু এই রকম বিক্ষোভ ইতিহাসের বর্তমান পটভূমিকায় যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যদি আমরা সাময়িক চাঞ্চল্যে অনবরতই এমন কিছু করিতে থাকি, যাহাতে আমরা সংকট-সমাধানের পথে না গিয়া বিপথে যাই, তাহা হইলে আপাতত আমাদের উত্তেজনার যতই কারণ থাক্ না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাতে আমরা সমাধানের দিকে অগ্রসর হইব না—ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করিবে না।

সুতরাং ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, অবস্থাটা কি দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে। প্রথমে অর্থনৈতিক দিকটার উল্লেখ করিয়াছি এবং বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, স্বাধীনতা লাভের সময়ই শুধু যে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে গভীর ফাটল ধরিয়াছিল তাহাই নহে, যত দিন যাইবে ততই সংকট আরও গভীর হইবে এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা আরও বাড়িবে। সেইজন্য আজ যখন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে, তখন কেবল যে সমস্যাটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে শুধু সেইটার কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না। ইতিহাসের বিবর্তনের মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লইয়া সেই অনুসারে আমাদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে

দুঃখের বিষয়, আমাদের এইরূপ দূরদৃষ্টি লইয়া কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। বরং দেখিতেছি, যখন যে সমস্যাটি আসিয়া পড়িতেছে, সাময়িকভাবে সেইটিকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়া তাহার সমাধানেরই চেষ্টা হইতেছে। সে চেষ্টা হোক, কোনও আপত্তি নাই,

বরঞ্চ সে চেষ্টা প্রাণপণেই করিতে হইবে। কিন্তু সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিতে হইবে, বর্তমান সমস্যার পিছনে পিছনে ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যা আসিতেছে কি না। যদি আসে, তাহা হইলে বর্তমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভবিষ্যৎ সমস্যার উদ্ভব না হয়, বা উদ্ভব হইলেও আমরা তাহার জন্য তৈয়ারি থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থাও করা দরকার।

উদাহরণস্বরূপ এ কয় বছরের মোটামুটি কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের সময় অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রসারের জের মিটিয়া যায় নাই। তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক টাকা, তখনও আমরা অনেক স্টার্লিং পাইবার অধিকারী, তখনও খাদ্য আমদানির পরিমাণ এত বাড়ে নাই, আমাদের আন্তর্জাতিক লেন-দেনে আমাদের কিছু নীট উদ্বৃত্ত থাকিতেছে। এই অবস্থায় আমরা বড় বড় পরিকল্পনা আরম্ভ করিব, ইহা স্বাভাবিক। বাস্তবিকপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারও এই সময় অনেকগুলি নদী-সেতুবন্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, প্রাদেশিক সরকারদের নানা নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বলিলেন, জাহাজ-কারখানা, নূতন নূতন শিল্প স্থাপন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। শুধু কথাবার্তা নয়, নানা বিষয়ে কাজও আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, দেশের চেহারা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দারুণ রকম বদল। দেশে আর্থিক মন্দা শুরু হইল, কেন্দ্রীয় সরকারের নিদারুণ অর্থাভাব আরম্ভ হইল। আমাদের যে স্টার্লিং পাওনা ছিল, মনে করিয়াছিলাম যাহা হইতে আমাদের শিল্পের উন্নতি করিব, ক্যাপিটাল গুড্‌স আনিতে পারিব,—অবস্থার চাপে তাহা আমাদের বিশেষ কোনই কাজে লাগিল না।[১]

১। আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কতকগুলি হিসাব হইতে বোঝা যাইবে। আন্তর্জাতিক **আর্থিক** লেন-দেনে (International Balance of Payment) ১৯৩৮-৩৯ সালে আমরা পাইয়াছি ২২১ কোটি টাকা, দিয়াছি ২৩৭ কোটি—অর্থাৎ আমরা নীট দিয়াছি ১৬ কোটি টাকা। ১৯৪৬ সালে আমরা পাইয়াছি ৪৬৫ কোটি টাকা, দিয়াছি ৪৯৮ কোটি টাকা—অর্থাৎ আমরা নীট দিয়াছি ৩৩ কোটি টাকা।

সেই সঙ্গে দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। কিছুদিন আমরা সেই সমস্যা লইয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু তাহার জন্য আমরা সাময়িকভাবে যতই চেষ্টা করি না কেন, যে সমস্ত মৌলিক কারণে এই সমস্ত গোলমাল হয়, সে সব মৌলিক কারণ প্রায় সবই রহিয়া গেল।

আবার সেই পালা কাটিতে না কাটিতে দেখা দিল কেন্দ্রীয় বাজেটের বিপুল ঘাটতির আশঙ্কা। যেখানে ৪৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে আশঙ্কা হইল কম-বেশি ৪০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। ফলে শুরু হইল সব দিকে সংকোচন, এক কথায় আশি কোটি টাকার সংকোচন করা হইল। কত পরিকল্পনা কাটা গেল, কত পরিকল্পনা পিছাইয়া গেল, কত পরিকল্পনায় অর্থব্যয় হইলেও তাহা বন্ধ রাখিতে হইল, অথবা আংশিক পরিত্যাগ করিতে হইল। অথচ শেষকালে দেখা গেল ঘাটতির বদলে কিছু বাড়তিই হইল,—এমন কি শিল্প ও নানা বিষয়ে ট্যাক্স রেহাই দিয়াও বাড়তি হইল। এক দিকে কাটা পড়িল নানা উন্নয়ন-পরিকল্পনা, সেই দিকে যে টাকা বাঁচিল তাহারই জোরে আয়কর প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে করভার লাঘব করা হইল (যদিও ইহাতেও শিল্পের প্রসার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। শিল্পপতিরা তো এততেও নারাজ।), তবুও কিছু বাড়তিই রহিয়া গেল। মাঝে হইতে বহু উলটপালট হইয়া গেল। সেই সঙ্গে আমাদের উপর আন্তর্জাতিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের হাঙ্গামা আসিয়া পড়িল, তাহার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল, পাট আসা বন্ধ হইল, কয়লা যাওয়া বন্ধ হইল, এখানকার লোক ওখানে নিজের পরিবারের কাছে টাকাকড়ি জিনিস-পত্র পাঠাইতে পারে না—অন্য দিকে আমেরিকা ও ডলার এলাকা হইতে জিনিসপত্র আনা কঠিনতর হইল, স্টার্লিং এলাকার উপর নির্ভরতা আরও বাড়িল, যদিচ স্টার্লিং এলাকা হইতে আমরা প্রয়োজন-মত জিনিস সকল রকম পাই না, ঠিক সময়মতও পাই না এবং

১৯৪৭ সালে আমরা পাইয়াছি ৫৩৭ কোটি, দিয়াছি ৬৭৪ কোটি—অর্থাৎ নীট দিয়াছি ১৩৭ কোটি। ইহার পরের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহা আরও বাড়িয়াছে এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

আমাদের স্টার্লিং পাওনাও খুব যথেষ্ট পরিমাণে নাই এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিলে আমাদের ঋণও বাড়িয়া যাইতেছে।

সুতরাং এই রকম ভাবে সকল সমস্যার সাময়িক ঠেকা দিয়া গেলে চলিবে না। এমনভাবে আমাদের নীতি ঠিক করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে সমস্যার উদ্ভব না হয়, হইলেও আমরা তাহার তীব্রতা আগে হইতেই কমাইয়া দিতে পারি। এই নীতি ঠিক কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে বহু অর্থনৈতিক তথ্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইবে—যাহা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মাত্র দুই-একটা কথা বলিব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম মৌলিক ও অবিস্মরণীয় নীতি হইবে, সাময়িক যতই সমস্যা আসুক না কেন, কাশ্মীরের জন্য বা বাস্তুহারাদের জন্য যতই অর্থব্যয় করিতে হোক না কেন, তাহার উপরেও এমন কতকগুলি বিষয়ে খরচ করিতেই হইবে, যাহাতে আজ হোক, কাল হোক, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আবার নূতন আকারে নূতন ভাবে রচনা শুরু হইতে পারে। রাতারাতি দেশের চেহারা বদল হইয়া যাইবে—এ কথা কেহই আশা করে না। এতদিনকার শোষণ ও অবহেলার ফলে যে চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকার একদিনেই হয় না। কিন্তু তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে, ধাপে ধাপে তাহার কাজ শুরু হইয়াছে—ইহা না হইলে আমরা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তো করিতে পারিবই না, অন্য কিছুও করিতে পারিব না। ইহা অত্যুক্তি নহে। দেশময় যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই আশা যদি সম্পূর্ণ ভাঙিয়া যায়, হতাশ্বাস ও বিক্ষোভ যদি কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা যদি চরম অবস্থায় পৌঁছায়, তাহার ফলে দেশময় যদি বিক্ষোভ ও অরাজকতা আরম্ভ না-ও হয়, তাহা হইলেও দেশের জনসাধারণের যে সাগ্রহ-সহযোগিতা ও উদ্যম ছাড়া কোনও শাসন-ব্যবস্থার চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফল হইতে পারে না, সেই সাগ্রহ-সহযোগিতা ও উদ্যমের কোনও চিহ্ন দেখা যাইবে না।

এই হইল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইল, দেশের যে কোনও

রকম উন্নতি করিতে হইলে টাকার দরকার। সমস্যা যে রকম বিরাট, তাহার সমাধানের প্রয়োজন যেরূপ তীব্র, তাহাতে টাকা যে পরিমাণে দরকার, আমাদের টাকা তাহার তুলনায় অনেক কম। এমন কি, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেই বা কি টাকা আছে? ১৯৫০—৫১ সালের বাজেটের কথাই ধরা যাক। ৩৩৭ কোটি টাকা মোট খরচের মধ্যে ১৭০ কোটি তো গেল দেশরক্ষা খাতে। তবুও তো যে রকম দ্রুতগতিতে আমাদের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রসার হওয়া উচিত ছিল তাহার কিছুই হয় নাই। রিলিফ এবং আরও কয়েকটি খাতে গেল ৩০ কোটি টাকা; দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে দিতে হইল ২৬ কোটি টাকা। এইভাবে দিতে দিতে দেশের গঠনমূলক বিভাগগুলির জন্য রহিল মাত্র ২৮ কোটি টাকা। ইহাতে আমাদের সমস্যার কতটুকু সমাধান হইবে? দেশময় শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার এক-একটাও ভাল করিয়া করিতে গেলেই তো বহু কোটি টাকার দরকার। এই টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

বাস্তবিকপক্ষে শোষিত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির সমস্যাই এই। তাহাদের দরকার যত বেশি, সম্বল তত কম। সেইজন্য এই সকল দেশের উন্নতি এই বিষচক্রে পড়িয়া অবিরত ব্যাহত হইতে থাকে।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের দুইটি মাত্র পথ আছে। যখন দেশের সম্বল হইতে এই সমস্ত সমাধান করিয়া উঠিতে পারা যায় না, তখন বিদেশ হইতে মূলধন আমদানি করিয়া তাহার সমাধানের একটি পথ আছে। জগতে এই সমাধান অবলম্বিত হইতে বহু জায়গায় দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে, বৈদেশিক মূলধন আমদানির মূল্য শুধু যে আর্থিক শোষণেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে তাহা নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়েও তাহার মূল্য দিতে হইয়াছে। লেনিনের কথাই তো ছিল, ধনতন্ত্রের শেষ পর্যায়ই হইল সাম্রাজ্যবাদ। ভারতবর্ষে বৈদেশিক মূলধনের সে চেহারা আমরা দেখিয়াছি, তাহার পীড়ন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি—কাজেই বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে আমাদের

একটা নিদারুণ ভীতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভীতি থাক্ বা নাই থাক্, আজ কাজের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, বৈদেশিক মূলধনকে যথেষ্ট আমন্ত্রণ জানাইলেও যে কোন কারণেই হোক বৈদেশিক মূলধন এ দেশে নূতন করিয়া বিশেষ আসিতেছে না, যাহা আসিয়াছে তাহা নাম মাত্র।

সেইজন্য প্রথমে ঠিক করা প্রয়োজন, আমরা বৈদেশিক মূলধন কতটা আনিব, কতদূর অবধি মূল্য দিতে রাজী হইব, সেই মূল্যে আমরা প্রয়োজনমত মূলধন পাইব কি না! যদি দেখা যায় যে, আমাদের রাজনৈতিক কোনও ভয় নাই, মূল্য আমাদের বেশি দিতে হইতেছে না এবং তাহাতেই আমরা যথেষ্ট মূলধন বিদেশ হইতে পাইতেছি, ভাল কথা। তাহা হইলে আমাদের সমস্যা তো সহজেই মিটিয়া গেল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার লক্ষণ দেখিতেছি না। সুতরাং অন্য দিকে আমাদের মূলধন সন্ধান করিতে হইবে। তাহা হইল দেশের মধ্য হইতেই মূলধন সংগ্রহ করা। ইহাই দ্বিতীয় পথ।

আমরা এ পর্যন্ত বড় শিল্পপতিদের দুয়ারেই এই মূলধন সন্ধান করিয়াছি। প্রথমে আমরা শিল্পপতিদের উপর কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছিলাম, শিল্প জাতীয়-করণের কথা ভাবিতেছিলাম, আয়কর ইত্যাদি কড়া করিয়াছিলাম, আয়কর-তদন্ত-কমিশন বসাইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের অর্থাভাব যত তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল, আমরা ততই সেইসব কড়াকড়ি হ্রাস করিতে শুরু করিলাম। সরকার শিল্প-জাতীয়করণ সম্বন্ধে যে নীতি ঘোষণা করিলেন, তাহাতে শিল্পপতিদের অনেকটা ক্ষেত্র ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের আরও নানারকম আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। এদিকে আয়কর ইত্যাদি ব্যাপারেও আমরা অনেক নরম হইয়াছি। এখনও বাজারে সুদের হার Cheap money policy হিসাবে আমরা বাড়াই নাই সত্য, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং যখন দেখা যাইবে যে দুই টাকা আড়াই টাকা সুদের ঋণপত্র ছাড়িয়া সরকার ঋণ পাইতেছেন না, তখন হয়তো চড়া সুদ দিয়া ঋণপত্র ছাড়িতেও সরকার বাধ্য হইবেন। অবশ্য সে এখনও ভবিষ্যতের

কথা। কিন্তু দেখিতেছি, এ পর্যন্ত আমরা যতটা নরম হইয়াছি তাহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় নাই, বরং শিল্পপতিদের দাবি দিন দিন আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশেষত এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে শিল্পপতিদের নানারকম সুবিধা ও উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও ভারত-বণিক-সভার সভাপতি বাজেটের অব্যবহিত পরেই বণিক-সভায় যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আরও নানা দাবি জানাইয়াছেন, বর্তমান ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? বিদেশী ও স্বদেশী মূলধনিকদের নিকট মাথা ঠুকিলাম, কপাল ফাটিল, কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। আমরা তর্জন-গর্জন অনুনয়-বিনয় করিলাম, ফল হইল না। এখনও কি আমরা নরম-গরমের পালাগান গাহিয়া যাইব? অন্য সময় হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে সুস্থে এই পালা চলিলে কোনও আপত্তি হয়তো হইত না। কিন্তু আমরা যে সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহাতে আমাদের হাতে বেশি সময় তো নাই। দেশ বুকজোড়া তৃষ্ণায় শুকাইয়া কাঠ হইয়া আছে, মাটি চিড় খাইয়া ফাটিয়া হা-হা করিতেছে, বেশিদিন তাহাতে জল না দিলে যে রুক্ষ ভূমির উদ্ভব হইবে সেই মরুভূমির তপ্ত ঝড়ে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে। সুতরাং ধীরে সুস্থে বেশিদিন ধরিয়া এই এক্স্‌পেরিমেণ্ট করিবার উপায় তো আমাদের নাই।

এ অবস্থায় আর একটিমাত্র পথ খোলা আছে। জগতের ইতিহাসে সে পথ রুশিয়া খুলিয়া দিয়াছে। বিপ্লবের পর রুশিয়ার অবস্থা ছিল কঠিন—এক দিকে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ তাহাকে রোধ করিতে হইয়াছে, অন্য দিকে নিজের দেশের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে সে মূলধন পায় নাই, বৈদেশিক মূলধন সে চায়ও নাই। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণতাই রুশিয়ার নীতি। নিজেদেরই চেষ্টায় তখন তাহারা যুদ্ধোদ্যম চালাইয়াছে, নূতন শিল্প গড়িয়াছে, দেশের উন্নতি করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে তো দেখা গিয়াছিল যে, জার্মানির বিরুদ্ধে এক দিকে ইংলণ্ড-আমেরিকার মত বড় বড় মূলধন-ওয়ালা দেশ যতখানি করিয়াছিল, অন্য দিকে রুশিয়া একা তাহার চেয়ে

কিছু কম করে নাই। তাহার জন্য শিল্প অর্থ যা কিছু প্রয়োজন প্রায় সবটাই সে একার চেষ্টাতেই করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল বাহিরের সাহায্যে নয়, নিজেরই চেষ্টায়, কারণ বিপ্লবের পর হইতে তাহার যাহা কিছু পুনর্গঠন তাহা বাহিরের সাহায্যে হয় নাই, প্রায় সবটাই নিজের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

যাঁহারা রুশিয়ার ইতিহাস পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, ইহার জন্য রুশিয়াকে কম কষ্ট করিতে হয় নাই। দেশে বড় বড় ধনিক কেহ ছিল না, সেইজন্য মূলধন যা কিছু দরকার হইয়াছে তাহা জনসাধারণের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। একসঙ্গে বেশি মূলধন এভাবে যোগাড় করা দরিদ্র দেশের পক্ষে কঠিন, capital goods উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে গেলে consumer goods তৈরির ব্যবস্থা কুলায় না, consumer goods-এর ব্যবস্থা করিতে গেলে capital goods-এর ব্যবস্থায় টান পড়িয়া যায়। একসঙ্গে সবদিক হইয়া উঠে না। এই অবস্থায় রুশিয়া প্রথমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ঠিক করিয়াছে,জাতীয় উন্নতির জন্য কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে আরম্ভ করা হইবে। সেই পর্যায়ক্রম ঠিক করিয়া লইয়া সে অগ্রসর হইয়াছে, প্রত্যেকটি লোক তাহার বোঝার অংশগ্রহণ করিয়াছে, অন্য দিকে সে মাথা ঘামায় নাই। সে সময় নানা বিদেশী লেখক করুণার সুরে বলিয়াছেন, আহা, রুশিয়ার কি কষ্ট! এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে মাসে একখানা সাবানও পাওয়া যায় না! রুশিয়ার জবাব হইল, আমাদের পরিকল্পনায় সাবান তৈরি যদি প্রথম স্থান না পাইয়া থাকে, চুলায় যাউক সাবান, আমরা সাবান ব্যবহার করিব না, কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবিচলিত চিত্তে করিয়া যাইব। প্রচলিত ভঙ্গীর মূলধন রুশিয়াতে নাই, কিন্তু এই সমস্ত উন্নতির জন্য যে কিছু সম্বল দরকার তাহা তিলে তিলে জনসাধারণের নিকট হইতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। জনসাধারণ তাহাতে বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হয় নাই, কেন সাবান পাইলাম না—বলিয়া হৈ-চৈ করে নাই, দৃঢ়চিত্তে কাজ করিয়া গিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে যদি আমরা বিদেশী মূলধন না পাই, বা যে

কোন কারণেই হোক বিদেশী মূলধন আনা সম্ভব না হয়, আর দেশেও যদি বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে। আমাদের স্বদেশ হইতেই যেমন করিয়া হোক মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার জন্য শিল্পপতিদের নিকট আর অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, তাঁহাদের স্পষ্ট জানাইয়া দিতে হইবে যে, তাঁহাদের অর্থ আইনত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও আসলে তাহা জাতিরই জিনিস। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহাদের শতকরা ছয় টাকা সুদের জায়গায় তিন টাকা সুদ হইবে বলিয়া তাঁহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন তাহা চলিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থা করিতে হইবে—দেখিতে হইবে যে, জাতির অর্থের এতটুকুও অকাজে পড়িয়া না থাকে। যাঁহারা স্বেচ্ছায় সে কাজে যোগ দিবেন না, তাঁহাদের অনিচ্ছাতেই সে কাজ করাইয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে বাধা আসিবে, আপত্তি আসিবে, নানারকম গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা হইবে; কিন্তু তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে না, বিচলিত হইলে কাজ হইবে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের নেতাদের মন স্থির করিয়া ফেলিবার সময় আসিয়াছে।

সেই সঙ্গে অন্য দিকে দেশের জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলিতে হইবে, এই হইল আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ইহার জন্য এতটা অর্থের দরকার। প্রত্যেকটি দেশবাসীকে যদি আমরা সেই পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত দেশের লোকের নিকট হইতে আমরা তিল তিল সম্বল আহরণ করিয়াই আমাদের সমস্যা মিটাইতে পারিব। কেহ অর্থ দিবেন, কেহ কায়িক পরিশ্রম করিবেন, সমস্ত দেশময় কাজের সাড়া পড়িয়া যাইবে।

ইহা অবশ্য শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। সারা দেশকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে দেশের লোকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঠিকমত আঘাত করিতে হইবে, লোকের মনে এমন উৎসাহ এমন উদ্যম জাগাইতে হইবে যে, সমস্ত জাতি একটা বিরাট সেনাবাহিনীর মত কাজ করিয়া

যাইবে। এই অবস্থার সৃষ্টি করার দায়িত্ব রাজনৈতিক, কিন্তু তাহা না হইলে অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিবে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

"দায়ভাগী"

মূল্য

ঘটনা খুলনার।

তবে অন্য কোথায়ও যে ঘটিতে পারিত না, এমন নহে।

২

বছর খানেক ধরিয়া ভোগাইতেছে। কি মতলবাজ লোকটা!

গালাগালি দিলে গায়ে মাখে না। অনুনয়-বিনয় ব্যবসায়ী হাসিতে উড়াইয়া দেয়। অথচ নড়িবার নাম নাই।

বলে, উঠিয়া যাইব না—এ কথা কি কোন দিন বলিয়াছি? বাড়ি পাইলেই যাইব। ভাড়া বাড়িতে কি আর কেহ চিরদিন থাকে?

এই ভাবে এক বছর কাটাইয়াছে।

কোর্টও করিয়াছেন ভবানন্দবাবু। সেখানেও লোকটি ওই একই কথা বলে।

উঠিব না—এ কথা তো কোন দিনই বলি নাই ধর্মাবতার। উঠিব, তবে সময় চাই।

৩

কিন্তু আর কত সময় দিবেন ভবানন্দবাবু?

দিনে দিনে জায়গার দাম বাড়িতেছে কত! কলিকাতার রাজপথে রক্ত ঝরিতেছে। দিল্লী-সিমলায় ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছে। হোয়াইট হাউসে মন্ত্রগুপ্তি চলিতেছে। ভারত-ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদ রচিত হইবে। দেখিতে দেখিতে কি ভয়ানক গুরুত্ব বাড়িয়া যাইতেছে জায়গাটার! গুরুত্ব অর্থাৎ মূল্য।

হতভাগা লোকটি কি তাহা বুঝিবে?

কাল কাঁচা ভাগের রায় বাহির হইয়াছে।

পার্শ্বের রাহুগ্রস্ত দেশ হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতেছে। স্টীমারঘাটে গিয়া ভবানন্দবাবুর মাথায় খুন চড়িয়া গিয়াছে।

যে করিয়াই হোক লোকটাকে ভাগাইতে হইবে।

মাত্র দুইখানি টিনের ঘর অতখানি জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। সোনার জায়গা। ঘরগুলি ভাঙিয়া পাঁচ হাত বাই তিন হাত খুপরির দুই সারি চালা তুলিতে পারিলে আর তাঁহাকে পায় কে? এক এক খুপরি নিদেন পঞ্চাশ টাকা। পঞ্চাশ ইনটু দশ পাঁচ শো।

উঃ! প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ভবানন্দবাবু।

এই বিরাট প্রাপ্তিযোগ বানচাল করিয়া দিতে যেন কোমর বাঁধিয়াছে লোকটি।

আমার ধনস্থানে শনিগ্রহ। উহাকে সরাইতে না পারিলে প্রস্তররুদ্ধ ভাগ্যগঙ্গোত্রীর উৎসমুখ খুলিবে না। কঠিন ক্রোধে আপন মনে গরগর করিতে লাগিলেন ভবানন্দবাবু।

মোটা চাঁদা দিয়া পাড়ার ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেদের লেলাইয়া দিলেন। আইনের পথে কিছু হইবে না, এতদিনের অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিয়াছেন।

নিত্য হাই ভোল্‌টেজের খিস্তি সহ কলহ বাধিতে লাগিল লোকটির সহিত অ্যামেচার অভিনেতাবর্গের। ছুতায়-নাতায়, অকারণ।

ঝগড়া করিতে নামিয়াও কিন্তু লোকটা মাথা খারাপ করে না। অদ্ভুত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। সাংখ্যের নির্বিকার পুরুষ যেন।

বলে, কেন মিছামিছি ঝামেলা করিতেছেন? দুদিন সবুর করুন না।

ছেলেরা সে প্রশান্ত নির্বিকারতা দেখিয়া কূটকৌশল সন্দেহে উত্তেজিত হইয়া উঠে, মহা খলিফা লোক তো! দেড় বছর ভদ্রলোককে নাকাল করিয়া এখনও গ্যাঁট হইয়া বসিয়া আছে!

কে খলিফা?

ছেলেরা ফুঁসিয়া উঠে।—আপনি, আবার কে? ঘরের অভাবে নিরীহ লোকটি কি সাংঘাতিক কষ্ট পাইতেছে, আর আপনি দিব্যি চুপচাপ বসিয়া আছেন!

লোকটি হাসে।

কিন্তু মুখে এক কথা।—যাইব, নিশ্চয়ই যাইব।

ভবানন্দবাবুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে। ছাপ্পর ফুঁড়িয়া মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা দিবার জন্ম তো হাত তুলিয়াইছিলেন ভগবান। লোকটি তাঁহার সে উদ্যত হস্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ও আর গিয়াছে! রাহুগ্রস্ত দেশ হইতে এই নির্বাসীদের অনুপ্রবেশ শুরু হইল। শহরে লোক গিজগিজ করিতেছে। রোগে মারীতে আর কয়েকদিন পর শহর জরজর হইবে। তখন চুটাইয়া ব্যবসা করিবেন। এমন মওকা কেহ ছাড়ে?

লোকটি হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ।

৪

আর সকলের মত ভবানন্দবাবুর মুখেও বিষাদের কালো ছায়া। লোকটা জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিতেছে। নিঃসন্দেহে চলিয়া যাইবে। ভবানন্দবাবু লক্ষ্য করিলেন, লোকটির মুখে বিদায়ের পূর্বকালীন কোন বিষণ্ণ ভাব নাই। সে হি-হি করিয়া হাসিতেছে। দাঁত বাহির করিয়া, প্রাণ ভরিয়া।

জিনিসপত্র ছ্যাকরা গাড়িতে চাপাইয়া আসিয়া বলিল, আমি চলিলাম। দেখুন, কথা রাখিয়াছি কি না!

বলিয়া পূর্ববৎ হাসিতে লাগিল। কাল হইতে সে এমনই বেদম হাসিতেছে। সারা শহরে সেই একমাত্র হাস্যমুখর হিন্দু।

ভবানন্দবাবুর সমস্ত অন্তরাত্মা বলিতে চাহিতেছে, থাকিয়া যাও। ওই সর্বব্যাপী পলায়নপর জনতায় মিশিও না। ভাড়া চাই না। এমনিই থাকিও। তবু তো বাড়ির পাশে একজন আত্মজন রহিবে।

কাল র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড বাহির হইয়াছে। পাকা ভাগের রায়।

অ. কু. রা

রসনা যার বশ না মানে,
তাহার বিপদ সবাই জানে।

*

মস্করা ক'রে বশ করা যত যায়
কিছুতে তেমন হয় না এ দুনিয়ায়।

*

বনিতা যাহার কবিতা লিখিতে পারে,
এক খোদা ছাড়া কে বল রাখিবে তারে?

গান্ধী ও শেলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

তাঁদের বিশ্বমৈত্রীবোধ প্রাণীজগৎকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। তাঁদের মতে সবাই আপন, "কেহ নহে নহে দূর"। কবি বলেছেন—

> "‥ no bright bird, insect, or gentle beast
> I consciously have injured, but still loved
> And cherished these my kindred."

> "ক্ষুদ্র কীট, নম্র জীব, চঞ্চল বিহগ
> কারে কভু করি নি হনন।
> মানি সবে পরম আপন
> মিত্রজ্ঞানে বাসিয়াছি ভাল।"

ভক্ত গান্ধীর মতে—ঈশ্বর বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি বলেন, "আমি কেবলমাত্র বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যেই একভ্রাতৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাই না, উপরন্তু সকল জীবের সঙ্গে, এমন কি মৃত্তিকাশ্রয়ী কীটের সঙ্গেও, এক হয়ে মিশে যেতে চাই।"

"I want to realise brotherhood or identity not merely with the beings called human, but I want to realise identity with all life, even with such things as crawl upon the earth."

গান্ধী ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রচলন করবার জন্য এবং ভারতবাসীকে স্বরাট দেখার জন্য বহু আন্দোলন ক'রে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এই স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং মানব-গোষ্ঠীবাদ পরস্পরবিরোধী মনে হয়। দেশবাসীকে স্বদেশীভাবাপন্ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেশমাতাকে দেবী বানিয়ে তার বেদীমূলে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবার বা তার মহিমা বৃদ্ধি করার জন্য অপর দেশের ধ্বংস কামনা করার শিক্ষা দেন নি। দেশভক্তির নামে যে বর্বর নিষ্ঠুরতার প্রকাশ দেখা যায়, তা বর্জন করতে বলেছিলেন, কারণ—"আমার কাছে স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বমানবপ্রীতি এক। এর মধ্যে বর্জন-নীতির স্থান নেই। আমি ভারতকে রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ড বা জার্মানির ক্ষতি করব না। আমার পরিকল্পিত জগতে সাম্রাজ্যবাদের ঠাই নেই।"

"For me patriotism is the same as humanity. It is not exclusive. I will not hurt England or Germany to save India. Imperialism has no place in my scheme of life."

তাঁরা দুজনেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন। গান্ধী ব্রিটিশের দাস ছিলেন, সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। শেলী স্বাধীন দেশের মানুষ, তবু তাঁর অবমানিতের প্রতি সমবেদনা এত প্রবল ছিল যে, তিনিও এর বিপক্ষে রায় দিয়ে গেছেন। নেপোলিয়নের পররাজ্য গ্রাস করার দৃষ্টান্তে মর্মাহত হয়েছিলেন। ফরাসী দেশের আন্দোলন একদা তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। সেই ফরাসী দেশের রাজার স্বৈরাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,

"I hated thee, fallen tyrant !
...thou shouldst dance and revel on the grave
Of liberty. Thou mightst have built thy throne
Where it had stood even now : thou didst prefer
A frail and bloody pomp, which time has swept
In fragments towards oblivion."

"হৃতগর্ব স্বৈরাচারী ! তোমারে করেছি ঘৃণা।
স্বাধীনতা-প্রাণ হরণ করেছ তুমি।
তাহার সমাধি 'পরে
লাস্য-লীলাভরে
মদগর্বে চ'লে গেছ।
সিংহাসন রচিবার ছিল ভিন্ন পথ—
তুচ্ছ করি তারে
রক্তমাখা বিলাসসম্ভারে
করিলে বরণ।
কাল তারে করিল হরণ
নিজ রথচক্রভারে
চূর্ণ করি ফেলি দিল বিস্মরণ-পারে।"

মুসোলিনির আবিসানিয়া-গ্রাস, হিটলারের ইহুদীদলন এবং চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতিকে অধিকার ক'রে ইউরোপের ছত্রপতি

হবার আকাঙ্ক্ষা তথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা করা দেখে গা অনুরূপ বিরাগ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন: "হিটলারবাদ হচ্ছে সেই নির্লজ্জ নির্মম শক্তি যা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জাতির স্বাধীনতা হরণ করেছে" এবং "এমন এক যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছে, যা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে।" তিনি প্রশ্ন করেছেন, "এ বিজয়সাফল্য নিয়ে হিটলার কি করবে? সে কি এত শক্তি আত্মসাৎ করতে পারবে? ব্যক্তিগতভাবে তার পূর্বপুরুষ আলেকজান্দারের মতই সে রিক্তভাবে শূন্যহাতে লয় পেয়ে যাবে।"

"Hitlerism means naked ruthless force that has robbed smaller nations of their liberty" and led to "a war that reduced humanity to the savage state." He asked: "What will Hitler do with his victory? Can he digest so much power? Personally, he will go empty handed as his predecessor Alexander."

কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ কেন, নিজরাজ্যবাদ অর্থাৎ স্বাধীন দেশের স্বরাট সরকারও যদি স্বৈরাচারী হয়, তার শাসনপদ্ধতি যদি ব্যক্তির বিকাশের অন্তরায় হয় তো তার উচ্ছেদও কামনা করতেন। বিধিনিষেধের 'পরে ভিত্তি ক'রে যে শক্তি কার্যকরী হয়, তার সঙ্গে মানুষের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ থাকে না। তাঁরা মানুষের সদাগ্রহ, ঐক্যবোধ, শুভচেষ্টার 'পরে বেশি জোর দিতেন। দণ্ডের নজির দেখিয়ে বাইরে-থেকে-চাপানো কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র থেকে কল্যাণ হয় না—এ উপলব্ধি তাঁদের ছিল। শেলী সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। গান্ধীও আংশিকভাবে তার সমর্থক। গান্ধীর মতে রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক কর্তৃত্ব মানুষকে যন্ত্রবৎ চালিত করে, ফলে তার ব্যক্তিত্ব আহত হয়। "রাষ্ট্র অর্থে—সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত হিংসা বোঝায়," অতএব রাষ্ট্রবিহীন সমাজই আদর্শ সমাজ। জ্ঞান ও পরহিত-কামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্যবাদ গান্ধীর কাম্য; কারণ, "সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের শাসনকর্তা। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজেকে চালিত করে যে, কেউ কখনও তার প্রতিবেশীর কোনও বাধার কারণ হয় না। অতএব আদর্শ-জগতে কোন রাজনৈতিক শক্তি থাকবে না, কারণ রাষ্ট্র থাকবে না।"

"...in such a state (enlightened anarchy) everyone is his own ruler. He rules himself in such a manner that he is never a hindrance to his neighbour. In the ideal state, therefore, there is no political power because there is no state.

"State represents violence in a concentrated and organised form."

স্বাতন্ত্র্যবাদী শেলী বহুকাল পূর্বেই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এ পরিকল্পনার রূপ দিয়েছেন।—

"Power, like a desolating pestilence,
Pollutes whatever it touches ; and obedience
Bane of all genius, virtue, freedom, truth,
Makes slaves of men, and of the human frame
A mechanised automaton."

"মত্তশক্তি যারে স্পর্শ করে
তারে দুষ্ট করে
প্রাণঘাতী মারীসম ;
বশ্যতার নাগপাশ
মানুষেরে করে দাস
নাশিয়া স্বাতন্ত্র্য, সত্য
সর্বগুণ, সর্বতত্ত্ব
চালনা করিতে থাকে
যন্ত্রপুত্তলিকাপ্রায়।"

তিনি যে সেই ভাবীযুগের ভাবীকালের স্বপ্ন দেখেছেন, যখন,

"The loathsome mask has fallen, the man remains
Sceptreles , free, uncircumscribed, but man
Equa , unclassed, tribeless, and nationless
Exempt from awe, worship, degree, the king
Over himself ; just, gentle, wise ; but man."

"ঘৃণ্যতম আবরণ গিয়াছে খসিয়া।
সেথা রয়েছে বসিয়া
শাসন-শোষণমুক্ত, স্বাধীন, স্বরাট
সবল মানুষ ;
নামহীন, গোষ্ঠীহীন, জাতিহীন
সাম্যসন্ধী পরমপুরুষ।

পদগর্ব, মৃত্যুভয়, অন্ধপূজা
করিয়া বর্জন,
করেছে অর্জন
আপন প্রভুত্বশক্তি ;
ন্যায়ধর্মী, শান্ত, জ্ঞানী—
সহজ মানুষ।"

মানুষের ত্রুটিগুলি তাঁরা স্পষ্টভাবে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, কিন্তু এই তুচ্ছতার ধূলিজাল থেকে তার মুক্তি নেই—এমন কথা বলেন নি। মানুষ সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক বা হতাশাজনক মন্তব্য করেন নি। তাঁরা জানতেন, পাপকে বর্জন করতে হয়, পাপীকে নয়। মানুষ বার বার ভুল করবে এবং বার বার বিচ্যুতি থেকে উর্ধ্বে ওঠার নিয়ত প্রয়াস করবে—এ তাঁদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল।

"......the eternal world
Contains at once the evil and the cure."

"চিরদিন আতুর এ ধরা ;
তবু সর্ব আর্তিহরা
শিবমন্ত্রে-ভরা।"

যদিও গান্ধী ছিলেন সংস্কারক ও রাজনীতিজ্ঞ, যদিও গান্ধী ছিলেন কর্মযোগী, তবু তিনিও ভাববিলাসী শেলীর মতই সমাজের সংস্কার অর্থাৎ সকল জড়তা ও অকল্যাণ হতে মুক্তি-কামনার আগ্রহে মানুষের কাছে অসম্ভব দাবি নিয়ে এসেছিলেন ও মানুষের শারীরমানসশক্তির প্রায়-অনায়ত্ত আদর্শ তার সামনে তুলে ধরেছিলেন। একক মানুষের মন কি ভাবে কাজ করতে পারে, কতদুর পর্যন্ত তার মনের গতির বেগ ও ব্যাপকতা, সে বিষয়ে যেন উদাসীন হয়ে ভাবুকের মত অসাধ্য-সাধনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনে ও জীবনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শেলী ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাবের কল্পনা করেছিলেন, সর্বতাপকলুষমুক্ত এক আদর্শ-সুখশান্তিচিহ্নিত সমাজব্যবস্থার আনন্দময় নবযুগের প্রবর্তন হোক—এই কামনা মাত্র

করেছিলেন। প্লেটোর মত তাঁরও ধারণা ছিল যে, গঠনমূলক চিন্তাধারার দ্বারাই যুগপরিবর্তন সম্ভব এবং সেই বিশ্বাসে পশ্চিমা বাতাসকে অনুনয় ক'রে বলেছিলেন ;—

"Drive my thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth."

"এ বিশ্বভুবন 'পরে
নবজাগরণ তরে
জীর্ণপত্র সম
সুপ্ত চিন্তা মম
দাও ছড়াইয়া।"

গান্ধীও তেমনই জনগণের নিকট কতকগুলি সহজবোধ্য ভাবধারার ও স্থূল কর্মপদ্ধতির তালিকা পেশ ক'রে রামরাজ্যের পুনরুদ্ভব হবে এই আশা পোষণ ক'রে গেছেন।

তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর ও প্রবল বাধাবিপত্তি এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবু শেষ দিন পর্যন্ত আদর্শে নিষ্ঠা হারান নি। অবশ্য মানুষের উদাসীনতা ও অন্তরসাধনার অসহযোগিতা তাঁদের মনে আক্ষেপ ও অভিমানের সৃষ্টি করেছিল। ক্ষণেকের জন্য মনে নিরাশার বিষাদের ছায়াপাত ঘটেছে, আবার পর-মুহূর্তে অফুরন্ত উৎসাহের স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। এই আশা-নিরাশার দোলার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের বেদনাকাতর নিঃসঙ্গ মনের খেদোক্তি শোনা যায়। ভারত খণ্ডিত হবার পর হিন্দু-মুসলমানের অবিরাম আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়ে গান্ধী বলেন, "আমার মত মূর্খের আনন্দঘন আকাজ্ক্ষা কোন দিন পূর্ণ না হ'লেও কিছু আসে যায় না ···। আমার ক্লৈব্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে···। আজ আমার আহ্বান অরণ্যে রোদন মাত্র···। একদা আমি যা কিছু বলেছি জনগণ তা পালন করেছে, আজ আমার শ্রোতা নেই···। ১২৫ বছর দূরে থাক্, আর আমার বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা নাই। এই ঘৃণা এবং মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে আমি বাঁচতে পারি না।"

"It matters little if the ecstatic wishes of a fool like me are never realised...My impotence has been gnawing at me of late...Today mine

is a lone voice in the wilderness...Time was when whatever I said the masses followed. Today, mine is a lone voice. I have lost all desire to live long, let alone 125 years. I cannot live while hatred and killing mar the atmosphere."

এমনই হতাশ সুরে শেলী বলছেন—

"O World ! O Life ! O Time !
On whose last steps I climb,
Trembling at that where I stood before,
When will return the glory of your prime ?
No more—oh, never more !"
"...I fall upon the thorns of life ; I bleed."

"হে ধরণী, হে জীবন, হে শাশ্বতকাল,
যাহার সোপানচূড়ে বসি
চেয়ে আছি শঙ্কাভরে অতিদূরে
যেথা হতে যাত্রা হয়েছিল শুরু।
ফিরিবে কি আর
সে তোমার
যৌবনগর্বিত কাল ?
নহে কভু নহে··· ।"
"আজি হায়
জীবনের কণ্টকধারায়
আহত বিক্ষত আমি,
রক্তে ঝ'রে যায়।"

আর একটি তুচ্ছ অথচ চোখে পড়ে এমন সাদৃশ্য আছে উভয়ের অপঘাত-মৃত্যুতে। তাঁরা যেন ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবলে মরণ কি ভাবে জীবন হরণ করবে, তার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং তার উল্লেখ ক'রে গিয়েছিলেন। একদা নৌকাবিহারকালে ঝড়ের রুদ্র লীলার ফলে শেলীর সলিল-সমাধি ঘটে ; সে দুর্ঘটনার কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, যেন আমি এক পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। বহু দুঃখে আমি এখানে আরোহণ করেছি এবং বহুতর দুঃখ ব্যতীত এ স্থান হতে অবতরণ করা সম্ভব নয়। আমার জীবনের শেষ বিদায়ক্ষণে আমার মাথার উপর প্রসন্ন মধুর আকাশ দেখতে পেলে আমি তৃপ্তি বোধ করব।"

"I stand, as it were, upon a precipice, which I have ascended with great peril and cannot descend without greater peril, and I am content if the heaven above me is calm for the passing moment."

বুদ্ধিবিভ্রমের ফলে কোনও আততায়ী (স্বদেশবাসী) তাঁকে হত্যা করতে পারে এবং সে মৃত্যুও যেন তিনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে করতে শান্ত ক্ষমাসুন্দর মনে গ্রহণ করতে পারেন—এই ইচ্ছা গান্ধী ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় মীর আলমের যষ্টি-আঘাতে অচেতন হবার সময় থেকে ১৯৪৮ সালে ৩০এ জানুয়ারি দিল্লীর প্রার্থনা-সভায় বোমা-নিক্ষেপকাল পর্যন্ত অসংখ্যবার প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনে প্রথম ও শেষ উক্তি, "কোনও ব্যাধি বা ঐ জাতীয় কোনও কারণে মৃত্যু অপেক্ষা আমার কোনও ভাইয়ের হাতে মৃত্যু আমার কাছে দুঃখদায়ক হবে না। এরূপ ক্ষেত্রেও যদি আমার মন আমার শত্রুর প্রতি ক্রোধ বা হিংসাচিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, তা হ'লে জানব যে, আমার শাশ্বত কল্যাণ সাধিত হবে এবং আমার আততায়ী পরে বুঝতে পারবে যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলুম।"

"যদি একজন বাতুলের গুলিতে আমার মৃত্যু ঘটে, আমি যেন তা হাসিমুখে বরণ করতে পারি। আমার মনে যেন ক্রোধ না থাকে। আমার মুখে এবং অন্তরে যেন ঈশ্বরের নাম ধ্বনিত হতে থাকে। তোমরা আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দেবে। যদি এমন ঘটনা ঘটে তো তোমরা একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না।"

"To die by the hand of a brother, rather than by disease or in such other way cannot be for me a matter of sorrow. And even in such a case if I am free from thoughts of anger or hatred against my assailant, I know that that will redound to my eternal welfare, and even the assailant will later on realise my perfect innocence."

"If I am to die by the bullet of a mad man, I must do so smiling. There must be no anger within me. God must be in my heart and on my lips. Should such a thing happen you are not to shed one tear."

যেন তাঁর সুরে সুর মিলিয়েই শেলী ব'লে গেছেন—

"Oh, weep for him (Adonais)—he is dead!
......yet wherefore ?......

For he is gone, where all things wise and fair
Descend !......
He lives, he wakes—'tis Death is dead, not he ;
Mourn not for him......"

"শোক কর তারি লাগি। সে যে মৃত।
কিন্তু কেন ?
যেথায় সে করেছে প্রয়াণ
সেথায় বিরাজমান
সর্ব সৌম্য-সুধী প্রাণ।
সে যে চিরঞ্জীব
সে চির-জাগ্রত।
মৃত্যু আজি মৃত
সে তো নহে ;
তার লাগি করিও না শোক।"

গান্ধী ছিলেন সত্যনিষ্ঠ কর্মযোগী। মানুষের কল্যাণকামী এই পরমসুহৃৎ অবিরাম অবিচল সাধনা দ্বারা সকল সৎ সঙ্কল্পের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ক'রে, কার্যে পর্যবসিত ক'রে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি বিশ্ববরেণ্য, আর্তবন্ধু। এই যুগপ্রবর্তক মহামানবের সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও প্রেমধর্মের পূজারী ইংলণ্ডের এক গণবন্ধু কবির তুলনামূলক আলোচনা করায় হয়তো গান্ধীচরিত্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হ'ল। কবি নিত্য নূতন সৃষ্টি করেন, বিশ্বপ্রেমিক সাধক জীবনে তার মূর্ত রূপ দান করেন। কীট্‌স সংক্রান্ত শেলীর একটি রচনার আংশিক উদ্ধৃতি এ উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করবে ; এ বর্ণনা স্বয়ং কবির প্রতিও প্রযোজ্য।

"Thine is the brow whose mildness would defy
Its (crime) fiercest rage, and brave its sternest will.
Thou art sincere and good ; of resolute mind,
Free from heart-withering custom's cold control,
Of passion lofty, pure and unsubdued,
...Virtue shall keep
Thy footsteps in the path that thou hast trod,
And many days of beaming hope shall bless

Thy spotless life of sweet and sacred love.
Go happy one !"

"তোমার প্রসন্ন ললাট তুচ্ছ করি
পাপের প্রবল ক্রোধ
জানাবে বিরোধ ;
স্পর্ধাভরে করি রোধ
সে কঠিন ইচ্ছাগতি ।
তুমি সাধু,
তুমি দৃঢ়ব্রতী, সত্যধর্মী ।
হৃদয়বিদারী, কদাচারী নিয়মের
কঠিন নিগড়
তোমারে করে নি বদ্ধ ।
তুমি মুক্ত,
তুমি শুদ্ধ,
পরম অপাপবিদ্ধ
বাসনাবিলাসী ।
তব পথরেখা চাহি
তব পদরেখা বাহি
ধর্ম নিজে করিবে পালন
তোমার কল্পিত সাধন ।
জ্যোতির্ময়ী আশা
যুগ যুগ ধরি
স্নেহধন্য করি
রাখিবে সে পবিত্র পরাণ
সে মহান
নিষ্কলঙ্ক মধুপ্রেমপূত প্রাণ ।
যাও বীর··· ।"

"মুসাফির"

অ-রাজনীতি

রাজনৈতিক ভাষা

পরিভাষা-সংকুল অনুবাদ-গন্ধী আধুনিক বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা যে রূপ নিয়েছে ও নিচ্ছে, বাংলা গদ্যের জন্মদাতা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে যদি আজ একখানা দৈনিক পত্রিকা তুলে দেওয়া যায়, তিনি বোধ হয় আমাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতি-পরিপন্থী কার্যকলাপ' দেখে স্তম্ভিত হবেন। তিনি যখন বড় বড় অক্ষরে ছাপা দেখবেন —

"সাম্যবাদীর আক্রমণ হইতে ভারতকে বাঁচাও"

তখন হয়তো মনে ভাববেন, উচ্চনীচ-ভেদাভেদ-জ্ঞান নেই—এই ধরনের এক দল সাধুপুরুষ মার্চ ক'রে ভারত অধিকার করতে আসছেন। মহাপুরুষ ভেবে আকুল হবেন, ভারত-আক্রমণকারী মহাপুরুষরা অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাবেন! মনে মনে চিন্তা করবেন, এতে ভারতের বিপদই বা কি? সমদর্শী সাধুপুরুষদের হাতে যাবে দেশপালনের ভার ('দেশশাসন' বললে ভুল হবে—দেশপাল ও প্রদেশপালেরা শুধু পালন করেন, শাসনের নামগন্ধও নেই), এতে দোষের কিছুই থাকতে পারে না। তিনি বরং বলবেন, তাঁদের ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-পুষ্পমাল্য-মঙ্গলশঙ্খ-সহ অভ্যর্থনা ক'রে আনতে।

'পরাধীন জাতির নিজস্ব কোনও পলিটিক্স নেই', এখানে 'পলিটিক্সে'র বাংলা যদি 'রাজনীতি' হয়, তিনি (বিদ্যাসাগর) বিপরীত ধারণা করবেন। পরাধীনেরাই 'রাজ'নীতির অধীনে থাকে, স্বাধীন হ'লে পায় অ-রাজনীতি বা স্ব-রাজনীতি, সহজ কথায় নিজস্ব রাষ্ট্রনীতি। 'গণপরিষৎ' বলতে তাঁর ব্যাকরণ-কৌমুদীর ভ্বাদিগণীয় তুদাদিগণীয় ধাতুগুলোর কথা মনে প'ড়ে এক 'সংকটময় পরিস্থিতি'র সৃষ্টি করবে। 'স্বরাজ' শব্দ বরং গণতন্ত্র-দ্যোতক, আমরা নিজেই নিজের রাজা—

'মা এদেশের রাজা, মা এদেশের রাণী'

—গানখানা অবশ্য যদি তিনি শুনে গিয়ে থাকেন।

স্বদেশী যুগে শহরের বক্তারা যখন দূর পল্লীগ্রামে গিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন, "ভাইসব, জাগ, আর ঘুমিয়ে থেকো না", সরল পল্লীবাসীরা

ভেবেছিল, তারা তো ঘুমুচ্ছে না, জেগেই রয়েছে এবং ব'সে ব'সে বক্তৃতা শুনছে।

বক্তৃতার সাহায্যে দেশোদ্ধার হয় নি, বক্তৃতায় দেশ-নেতারা জনসাধারণের কেশাগ্রমাত্র স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, অন্তরের ছোঁয়া পান নি। নেতাদের বক্তৃতা মস্তিষ্কস্থানীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছিল হয়তো, কিন্তু জনসাধারণের মর্মে প্রবেশ করেছিল—

যায় যেন মা জীবন চ'লে
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ ব'লে।
লাল টুপি কি কালো কোর্তা, জুজুর ভয় কি আর চলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে মা ফেলে!

* * *

আমরা ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে,
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসির কাঠে ঝুলিলে॥

এবং এইভাবে তাদের অন্তরকে বিদেশী শাসনের বিরোধী ক'রে তুলেছিল। এই ধরনের ভাব ও ভাষার সঙ্গে তাদের পূর্বপরিচয়ও ছিল—

শমন, আছি দাঁড়িয়ে,
কালী-নামের গণ্ডি দিয়ে।
ভয় দেখাবি সাজা পাবি, শ্যামা-মাকে দেব ক'য়ে॥

লক্ষ্য করবার বিষয়, বাংলা গদ্য-পদ্য যেমন প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে, প্রচুর উৎকর্ষ সত্ত্বেও বাংলা গান ততটা করে নি। এ কথা অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত খাটে।

আগে যারা শুনেছে—

হরিনামের গুণে গহনবনে মৃত তরু মুঞ্জরে

সরল সহজ ভাব-প্রকাশের অনুকূল চির পরিচিত ভাষা, ছন্দ ও সুরে তারা নূতন ক'রে শুনলে—

অঘ্রাণে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে।

আগে তারা শুনেছিল—

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে,

অভ্যস্ত-বাণী তাদের কানের ভিতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করল—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

ইত্যাদি। যথা—

দেখো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের কাছে,
রাই-প্রেমে গড়া তনু ধুলায় পড়ে পাছে।

তথা—

পিতল-কাঁসা ছিল খাসা, কাজ চালাতাম কলার পাতে
এখন, এনামেলে মাথা খেলে কলাই করার ব্যব্সাতে।

সেদিন দেশকে জাগিয়েছিলেন কবিরা তাঁদের খাঁটি বাঙালীর প্রাণের ভাষা দিয়ে, অনেক স্থলে যার ইংরেজী অনুবাদ অসম্ভব—

তাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের মোটা ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মার বাগানের কলাপাত।

রাজনৈতিক বক্তারা বক্তৃতা দিতেন হয় ইংরেজীতে, না হয় তার তর্জমা ক'রে, যার গোড়ার দিকটা হ'ত এই ধরনের—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মহিলাবৃন্দ (না থাকলেও), ও ভদ্র-মহোদয়গণ! সভাপতি মহাশয় এই সভায় আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। এতে, এক দিকে আমি যেমন নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত, অন্য দিকে তেমনই সম্মানিতও বোধ করছি—"

পল্লীবাসীরা এর একবর্ণও বুঝতে পারত না, আমরা মনে মনে বলতাম, 'তবে, হয় কিছু বল, না হয় ব'সে পড়।'

বক্তৃতার মাঝখানে থাকত বঙ্গচ্ছেদ-জনিত আক্ষেপ এবং 'শোষক' ইংরেজের 'অমানুষিক' অত্যাচার-কাহিনী। তাদের বাংলা-মাকে ইংরেজ দু-আধখানা ক'রে কেটে ফেলেছে, এই মর্মন্তুদ দৃশ্য-কল্পনায় পল্লীবাসীর চির-শোকার্ত অন্তর শুধু একটুখানিও খানিকক্ষণের জন্য বিচলিত হ'ত, কিন্তু তারা ভেবে ঠিক করতে পারত না, মাটি কাটলে কার কি ক্ষতি, তারা তো হরদম কাটছে!

বক্তৃতার শেষের দিকটার নমুনা—

"ভাইসব, আমি আশা করি এবং সেই সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে যে, আমি

আমার বক্তব্য বিষয় গুছিয়ে বলতে পেরেছি কিংবা পারি নাই। যাই হোক, আমি আর অধিক ব'লে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। আপনারা সুধী, বিজ্ঞ—"

যা তারা মোটেই ছিল না, কারণ, ঐ দুটো কথারই তারা মানে জানত না।

জাতির জাগরণ-যজ্ঞে যে সব কবি-ঋত্বিক গানের ভাষায় প্রতি পল্লীর প্রাণে প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং মনে মনে আগুন লাগিয়েছিলেন—

বিদেশী, আর কি দেখাও ভয়,
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন রয়!

সহৃদয় ঐতিহাসিক তাঁদের পবিত্র স্মৃতি লিপিবদ্ধ ক'রে ধন্য হবেন। কাব্যবিশারদ, রজনীকান্ত, স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস প্রভৃতির কথাই আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এবং তিনি (ঐতিহাসিক) যদি সাহিত্য-সমালোচকও হন, তা হ'লে আশ্চর্য হবেন এই ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর দ্বিতলের আসন হ'তে নেমে এসে এই আসরে গান জমিয়েছিলেন, যদিও একটু তফাত থেকে।

গানের আগুনে সকলের মনে পরাধীনতার জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু তার সাহায্যে স্বাধীন জাতির সমস্যাপূরণ হয় না। একটি স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতি সারা বিশ্বের নজর থাকে, কিন্তু লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। স্বাধীন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ জাগিয়ে তুলতে এবং দেশের সকল সমস্যা ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ('পরিস্থিতি' বললে তারা বুঝবে না) জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতে হবে, সাধারণ শিক্ষাবিধির সাহায্যে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এর জন্য সহজ সরল রাজনৈতিক ভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজন। যদি আমরা ঐ সব মূক কণ্ঠে ভাষা দিতে চাই, মূক কণ্ঠের ভাষাও আমাদের শিখতে হবে। এ কাজ প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের, এবং তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই অবতারণা।

তা বুঝতে পেরেছিলেন ব'লেই নীতি-ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সমন্বয় ছিল তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। তাঁর প্রার্থনা-সভাগুলিতে ভারতে উদার ধর্মমত স্থাপনের বীজ নিহিত ছিল।

মোট কথা, প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া মানুষ করবেই, তবে ধর্মকে জড়িয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ নিতান্ত সেকেলে, ওর নাটকীয় সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে এই যা অসুবিধা। জুড়ির গানের মতই এ যুগে তা অচল।

এইজন্য আমি আশা করেছিলাম যে, জুড়ির গানের পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাছা বাছা আধুনিক গান স্থান পাবে অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্মশিক্ষার উপরেই বেশি রকম জোর দেওয়া হবে। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে দেখতে পেতেন, দু দিন পরে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা, অ্যালজেব্রার ফরমুলা, ব্যাকরণের প্রত্যয়, ইতিহাসের সন-তারিখ, বিজ্ঞান-রীডার, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং কুইনীন ও জ্বরাস্তকষায়ের মত ধর্মও তাদের কাছে তেতো হয়ে যেত, আমাদের জাতীয় জীবনে 'সর্বজ্বরগজসিংহে'র কাজ করত—

বিনয়ে, শঙ্খনিধি বলে বিধি
গজসিংহ কর সেবন !*

অহং তত্ত্বাগ্রহী

তত্ত্বাগ্রহীর স্থান সত্যাগ্রহীর অনেক উর্ধ্বে, সব অবস্থাতেই তিনি নিজ তত্ত্বে অবিচল। একমাত্র প্রবলতর তাত্ত্বিক বিরোধ ছাড়া কোনও অস্ত্রই তাঁকে জব্দ করতে পারে না। সত্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে, সত্যাগ্রহীকে বাস্তবের সঙ্গে অনেক কিছু বোঝাপড়া করতে হয়। কিন্তু কে বুঝল কে বুঝল না, কে পড়ল কে পড়ল না, তত্ত্বাগ্রহী মোটেই তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, করবার উপায়ও নেই, ভ্রূযুগ-মধ্যস্থিত তত্ত্ব-বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

অন্য দিকে কর্মক্ষেত্রে তত্ত্বাগ্রহী সত্যাগ্রহীর পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য

---

* এই ধরনের বিজ্ঞাপন-সাহিত্যের রচয়িতারা আমাদের (সাধারণ-সাহিত্যিকদের) মত সঙ্কীর্ণমনা নন। তাঁদের রচনা পুনঃপ্রকাশ কিংবা অনুবাদের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করতে হয় না

নন, বাস্তব-প্রয়োগে একেবারে অচল। দুঃখীর দুঃখে তাঁরও প্রাণ কাঁদে, কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত দুঃখীকে একমুঠো ভাত দেওয়া না-দেওয়া তাঁর কাছে সমান, কারণ তাতে স্থায়ী ফল হবে না; তিনি চাইবেন বিশ্ব-দারিদ্র্যের মূলে তাত্ত্বিক কুঠারাঘাত করতে; অত্যাচারীর অত্যাচারে তিনিও খুব উত্তেজিত হন, কিন্তু বিশেষ কিছুই ক'রে উঠতে পারেন না, দাম্ভিকের অবশ্যম্ভাবী পতনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, বিধাতার বজ্র তৈরি হচ্ছে।

বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সত্যাগ্রহী আবিষ্কার করলেন—অহিংস যুদ্ধ। তখন দেশকালপাত্র বিবেচনায়, হিংস্র সমর কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁরই হাড়ে নন-ভায়োলেণ্ট বজ্র তৈরি হ'ল এবং সুফলও ফলল—'পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ...'

কিন্তু পারিপার্শ্বিক যতই প্রতিকূল হোক, তত্ত্বাগ্রহী তাঁর গোঁ ছাড়েন না—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব বজ্র তারে যেন তৃণসম দহে।

অন্যায়কারীর প্রতি অভিশাপে শাস্ত্রগ্রন্থ পরিপূর্ণ; কিন্তু হায়, অন্যায় যারা বাধ্য হয়ে সহ্য করে, তাদের প্রতি এই নিদারুণ অভিশাপ দয়াধর্মের বহির্ভূত, অতএব অশাস্ত্রীয়। কিন্তু তত্ত্বাগ্রহী শাস্ত্র মেনে চলবার লোক নন। 'অহং তত্ত্বাগ্রহী' এই তাঁর অহংকার, সোঽহং পর্যন্ত তাঁর স্পর্ধা গিয়ে ঠেকে। অপিচ—

দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো

হানাহানি নিশ্চয় অহিংসা নয়। তাত্ত্বিক ভেবে দেখলেন না, দুর্জনকে আঘাত করা দূরের কথা, যে নিজেই দুর্বল সে দুর্বলকে রক্ষা করবে কেমন ক'রে! মনে হয়, এই সব ব্যবস্থা 'বজ্রাঘাতের' পরবর্তী অবস্থার জন্য।

একটা কথার উল্লেখ না করলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে যে, বাস্তবের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো এই মিশ্র সত্যের তলদেশে তত্ত্ব অর্থাৎ অবিমিশ্র সত্যও ক্রিয়াশীল ছিল, অনেক সময় মদোন্মত্ত সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের নখদন্তবিকাশ দেখতে পেয়েছিল। দুর্বল মুহূর্তে খাঁচা ভেঙে

যখন সে বেরিয়ে পড়ল, তখন আর উপায় ছিল না, সব কিছু তার হাতছাড়া।

তত্ত্ব এই যে, মানুষ হিংস্র জন্তু; সত্য এই যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাকে সভ্য ক'রে তুলছে—অন্তত, সে গর্বটুকু তার আছে। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাত্ত্বিকের মনে এই একমাত্র ভরসা। অপর এক আশা, নিরুপায় হয়ে যদি সে কখনও তার হিংস্রত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু তা নিতান্ত ভঙ্গুর এবং অত্যন্ত অস্থায়ী, উপায় হ'লেই নিজ মূর্তি ধারণ করবে।

লীলা ফুরিয়ে গেলে মহাপুরুষরা আর বেঁচে থাকেন না। মহাত্মাজীর অহিংসার লীলা তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়েছে। বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে ভারতে অহিংস প্রতিরোধ অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এইজন্য রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যাপারে অহিংস-নীতির প্রয়োগের কথা উঠলেই গোঁজামিল ছাড়া উপায় নেই। অস্ত্রগুরু তাঁর অস্ত্রের প্রয়োগবিধি শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ ও সময় পেলেন না। আপাতত তা সত্যের খোলস ছেড়ে তত্ত্ববীজরূপে ভারতের মাটিতে উপ্ত হয়ে রইল। পৃথিবীর এক শুভক্ষণে, যদি কখনও অহিংসা-তত্ত্ব হিংসা-তত্ত্বের চেয়ে অধিক শক্তিমান হয়, হয়তো তখন পরিপূর্ণ-মূর্তিতে প্রকট হবে। বর্তমানে, হিংসা-তত্ত্বের সভ্য-সংস্করণ নিয়েই আমাদের কাজ চলবে।

অশ্বশক্তির দ্বারা ইঞ্জিনের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। মহাত্মার মাহাত্ম্যকে 'হর্স্‌পাওয়ারে'র মানদণ্ডস্বরূপ ধ'রে নিলে, তাঁর অহিংস-তত্ত্বকে রাষ্ট্র-পরিচালনায় প্রয়োগ করতে, দার্শনিক পাটীগণিতের নিয়মে, অন্তত পক্ষে ২০-অশ্বশক্তির ইঞ্জিন চাই। আছে আপনাদের?

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যা সত্য ছিল, আজ স্বাধীনতা-লাভের পর তা তত্ত্ব-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে এবং সেকালের তত্ত্ব আজ সত্যের রূপ নিয়েছে—

'দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো'—এ ছাড়া রাষ্ট্রপরিচালনার কোন বাঁধা রাস্তা আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

ঔষধে জল মিশানো 'ভেজালিয়াতি' নয়। মহাত্মার অহিংস-নীতিতেও ভেজাল ছিল না।

কবির বাক্যকে এলোমেলো সাজানো কিংবা তাতে নূতন কথা জুড়ে দেওয়াকে 'কাব্যিক ভেজাল' বলে। ইংরেজীতে এর নাম 'প্যারডি'। আশ্চর্য কিছুই নয় যে, এই ভেজালের যুগে কবিগুরুর তত্ত্ববাক্যেও ভেজাল প্রবেশ করবে—

দুর্জনেরে রক্ষা কর, দুর্বলেরে হানো

এবং—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সয়,
খাদ্য-খাদকের ন্যায়ে দুজনেই রয়॥

ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল খাদক—দুই-ই আমাদের নজরে পড়ে, ধরা পড়ে না শুধু প্রকৃত ভেজালকারক বা 'ভেজালিয়াৎ'।

এই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধটা মেনে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। খাদ্য-জীবটির স্বাস্থ্যের দিকে খাদক-প্রভুর দৃষ্টি থাকে, খাদ্য-জীবও জানতে পারে, অন্তত একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত। অবশ্য বিবর্তনের নিয়মে খাদ্য-খাদকের দল পালটায়। খাদ্য-দলের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যারা খাদক-দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাদের মনের কথা এই—"আহা, কৃষ্ণের জীব, মারিস নে রে, বরং আমাকে দে, পুড়িয়ে খাব।" জয়লাভ ক'রে, তারাই ফের খাদক-দলে প্রমোশন পায়, খাদ্যের দল অটুট থাকে। নানান হেরফের, কারচুপি ও ইজ্‌মের লেবেল এঁটে এই একই তত্ত্ব যুগে যুগে প্রকাশমান।

এর একমাত্র প্রতিকার, খাদ্য-দলকে চালাক ক'রে তোলা। কিন্তু শত অত্যাচারেও পৃথিবী 'নিষ্পণ্টক' (তুঃ 'নিষ্কণ্টক'; নিষ্পণ্টক=পাঁঠাহীন) হবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।

মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে তিনটি 'পুরুষ্টু' বোকা পাঁঠাকে ব্রহ্মার কাছে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল, তাদের দেখে ব্রহ্মা বলেছিলেন, "তোমরা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের দেখিয়া আমারই রসনা রসসিক্ত হইতেছে, মর্ত্যমানবের অপরাধ কি?"

সাম্যবাদ কথাটি বড়ই মিষ্ট, বড় মোলায়েম। আহা, ঈশ্বর ও গভর্মেণ্টের রাজ্যে সবাই সমান, এর চেয়ে বড় কথা কি হতে পারে? কিন্তু এই সাম্যবাদ যেখানে যতটুকু স্থাপিত হয়েছে, হিংস্র উপায়েই

গণিতের আকারে তার মাথায় ঘুরছিল কয়েক দিন থেকে। গত কয়েক দিন সে সহস্রবার মনে মনে বলেছে, এক দুই হতে চাইছে। এক দুই হতে চাইছে।

তার জীবনে মালতীর আবির্ভাব তাই সময়ের এত সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তিতেও এমন অভাবনীয় ব্যাপক গভীরতার সৃষ্টি করতে পেরেছে। দেয়ালপঞ্জীর বিচারে কত অল্প তাদের পরিচয়, অথচ কি এক অবোধ্য রহস্যময়ভাবে সময়কে টেলিস্কোপ করা হ'ল! যুগযুগান্ত আশ্রয় নিল কটি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে, জন্মজন্মান্তর হয়ে গেল অল্প কটি দিনের পরিসরে!

চিঠিটা এসেছিল বিকালের ডাকে। দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেবেশ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, পাঁচটা বেজে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। তখনই উত্তর লিখতে বসবে? দেবেশ কিছু স্থির করতে পারল না। বাংলা লিখতে তার এত সময় লাগে যে, নিজেরই কাছে সত্যটা স্বীকার করতে লজ্জার সীমা থাকে না। ঠিক কথাটা যেন কিছুতেই কলমে আসবে না। ইংরেজী যে কথাটা সহজেই প্রথমে মনে আসে, কিছুতেই দেবেশ খুঁজে পায় না তার ঠিক যথাযথ বাংলা কথাটা। প্রতিশব্দটাকে মনে হয় স্থূল ব'লে, ভাবটির বা অর্থটির ঠিক শেড্‌টি যেন এতে ধরা পড়ে না! শেষ পর্যন্ত বাংলা সে যা লেখে, তা তার নিজেরই কাছে মনে হয় অক্ষম অনুবাদ ব'লে। ঠিক মূল চিন্তার সুরটি যেন কিছুতেই ধরা পড়ে না। শেষ পর্যন্ত নিজের লেখার উপর কঠোর মন্তব্য ক'রে আর একটা ইংরেজী কথার অনুবাদ করে। বলে, মধ্যরাত্রির কেরোসিনের গন্ধে উৎকট এ রচনা!

না, মালতীর সঙ্গে তার মিলন গোধূলির, মধ্যরাত্রির নয়। চিঠির উত্তর তাই এখন স্থগিত থাকবে। কিন্তু চিঠিটাকে আস্তে, পরম আদর ক'রে, ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখতে রাখতে মালতীকে দেখবার ইচ্ছা দেবেশকে এমন নিঃশর্তভাবে অধিকার ক'রে বসল যে, সে ইচ্ছার পায়ে আত্মসমর্পণ না ক'রে উপায় ছিল না। তৎক্ষণাৎ দেবেশ মালতীকে টেলিফোনে ডাকল। অপারেটরকে নম্বর দিয়ে মনে একটু দ্বিধার উদ্ভব হয়েছিল। ভেবেছিল, উত্তর না পেলে এবং পাওয়াই তো

বিস্ময়ের ব্যাপার, আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে না। কিন্তু সেই বিস্ময়কর যোগাযোগ যখন ঘটল, তখন সকল দ্বিধা নিশ্চিহ্ন হ'ল। মালতীর 'হ্যালো' শুনতেই স্পষ্ট দ্বিধামুক্ত, প্রায়-উচ্চকণ্ঠে বলল, কি করছেন আজ সন্ধ্যায় ?

মালতী এই ডাক একবারও আশা করে নি। বরং চিঠিতে স্পষ্টই লিখেছিল যে, টেলিফোনে সে তার চিঠির উত্তর চায় না। আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কেন বল তো ?

বিশেষ প্রয়োজন, আজ আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া চাইই।

মালতী ভয় পেল। দেবেশের স্বরে এমন একটা অবিশ্বাস্য তাড়া ছিল যে, তার সম্মুখে মালতীর সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সংকোচকেও অতিক্রম করল দেবেশের 'আপনি'-জনিত অস্বস্তি। সে তো শুধু চিঠিতেই 'তুমি' লেখে নি, একটু আগেও সহজেই তার পুনরাবৃত্তি করেছে। তবু কেন দেবেশ এমন ক'রে তার পূর্বজন্মের দূরত্ব আগলে থাকবে ? বলল, তার চেয়ে এখনই বলুন না যা বলবেন। দূর থেকে কঠোর সহনীয় হবে।

দেবেশের বিপদই এই। কোমলও তার কণ্ঠে কড়ির মত শোনায়। তা নইলে মালতী কি ক'রে কল্পনা করতে পারল কঠোরতার কথা, তার অন্তর যখন একেবারে বিপরীত ভাবে উচ্ছল ? যতদূর সম্ভব স্বর নামিয়ে বলল, সে জন্যে নয়। যা কোমল, তা টেলিফোনে যথেষ্ট কোমল না শোনাতে পারে, সেই আশঙ্কায়ই এখন বলব না। দেখা হ'লে বলব। কখন আসব বলুন ?

মালতী আর প্রতিবাদ করল না। দেখা হওয়ার জায়গা ও সময় ঠিক হ'ল টেলিফোন রাখবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেন আর কাটতে চায় না! আরও বার কয়েক চিঠিটা পড়ল, যদিও তার সব কিছু দেবেশের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। হাত ধোবার ঘরে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখে দেবেশের আক্ষেপ হ'ল যে, বাড়ি গিয়ে বদল করবার সময় নেই। আজকের কোটটা তার নিজেরই ভাল লাগে না। কোট না হয় না নেবে, কিন্তু ভাল সেই 'লাকি' টাইটাও আজ সে পরে নি ব'লে দেবেশের

গভীর অনুশোচনা হ'ল। এই সব পোশাকের ব্যাপারে দেবেশের খেয়াল ছিল না কোনও দিন। কি কোট পরেছে, বা কি টাই, এসব সম্বন্ধে সে ছিল একেবারেই অচেতন। আজ যেন তার পোশাককে তার উৎসবের অনুপযুক্ত ব'লে মনে হ'ল। ভাগ্য ভাল, রজার ডি কভার্লির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে মালতী সেখানে উপস্থিত ছিল না!

মালতীর নিজেরও সমস্যার শেষ ছিল না। টেলিফোন রেখেই সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল স্নানের ঘরে। জুলাই মাসের গরমে সারাটা দুপুর সে সীলিঙের পাখাটাকে হয়রান করেছে, আর ঘেমেছে সে নিজে। গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে কুণ্ডলী ক'রে বাঁধা চুলটা খুলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত এলিয়ে পড়ল মালতীর লম্বা চুলগুলি। অসামান্যা রূপবতী ব'লে মালতীর খ্যাতি নেই; কেন না বর্ণ তার উজ্জ্বল শ্যাম মাত্র, ফ্যাকাশে ফরসা নয়। সে নিজেও নিজেকে কখনও অসামান্যা সুন্দরী ব'লে মনে করে নি। রূপ নিয়ে সে মাথাই ঘামায় নি তেমন। আজ কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে একটু সচেতন গর্ব হ'ল মালতীর। সদ্যধৌত চর্মের উজ্জ্বলতা অগৌর হ'লেও অগৌরবের নয় আদৌ। তাই নয়? কিন্তু বর্ণের কথা ছেড়ে দিলেও, এমন চুল আছে কজন বাঙালী মেয়ের? সর্বোপরি, এমন সুসমঞ্জস ফিগার আছে কটি ভারতীয়ার? স্বাস্থ্যবতী অথচ তন্বী, দীর্ঘা অথচ অরুগ্না, চোখ দুটি সজাগ, সমস্ত মুখে নির্মল বুদ্ধির নিঃসন্দেহ দীপ্তি, সব কিছু মিলিয়ে মালতীর আকর্ষণ শুধুমাত্র দেহের নয়, অনেকখানি হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের, কিন্তু আকর্ষণটি অনস্বীকার্য। মালতী মনে মনে বলল, কথাটা আমি নিজে বললেও সত্য।

অন্যান্য মেয়েদের মত পোশাক করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নেয় না মালতী। মালতীর রূপের যতটুকু দেহের, তার পরিচর্যা শক্তও নয়, সময়সাপেক্ষও নয়। অন্তর্বাসের উপর ব্লাউজ-পেটিকোট ও তার উপর শাড়ি প'রে মালতী যখন বেরুবার জন্যে তৈরি হ'ল, তখনও হাতে একটু সময় আছে। মাথার উপর পাখাটা আরও একটু জোরে চালিয়ে দিয়ে মালতী বসল একটু।

দেখা তো করতে যাচ্ছে, কিন্তু তারপর? দেবেশ কি বলবে? কি এমন বিশেষ প্রয়োজন? চিঠির কথা যদি বলে? চিঠিতে কি কি লিখেছে তার কিছুটা মনে হতেই মালতীর লজ্জার অবধি রইল না। ছি ছি! সব কথা এমন লজ্জাহীনার মত সে লিখতে পারল কি ক'রে? রাত্রির উন্মাদনার অন্ধকারে লেখার কথা এখন যদি সাক্ষাতের দিবালোকে আলোচিত হয়? শাড়ি-ব্লাউজ তো ঠিক পরেছে মালতী, কিন্তু এমন মানসিক বিবস্ত্রতা নিয়ে দেবেশের সামনে যাবে কি ক'রে সে? ছি ছি!

কিন্তু আর দেরি করবার উপায় ছিল না অভিসারিকার।

নির্ধারিত স্থান অর্থাৎ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপর ত্রিকোণ পার্কের কাছে এসে দেবেশ ট্যাক্সি থেকে নামল।

সেই সঙ্গে আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি।

দীর্ঘ দগ্ধ দিনের অবসানে নিদাঘশ্রান্ত নাগরিকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনাই ছিল এই বর্ষণের জন্যে। সে প্রার্থনায় দেবেশও নিশ্চয়ই কণ্ঠযোগ ক'রে থাকবে একাধিকবার। কিন্তু সেই বারিধারাই যখন স্বর্গের শান্তিময়ী সুধার মত মুমূর্ষু ধরণীর মরূপম বক্ষতল সুশীতল করবার জন্যে মর্ত্যে অবতরণ করল, দেবেশ তখন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারল না। এমন অকালবর্ষাকে তার অভিশাপ না দিয়ে উপায় রইল না। হ্যাঁ, বৃষ্টি সে চেয়েছিল, কিন্তু তখন কি সে জানত যে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করতে হবে মালতীর সঙ্গে? জানলে কি সে চাইত এই বৃষ্টিরূপী বাধা?

ইতিপূর্বেই দেবেশ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, ঈশ্বরের একটুও ড্রামাটিক সেন্‌স্ নেই। এখন সে আবিষ্কার করল যে, তাঁর সেন্‌স্ অব টাইমিং আরও অল্প।

কিন্তু এই সময়-জ্ঞানের ব্যাপারে ঈশ্বরকেও বোধ করি হারিয়ে দিতে পারে মেয়েরা! দেবেশ হাতের বইটা দিয়ে চশমার উপর ছাদ রচনা ক'রে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে কোথাও মালতীর দেখা পেল না।

এমন বৃষ্টি মাথায় ক'রে মালতী কি আসবে? দেবেশের মন অসহ্য অনিশ্চয়তায় ছিন্ন হ'ল। কিন্তু, যখন—ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে—তখন মালতী না-ই বা আসবে কি ক'রে?

কথা ছিল রাস্তায় না দাঁড়িয়ে পার্কের ভিতরে এসে মাঝখানের গাছের তলায় বেঞ্চিটায় অপেক্ষা করা। দেবেশ তাই পার্কের টার্নস্টাইল পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করল। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় সবাই যখন পরম ত্রস্ততায় নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তখন একটা লোক সমান ত্রস্ততায় ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে, এতে স্বভাবতই কয়েকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। কিন্তু এসব দিকে মনোযোগ দেবার মত মন বা সময় ছিল না দেবেশের। সে এগিয়ে চলল।

পার্ক ততক্ষণে শূন্যপ্রায়। বৃষ্টির মেঘ এসে সন্ধ্যাকে এগিয়ে এনেছিল। পার্কের তিন দিকের বাড়িগুলিতে তাই আলো জ্বলছিল। বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে দেখলে, সেই বিজলী বাতিগুলিও কি রকম যেন একটা অনাগরিক রূপ ধারণ করে। পার্কের মধ্যে ল্যাম্পপোস্ট আর গাছগুলি অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। আর ভিজছিল দেবেশ।

ভিজতে ভাল লাগছিল। মাথার উপরের গাছটা যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তবু এখানে ওখানে কয়েক ফোঁটা অতর্কিতে গায়ে এসে পড়ছিলই। দেবেশ কিছু মনে করে নি। কিন্তু চশমাওয়ালা লোকদের বৃষ্টিতে বড় বিপদ, কেন না, চশমাটার কাচ দুটো ভিজে যায় সব চেয়ে আগে আর তখন দৃষ্টি হয় আচ্ছন্ন। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও সে অপেক্ষা করছিল। এই বৃষ্টির মধ্যে মালতী যদি আসে, এবং সে তো বলেছে যে আসবে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবে—তা হ'লে এই বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে, এই নির্জন পার্কের অলক্ষ্য সাক্ষ্যে এতদিনের বাক্যরাশিকে অতিক্রম ক'রে, সকল সংকোচ, সকল জড়তা ভাসিয়ে দিয়ে, এককে শুধু দুই করবে না, দুইকে এক ক'রে দেবে। দেবেশের অধীর আশায় বৃষ্টিধারা জলসিঞ্চন করল।

একটু পরেই হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেবেশ দেখল সে যেখানে

দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে একটি মহিলা দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই মালতী। মানুষ অভিলাষের দাস হ'লে দেবেশ নিজে এগিয়ে গিয়ে মালতীকে অভ্যর্থনা করত। পারল না। বাধল। সংকোচ তখনও কাটে নি। হাসতে হাসতে কাছে এসে মালতী বলল, যাক, এসেছ তা হ'লে? আমি তো ভেবেছিলেম, বৃষ্টি দেখে আসবেই না শেষ পর্যন্ত।

দেবেশ এখানে সাধারণত যে উত্তর দিত তা হচ্ছে এই যে, কথা দিলে সেটা রাখাই তার রীতি। আজকের সিক্ত সন্ধ্যায় এমন একটা শুষ্ক উত্তর দেবেশেরও মুখে সরল না। বলল, সেই আশঙ্কা যে আমার ছিল!

মালতী কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। দেবেশ বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু সেই আশঙ্কা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল, তখন আপনার আসাকে শুধু প্রতিশ্রুতি-পূরণ মনে হ'ল না। মনে হ'ল, প্রতিশ্রুতি তো বৃষ্টির মত অ্যাক্ট অব্ গড এসে নাকচ ক'রে দিয়েছে। পরবর্তী প্রাপ্তিটি তাই দুর্লভ সৌভাগ্য; মাইনে নয়, বোনাস; পাওনা নয়, বখশিশ।

বর্ষণের স্পর্শে আর সঙ্গীতে মালতীর হৃদয় এমনিতেই উচ্ছল হয়ে ছিল। দেবেশের ভাষণে আরও খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু এদিকে যে মাথার উপরে বারি ঝরঝর, সে খবর রাখ কি?

রাখি এবং রাখি নে। কিন্তু মাথাকে আজ বিদায় দিয়েছি, অতএব তার উপরে বারি ঝরঝর কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। মাথাকে বাদ দিয়ে যাকে নিয়ে এখানে এসেছি, সে হচ্ছে মন এবং এই বৃষ্টিটা তার একান্তই মনঃপূত।

কিন্তু এই বৃষ্টিতে কি এমনই দাঁড়িয়ে থাকব?

ও হো! কি অভদ্র আমি! অতিথিকে এতক্ষণ বসতে পর্যন্ত বলি নি।

বা রে, এটা কি তোমার বাড়ি নাকি?

না, বাড়ি নয়। পার্ক, কিন্তু আমার। এটাকে আজ আমি রিকুইজিশন করেছি। ট্রেস্‌পাসার যারা ছিল তাদের একটু আগে

তাড়িয়ে দিয়েছি, পুলিস যেমন ক'রে হোস-পাইপ দিয়ে জল ছড়িয়ে বেআইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়।

এ কি দেবেশ, না, আর কেউ? লোকটা এমন স্বাভাবিক মানুষের মতও কথা বলতে পারে? মালতী বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিন্তু সহাস্যে উপভোগ করছিল দেবেশের পরিহাস। দেবেশ সচেতন থাকলে নিজেও বিশ্বাস করতে পারত না তার বর্তমান মূর্তি। কিন্তু পত্রে যে সেতু রচিত হয়েছিল, তার উপর দিয়ে দেবেশ অবলীলাক্রমে অপর পারে এসে পৌঁছেছিল। যে আত্মসচেতন সংকোচ, তার জন্মগত অভিশাপ, তাকে ফেলে এসেছিল ওপারে।

পাগলের মত প্রলাপ থামিয়ে কপট দরবারী লৌকিকতার স্বরে বলল, আর্যে, আমার দীন উদ্যানে আসন গ্রহণ ক'রে অধমকে ধন্য করুন।

হাসতে হাসতে ভিজে বেঞ্চিটার উপর ব'সে মালতী বলল, চিনতে পারছি নে তো। নতুন লোক ব'লে মনে হচ্ছে।

বিস্ময়ের কিছু নেই। সত্যি নতুন যে! নতুন বোতলে পুরানো আসব ভর্তি করা শঠতা। তার চেয়ে বড় শঠতা পুরানো শিশিতে নতুন আসব। তেমন শঠতা আমি করতে পারব না।

এর আগে এত কথা তো কখনও—

সামনে গিরি নেই, যা পঙ্গু লঙ্ঘন করতে পারে। তাই ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে মূককে বাচাল হয়েই শাস্ত্রবচনানুযায়ী পরিবর্তনের পরিমাপটা বোঝাতে হচ্ছে।

দুজনে প্রাণ খুলে হাসছিল। ঝরঝর বৃষ্টি। চতুর্দিকে কোথাও গুপ্তচর নেই কান পেতে। আকাশে তারাগুলি নেই চোখ মেলে। উভয়ের মনের পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে বিদায় নিয়েছে সকল বাধা। মনের পুরোভূমি অধিকার ক'রে আছে দুটি তৃষিত বুভুক্ষু চিত্তের দুর্দম মিলনপিয়াসা।

দেবেশ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মালতী বলল, অতিথি-সৎকার তো হ'ল। এবার গৃহীর উপবেশনে তো বাধা নেই।

বাধা নেই। সাধও আছে। কিন্তু এই জলধারার মধ্যে ওই শুষ্কং কাষ্ঠং-এর বেঞ্চিতে বসতে পারব না।

সে ভয় নেই। শুষ্কং এটা আদৌ নেই। কিন্তু কোথায় বসব তা হ'লে?

দেবেশ কাছের গাছটা দেখিয়ে বলল, বৃক্ষ ঈব।

গাছের উপরে নয় আশা করি!

দেবেশ একটু ভেবে বলল, উঁ, না। উপরে নয়। তার চেয়ে গাছটাকে বলা যাক, আমাদের মাথার উপর ছাতা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ছত্রটি নিশ্ছিদ্র নয়।

ছাতা তো ছাতা, লুই ম্যাকনীস্ আকাশকে পর্যন্ত ছিদ্রময় ব'লে বর্ণনা ক'রে কাব্য রচনা করেছেন। অভিযোগ ক'রে কি হবে?—সহসা দেবেশ গম্ভীর হ'ল ওই কবিতাগুলির কথা মনে ক'রে।

কিন্তু অভিযোগ কোথায়? মালতী অভিযোগ করবে আজ এই এমন একটি সন্ধ্যায়! সে কি এমনই অকৃতজ্ঞ? এতক্ষণ সে তো শুধু বৃষ্টিধারার রিমঝিম শুনেছে, আর শুনেছে দেবেশের অভূতপূর্ব পুলকপ্রকাশ পরিহাস, আর মনে মনে শুধু বলেছে, এ কি ঘুমে, এ কি জাগরণে, কি জানি কি জানি! এত আনন্দের মধ্যে দেবেশকে হঠাৎ মলিন হতে দেখে মালতীর ভাল লাগল না। দণ্ডায়মান দেবেশের হাত ধ'রে মালতী বলল, চল. ওই গাছটার তলায় বসিগে।

মালতীর স্পর্শে দেবেশ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে তার মন থেকে বিষাদকে বিতাড়িত করল সজোরে। মনে মনে বলল, আজ এই সন্ধ্যায় এই নির্জন বৃষ্টিমুখর ত্রিকোণ পার্ককে ঈডেন উদ্যানে পরিণত করব। মনের কাঁধের 'পরে থাকতে দেব না ওরিজিন্যাল সিনের দুর্বহ বোঝা। আনন্দকে মনে করব না অপরাধ ব'লে। ওই বৃক্ষের ফল লাল হয়ে লোভ দেখাতে চাইলে চোখ ফিরিয়ে নেব। ওটা আপেল গাছই নয়। ওটাকে করব মিস্‌লটো। আজ বড়দিন। বরফের বদলে বৃষ্টি ঝরছে, এইটুকুই যা প্রভেদ।

গাছের কাছে এসে মালতী বলল, কিন্তু এখানে শুধু ভেজা নয়, কাদাও রয়েছে যে।

দেবেশ তাড়াতাড়ি তার হাতের বইটা মাটির উপর রেখে বলল, এইবারে বসুন।

বই সম্বন্ধে দেবেশের এমন অবজ্ঞা দেখে মালতী বিস্মিত হ'ল। বইয়ের উপর বসতে তার নিজেরও ইচ্ছা ছিল না। বলল, কিন্তু বইটা—

দেবেশ বাধা দিয়ে জোর ক'রে মালতীকে বইয়ের উপর বসিয়ে দিতে দিতে বলল, আজ—বুক্স, ডু নট লুক অ্যাট মি; ক্লক্, ডু নট স্টেয়ার। ব'স।

আপনি ও তুমির মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর ছিল, দেবেশ তা বিনা চিন্তায়, বিনা চেষ্টায়, প্রায় অজ্ঞাতসারে ধূলিসাৎ ক'রে দিল। সেই সঙ্গে চূর্ণ হ'ল আরও অনেকগুলি প্রাচীর। দুজনে বসল পাশাপাশি। একজনের হাত রইল আর একজনের হাতে। গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা সন্ধ্যাটি সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় সুন্দর হয়ে উঠল।

সেই পূর্ণতার মধ্যে বাক্যনবাব দেবেশের এবার কেন যেন কথার জন্যে ভিখারী ব'লে মনে হ'ল নিজেকে। নিজের কথা হারিয়েছে, কিন্তু কেবলই মনে আসছে নানা গানের সুর, নানা কবিতার ছন্দ।

দেবেশের হাতটা একটু চেপে ধ'রে মালতী বলল মৃদুস্বরে, প্রায় কানে কানে, কি, হঠাৎ চুপ ক'রে রইলে যে?

দেবেশের মনে যে কথাগুলি গুনগুন করছিল, তা মালতীরই মত মৃদুস্বরে তার কানের কাছে এসে বলল, যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি, জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী। মালতী, এবার আমি শুনি আর তুমি বল।

দেবেশের স্কন্ধে আলগোছে মাথাটা স্থাপন ক'রে মালতী এলায়িত কণ্ঠে বলল, বাণী মোর নাহি। স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি। তুমি বল।

দেবেশ বলল, তুমি বল।

ওই নিজের বলতে অস্বীকৃতি ও অপরকে বলতে অনুরোধটুকুর মধ্যে কত যে বলা হয়ে গেল, তা ওরা দুজনেই বুঝল। কিছুক্ষণ পরে মালতী বলল, আমার কথা তো আমি সব বলেছি। আর যা কথা তা যদি আজও না জেনে থাক, তা হ'লে আর কখনোই জানা হবে না। তুমি বল।

দেবেশ যতই সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠুক, কখনোই খুব দীর্ঘ সময়ের জন্যে তার জীবনের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা মন থেকে দূরে থাকে না। একটু আগে বাণী কথাটির দুবার উল্লেখ হয়েছে। এবারে মালতীর ইঙ্গিত। দেবেশের ইচ্ছা ছিল না এমন কথা উত্থাপন ক'রে আজকের এই সন্ধ্যাটিকে বিষণ্ণ ক'রে তুলতে। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। কাব্যের সুর পরিহার ক'রে শান্ত স্বাভাবিক গদ্যময় স্বরে দেবেশ বলল, মালতী, এতদিন যে তোমাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলি নি, তা কিছু গোপন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে নয়। যে কথাটা শুনতে চাইছ, সেটাতে অপরাধ নেই কারোই। তাই গোপন করবার কারণ নেই। সেটা শুধু দুজনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তার ফলটা যে মন্দ হয়েছে তার কারণ এই নয় যে, একজনেরও উদ্দেশ্য মন্দ ছিল। ছিল না। মন্দ ছিল শুধু ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে তুমি বিরক্ত হবে, শুধু এই আশঙ্কায়ই এত দিন বলি নি।

দেবেশ, ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার কোনও কথায় আমি বিরক্ত হব—এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে?

সংক্ষেপে বলি তা হ'লে। দুর্ঘটনা ঘটেছিল, আজ থেকে আড়াই বছর আগে। বাণীকে তার আগে কখনও দেখি নি। পরে আত্মীয়েরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই কথা ব'লে যে, এমন কাউকে আমি বিয়ে করলেম কি ক'রে যার সঙ্গে এতটুকুও পরিচয় নেই! এ প্রশ্নের জবাব আজও জানি নে। যাই হোক, তার চাইতে যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে এই যে, বিয়ের পরেও পরিচয় আর হয়ে উঠল না। আমার বয়স হয়েছে, আমার অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা যদিবা অল্প, সহনশীলতা অপরিসীম। আমি তাই চুপ ক'রে ছিলেম। কিন্তু বাণীর কাছ থেকে সেটা আশা করাই অন্যায়। ঠিক দু বছর পরে তাই সে এখান থেকে মার কাছে চ'লে গেছে। বলা বাহুল্য, এতে আমি বিলাপ করি নি। বাধাও দিই নি। যাকে সুখ বা শান্তি দিতে পারি নি, তাকে অন্তত স্বাধীনতা দিতে দ্বিধা কার নি। এ নিয়ে দোষারোপের অন্ত নেই। তা নিয়েও আমি অনুদ্বিগ্নমনা। আমার এই অনুদ্বেগ যে পাষণ্ডের হৃদয়হীনতা ব'লে প্রচারিত হয়েছে, তা নিয়েও অভিযোগ করবার

অধিকার নেই আমার। করিও নে। আইনের অমানুষিকতার জন্যে যে অপ্রীতিকর অধ্যায়ের সুষ্ঠু অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি, সে জন্যে মানুষকে অমানুষ ব'লে গাল দিলে সুবিচার হয় কি না—সমাজই বিচার করুক। যদিও তাতে আসামীকেই বিচারক করা হয় বোধ হয়। সে যাই হোক, আইনত শেষ না হ'লেও আর সব দিক থেকে তার সমাধি হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই।

মালতীর অভিজ্ঞতাও মূলত বিভিন্ন নয়। সে জানে এমন অভিশপ্ত জীবনের বেদনা কোথায়। তাই সে বুঝল দেবেশের কথা অন্তরে অন্তরে। শুধু দেবেশ যা বলেছে তাই নয়, যা বলে নি তাও। গভীর চিন্তা ক'রে নয়, নিজের মনে মনে যা অসংখ্যবার আবৃত্তি করেছে, তা-ই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলল, মুশকিল হচ্ছে এই যে, এটাকে সমাধি ব'লে মনে করলে ভূতে বিশ্বাস করতে হয়। ভূতটা যেন শিকল হয়ে পা দুটোকে বেঁধে রেখেছে সর্বক্ষণ।

আমি ঠিক শিকল বলব না। আমি বলি, এ যেন, এ যেন—। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে উপমাটা খুঁজে পেল।—এ যেন জুতায় লাগা কাদা। অপরিচ্ছন্ন আর ভারী এই বোঝাটা নিয়ে পথ চলতে অসুবিধে হয় বইকি। কিন্তু অসুবিধাই মাত্র, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই এর আমার জীবনে।

এই আলোচনাটা ভাল লাগছিল না দেবেশের। এ শেষ ক'রে মধুর সন্ধ্যাটির মূল সুরের ঠিক লয়ে ফিরে আসবার জন্যেই মালতীর অবশ হাত দুটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের দু দিকে স্থাপন ক'রে আস্তে আস্তে বলল, আমার জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত ঘটনাটার সামান্যতা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যখন বলি, আমি যদি ওটাকে নিয়ে কখনও কিছু লিখি, তা হবে কোন দৈনিক কাগজের পূজা-সংখ্যার জন্যে একটা ছোট গল্প, কলকাতা থেকে রামরাজতলা পর্যন্ত যার আয়ু আর দৈর্ঘ্য।

দেবেশ কথাটা বলেছিল একটু চেষ্টাকৃত লঘুতার সুরে। মালতী কিন্তু হাসল না। দেবেশ তাই আরও কাছে এসে গভীর স্বরে যোগ করল, আর তোমার-আমার পরিচয় নিয়ে যদি কখনও লিখি, তবে তা

হবে অন্তহীন একখানি উপন্যাসমালা। এবারে প্রভেদটা বুঝতে পেরেছ আশা করি।

বুঝেছি। কিন্তু আমি কি তা হ'লে বাণীর কাছে অপরাধিনী হয়ে রইলেম না?

দেবেশ এই উক্তিটার আয়নায় আপন রূপ দেখে চমকে উঠল। তা হ'লে সেও কি অপরাধী নয় কর্নেল রণেন গুপ্তের কাছে? দেবেশ আর মালতী কি তা হ'লে পার্টনারস্ ইন ক্রাইম? প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পেল না দেবেশ। প্রশ্নগুলি ছাপিয়ে মন কেবলই বলতে থাকল, এমন অপার্থিব আনন্দের ভিত্তি কিছুতেই হতে পারে না অন্যায়। এমন স্বর্গীয় পুলকের পশ্চাতে কিছুতেই থাকতে পারে না পাপের আভাস। তবে? কিন্তু? জিজ্ঞাসাগুলি তীরের মত বিঁধতে থাকল। এবারে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যেন তীক্ষ্ণ ধারালো মনে হতে থাকল।

মালতী সাদরে দেবেশের কপালের উপর চ'লে-আসা ভিজে চুলগুলি সরিয়ে সাজিয়ে দিতে দিতে মিনতির সুরে বলল, কি, বল।

সেই কোমল স্পর্শের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-শয়তানী দেবেশের মন থেকে সন্দেহের করাল ছায়া সরিয়ে নিয়ে আবার সেখানে আনন্দের আলোকপাত করল। দেবেশ উত্তর খুঁজে পেল। যুক্তিটা সাজাবার সময় নেবার জন্যেই বলল, তুমি যদি বাণীর কাছে অপরাধিনী হয়ে থাক, তা হ'লে আমিও যে কর্নেলের কাছে ক্রিমিন্যাল। তাই নয়?

মালতীর প্রশ্নের এই অনুপ্রশ্নটা একবারও তার মনে আসে নি। মনের জিভ কেটে বলল, কিন্তু কই, তোমাকে যে একবারও অপরাধী ব'লে মনে করতে পারি নে।

আর আমিই বুঝি তোমাকে অনায়াসে অনুক্ষণ অপরাধিনী মনে করি, না? তুমি জান, তা নয়। তবে আমি এতদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, অপরাধীকে অন্তরে অন্তরে তার অপরাধের বোঝা বহন করতে হবেই হবে। তবে কি তুমি আর আমি পরোক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি? এই যে তুমি আর আমি এই মুহূর্তে এক ও অভিন্ন হয়ে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয়েছি, এটা কি সত্য নয়?

ভাষাহীন মাধ্যমে মালতী তার সর্বান্তঃকরণ সম্মতি জানিয়ে দিল।

পিছনের গাছটাকে সেই মুহূর্তের মত মিস্লটোর ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'ল।

আরও অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেশ আবার বলল, এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত অনন্ত সত্যের চাইতে বড় হয়ে গেল সেই বাজে মিথ্যাটা? শুধু মাত্র এই জন্মে যে সে মিথ্যা উচ্চারিত হয়েছিল উদরপরায়ণ কতকগুলি লোকের উপস্থিতিতে আর ঘৃতপুষিত অগ্নিশিখার সাক্ষ্যে? আর তোমার আমার সারা জীবন এই মিথ্যাটা আগলে যেতে হবে? এ কেমন বিধি? এ কেমন বিধান? এ কেমন বিচার? একটু আগে তুমি বাণীবঞ্চনার কথা বলছিলে। এর উত্তর তো তুমিই দিয়েছিলে। বঞ্চনা কাকে বল? যার যা ছিলই না, তাকে তা থেকে বঞ্চনা করা কি সম্ভব?

মৃত অতীতের সকল বিশ্বাস নিঃশেষে বিস্মৃত হয়ে দেবেশ ব'লে চলল, তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটাই এ ক্ষেত্রে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। আর সে প্রসঙ্গ যদি উত্থাপন করাই হয়, তা হ'লে বলব, অপরাধের সবটাই অপর পক্ষের। আমি সৈনিককে বঞ্চনা করি নি, সৈনিক আমাকে বঞ্চনা করেছে। তুমি বাণীকে বঞ্চনা কর নি, বাণী তোমাকে বঞ্চনা করেছে।

তীব্র এই উক্তিটার প্রতিবাদ করল না মালতী। কিন্তু পুরোপুরি সমর্থনও যে করতে পারল না, তা দেবেশের জানতে বাকি রইল না। তাই সে আরও ব্যাখ্যা ক'রে বলল, বঞ্চনা নয় তো কি? এ তো জমিদারের অবর্তমানে তার জমি দখল করারই সামিল। তোমার আমার পরিচয় ছিল না। সেই অপরিচয়ের সুযোগে দুটি অনধিকারী ব্যক্তি তোমাকে আমাকে তাদের সম্পত্তি ব'লে চুরি করল। পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তে আসল মালিকানা প্রকাশ হয়ে পড়ল। অনেকগুলি বছরের অলীক দখল তৎক্ষণাৎ আমরা দুজনে অস্বীকার করলেম। জবরদস্ত অধিকার সত্ত্বেও আমরা অন্তরে ছিলেম একেবারেই শূন্য। তাই যে মুহূর্তে দেখা হ'ল, অমনই একটিমাত্র ক্ষণ আড়াল ক'রে দিল দীর্ঘ আড়াই বছরকে।

আমার বেলায় দশটা বছর।

তা হ'লেই দেখ, পূর্বেকার দখলটা কত নকল, কত মেকি!

ঠিক। কিন্তু আর সবাই যে শুধু সেই স্বত্বটাকেই স্বীকার করবে।

তারা যদি স্বত্বকে সত্যের উপর স্থান দেয়, তা হ'লে তুমি আমিও কি সেই অন্যায়ে সহায়তা করব?

দেবেশ, তুমি পুরুষ।

মালতী, তুমি মানুষ।

ওই দুটি কথা থেকে মালতী অপরিসীম শক্তি সংগ্রহ করল। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের নির্বোধ সংস্কারের নিষ্ঠুর বন্ধন তবু যেন ছিঁড়তে চায় না। ছেঁড়ে শুধু মালতীকে।

একটু থেমে দেবেশ আবার শুরু করল, মালতী, পাপপুণ্যের সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সংজ্ঞা নেই। কালে কালে তার পরিবর্তন। তবু মোটামুটি আমি সেই কাজকেই বলব পাপ, যার ফলে কাউকে ব্যথা দেওয়া হয়; আর তাকেই বলব পুণ্য, যাতে পরকে আনন্দ দিই।

দেবেশ, তুমি পুণ্যবান।

দেবেশের হৃদয় পূর্ণ হ'ল। মালতীর কানে কানে বলল, আর তোমার কথা আমি বলব?

আমিই বলি, এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর, তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা কর।

বলতে বলতে মালতী কেঁদে ফেলল। বৃষ্টিসিক্ত আননে এমনিতেই জলধারা অবিরত ব'য়ে যাচ্ছিল। অশ্রুধারা তার সঙ্গে মিলিত হ'ল।

দেবেশ মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করল মালতীর বেদনার পরিমাপ। এতক্ষণ সে সমাজ-সংস্কারকের মত তর্ক করছিল। সেই বক্তৃতার সুর পরিহার ক'রে বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলল, মালতী, মিছেই এতক্ষণ তর্ক করছিলেম। তর্ক চলে মানুষের পূর্বকল্পিত, সজ্ঞান কর্ম নিয়ে। মানুষ নিজে যা করে তাই নিয়ে। প্রাচীন গ্রীকরা জানত যে, বিবাদ করা চলে না অমোঘ ভাগ্য নিয়ে। ডেস্‌টিনি, নেমেসিস্‌ এসব নাম দিয়েছিল ওরা। ওই তালিকায় আর একটি নাম যোগ করতে হবে, সেটি প্রেম। এ কেউ করে না, এ ঘটে। এই ঘটনের আইন-কানুন মানুষের জানা নেই,

মানুষের আইন-কানুন তাই এর উপর খাটাতে যাওয়াই মূর্খতা। এই যে তুমি আর আমি, আজ বিকালেও কি আমরা জানতুম যে, আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে এমন ক'রে দুজনকে আবিষ্কার করব? এমন ক'রে একজন আর একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করব? একটুও না। একবারও কি এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে এসেছি যে, কাউকে বঞ্চনা করব? একটুও না। আমাদের এখানে আসার ফলে যদি কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের জন্যে সহানুভূতি হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু প্রতিকার কি এর? কিছু নেই। ডেস্‌টিনির মত নিঃশব্দে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর বঞ্চনার কথাই যদি বল, তুমি আর আমি বঞ্চিত হই নি? তুমি আর আমি এমন অনেক জিনিস হারাই নি, যাতে আমাদেরও অধিকার ছিল আর কারও চেয়ে কম নয়? তুমি আমি অভিযোগ করি নি, অভিযোগ ক'রে লাভ নেই ব'লে। যা পাই নি, আজ তা পেয়েছি। কল্পিত বঞ্চনার ভয়ে সেই পরমা-প্রাপ্তি অঞ্জলি ভ'রে গ্রহণ করব না এমন মূর্খ আমি নই। আমরা পরস্পরকে যা দিয়েছি আর যা পেয়েছি, তা একান্তই পরস্পরের জন্যে। এর আগেও তা আমাদের হৃদয়ে নিহিত ছিল, কারও কাজে আসে নি। আজ আমাদের একজন তা প্রত্যাখ্যান করলে আবার তা ফিরে যাবে আপন অব্যবহারের অন্ধ বিবরে, কারও কাজে আসবে না। অমিতব্যয়িনী প্রকৃতিও এমন অন্যায় অপব্যয় সহ্য করবে না।

বক্তৃতার উত্তেজনায় মালতীর হাতের মুঠি থেকে দেবেশের হাত একটু শিথিল হয়ে আসছিল। মালতী হাতটাকে আবার তুলে নিয়ে তার মুখের কাছে এনে তারই উপর ওষ্ঠ স্থাপন ক'রে বলল, দেবেশ, তর্ক বৃথা। যুক্তি বৃথা। পাপ ব'লে একে মানি নে। কিন্তু মানলেই কি অন্যথা করতে পারতেম? আজ সকালেও হয়তো পারতেম। এখন আর পারব না। পাপ ব'লে মানলেও না। যার গতি রোধ করবার সাধ্য আমার নেই, তার গন্তব্য নিয়ে গবেষণা ক'রে কি হবে? যেখানে যাবার সেখানে সে যাবেই। সেখানটা ভাল হোক মন্দ হোক, সে অবশ্যম্ভাবী। গতিটা যে স্বর্গের মধ্য দিয়ে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেটা প্রত্যক্ষ—

দেবেশ বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। মালতী তাকে নিঃশব্দে নীরব ক'রে দিল। তারপর আবার নিশ্বাস নিয়ে নিজের কথাটা শেষ করল, আর গন্তব্যে পৌঁছে যদি দেখি, সেটা স্বর্গ নয়, তা হ'লে তখনকার ব্যবস্থা তখন হবে।

এবারে দেবেশ মালতীকে নিঃশব্দ ক'রে দিয়ে নিশ্বাস নিয়ে বলল, মালতী, কালও স্বর্গ কথাটা শুনলে অবিশ্বাসের হাসি হাসতেম অবজ্ঞাভরে।

বৃষ্টি তখন অনেকটা শান্ত হয়েছে, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ভিজে জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়ে ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, আর যাই অপ্রতিরোধ্য হোক, নিউমোনিয়া নিবারণ করবার উপায় আছে এবং আর দেরি করলে সে উপায় থাকবে না। দুজনে সোজা হয়ে বসল। স্বপনে দোঁহে ছিল যে মোহে, জাগার বেলা হ'ল। উঠবার আগে দেবেশ বলল, মালতী, যাবার আগে শেষ কথাটি বল।

মালতীর ভাবতে হ'ল না এক মুহূর্তও। স্বতই অন্তরোত্থিত ধীর কণ্ঠে বলল, দেবেশ, আমি আজ পূর্ণ।

এই পূর্ণতারই জন্যে মালতী আর জানতে চাইল না দেবেশের শেষ কথাটি। তারও এমনই একটি কথা স্বতই মনে এসেছিল। আকাশের দিকে মাথা তুলে চোখ মুদে পরম প্রশান্তি সহকারে মন্ত্রের মত ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "*Nunc dimittis, nunc dimittis.*"

সতেরো

কিন্তু তা যে হবার নয়!

প্রকৃতির রীতিই নয় যথাস্থানে ইতি। ফুল ফুটে শান্ত হয় না, ঝরে। ফল পেকে ক্ষান্ত হয় না, পচে।

পৃথিবীতে তাই শেষ আছে, সমাপ্তি নেই। মৃত্যু নেই, আছে শুধু অকালমৃত্যু। তার কোনোটা আগে, কোনোটা বা পরে। যথাকালে নয় কখনোই।

হ'তে পারে বিধাতা ল্যাটিন জানেন না। হ'তে পারে জেনেও, বুঝেও, তিনি দেবেশের প্রার্থনা উপেক্ষা করেছেন।

কারণ যাই হোক, ত্রিকোণ পার্ক থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার

সময় প্রবল বারিপাত হ'ল, কিন্তু বজ্রপাত হ'ল না। দেবেশ নিরাপদে বাড়ি পৌছাল।

পূর্ণা মালতী পূর্ণতার কথা ঘোষণা করলে। কিন্তু বাহু প্রসারিত করলে আরও-র আশায়। না ক'রে পারলে না। অতএব—

কিন্তু, সে যে আর এক কাহিনী, ওয়াটসন।

শেষ

"রঞ্জন"

অমরাবতী ?

বিচিত্রচূড় অমরাবতীর স্বপ্নসরল তোরণদ্বার—
দেখা কি যায় ?
কেটে কি গিয়েছে অনেক দিনের আহত আতুর অন্ধকার
হয়েছে কি শেষ বিশ্বছিন্ন মনের ব্যর্থ যন্ত্রণার
সূর্য উঠেছে পূর্বাশায় ?
অমরাবতীকে আমি ভেঙেছি গড়েছি,—আজকে তাই
অন্তরে আসে,—আলোয় আঁধারে হাজার রূপের ব্যঞ্জনাই
উঠেছে পড়েছে,—কত গম্বুজ নীলাভ্রলীন মিনারচূড়
মসৃণাকাশে ডানা-মেলা চিল—রোদে ঝলমল কত দুপুর
মানস-ক্রান্তি চক্রে ঝলসে অমরাবতীর সীমানাটাই
অমরাবতীর নিঃসীমাকাশে, ছায়াস্তব্ধ গহনতায়
এক হয়ে গেছি কত না বার
হঠাৎ ফুটেছে দীপ্তিকুসুম, তমিস্রলীন এ চেতনায়
ফোয়ারার মত ফুটেছে জীবন, তারা কোন বাধা
মানে নি হায়—
শিলা-স্তূপের কঠিনতার
দেখা কি যায় ? দেখা কি যায় ?
অমরাবতীর তোরণদ্বার ?
এখনও কি সেই পাতালপুরীর সিক্ত সবুজ অন্ধকার
নিমেষে নিমেষে নিঃসাড় শিরা বেড়ে ওঠে তার জীবনটার
এখনও হায় ?

বিপ্লবান্তে

প্রকাণ্ড শহর। অসংখ্য তার অধিবাসী। সকাল থেকেই সমস্ত শহর জুড়ে অদ্ভুত চাঞ্চল্য। দেশবিখ্যাত বিপ্লবী নেতাকে আজ সমস্ত দেশ একযোগে অভিনন্দন জানাবার সঙ্কল্প করেছে। পাঁচ শো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ দু হাতে কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে দিয়েছেন এই মহামানব। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রদূতকে যোগ্য সম্মান দেখাতে সমস্ত দেশের উদ্ভাবনী-শক্তি আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর তখনও শেষ হয় নি। অতিকায় ময়দানটি দেখতে দেখতে জীবন্ত নরমুণ্ডের সমুদ্র হয়ে উঠল। মাঠের পাশ-ঘেঁষা বড় বড় গাছগুলো মানুষে-আঁটা স্তম্ভের মত দেখাতে লাগল। নতুন পাওয়া স্বাধীনতার কড়া আমেজে শান্তিরক্ষীর দল বিব্রত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সমস্ত জনতা পাগলের মত একসঙ্গে চীৎকার ক'রে মহামান্য অতিথির শুভাগমন ঘোষণা করল।

দীর্ঘকায় একটি মানুষের দেহের অবশেষ কোন রকমে অভ্যর্থনামঞ্চে আরোহণ ক'রে চারদিক একবার চেয়ে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিক থেকে জনতা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল।

মাইকের সামনে স'রে এসে তিনি দুটি হাত জোড় করলেন।

আপনারা শান্ত হোন।—তিন-চারবার একই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

বক্তার বিনয়ে অভিভূত হয়ে আরও ক্ষেপে গেল জনতা। জয়ধ্বনি ক্রমশ উন্মত্ত সৈনিকের যুদ্ধকোলাহলের মত শোনাতে লাগল।

হঠাৎ অভ্যর্থনামঞ্চের দিকে চেয়ে সমগ্র জনতা যেন পাথর হয়ে গেল, শীর্ণদেহের খোল থেকে যেন এক অতিকায় দৈত্যের আবির্ভাব হয়েছে—হাত দুটো তাঁর আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

মাইক্রোফোনের বুক চিরে অমানুষিক উদ্ধত স্বর বেজে উঠল।—আপনাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি ভক্তিমান কে, হাত তুলে জানান।

মৃদু চাঞ্চল্যের একটা ঢেউ ব'য়ে গেল জনতার ওপর দিয়ে—একখানা হাতও উঠল না।

অনেক অন্যায় কাজ আমি করেছি। দেশের অন্তত আট আনা

লোক আমার মতের বিরুদ্ধতা করত। আমি কি মনে করতে পারি না, এর মধ্যে অনেকেই আমাকে ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা করেন না?

বিরাট জনসমাগম তখনও নীরব হয়ে রইল।

কি চান আপনারা?

এতক্ষণে অভ্যর্থনামঞ্চের ওপর একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে আজকের এই সভা ডাকা হয়েছে।

আমাকে? না, আমার বিপ্লবী শক্তিকে?

যদি বলি আপনাকে?

আমাকে? সঙ্গে সঙ্গে অতিকায় মূর্তি স'রে গেল। আবার সেই জীর্ণ দেহ—ক্লান্ত দুটি চোখের মধ্যে প্রাণশক্তি শ্বাস টানছে।

আপনাকে। আমাদের উদ্ধারকর্তাকে। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতাকে।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা উঠল জনসমুদ্রের ভেতর থেকে।

সভার কার্য আরম্ভ হ'ল—অনর্গল বক্তৃতা, প্রশস্তি-অভিনন্দন-জ্ঞাপনের পর যথারীতি সভা ভেঙে গেল।

মহামান্য অতিথি সারাক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। কিসের এ নিস্তব্ধতা? রণক্লান্তি? ঊদাসীনতা? ভাবাবেগের আতিশয্য? কে জানে?

সুসজ্জিত গাড়ি অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। গাড়ির পাদানিতে পা দিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। বহুদিন আগেকার সহকর্মীদের একসঙ্গে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আজন্মবিপ্লবীর গৌরবময় অতীত যেন কানমলা খেয়ে মুখ নীচু করল। তবুও তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন, ভেলভেট-মোড়া পা-রাখবার জায়গায় পা ডুবিয়ে দিলেন। সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে গাড়ি যেন পিছলে চলতে লাগল। নানা রঙের আলো আর নানা সাজের মেয়ে-পুরুষের ভিড়ে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কিসের এ বৈচিত্র্য? কত জনপদকে অস্থিচর্মসার ক'রে এই অমরাবতীর জৌলুস? বাড়িতে বাড়িতে তোরণ, ফুলে পাতায় জড়ানো রঙিন কাপড়ের স্তূপ, সুদৃশ্য পতাকার ছড়াছড়ি। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে বিপ্লবীর মন। ক্ষয়রোগীর চলচলে মুখের মত মনে হচ্ছে এই শোভাসম্পদ।

দেখতে দেখতে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন তিনি। দরবার-কক্ষ। তোপধ্বনি থেকে আরম্ভ ক'রে গার্ড অফ অনারের মুখস্থ অনুষ্ঠান কিছুই বাদ গেল না।

আমাকে বলতে পারেন—এ পূজা, না, আত্মপ্রসাদ ?

সমস্ত দেশবাসী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েও আজকের এ অনুষ্ঠান শেষ করতে পারবে না, আপনার ঋণের এক আনাও শোধ হবে না।

চেয়ে দেখলেন তিনি, লাবণ্য-উপচে-পড়া একটি মহিলা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। শুকনো মালতীমঞ্জরীর সদ্য-জল-পাওয়া সজীবতার মত এই নারীসুষমা বহু ঝড়-ঝাপটা লাগার সব চিহ্নগুলো এখনও ঠিক ঢাকতে পারে নি। ব্রতচারিণী তাপসীর শৃঙ্গারসজ্জার মত বিসদৃশ লাগল এই পরিবর্তন।

আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

স—কে চিনতে পারছেন না ?

আরে ? অ— যে ! তোমাকে আর চেনাই যায় না।

গুপ্ত আন্দোলনের আদিপর্বের ছোট্ট একটি মেয়ে—ফিনফিনে পাতলা, আদর্শবাদে ভরপুর, নিজের গায়ের গহনা বিক্রি ক'রে কতদিন তাদের খাবার জুটিয়েছে। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে দু-দুবার অ—কে বাঁচাতে পেরেছিল সে। আর আজ ? অ—র দেহে জমেছে মেদ, আর স—র মুখে দপদপ করছে বিলাসচর্চার চিহ্ন !

পারছি। তবে নামগুলো তোমাদের বদলে রেখো। জান তো, মানুষ বেঁচে থেকেও বহুবার জন্মায় আবার মরে।

তা বটে। সেই জন্যেই তো আপনাকে ফিরিয়ে এনেছি। ভাঙার কাজ তো হ'ল, এবার গড়ার কাজের ভিতপত্তন আপনি নিজের হাতেই করুন।

কালবোশেখী ঝড়ের মতন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বিপ্লবী। সমস্ত লোকের বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেছে।

ভয় নেই, ওটা ফাঁকা আওয়াজ। বারুদ পুড়ে গেছে, শুধু খোলটা প'ড়ে আছে। ঝড় যখন ওঠে, ঝিরঝিরে মলয় তখন মিনিটে মাইল ছোটে—সেটা বাতাসের বাহাদুরি নয়, উত্তাপের কারসাজি। কিন্তু

এক হাতে ভাঙব আবার এক হাতে গড়ব, সে রকম বহুরূপীর হাত তো আমার নেই।

কি বলছেন আপনি? আপনার প্রতিভার সীমা আছে? আপনি না পারলে কে পারবে? স—র লাবণ্য স'রে গিয়ে কঠোরতা আত্মপ্রকাশ করছে একটু একটু ক'রে। স—র চোখের বিদ্যুৎ প্রদীপের শিখার মত স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। এতক্ষণে বিপ্লবী যেন তাঁর অভ্যর্থনার আসন খুঁজে পেলেন।

গদিমোড়া দামী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গুনে গুনে পা ফেলে অনেক দূর চ'লে গেলেন। ছায়ার মত স— তাঁকে অনুসরণ করল। কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল সবাই।

তুমি কোথায় যাচ্ছ স—? হঠাৎ যেন বিষধর সাপ দেখে দাঁড়িয়ে গেল স—।

আপনি কোথায় চললেন?

তা তো জানি না।

এখনও কাজ শেষ হ'ল না। অনুষ্ঠানের অনেক কিছু বাকি। দশ বছরের বালিকার মত চোখের তারা নেচে উঠল স—র।

বাকিটা ওরাই সেরে নেবে। একটা কথা আমার রাখবে?

বলুন।

পুরানো জিনিসের ওপরটা রঙ লাগিয়ে চকচকে করলে তার ভেতরের দোষটা যায় না। সে জোড়াতালি বেশি দিন চলে না। নিজের জীবনটা যদি ঠিকমত যাচাই করতে চাও, তার ফাঁকগুলো ভাল ক'রে দেখো, তা হ'লে মিথ্যের ভরাডুবি থেকে নিজেও বাঁচবে, অনেককে বাঁচাতেও পারবে।

অস্পষ্ট আলোয় স—র মুখখানা যেন বড্ড লাল দেখাল।

চেষ্টা করব। কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে যাওয়া কি আপনার ভাল হচ্ছে?

তোমরা তো সবাই রয়েছ। আমাকে বাদ দিয়ে ওটা কি তোমরা সেরে নিতে পারবে না?

প্রচ্ছন্ন অভিমানের মত কি একটা কানে যেতেই স— সোজাসুজি এসে বিপ্লবীর দুখানা হাত ধ'রে ফেলল।

কি বলছেন আপনি? আপনার মত অভিজ্ঞতা কারুর আছে, না, অত শক্তি কারুর আছে?

স—, তুমি বিপ্লবের ছায়ায় মানুষ হয়েছ, তাই শক্তির ভেল্কিবাজিই তুমি বড় ক'রে দেখতে শিখেছ। দেখ, বড় বড় দিগ্বিজয়ী বীর যখনই অস্ত্র ফেলে দিয়ে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার সারা জীবনের সঞ্চয় ফাঁকির চোরাবালিতে লেগে বানচাল হয়ে গেছে। কেন জান? আগুন যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ ভালমন্দ অনেক কিছুই সে পুড়িয়ে ফেলে, কিন্তু আগুন নিবে গেলে তার আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তলোয়ারের কাজ মিটে গেলে তাকে তুলে রাখাই ভাল।

বিপ্লবী তখন অনেক দূর চ'লে গেছেন। তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল স—।

শক্তির সামঞ্জস্য করা কি শক্তিমানের ধর্ম নয়?

ওর জবাবটা তোমার মুখ দিয়ে শোনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

আরও কিছুদিন পরে। সমস্ত দেশটা প্রায় চ'ষে ফেললেন বিপ্লবী। ছোট বড় শহর, নগণ্য পাড়াগাঁ সব যেন এক সুরে বাঁধা। প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই, সৃজনী-প্রতিভা যেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বহুদিনের পরাধীনতার বিষ সমাজ-অঙ্গের প্রত্যেকটি স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। এতদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে কি পেল দেশ? এ স্রোত কি আর ফিরবে না? নিজের মধ্যে কোন শক্তি, কোন অবলম্বন আর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

প্রকাণ্ড একটা মাঠের ধারে বটগাছের ছায়ায় একলা ব'সে আছেন বিপ্লবী, দুপুরের অগ্নিবর্ষী আকাশ তখন অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে। মেয়ে-পুরুষে মিলে ছোট্ট একটা দল তাঁর সুমুখ দিয়ে চ'লে গেল, সারাদিনের পরিশ্রমে মুখগুলো তাদের শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু চোখ অত্যন্ত লাল, চলনভঙ্গীর কোন সঙ্গতি নেই। ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে জ্বলতে লাগল তাঁর, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

হাট থেকে বেচা-কেনা সেরে ঘরে ফিরছে চাষীর দল, অশ্লীল গানের ফোয়ারা ছুটেছে তাদের মুখে। বর্বর যুগের তাজা রক্তের উল্লাস এতদিন পরেও তো মিলাল না।

মহকুমা-আদালত থেকে কাতারে কাতারে লোক ফিরে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীকে পীড়ন করার আত্মপ্রসাদ তারা আর চেপে রাখতে পারছে না।

মনুষ্যত্বের পরিপন্থী বেসুরো গুঞ্জন অসহ্য লাগছে বিপ্লবীর। এইভাবেই কি মানুষ বাঁচবে? এ সমস্ত কি বাস্তব? দু হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

আপনার কি অসুখ করেছে?

এ কি? এ স্বর যে নতুন! চোখ চেয়ে দেখলেন তিনি, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী একটি যুবক, কোলে তার সাত-আট বছরের একটি বালকের কঙ্কাল।

হ্যাঁ। আমি অসুস্থ।

কোথায় যাবেন আপনি?—জিজ্ঞাসার প্রত্যেকটি অক্ষর আন্তরিকতায় ভরা।

ঠিক বলতে পারি না।

আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

কোন কথা না ব'লে বিপ্লবী তাকে অনুসরণ করলেন। মাঠ পার হয়ে ছোট্ট একটা গ্রামে এসে পৌঁছলেন তিনি।

ছেলেটি আপনার কে?—জিজ্ঞাসা করলেন বিপ্লবী।

আমার ভাই।

কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা সুপ্রশস্ত অঙ্গন পার হয়ে ছোট্ট একখানি মাটির বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়াল যুবকটি। চারদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার জমতে আরম্ভ করেছে।

আপনি একটু বসুন। ছোট্ট একখানি বেতের চেয়ার এগিয়ে দিল ছেলেটি। ঘরের দোর ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি দড়ির খাট পাতা, আর তার ওপর হাসপাতালের অনুকরণে অল্পবয়সী ছেলেরা শুয়ে আছে। তাদের দেখাশুনা করছে একটি স্ত্রীলোক, অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল দেখা গেল না।

এই নাও দিদি। বাপ মা এর দুজনেই মারা গেছে, এরও আর বোধ হয় বেশিদিন নেই।

রুগ্ন ছেলেটি স্ত্রীলোকটির কোলে তুলে দিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আপনার কি হয়েছে বলুন তো?

এটা কি হাসপাতাল?—বিপ্লবী জিজ্ঞাসা করলেন।

বিশেষ কিছুই নয়। এই সময় সমস্ত দেশটাই প্রায় হাসপাতাল হয়ে ওঠে। কাজেই এইটুকুকে অত বড় নাম দিলে মিথ্যে কথা বলা হয়। তবে যারা অনাথ, একেবারে অসহায়, তাদের বাঁচাবার সামান্য একটু চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিপ্লবী। ঋজু দেহের সতেজ ভঙ্গী দেখে চমকে উঠল যুবকটি।

আপনি বিশ্রাম করবেন না?

না। তোমাকে দেখে আমার সমস্ত রোগ সেরে গেছে। তোমার হাসপাতাল, অনাথ-আশ্রম, সেবাব্রত এ সমস্ত তোমার মনের ঐশ্বর্য। ওর দাম যতই হোক, তোমার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। তোমার সৃষ্টি যেন কোনদিন তোমার চেয়ে বড় না হতে পারে—এই আশীর্বাদ আমি তোমায় ক'রে গেলাম।

ক্ষিপ্রপদে অনেকটা এগিয়ে গেলেন বিপ্লবী।

আমার জবাবটা শুনে গেলেন না?

পেছন ফিরে চাইতেই স—র চোখের সঙ্গে তাঁর চোখ মিলে গেল। সেই স—, আদিকাণ্ডের উদ্দীপনাময়ী স—।

জবাব আমি পেয়েছি। কিন্তু সাবধান। আলো জ্বেলেছে ছেলেটি, তার শিখাটুকু বুকে ক'রে নিয়ে আমি চললাম। আগুন যদি কোনদিন জ্বলে, তার জন্যে দায়ী হবে তুমি। বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত পাকিয়েছিলে কিনা, তাই এই কথা বললাম।

ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আর তাঁকে দেখা গেল না।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

এ যুগের

কুকুর এ সমাজেই র'য়ে গেল,
কেন যে,
পৃথক সমাজ গ'ড়ে তুলল না
অন্য অনেক চতুষ্পদী প্রথায়
কে জানে ?
হয়তো সুনিবিড় আকর্ষণে,
মানুষকে আপন করে,
মানুষে প্রভুত্ব আরোপ করে,
আত্মবিলোপী সাধনায় নিমগ্ন হ'ল
রইল ভূতলে,
পদতলে,
অঙ্গনে,
বাঁধন মেনে নিল শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে।
মানুষকে সে দিল সব,
দিল তার সদা-জাগ্রত মন
তার স্বার্থ, তার জীবন,
দাক্ষিণ্যের শেষ রইল না কোথাও।
অনুকম্পার চোখে মানুষ
দান গ্রহণ করল।
কিন্তু দান এবং গ্রহণ,
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে
তাই মানুষ, বিস্মৃত মুহূর্তে
নির্ভরতা আর বিশ্বাস
অর্পণ করল কুকুরে,
যা অত্যন্ত ন্যায্য প্রাপ্য ছিল
অন্য মানুষের
তা আর হ'ল না।
এবং অজানিতে
ঠাঁই পেল পদলেহনবৃত্তিতা
মানুষের মনে।

আরতি রায়

যা দেখছি

[লেখক দীর্ঘ সাতাশ বৎসর আমেরিকায় বাস করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমাদের দেশের অবস্থাদৃষ্টে বিচলিত হইয়া আমেরিকায় অবস্থিত তাঁহার আত্মীয়াকে যে পত্রাঘাত করিয়াছেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম]

তুমি বোধ হয় আমার গত পত্রখানা একটু ভুল বুঝেছ। আমি তো কাউকে গাল দিই নি।—শুধু দুঃখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের কথা কটি মনে আছে?—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎ র্সনা"। —আমারও তাই।

এতকাল পরে দেশে ফিরে, দেশের অবস্থা দেখে—বিশেষত বাংলা দেশের হাহাকার দেখে, চোখে জল না এসে আর পারে না। আর ভৎর্সনা করব কাকে? আমার ভৎর্সনায় ভয়ই বা হবে কার? ভয় দূরে থাক্, বোধ হয় লজ্জাও আমাদের ছেড়ে পালিয়েছে।

এত দুঃখ কেন করি জানতে চেয়েছ। তবে শোন একটা ছোট্ট কথা। এই কলকাতারই কথা। যে কলকাতার বড়াই আমরা এতকাল ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ক'রে এসেছি। মনে পড়ে, কতবার বিদেশীদের কাছে বড়াই করবার যা ছিল তার তো বড়াই করেছিই, উপরন্তু অনেক সময় আবার যা ছিল না তাও ধার ক'রে বিদেশীদের কাছে ধরেছি। কলকাতা কত সুন্দর তা প্রমাণ করতে কত চেষ্টা করেছি। সে কলকাতা ও আজকার কলকাতায় পার্থক্য অনেক। কলকাতার স্বাস্থ্য, কলকাতার সৌন্দর্য, কলকাতার বিশেষত্ব এখন শুধু আমাদের পূর্বস্মৃতিতে।

আমার চোখের জলের কারণ শুধু তাই নয়, আরও আছে। দুর্ভিক্ষের সময় বা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়, অথবা বিগত যুদ্ধের সময় যেসব বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে, তা নিজে দেখি নি; তাই তার কথা এখন বলব না।—যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু আমার কান্না আসে তার পরে আমরা কি করেছি তাই দেখে। এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন তো আমাদের নিজেদের মন্ত্রীত্ব, নিজেদের গভর্নরত্ব, নিজেদের পুলিসত্ব হয়েছে; এমন কি, বাংলার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক।

সকলেই আশা করেছিল যে, এ মন্ত্রীত্বে আর কিছু হোক বা না হোক, অন্তত কলকাতার ঘর-বাড়ি রাস্তা-ঘাটগুলো একটু পরিষ্কার হবে; আব কোনও বিভাগে কাজ হোক বা না হোক, অন্তত স্বাস্থ্যবিভাগের কাজটা খানিকটা দৃষ্টি পাবে; আর কিছু হোক বা না হোক, অন্তত কলকাতার লোকগুলোকে দিনরাত কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু শুনলাম, কাজে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। এবার যত লোক ঐ সব রোগে মারা গেছে বা যত লোক আক্রান্ত হয়েছে, অন্য বহু বছরের মধ্যে এমন নাকি হয় নি। এত বেশি প্রাণ এ রকম রোগে এত সহজে নাকি যায় নি।

অথচ কি ক'রে যে এর প্রতিকার করা যায় সে উপায় যে এঁরা জানেন না, তা নয়। জানেন এবং খুব ভাল ক'রেই জানেন। অথচ আমাদের কলকাতায় দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়,—এই বুঝি কলেরা হ'ল, এই বুঝি টাইফয়েড ধরল, ইত্যাদি।

চোখের জল কেন জান? আমাদের সোনার বাংলার দুর্দশা দেখে। বাংলা দেশে এসে অবধি বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তা ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাদের এর আগে কখনও চিনতাম না, অর্থাৎ জন্মায় নি। যাদের আমি চিনতাম, তাদের বহু লোকই চ'লে গেছে। সে দোষটা আমি সম্পূর্ণ মন্ত্রীদের বা দেশের নেতাদের উপর চাপাতে চাইছি না। আমারই জানা উচিত ছিল যে, এতকাল এরা সবাই যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে যমরাজের কাছ থেকে ছুটি পাবে, তা সম্ভব নয়। দু-পাঁচ বছর না হয় কোনও রকমে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু আমি যে একেবারে সাতাশ বছর কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাব, আর তারা সব কলেরা টাইফয়েড যক্ষ্মা ম্যালেরিয়াকে চাপা দিয়ে রাখবে তা আমি আশা করতে পারি না। সে যা হোক, মনে মনে আমি কেবলই ভাবছি যে, স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের দেশে ও আমেরিকাতে কত তফাত! কই, এত বছর ও-দেশে তো এই সব রোগের জন্য আতঙ্ক হয় নি? আতঙ্ক দূরের কথা, অনেকে এসব রোগ কেমন তাই-ই জানে না।

কলেজের ছাত্ররা এসব রোগ শেখবার জন্য শুধু বইয়ের ছবি ছাড়া, সাধারণত জীবন্ত রোগী দেখতে পায় না। আমার বেশ মনে আছে,—হঠাৎ একদিন খবর এল যে, এক ভারতীয় জাহাজের একটি ভারতীয় খালাসীর ম্যালেরিয়া হয়েছে এবং চিকিৎসার জন্য তাকে কলম্বিয়া হাসপাতালে আনা হয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের সে কি উৎসাহ! এবং আমার কি অতিরিক্ত খাতির, কেন না সেখানে একমাত্র আমিই তার ভাষা জানি এবং একমাত্র আমিই তার রোগের কথা সব নিজের ভাষায় শুনে অন্য সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারি। উৎসাহ এই যে, এবার যখন কাঁপিয়ে জ্বর আসবে, তখন সেই রোগীটির রক্ত নিয়ে সকলে যার যার নিজের মাইক্রোস্কোপে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করতে পারবে। এ রকম সৌভাগ্য ওদেশে অতি কম ছাত্রের জীবনে ঘটে। অথচ, ম্যালেরিয়া যে ওদেশে কখনও ছিল না বা টাইফয়েড ছিল না বা এখনও নেই, তা নয়। এমন কি যক্ষ্মাও ওদেশে আছে। কিন্তু তফাত কত! গভর্মেণ্ট কত অর্থ ব্যয়ে এসব রোগ নির্মূল করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আর কোথায় আমরা? কত দূরে প'ড়ে আছি! তাতেই বলছি—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা"।

কলকাতার সংবাদপত্রে রোজই সংবাদ থাকে যে, কতগুলি লোক কলেরা বা প্লেগ বা বসন্তে মারা যায়। অন্য রোগের কথা দেওয়া হয় না। এগুলি দারুণ ছোঁয়াচে রোগ ব'লেই এর সংখ্যা দেওয়া হয়। যাই হোক, উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, এটা পড়লে সকলে একটু সাবধান হতে পারবেন যে শহরে ছোঁয়াচে রোগ চলছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীরা বেশ সুশিক্ষিত। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই তা বেশ সহজে বোঝা যায়। তাঁদের শিক্ষা বা তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য কোনও দেশের তুলনায় কিছুই কম নয়। এমন কি অনেকগুলিকে মনে হয়, অতি উপযুক্ত, অতি অভিজ্ঞ। কিন্তু কেমন ক'রে যে এঁদেরই রাজত্বে কলকাতার মত শহরে এসব ব্যাধির বিভীষিকা অনায়াসে চলতে পারে, তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। তাতেই আমি তোমায় লিখেছিলাম—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা"। এই কলকাতায়

ব'সেই কয়েক মাস আগে দেখেছি যে, দৈনিক কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে—অথচ কলকাতার প্রায় সকল রাস্তার মোড়ে—এমন কি বিখ্যাত এসপ্ল্যানেডে (যার সঙ্গে নিউইয়র্কের টাইম্‌স্‌ স্কোয়ার বা লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাসের তুলনা করা হয়) নানা জাতীয়, নানা ধর্মীয় ও নানা ভাষীয় ফেরিওয়ালারা অনায়াসে খোলা থালাতে নানা রকমের মিষ্টান্ন নিমকি কচুরি প্যাঁড়া ও বিভিন্ন রকমের টুকরা টুকরা ফল—শশা, আনারস, কাঁঠাল, আম প্রভৃতি বিক্রি ক'রে বেড়াচ্ছে এবং বহু মাছি এর সবগুলিরই আস্বাদ গ্রহণ ক'রে সানন্দে ভোঁ-ভোঁ করছে। কয়েকবার কয়েকজন কাগজে এর প্রতিবাদ ক'রে জিজ্ঞাসা করেছেন—কলকাতার স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তারা কোথায়? করছেন কি? পুলিস করছে কি? তারা কি দেখে না? গুজব শুনি যে, স্বাস্থ্য-বিভাগের ইন্সপেক্টররা সবই জানেন, সবই পড়েন এবং সবই শোনেন। তবু ফেরিওয়ালারা বেশ দু-পয়সা ক'রে নিচ্ছে। দুষ্ট লোকেরা বলে, ওসব ঘুষে হয় মশায়, ওসব ঘুষে হয়, ঘুষেই জগৎ চলছে। একদিন প্রশ্নটি আমি কোনও একজন উচ্চ পুলিস-কর্মচারীকে করেছিলাম। উত্তরে তিনি আমায় বেশ একটু অবাক ক'রে দিলেন। তাঁর মতে সাধারণ লোকেরই দোষ। বললেন যে, পুলিস বহুবার ঐসব ফেরিওয়ালাদের জিনিস নষ্ট ক'রে দিয়েছে, এমন কি একবার তার ছবি পর্যন্ত কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু আবার তার পরদিনই সেই ফেরিওয়ালারাই নূতন জিনিসপত্র নিয়ে হয়তো নূতন কোনও জায়গায় আশ্রয় নেয়—এবং এখানেই, তাঁর মতে, সাধারণ নাগরিকদের দোষ যে, তারা আবার ওইসব ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে ওইসব জিনিস কিনতে প্রস্তুত। আমি বললাম যে, তা যদি সত্য হয়, তবে প্রমাণ হচ্ছে যে এখানকার ফেরিওয়ালাদের দক্ষতা আপনাদের স্বাস্থ্য-বিভাগ বা পুলিসের চেয়েও বেশি। তবে এ রকম অযোগ্য স্বাস্থ্য-ইন্সপেক্টর বা পুলিস রাখার দরকার কি? তখন ভদ্রলোক বললেন যে, পুলিস ঠিক অযোগ্য নয়—তবে তাদের পেটেও বেশ ক্ষিদে থাকা স্বাভাবিক। ওইসব ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে শুধু এটা ওটা ভাজা, অর্থাৎ ফেরিওয়ালাদের থেকে বিনাবাক্যব্যয়ে পেট পোরানো সব সময়ে সম্ভব

নয়। গভর্মেণ্টও তাদের মাইনে বাড়াবে না, কেন না টাকা নেই। অথচ জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে আরও বাড়ছে যুক্তসংসারের সন্তানের সংখ্যা। সুতরাং বুঝেই দেখুন এ অঙ্কের উত্তর কি ? অর্থাৎ অঙ্কটি হ'ল এই যে, পুলিসে যারা কাজ করে, তাদের পেটেও আমাদের পেটের ক্ষিদের মত ক্ষিদে আছে, তাদের সন্তানসন্ততি আছে, যুক্তপরিবারের দায়িত্ব আছে, মেয়ের বিয়ের যৌতুক আছে, মা-বাপের শ্রাদ্ধ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, অথচ উল্টো দিকে তার মাইনের পরিমাণ অতি কম। বেশি হওয়া অসম্ভব, কেন না গভর্মেণ্ট অরাজি। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ; তা কমাবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, লাভের জন্যে অনেকে তার প্রশ্রয় দিচ্ছে। গভর্মেণ্ট তাতে নাকি আবার নানা রকমের পারমিট ও লাইসেন্স বসিয়ে এবং সপ্তাহ অন্তর নিজেদের মত বদলিয়ে ব্যবসায়ীদের বেশ দু-পয়সা খরচা করিয়ে দিচ্ছেন। আমায় বেশ সহজে বুঝিয়ে দিলেন যে, পারমিট বিনামূল্যে হয় না। তারা তো আর সে বাজে খরচটা বাদ দিয়ে দেবে না। তারা সেটা জিনিসের দামের ওপরই বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে হচ্ছে এই যে, নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম ক্রমে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। সুতরাং এখন নিজেই বিচার ক'রে দেখুন, সমস্যাপূরণ নিজেই করতে পারবেন—এদের বাকি টাকা আসছে কোথা থেকে ?

আমি বললাম, পুলিস যদি প্রকৃত ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, তবে তারা এসব বে-আইনীগুলো একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে পারে ; সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। দরকার শুধু পুলিসের উপরওয়ালাদের একটু কড়া হুকুম। তাঁরা যদি বলেন, যে কেউ আইন অমান্য করবে তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে, যে পুলিস যে কোন কারণেই হোক তার কর্তব্য পালন না করবে তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে, তবে কতজন আর আইন ভাঙতে সাহস করবে ? এর উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে আরও একটু বেশি অবাক ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, মশায়, আপনি বহুকাল দেশে ছিলেন না। তাই দেশকে ভুলে গেছেন। আপনি জানেন না যে, আইন ভাঙাটাই

আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। গান্ধীজীর আমলে দেশের লোক নির্ভয়ে আইন ভাঙতে শিখেছে—আইন ভেঙেই জেলে গেছে। যত বেশিবার আইন ভেঙেছে তত বেশিবার জেলে গেছে,—আর যে যত বেশিবার জেলে গেছে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর তত বেশি তার দাবির মাত্রা বেড়ে গেছে।

আমি এটা অপেক্ষাকৃত সহজেই বুঝলাম। কেন না ইংরেজ-আমলে যেসব আইন ভাঙা হয়েছে, সেগুলো বে-আইনী আইন ছিল। তাই গান্ধীজী সেসব আইন ভাঙতে দেশের লোককে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর এখন আমাদের স্বাধীন দেশের যেসব মঙ্গলকর আইন—অর্থাৎ যে আইন না থাকলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, সংসার ভেঙে যায়, দেশ চলতে পারে না,—সে আইন ভাঙলে দেশের উপায় কি? তিনি আমায় একটু আশ্বস্তি দিতেই বোধ হয় বললেন, অত বেশি ভাববেন না, অত সহজে মন খারাপ করবেন না। সবে দেশে এসেছেন, আরও কিছুদিন দেশে থাকুন, আরও খানিকটা দেশের দশা দেখুন। দেখবেন, তখন অত খারাপ লাগবে না। অনেকটা গা-সওয়া হয়ে যাবে। দেখবেন, কত জেলকয়েদী কত কি করছে! দেশের বর্তমান নেতারা প্রায় সবাই তো জেলকয়েদী, তা জানেন। সুতরাং আপনার মন খারাপ করার দরকার কি?

জানি না, এর উপরে আর আমার বলবার কি আছে? এ কথা সত্যি যে, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে জেলে গেছেন—ইংরেজরাজের অনেক অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করেছেন, তাঁরা দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশশাসনের উচ্চস্থান অধিকার করবেন। কিন্তু তাঁদের শাসনের নমুনা দেখে আমার চোখে জলই এসেছে। অনেকে বলে যে, তাঁদের অনেকেই শাসনের কাজে অনুপযুক্ত। এমন কি কোন কোন দুষ্টলোক আবার বলে যে, তাঁদের কেউ কেউ একমাত্র জেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজেই অক্ষম। অবশ্য আমার মনে হয়, অতবড় অপবাদ একটু অতিরিক্ত হ'ল। সে যাই হোক, আসল কথা এই যে, দেশের অবস্থা খুব ভাল নয়। এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করে। যে অদম্য উৎসাহ নির্ভীক প্রাণ

ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ নিয়ে দেশ স্বাধীন করতে আমাদের দেশের লোক এক সময়ে উন্মত্ত হয়েছিল,—সেই উৎসাহ, সেই প্রাণ, সেই ত্যাগ আবার আমাদের সকলের ভিতর আনতে না পারলে দেশের দুর্দশার সীমা থাকবে না।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ যে, পুলিসের উপর আমার এত দাবি কেন? আমার উত্তর হ'ল এই যে, দেশের শান্তি বজায় রাখতে, দেশের আইনগুলোকে কার্যকরী করতে এবং দেশবাসীর প্রাণে বল দিতে পারে একমাত্র পুলিস। পুলিসের হাতেই এর কলকাঠি আছে,—তারাই এর মন্ত্রতন্ত্র জানে। তারা যদি প্রকৃত চেষ্টা করে (অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে আইন না ভাঙে), তবে দেশের শান্তি রক্ষা হয়। কেউ বে-আইনী ক'রে শান্তি ভঙ্গ করতে পারে না। কিন্তু সেইখানেই আমাদের মস্তবড় গলদ। তাতেই আমি লিখেছিলাম—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা"।

তোমার পত্রের ভাষায় মনে হ'ল, তুমি আমার সব কথাগুলো বিশ্বাস কর নি। তোমার যেন একটু ধারণা এখনও আছে যে, আমি এর আগে পুলিসের সম্বন্ধে যা-সব তোমায় লিখেছি, তার খানিকটা অতিরঞ্জিত। বহুকাল আমেরিকায় বাস ক'রে তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে পার নি যে, কোনও লোক এক আনা দু আনা বা চার আনা ঘুষ নিতে পারে। কিন্তু এ পোড়া দেশে, এ গরিব দেশে ও-রকম ঘুষ বা বকশিশ খুব চলে—এই তো আমায় এইখানকার লোকে বলে। আমিও প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু এখন আর তেমন অবিশ্বাস করি না। কেন না, কতকগুলো ঘটনা যা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাতে আর আমার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন এর উপায় কি, জিজ্ঞাসা করেছ। এর উত্তরটা বড় সহজ নয়। উপায় যে একেবারে নাই, তাও আমি স্বীকার করি না। উপায় আছে, চেষ্টা করলেই হয়। সহজ না হতে পারে। কিন্তু সব কাজই যে সহজ হবে—এ রকম আশা করাও অন্যায়। আমাদের দেশে আইন ছিল এবং এখনও আছে। যদিও এর অনেক আইন ইংরেজের তৈরি, তবুও দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্যে ইংরেজের আইনই হোক

আর স্বদেশী আইনই হোক, আইন যদি সমাজের মঙ্গলের জন্যে হয় ও সে আইনগুলো যদি খাঁটি নিরপেক্ষভাবে চালানো যায়, তবেই দেশের ও সমাজের মঙ্গল আশা করা যেতে পারে। আমরা তা করছি না। আইন যেখানে চালানো উচিত, সেখানে আমাদের অবহেলা; আবার অনেক সময় এ রকমও দেখা যায় যে, যেখানে আইন না চালালেই বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত, সেখানেই আমরা প্রাণপণে আইনের চরম চালাতে চেষ্টা করি।

তুমি যে কলকাতার মেয়েদের উপর গুলি-চালানোর কথাটা শুনেছ, ওটাকেই হয়তো একটা উদাহরণ দিতে পারি। আমেরিকার কাগজে হয়তো একটু অতিরঞ্জিত হয়ে ও-খবরটা বেরিয়েছিল, তাই তোমাদের এত লেগেছে। আমি ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছি না। বরং ওইটাকেই আমি আমাদের নেতাদের 'অল্পবুদ্ধিতার' পরিচয় ব'লে মনে করি ও তোমাকেও তাই বলতে চেষ্টা করছি। এ নিয়ে আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি ও খানিকটা তর্কযুদ্ধও করেছি। যারা এই দুর্যোগে পুলিসের গুলি-চালানো ও মেয়েদের গুলি করা সমর্থন করেন, তাঁদের এর বেলায়ই আইন পুরামাত্রায় বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা। তা নইলে দেশ, সমাজ ও আমাদের সর্বস্ব যেন বঙ্গোপসাগরে ডুবে যেতে পারে। ভেবে দেখ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবক-যুবতী যদি প্রেসেশন ক'রে কলকাতার রাস্তায় বেরোয়, তবে বুঝি কলকাতা শহর তার হাজার হাজার পুলিস, হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত গোলা-গুলি বোমা-বন্দুক সমেত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই রকম হ'ল তাদের মত। এবং দেশ ও সমাজ রক্ষা করতে তারা তখনই কোমর বেঁধে লেগে যেতে চান। যাতে যুবক-যুবতীরা আইন ভাঙতে না পারে—এই হয়েছিল তাদের জেদ; যাতে ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে প্রেশেসন না করতে পারে—এই হয়েছিল তাদের সংকল্প। এই হ'ল এ দলের মত। তাঁরা বলেন যে, অল্প কটি মেয়েকেও যদি একটা ছোট আইন ভাঙতে দেওয়া হয়, তবে বড় আইন ভাঙতে কতক্ষণ? হয়তো এতে খানিকটা সত্যও আছে। কিন্তু ওঁদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে

নেতা যে নিত্যই এ রকম আইন ভাঙছেন, সে কথা কি একেবারে ভুলে যেতে বলেন? তখন কেন আইনের চরম—চরম দূরের কথা—একটু কণাসমও চালাবার চেষ্টা হয় না?

যাক, আমি যুবক-যুবতীদের আইন ভাঙতে বা ১৪৪ ধারা ভাঙতে প্রশ্রয় দিতে চাইছি না, শুধু বলছি এই যে, যেদিন একদল যুবক-যুবতী ঐ রকম একটা প্রশেসন ক'রে যাচ্ছিল, সেদিন পুলিস তাদের গ্রেফতার করতে পারত, জেলে দিতে পারত। গুলি করাই কি একমাত্র ঔষধ? বলতে পার যে, কত লোককেই বা জেলে জায়গা দেওয়া যায়? তা ঠিক, ইংরেজের আমলেই অনেকটা সেই রকম হয়েছিল, জেল সব ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা আনন্দে জেলে যেতাম, আরও আনন্দে বলতাম—দেখি ইংরেজ, তোমার জেলে কত জায়গা আছে? সব দেশটাই জেলে পরিণত হবার মত হয়েছিল। তার কারণ, আমরা চেয়েছিলাম যা আমাদের ন্যায্য দাবি—অর্থাৎ স্বাধীনতা; আর ইংরেজ চেয়েছিল যা তাদের অন্যায্য দাবি—অর্থাৎ আমাদের অধীন রাখতে। সমস্ত জগৎ বুঝেছিল যে, সে বিবাদে গভর্মেণ্টই দোষী—ভারতীয়রা নির্দোষ। তাই নিরস্ত্র ভারতীয়রা অতবড় প্রবল ইংরেজ-শক্তিকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

আমাদের বর্তমান গভর্মেণ্ট এবং যাঁরা এঁদের বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে, তাঁদের সম্বন্ধটা যে কেমন সেইটা বুঝতে চেষ্টা কর, তা হ'লেই সহজে বুঝতে পারবে যে, মেয়েদের উপর গুলি-চালনোর ব্যাপারে কার দোষ। ইংরেজ যেসব অত্যাচার করত, তা তাদেরই পক্ষে নিতান্ত দরকার ছিল। নইলে তাদের এ দেশে থাকাই অসম্ভব হ'ত। তাই তারা একমাত্র দমননীতিই জানত। বর্তমান স্বাধীন গভর্মেণ্ট ইংরেজের সেসব নীতি নকল করলে ফল হবে বিষময়। বুঝেই দেখ, কি হচ্ছে! আমাদের ও আমাদের শাসকদের মনোবৃত্তি বদল করা নিতান্ত দরকার, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, তা নইলে সারা দেশময় আগুন জ্বলাও অসম্ভব নয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

পূর্ব-পাকিস্তানে গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আরব্ধ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দুস্থানে আরব্ধ এলোপাথাড়ি প্রত্যক্ষ জবাব দানের ফলে উভয় অংশের সংখ্যালঘুদের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত একপ্রকার ঠাণ্ডা-যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। আমাদের অংশে শিল্পে বাণিজ্যে ফ্যাক্টরিতে কারখানায় মাঠে ঘাটে অপরিহার্য অভিজ্ঞ মুসলমান কর্মীদের ভীতিমূলক অসহযোগিতায় এই মাসাধিক কালের মধ্যে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া হিন্দুস্থান-পাকিস্তান চুক্তিকে ব্যবসায়ী মাত্রেই মুক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন এবং অনুভব করিতেছেন রাষ্ট্রগতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা সম্ভব হইলেও ভারতবর্ষের পক্ষে মুসলমান-বর্জন অসম্ভব ও কল্পনাতীত। কৃষি, মৎস্যব্যবসায়—বাংলা দেশের পক্ষে এই দুইটি প্রধান ব্যাপারে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ মুসলমান কর্মীদের উপর নির্ভরশীল। ছোটখাট অসংখ্য কারুশিল্পে তাহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। আমরা রাগ বা অভিমান করিয়া কিছুকাল অনাহারে থাকিতে পারি অথবা শিল্পগুলির সাহায্য না লইতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি ও কারুশিল্পের মর্যাদাবোধ আমাদের মধ্যে পুরাপুরি না জাগ্রত হইতেছে, অর্থাৎ আমরা হাতে-কলমে সকলপ্রকার কাজের কাজী না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কিছুতেই সফল হইবে না; স্বপ্ন দেখাটাই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। নূতন চুক্তি যদি কার্যকরী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রয়োজনও হইবে না।

আমাদের ব্যবসায়ে আমরা ভুক্তভোগী বলিয়াই এই কথা জোরের সঙ্গে বলিতে পারিতেছি। পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যাপারে হিন্দুরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কর্মীদের অনুপস্থিতি এই ব্যবসায়ে প্রচণ্ড ঘা দিয়াছে; যথাসময়ে পত্রিকা-প্রকাশ তাই কিছুতেই সম্ভব হয় নাই। আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি। চৈত্রের পত্রিকা আজ ৯ই বৈশাখেও বাহির করিতে পারি নাই।

তাই সম্প্রকৃত চুক্তিতে আমরা আনন্দিত হইয়া আশা করিতেছি, পলাতকদের প্রত্যাবর্তনে আমরা আবার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করিতে পারিব। আমরা আমাদের বর্তমান নববর্ষের চিন্তাধারা চৈত্রের সংখ্যাতেই লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি বলিয়া এই জবাবদিহি করিলাম।

নববর্ষ

মাত্র দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন বাঙালীর জীবনধারাকে এমন বিপর্যস্ত করেছিল যে, আমাদের বঙ্গাব্দের শুভ নববর্ষ দিবসটি কোনও গতিকে পাঁজির পাতায় এবং পুরাতনপন্থী ব্যবসায়ীর গদির হালখাতায় এসে ঠেকেছিল; সন-তারিখের হিসেবে ইংরেজের সাহায্যে আমরা প্রায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য, মানে ইউরোপ-আমেরিকার দলে ভিড়েছিলাম—ছিলাম কেন, এখনও ভিড়ে আছি। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে সুবিধা আমাদের কম হয় নি, ইংরেজী ভাষার মত এই পাশ্চাত্য ক্যালেণ্ডারও আমাদের অনেকখানি বিশ্বমুখীন ক'রে তুলেছে। যে পঞ্জিকামতে আজ আমাদের নববর্ষের শুভদিন, সে শুধু অর্বাচীন নয়—বৈদেশিকও। মুসলমানী হিজরীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের অনুশাসন জড়িয়ে বাংলা দেশে এই তথাকথিত বাংলা সন প্রচলিত হয়েছে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ও বাংলা ছাড়া আরও যে নটি বছর গণনার রীতি চলে অর্থাৎ সম্বৎ, শক, মুলকি, মাগি, বর্মী, ইয়াজদেজার্দি, ফসলি, নওরোজ ও হিজরী—কারও সঙ্গে এই বাংলা সনের মিল নেই, এ এক অদ্ভুত খিচুড়ি-পাকানো ব্যাপার।

কিন্তু তা হ'লে কি হয়, ব্রিটিশের সঙ্গে স্বাধীনতা-লাভের সংঘর্ষে আমাদের মনে যে জাতীয়-চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, তার ফলে আমরা এই বাংলা পঞ্জিকাকেও ভালবাসতে শিখেছি এবং শুভ পয়লা বৈশাখে নববর্ষকে ঘটা ক'রে আহ্বান ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ একেবারে সম্পূর্ণ বাঙালীর ঘরোয়া জিনিস; স্বদেশী আমল থেকে এর মহিমা ধীরে ধীরে বাঙালীর মনে বদ্ধমূল হতে আরম্ভ হয়ে আজ একটা রীতিমত জাতীয় উৎসব-দিনে পরিণত হয়েছে। এই দিনটিকে আরও সার্থক, আরও স্মরণীয় ক'রে তুলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, গানে

কবিতায় বক্তৃতায় প্রবন্ধে—নানা ভাবে তিনি এই দিনটিকে জয়যুক্ত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখের উৎসবকেও শুভ পয়লা বোশেখে টেনে এনে বাঙালীর মনে নববর্ষের এক নতুন সংজ্ঞা জাগিয়ে দিয়েছেন। যদি বলি, এই উৎসব-দিনটি বাঙালী জাতিকে রবীন্দ্রনাথের দান, তা হ'লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আমাদের আত্মশক্তিকামী জাতীয় নেতারাও সহযোগিতা করেছেন কবির সঙ্গে, এই দিনটিকে সর্বত্র জাতীয় শক্তি ও সংহতির বিশেষ চর্চা ও প্রদর্শনীর দিন ক'রে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে ময়দানে ময়দানে পার্কে পার্কে আর আখড়ায় আখড়ায় এই দিনে ছেলেমেয়েরা সংঘবদ্ধ ভাবে ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ করে, একজাতীয়ত্বের মহিমা প্রচার করে, সমবেতকণ্ঠে গায় জাতীয় সঙ্গীত, দুর্বল নির্বীর্য আশাহতের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা; এই দিনটিকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালী মনে মনে ভাবে

> "বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
> বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥"

ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর এই ভাবনা রূপ নিয়েছিল কঠিন আত্মবলিদানের সাধনায়, ইংরেজী ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট তারিখে সেই বাঞ্ছিত স্বাধীনতা এল ভারতবাসীর আয়ত্তের মধ্যে, কিন্তু তার জন্যে শেষ চরম মূল্যও দিতে হ'ল বাঙালীকে; দ্বিখণ্ডিত হ'ল বাংলা দেশ—হিন্দু-বাংলায় এবং মুসলমান-বাংলায়।

"আঁধার রাতে কাল-পেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চললেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হলেন।...বললেন, এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান করছে; থাক্, এদের দু'দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে যাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিন্দু। এরা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই ব'লে: তিনি বাঙালীকে দু'দল ক'রে দিলেন —[illegible]

গেল মোছলমান। পুবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাকৃল হিন্দু।"—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'।

তারপর ঘোরতর দুর্যোগের মধ্যে দু-দুবার এল বাঙালীর শুভ নববর্ষ, কিন্তু উৎসব জমল না। আত্মীয়বিচ্ছেদ-বিরহের দীর্ঘশ্বাসে আর হাহাকারে মথিত হয়ে উঠল বাংলার আকাশ বাতাস; পরস্পর বিশ্বাস হারাল বাঙালী, হারাল আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি; একই সম্পূর্ণ অবয়বের দুই অঙ্গ ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হয়ে কালো হয়ে গেল। ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত ভাগ সর্বধ্বংসী আগুনের ভয়াবহ পূর্বাভাসের ধোঁয়ায় হয়ে গেল আঁধার। তার পরে দেখতে দেখতে আবার ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে লেলিহান হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি; জ্ব'লে পু'ড়ে খাক হয়ে গেল বাংলা দেশ; এ-পার থেকে ও-পারে বানের মুখে ছিন্নমূল তরুর মত ভেসে যেতে লাগল বাঙালী, তারপর দূরে—আরও দূরে বাংলা দেশ ছাড়িয়ে—নবজীবনের মধ্যে, না, নিশ্চিহ্ন অবলুপ্তির মধ্যে, কে জানে!

এই ভীষণতম দুর্যোগের নিরন্ধ্র তামসীময়ী অমারাত্রির মধ্যে আজ আবার এসেছে বাঙালীর নববর্ষ—শুভ পয়লা বৈশাখ। সমস্ত শিব, সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত শুভকে ভস্মসাৎ ক'রে দাবাগ্নি জ্বলছে বাংলার অরণ্যপ্রান্তরে, আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের দামামাধ্বনি স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল কান পেতে থাকলেই শোনা যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ গৃহচ্যুত আশ্রয়ছিন্ন বাঙালী উন্মুক্ত প্রান্তরে কালবৈশাখীর নির্দয় আঘাত সহ্য করবার জন্যে অসহ্য প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, অনশনব্যাধিক্লিষ্ট আত্মীয়-আত্মীয়ার পীড়ন অত্যাচার লাঞ্ছিত বান্ধবদের মধ্যে ভীতচকিত বাঙালীর নববর্ষ আবার এল—কোন্ দেবতার পূজায় আজকের এই সর্বনাশা উৎসব বাঙালী সম্পন্ন করবে?

জাতির কর্ণধারেরা পথের সন্ধান করছেন, বাঙালীর এই চরম দুর্দিনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ—আমরা কি শুধু পা ছড়িয়ে কাঁদতেই থাকব? কর্মভ্রষ্ট উদ্যমভ্রষ্ট বাঙালীর মনে আজ এই ধিক্কার জাগাতে হবে। তাকে বার বার শোনাতে হবে বিশ্বকবির, বাঙালী কবির, ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শুভ নববর্ষের মহতী বাণী—"প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত

এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনও মতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্মের সাধনা, মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে ব'লে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্যেই তার উপরে এত দাবি, এই জন্যেই নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব ক'রে চলতে হয়, এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসংবরণ।

"মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত ক'রে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত ক'রে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আরেকটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ করো,—তুমি মুক্ত হও, তুমি বদ্ধ থেকো না···

"এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র—সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বলকণ্ঠে বলি, আমার বল নেই, সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা ক'রে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শাণিত অস্ত্র সব ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছে। সে সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ সমস্ত তো সঞ্চয় ক'রে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বাহির হতে হবে। এস, এস, দলে দলে বাহির হয়ে পড়—নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয় ভেরি বেজে উঠছে—সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে প'ড়ে যাক, জয় হোক তোমার···

"না, না, এ শাস্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্ন ভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে। মনুষ্যত্ব লাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ ক'রে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে, এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ কর।"—'শান্তিনিকেতন', ২য় খণ্ড।

বাঙালীর এই একান্ত নিজস্ব নববর্ষের উৎসবদিনে সে স্বভাবতই একটু আত্মকেন্দ্রিক হয়, একটু বেশি বাঙালীয়ানা প্রকাশ করে, এবারে তার সেই অহমিকায় ঘা পড়েছে; তার সত্য লাঞ্ছিত, শিব আহত, সুন্দর ক্ষতবিক্ষত। সে জীর্ণচীর ভিখারীর বেশে আজ পথের দু ধারে এসে দাঁড়াচ্ছে, দলে দলে কাতারে কাতারে। এই দুর্দশা-দুঃখদৈন্য-পীড়িত আর্তদুর্গত বাঙালীকে করতে হবে আত্মস্থ, সংঘবদ্ধ, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কঠিন সাধনা শুরু করতে হবে আজ থেকে। শুধু পঞ্জিকামুখী হয়ে অদৃষ্টের ওপর নির্ভর ক'রে বাঙালী নিজের লাঞ্ছনাকে অনেক দূর টেনে এনেছে, সে আজ শুধু দ্বিধাবিভক্ত নয়, এ-পারে ও-পারে দুপারেই সহায়-সম্বলহীন পরমুখাপেক্ষী। তার সৈন্য নেই পুলিস নেই, ব্যবসা নেই বাণিজ্য নেই, চাকরি নেই প্রতিষ্ঠা নেই, মুটে নেই মজুর নেই, চাষী নেই তাঁতী নেই, নাপিত নেই ধোপা নেই—আছে শুধু কয়েক লক্ষ কেরানী আর ইস্কুল-মাস্টার। শুধু এই সম্বল নিয়ে বাঙালীর অহঙ্কার-অভিমান বজায় থাকতে পারে না, আজ ক্যান্টিন আর আশ্রয়-শিবিরের ধুলোয় তা গড়াগড়ি যাচ্ছে। যে দুটি বস্তুর অভাবে সর্বনাশ শুরু হয়েছে বাঙালীর, সেই দুটি মহৎ বস্তুর পুনঃসন্ধানে বাঙালীর অভিযান শুরু হোক আজ নববর্ষে, বাঙালী ফিরে পাক চরিত্র, ফিরে পাক শৃঙ্খলা। শুধু বাক্‌সর্বস্ব সমালোচক হয়ে, পরের খুঁত ধ'রে, আত্মপ্রসাদ লাভ করবার দিন আর নেই। সারা ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে জ্ঞানের পথে কর্মের পথে—মার-খাওয়া বাঙালী কি শুধু কাঁদবে, শুধু নালিশ জানাবে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঠায় ব'সে থাকবে? এই সব বাঙালীর একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাক আজ নববর্ষের শুভদিনে, মৃত্যু অথবা মুক্তি—এই হোক আমাদের নববর্ষের পণ।

এই আশ্রয়চ্যুত গৃহহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান বাঙালীদের কর্তব্য কি—এই চিন্তাই এ বছরের নববর্ষের উৎসবকে ভারাক্রান্ত ও ম্লান ক'রে রেখেছে ; কিন্তু এই নিদারুণ সমস্যা সমাধান করবার মত শক্তি এবং সামর্থ্য আমরা অর্জন করি নি। এই বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করবার সাধ্যও একা বাঙালীর নেই। আজ নববর্ষে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা পরিহার ক'রে বাঙালীকে মনেপ্রাণে ভারতমুখী হবার দীক্ষাও গ্রহণ করতে হবে, প্রদেশকে একাত্ম হতে হবে কেন্দ্রের সঙ্গে। হয়তো শেষ পর্যন্ত যে বৃহত্তর পরিণতির মধ্যে এই সমস্যার সত্যকার সমাধান নির্ভর করছে, তার জন্যে প্রস্তুতি চাই, এবং সে কাজে অগ্রণী হতে হবে বাঙালীকে। আজ নববর্ষে সেই ইঙ্গিতপূর্ণ ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে আহ্বান করতে হবে।

মনে মনে অনুভব করতে হবে বাঙালীকে যে, তার এই শোচনীয় দুর্দশার মূল কারণ বাঙালী জাতির মধ্যেই সঞ্চিত হয়েছে যুগ যুগ ধ'রে, বাইরের কোথাও কারণ খুঁজতে গেলে ভুল হবে। মহৎ আদর্শের প্রতি সে সম্মান হারিয়েছে, নিজের গৌরবময় ঐতিহ্যের মর্যাদাও তার কাছে নেই, সে অলস, কর্মবিমুখ, পরনির্ভরশীল, ঈর্ষা-কলুষিত আত্ম-কলহে জর্জর। তার প্রাণশক্তি দলাদলির কোন্দলে নিত্য ক্ষীয়মাণ ; অভিভাবকেরা আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে ব'লে জাতির ভবিষ্যৎ-আশা-ভরসা তরুণ-তরুণীরাও উচ্ছৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতাহীন, শিক্ষার দোষে সুমুখের পথ অবরুদ্ধ ব'লে ভালমন্দ সব কিছুকেই তচনচ ক'রে নিজের কল্যাণ নিজের পায়ে দলে তারা এগিয়ে যেতে চায়, ছিন্নমস্তার মত নিজেকেই ছিন্নশির ক'রে নিজের রক্তধারা পান ক'রে তারা উল্লসিত, বহুদিনের পাপচক্রে ভ্রাম্যমাণ বাঙালী আজ পতিত, এবং পতিত ব'লেই লাঞ্ছিত। এই লাঞ্ছনা তার প্রাপ্য, অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে নিদারুণ আত্মঘাতের মধ্যে, আজ নববর্ষে আমরা যেন অনুভব করতে পারি, এই পাবকদাহন আমাদের কল্যাণের জন্যে আরম্ভ হয়েছে ; বিধাতার রোষ নতমস্তকে গ্রহণ করলে আমরা অচিরাৎ শুদ্ধ হব, নির্মল হব।

সর্বশেষে স্মরণ করছি বাঙালীর আশা ও গৌরবের স্থল বাঙালী

কবি রবীন্দ্রনাথকে—আজ তাঁর শুভ ঊননবতিতম জন্মদিনের উৎসব। তাঁর কল্যাণস্পর্শ আমাদের জীবনে আমরা পেয়েছি, তাঁর মাভৈঃ বাণী এখনও আমাদের সঞ্জীবিত করবে, তিনি যে মহৎ ঐশ্বর্য ভবিষ্যতের বাঙালীকে উত্তরাধিকারী ক'রে রেখে গেছেন তার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে দেবার কাজ বাঙালীরই; সেই বাঙালী যদি এই সঙ্কট উত্তীর্ণ না হতে পারে, তা হ'লে বাংলার নয়, ভারতের নয়, বিশ্বের অকল্যাণ ঘটবে। সেই সর্বনাশ থেকে ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে রক্ষা করবেন। আজ কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা যেন বলতে পারি—

"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।
শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥"

—

"বাংলা সাহিত্যে গুপ্ত-গবেষণা" লইয়া আমরা একটি যুগান্তকারী থীসিস লিখিতেছি। কাজ অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছে কথাটা মুখে মুখে চাউরও হইয়াছে। পাছে কেহ আমাদের সুচিন্তিত

বিষয়বস্তুটি মারিয়া দেন, এই আশঙ্কায় আমাদের গবেষণার কথা সাধারণের গোচরে আনিয়া বেসরকারী পেটেণ্ট করিয়া রাখিতেছি। এই গুপ্ত-গবেষণার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরে', তাহার পর দীর্ঘ এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বহু গুপ্ত উপগুপ্ত ডি-গুপ্তের সহায়তায় (সেন দাশগুপ্তেরাও গুপ্তবংশে ইনক্লুডেড) ইহা এখন মহা-মহীরুহের আকার লইয়াছে; আমাদের গবেষণাটি প্রকাশিত হইলে পাঠকেরা বিস্ময় বোধ করিবেন। গুপ্ত-গবেষণার শেষ মহত্তম "অবদান" হইতেছে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের। তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত 'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ' হইতে নমুনাস্বরূপ একটি গুপ্ত-গবেষণা দাখিল করিতেছি। "নিবেদনে" গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "মদ্যপানের ফলে সমাজ নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে কেশবচন্দ্র 'সুরাপান নিবারণী সভা' আশাবাহিনী (Band of Hope) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা মদ-না-গরল নামক পত্রিকা প্রচার তাঁহার অসাধারণ মনের বলের ও দুর্জয় সাহসের পরিচায়ক। 'আশাবাহিনী' বিনামূল্যে বিতরিত হইত।" উদ্ধৃত অংশের ভাষা-সৌষ্ঠব দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে তরুণ কর্মীদল মদ্যপাননিবারণে প্রচারকার্য চালাইতেন, তাঁহাদিগকে আশাবাহিনী বলিত। মানুষ পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। এইখানেই গুপ্ত-গবেষণার মাহাত্ম্য। যাহা হউক, শুধু ট্রেলার দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ফুল লেংথ ছবিও আমরা দেখাইব।

—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় গতানুগতিক পুনর্মুদ্রণের পক্ষপাতী নহেন, আজ পর্যন্ত নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফল তিনি সম্পাদকীয় টীকায় ব্যবহার করিয়াছেন; ইহাতেই নূতন সংস্করণটির মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত 'পরিষৎ-পরিচয়ে'র প্রকাশে পরিষদের বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিককালের কার্যাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচয় আসলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির পরিচয়। পরিষৎ-পত্রিকার বিগত ৫৮ বৎসরের প্রবন্ধ-তালিকা এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি করিয়াছে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড অত্যল্পকাল মধ্যে প্রকাশ করিয়া পরিষৎ যে কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য। এই খণ্ডে বাংলা দার্শনিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'যজ্ঞকথা' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

'শনিবারের চিঠি'র ১৩৫৬ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সং... যাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের অবগ...র জ... জানাইতেছি যে, আষাঢ়-শ্রাবণ কয়েক সংখ্যা আমরা সংগ্রহ করি... পারিয়াছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : কলিকাতা-৪

"বনফুলে"র

স্বপ্ন-সম্ভব

হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই উপন্যাসে সত্যকার মিলনের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তিন টাকা

অগ্নি

অগ্নিযুগের উপন্যাস। দুই টাকা

সপ্তর্ষি

বাংলা দেশের রাজনীতি এই উপন্যাসের পটভূমি। সাড়ে তিন টাকা

সে ও আমি

উপন্যাস আড়াই টাকা

দ্বৈরথ

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

নূতন টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

কিছুক্ষণ

ষ্টেশনপ্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

প্রথম খণ্ড। চার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড। চার টাকা
তৃতীয় খণ্ড। সাড়ে ছয় টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধাত্রীদেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। সাড়ে চার টাকা

প্রসাদমালা

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

দুই পুরুষ

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন আদৃত নাটক। দুই টাকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চি[ত্র]। আড়াই টাকা

সন্দীপন পাঠশালা

উপেক্ষিত শিক্ষক-জীবনের কাহিনী। সাড়ে তিন টাকা

রসকলি

মনের উপর দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাতজাত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

রাইকমল

প্রেমিক বৈষ্ণবীর দুঃখময় প্রেম-কাহিনী। দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমা[বেশ]

*

শ্রীআর্যকুমার সেনের

...বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২।৵০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৫৲ ও ২৸৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৸০ ও ৩৸৵০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১০ ভি. পি.তে ।৵০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায় ...কালে ভি. পি. করিয়া পাঠানো হইবে না ; চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে
... ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪ : ফোন—বড়বাজার ৩৩৭

সায়ামের সুখং উপত্যকায় এবার
হাঁসেরা এল না শীতের সময়…

কেন? কী অসাধারণ ঘটনা ঘটলো সেই দুর্গম দেশে? সামান্য সূত্র ধরে ঘনিয়ে এলো বিপদের সংকেত, ষড়যন্ত্রের গভীর নিশানা! খবর কিছু জবর নয়, তবু কান খাড়া হয়ে উঠলো মামাবাবুর! সামান্য খটকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আন্তর্জাতিক রহস্য! আজগুবি গল্প নয়, ঠিক সত্যির মতো। প্রেমেন্দ্র মিত্র সিদ্ধহস্ত এরকম লেখায়, সহজ অথচ রহস্যময়, স্বাভাবিক অথচ রোমাঞ্চকর।

"ড্র্যাগনের নিশ্বাস"এর ম্যাপ ও জীবন্ত ছবি দেখে ছোটোরা খুব খুশি হবে। চীনা লাল ও চীনা হলুদ রঙের বিচিত্র মলাট। মজবুত বাঁধাই। দাম ২৷৹

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট প্রেস: ১০৷২ এলগিন রোড কলিকাতা-২০




CAUTION
SEE THAT THE
INNER LID
UNDER THIS
IS INTACT
LIPTON'S
FINEST DARJEELING TEA
LIPTONS BUILDINGS
CALCUTTA
লিপটনের
মানে
ভালো চা